ফার্স্ট পার্সন
২

ফার্স্ট পার্সন
২

ঋতুপর্ণ ঘোষ

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা
নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচি

প্রথম খণ্ডে আছে
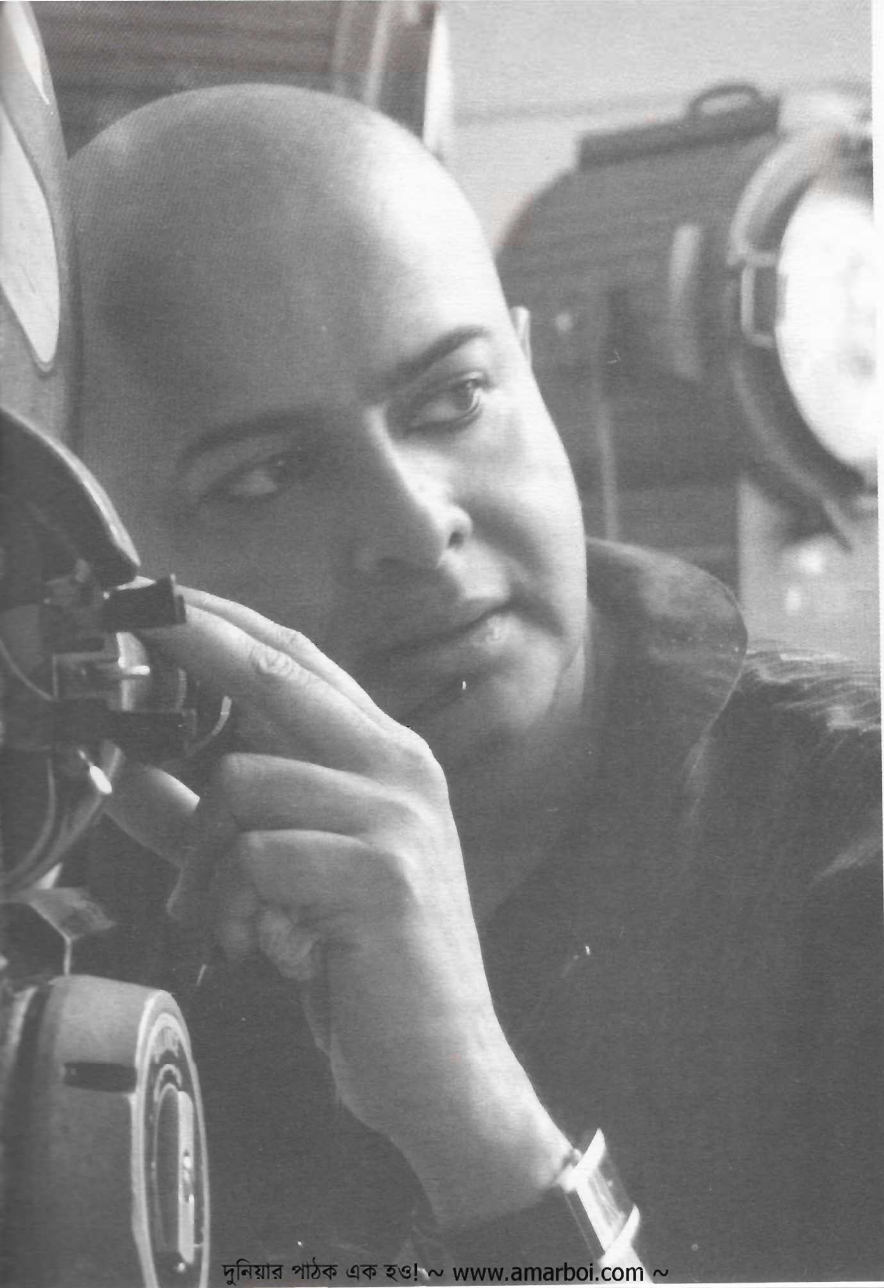
জীর্ণ বসন ত্যাগ করে নতুন বেশ ধারণ করে যে আত্মা সে যুগ যুগ ধরে অনুভবের অগ্নিতে দীপ্র, প্রোজ্জ্বল্যম-ঋান।

সেই অবিনশ্বর আত্মাই কি প্রেম?

সমস্ত হানাহানির মধ্যেও যে অক্ষত, সমস্ত হিংসার মধ্যেও কোমল, সমস্ত দাবানলের মধ্যেও যে অদাহ্য, আলোকময়।

শীতকে বিদায় দেওয়ার উৎসবই কি বুড়ির ঘর পোড়ানো? শুকনো বাদামি পাতার জঞ্জালের মধ্যে দিয়ে নতুন প্রাণের সূচনা! যে প্রাণ নানা রঙে, নানা আভায় পরিপূর্ণ, সুন্দর।

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন মারা গিয়েছিলেন এরকমই একটা সময়ে। কালের এবং বছরের। প্রেম এবং ঋতুচক্রের।

তাঁর মৃত্যু স্মরণিকা তিথি পালন করার দিনটাই ছিল ভ্যালেন্টাইনস ডে—মার্চ মাসের কোনও একটা দিন।

এই প্রেমের পুরোহিতের গোপন চিরন্তন ইষ্টমন্ত্র উদযাপন করার তারিখটি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ইওরোপের ক্যালেন্ডার জুড়ে।

মার্চ মাসে। ইওরোপে তখন বরফ গলার সময়। ঘোড়ার গাড়ি বা স্লেজ-এ করে ডাক পৌঁছোত মহাদেশের নানা কোণে। তাই হাতে সময় নিয়ে ভ্যালেন্টাইনস গ্রিটিংস ডাকে ফেলবার শেষদিনের সময় বেঁধে দিয়েছিল ইওরোপের ডাক বিভাগ। চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি।

তারপর একসময়, ঠিক পাতা ঝরার নিয়মেই ফেব্রুয়ারির সেই তারিখটা হয়ে দাঁড়াল সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে।

প্রণয় সংবাদ পাঠানোর বসন্তদিন।

কয়েক শতাব্দী পরে অন্য এক মহাদেশে এমনই এক মাঘীপূর্ণিমায় গঙ্গাতীরের এক ছোট ন্যায়তীর্থ নবদ্বীপে জন্মালেন এক নতুন প্রেমের অবতার। যে প্রেম সহজ বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মণ্য শাসনতন্ত্রের সমস্ত ভঙ্গুর আলপথ।

কয়েক বছর আগে, হীরের আংটি'র পরপরই একটা চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেছিলাম

চৈতন্যজীবন নিয়ে। ইসকন সেই ছবিটির সম্ভাব্য প্রযোজক ছিলেন।

প্রথম দশ পাতা পড়ার পর তাঁরা চিত্রনাট্যটি বাতিল করেন। তাঁদের মনে হয়েছিল এ ছবির দৃষ্টিভঙ্গি নিছক শিল্পীর। ভক্তের নয়।

তারপর ছবিটি আর করা হয়ে ওঠেনি। একটা বড় কারণ অবশ্যই অর্থানুকূল্যে। বাংলা ভাষায় এই মানের ছবির খরচ এবং তার বাজার।

জানি না, ছবিটা কখনও হবে কি না। তাই সেই চিত্রনাট্যের প্রথম দশপাতা আজ পাঠকদের জন্য সাজিয়ে দিলাম। ছবিই হোক, বা লেখাই—ভাগ করে নেওয়াটাই তো আসল কথা।

আপনাদের বসন্তোৎসব সুন্দর হোক।

কোথায় পাব তারে

এক

ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ প্রায়। নবদ্বীপের পশ্চিমদিকের গঙ্গার এই ঘাটে রোদের তেজ সূর্যাস্তের পরেও কিছুটা থেকে যায়। আজ বেলা শেষে মেঘলা আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়া নরম সোনালি আলোয় ঘাটের সিঁড়ির লম্বা লম্বা ছায়া—তারই একধারে অন্তিমশয্যায় চক্ষু বুজে শুয়ে ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ বিপ্র রামকিঙ্কর। শুয়েছিলেন না বলে শুইয়ে রাখা হয়েছে বলাই ভালো, কারণ রামকিঙ্কর চলচ্ছক্তিহীন—দিনদশেক পূর্বে তাঁর পরিবারের সকলে মিলে ঢাকঢোল সহযোগে তাঁকে এই গঙ্গার ঘাটে অন্তর্জলী যাত্রায় শুইয়ে রেখে গেছে। কবিরাজমশাই বলেছেন—রামকিঙ্করের আয়ু বাকি আর মাত্র কয়েকদিন।

ঘাটের নানাবিধ কোলাহলের সঙ্গে গত দশদিন হল যুক্ত হয়েছে ঢাক এ ঢোলের অবিরত বাদ্য। বাদকরা নিয়মত রামকিঙ্করকে প্রদক্ষিণ করে মহা-আড়ম্বরে ঢাক্‌ঢোল বাজয়ে চলে—তাদের এই উচ্ছ্বাসের বেগ সাধারণত আরও প্রবল হয় প্রত্যহ সকালে বা বিকেলে রামকিঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমাকিঙ্কর পিতাকে যখন দেখতে আসেন।

অদূরে ঘাটের সারি সারি সিঁড়ির ওধারটা একটু নির্জন। সেখানে বসে নিবিষ্ট মনে নৌকায় আলকাতরা মাখাচ্ছিল দুই মাঝি—ভজন ও পরাণ। ভজনের বয়স হয়েছে। আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নবদ্বীপের এই ঘাটে খেয়া পারাপার করতে করতে নানা নিত্যনৈমিত্তিকতায় ক্রমশ অভ্যস্ত। কোনও কিছুই আর নতুন করে তার কৌতূহল উৎপাদন করে না। পরাণ অল্পবয়সী—পেশায় এসেছেও বেশিদিন নয়। ফলে চারপাশের খুঁটিনাটি সম্পর্কে এখনও তার আগ্রহ তেমন স্তিমিত হয়ে আসেনি। দূরে রামকিঙ্করের অন্তর্জলীর দিকে তাকিয়ে প্রায় নিজের মনেই বলল—

পরাণ : এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেল, জানো!

ভজন : দাঁড়া। সবে তো একটু আগে পূর্ণিমা লাগল। ছাড়তে দে।

পরাণ : ও কিছু হবে না, দেখো। একাদশীর দিনও তো সবাই বলল 'আজ যাবে আজ যাবে'—কিছু হলো? দিব্যি আছে। দশদিন আগে যখন এসেছিল আর আজ, কোনও তফাৎ দেখছ?

ভজন : আছে আছে। পুণ্যির তফাৎ। এই যে দশদিন ধরে অষ্টপ্রহর গঙ্গার ধারে পড়ে রয়েছে, তার একটা পুণ্যি আছে না?

পরাণ : গঙ্গার পাড়ে পড়ে থাকলে পুণ্যি হয় বুঝি?

ভজন : হয় না? তবে আর লোকে অন্তর্জলীতে আসে কেন?

পরাণ কিছুটা বিস্ময়ে কিছুটা আক্ষেপে স্বগতোক্তির মতো করে বলে।

পরাণ : তা হলে যে আমরা সারা বছর ধরে রাত নেই দিন নেই গঙ্গার বুকে নৌকো বাইছি, আমাদের তো অ্যাদ্দিনে সশরীরে সগ্গে যাওয়ার কথা।

ভজন : বামুন হতে যেতে, পৈতে থাকলে যেতে...

ভজনের কথার মাঝখানে পরাণ হঠাৎ লক্ষ্য করে ঘাটের পিছল সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে নেমে আসছে রামকিঙ্করের পুত্র উমাকিঙ্কর। সেদিকে চেয়ে প্রায় নিজের মনেই পরাণ বলে ওঠে—

পরাণ : এ বোধহয় বড় ছেলে না!

ভজন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে উমাকিঙ্করকে দেখে নেয়।

ভজন : প্রথম পক্ষের। আজ এত সন্ধে করে এলো?

পরাণ : এটারই একটু বাপের ওপর ভক্তিছেদ্দা আছে। রোজ তবু একবার দেখতে আসে।

ভজন : একবার না দুবার। একবার সকালে, একবার সন্ধেয়।

পরাণ : (তির্যকভাবে) বা-ব্বা! এদিক নেই ওদিক আছে। দু-বেলা? এই অতিভক্তি মানেই দেখো গে যাও—দলিল টলিল সই করাবে।

ভজন : আসে, পুরনো পৈতেটা খোলে, গঙ্গাচান করায়, নতুন পৈতে পরায়-বাড়ি চলে যায়।

পরাণ : (সবিস্ময়) পৈতে পরায়? এখন? এই ঘাটে যাওয়ার সময়? কেন, বুড়োর ছেলেবেলায় পৈতে হয়নি?

ভজন : শুয়ে শুয়ে বাহ্যি-পেচ্ছাপ করছে না রোজ! পৈতে অশুচি হচ্ছে না? তাই সকাল বিকেল এসে পৈতে পরিয়ে দিয়ে যায়।

পরাণ : তা এই ভর সন্ধেবেলা বুড়ো মানুষটাকে গঙ্গাচান করাবে, তারপর সারারাত ভিজে কাপড় গায়ে শুকোবে?

ভজন : সে আর কী করা! মরবে তো আজ বাদে কাল এমনিই। অশুচি পৈতে নিয়ে মরলে নরক বাস না!

পরাণ : বোঝো! একগাছি সুতো, তার ওপর কী দরদ!

ভজন : দরদ কী আর সাধে হয়? ঠেকায় পড়ে হয়। এই সুতোটাই তো খাওচ্ছে পরাচ্ছে বাবা, খাওাচ্ছে পরাচ্ছে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। তার এইটুকু যত্নআত্তি না করলে চলবে কেন!

পরাণ একথার মানে কী বোঝে কে জানে। সব মিলিয়ে তার মুখ থেকে যে শব্দটি বেরিয়ে আসে প্রবল আক্ষেপ ছাড়াও তারমধ্যে মেশানো রয়েছে বহু যুগের প্রবঞ্চনার ইতিহাস। ক্লান্ত বিদ্রূপে পরাণ বলে।

পরাণ : শালা!

অন্যদিকে তখন ঢাকঢোলের প্রবল আওয়াজ। ভজনের কথাই বোধহয় সত্যি। রামকিঙ্করের পৈতে পাল্টানোর পালা চলছে।

দুই

ছোট্টো নরম হাতের পাতায় একরাশ নিমফুল মায়ের সামনে মেলে ধরলো দশ বছরের বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ : মা, এই দেখো।

আসন্ন প্রসবের যন্ত্রণায় শচীদেবীর গৌর-পাণ্ডুর মুখমণ্ডল বারবার কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। ছেলের হাতে সদ্য ফোটা নিমফুলের আঘ্রাণে নাক-ডুবিয়ে সেই যন্ত্রণার ভাব কিছুটা প্রশমিত হলো।

শচী : বাঃ।

বিশ্বরূপ মাথা নাড়ে। শচীদেবী ঘরের দরজার বাইরে তাকান। শেষবিকেলের আলো নিমগাছের ঘন পাতার মধ্যে দিয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা উঠোন জুড়ে। ঠিক নিমগাছের তলাটিতে আঁতুড় ঘর—নতুন খড়ে সদ্য তার চাল ছাওয়া হয়েছে। কিছু কিছু শুকনো পাতা এদিক ওদিক উড়ছে, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন থুমমারা পরিবেশ—বোধহয় বৃষ্টি হবে।

বিশ্বরূপ : ঘরামিরা ঘর ছেয়ে দিয়ে চলে গেল। উঠোন ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখি, এত ফুল।

শচী : হ্যাঁরে তবে তোর বাবা বললেন যে এবার খরা—ফুল, ফল, ফসল কিছু হয়নি।

বিশ্বরূপ : ঠিকই বলেছেন। বাইরে বেরোলে দেখতে পেতে—সব ধু ধু করছে।

শচী : তা আমাদের গাছে এত ফুল হল কী করে? আমরা তো আর ভিনদেশে থাকি না!

বিশ্বরূপ নিমগাছের তলায় আঁতুড় ঘরটার দিকে তাকিয়ে বলে—

বিশ্বরূপ : তুমি কি আজ থেকে ওই ঘরটার থাকবে, মা?

শচী সস্নেহে বিশ্বরূপের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন।

শচী : কেন বাবা? একলা ঘুমতে কষ্ট হবে তোমার?

বিশ্বরূপ মায়ের কাছটিতে ঘেঁষে আসে।

বিশ্বরূপ : তোমার কী অসুখ করেছে মা?

শচী : কেন রে?

বিশ্বরূপ : ঈশান কাকা বলল তোমার মা'র কাছে বেশি যেও না, মার শরীর খারাপ।

শচী : আর কী বলেছে ঈশান কাকা?

বিশ্বরূপ : বলেছে আমার নাকি ভাই হবে।

শচী : যদ্দিন আমি ওখানে থাকি, লক্ষ্মীছেলের মতো নিজে নিজে খেয়ে নেব। বাবা ঠিকমতো খেলেন কি না দেখবে।

বিশ্বরূপ : তুমি কদ্দিন থাকবে ওখানে?

শচী : একটু তো সময় লাগবেই বাবা। ভাই হবে, ভাই একটু বড় হবে। তারপর আবার আমরা এ বাড়িতে চলে আসব। ধরো একমাস।

বিশ্বরূপ : একমাস! আর যদি বোন হয়?

শচী : বোন হলেও একমাস তবে ভাই-ই হবে। গণকঠাকুর বলেছেন।

মালিনী, পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী, প্রায় শচীর সমবয়সী, কাঁসার বাটিতে গরম দুধ নিয়ে ঘরে ঢোকে।

মালিনী : নাও এটুকু খেয়ে নাও। আর একবার উঠে বসতে পারবে? চুলটা একবার বেঁধে দিই। আঁতুড়ে তো আর চিরুনি চলবে না।

শচী বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করে। মুখ যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠে। মালিনী দুধের বাটি নামিয়ে রেখে, চুল বাঁধার বাক্সটি খুলেছিল। শচীর মুখের চেহারা দেখে উৎকণ্ঠিতভাবে বলে ওঠে—

মালিনী : কী হল?

শচী উত্তর দেয় না। যন্ত্রণায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। মালিনী তাড়াতাড়ি এসে শচীর মাথায় হাত রাখে। দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে অবলম্বনের মতো দুর্বল-পাণ্ডুর হাত বাড়িয়ে শচী মালিনীর হাতখানি চেপে ধরে।

মালিনী : কষ্ট হচ্ছে?

শচী যন্ত্রণাকাতর স্বরে জিজ্ঞেস করে।

শচী : নারায়ণী এসেছে?

মালিনী : এসেছে। কিছু বলবে?

শচী : বলো আঁতুড় ঘরটা একটু নিকিয়ে নিতে। আমায় নিয়ে চলো। আর দেরি কোরো না।

মালিনী একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মালিনী : ওমা! (গলা তুলে ডাকে) নারায়ণী। (তারপর নিজের মনেই বলে চলে) দুলালীকে তো খবর দিতে হবে। ঈশান কোথায় গেল আবার?

বিশ্বরূপ এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এই ব্যস্ততা দেখছিল। মালিনীর প্রশ্নের উত্তর দেয়।

বিশ্বরূপ : মাঠে। গরু আনতে গেছে।

মালিনী : বোঝো। (বলতে বলতে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে নারায়ণী এসে দাঁড়ায়। মালিনী নারায়ণীর দিকে ফিরে বলে) নারায়ণী আঁতুড় ঘরটা একটু নিকিয়ে ধুনো দিয়ে দে তো। (তারপর শচীর পিঠে সযত্নে হাত রাখে) তুমি উঠোন পার হয়ে যেতে পারবে? কষ্ট হবে না?

ওদের আলোচনা শুনে বিশ্বরূপ এগিয়ে আসে।

বিশ্বরূপ : আমি ধরব মা?

মালিনী : না বাবা! এখন মাকে ছুঁতে নেই। ক'টা দিন যাক।

মালিনীর সাহায্যে শচী কষ্ট করে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করে। নামতে নামতে বলে—

শচী : উনি কি ফিরতে দেরি হবে বলে গেছিলেন, দিদি?

মালিনী : সবে তো পূর্ণিমা লাগল। সত্যনারায়ণ পূজো তো! একটু তো দেরি হবেই।

ইতিমধ্যে নারায়ণী আঁতুড় ঘরে ধুনো দেওয়া শেষ করে ঘরে ফিরে এসেছে। মালিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

নারায়ণী : ও! চলো। ইস্! বাড়িতে একটা বেটাছেলে থাকলে দুলালীকে অন্তত ডেকে আনতে পারতো।

বিশ্বরূপ : কে দুলালী বলো না, আমি ডেকে আনছি।

মালিনী : তুমি পারবে!

বিশ্বরূপ মাথা নাড়ে—পারবে।

মালিনী : বাগদি পাড়া চেনো?

বিশ্বরূপ : পশ্চিমদিকে তো। চিনে নেব।

মালিনী : সেখানে গিয়ে আমোদগলি বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে।

নারায়ণীকে ঈষৎ বিরক্ত দেখায়।

নারায়ণী : আঃ। ওকে আবার আমোদগলি-টলি বলার কী দরকার! ছেলে মানুষ। (বিশ্বরূপকে) বাগদিপাড়ার বাশুলীমন্দিরটা কোথায় জিজ্ঞেস কোরো। তার পিছনেই দুলালীর বাড়ি।

বিশ্বরূপ মালিনীর দিকে ফিরে তাকায়।

বিশ্বরূপ : মা'র কী হয়েছে খুড়ি মা?

মালিনী : (প্রবোধের সুরে) কিছু হয়নি। এ সময়ে ওরম হয়। তুমি এসো। দুলালীকে চট করে ডেকে আনো। ও জানে তোমার মা পোয়াতি—বোলো ব্যথা শুরু হয়ে গেয়েছে।

বিশ্বরূপ : কোথায় ব্যথা?

মালিনী : তুমি এটুকু বোলো। ও বুঝবে।

বিশ্বরূপ খড়ম জোড়া হাতে করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়। শচী সেদিকে তাকিয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বরে বলে।

শচী : ছাতি নিয়ে যাস বাবা। বৃষ্টি আসছে।

মালিনী : আর শোনো। ফেরার পথে চাঁদের দিকে তাকিও না যেন।

বিশ্বরূপ দাওয়া থেকে বাঁশের ছাতিটা কুড়িয়ে নিচ্ছিল। মালিনীর সতর্কবাণীতে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

বিশ্বরূপ : কেন?

মালিনী : আজ চন্দ্রগ্রহণ। গ্রহণের সময়ে চাঁদের দিকে দেখতে নেই।

তিন

তর্কটা আরম্ভ হয়েছিল বহুক্ষণ আগেই। নবদ্বীপের যে কোনও ন্যায়ের তর্ক যেমন হয়—আরম্ভ হলে থামতেই চায় না। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এখন প্রায় সূর্যাস্তের সময়। চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় বসে ব্রাহ্মণযুগলের তবু তর্কে বিরাম নেই। উৎসাহী জনতার ভিড় পালা করে আসে, যায়, কারই বা এত সময় বা ধৈর্য আছে, দাঁড়িয়ে পুরো তর্ক শোনার। তবু কিছু লোকের জটলা এখনও ঘিরে রেখেছে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের প্রাঙ্গণ। চণ্ডীমণ্ডপে দীপ জ্বলেনি এখনও, ফলে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মশার ঝাঁক বাড়তে আরম্ভ করেছে ধীরে ধীরে। ব্রাহ্মণ দু'জনের কারুরই অবশ্য সেদিকে খেয়াল করার মতো অবকাশ নেই—ন্যায়ের জটিল তত্ত্বে দুজনেই মগ্ন।

প্রথম ব্রাহ্মণ : সমুদ্র মন্থনের সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই যে এক বিশাল পাত্রে অমৃত আহরণ করেছিলেন, সে কথা তো ভাগবতেই আছে। আধারের যদি কোনো ভূমিকাই না থাকবে তা হলে অমৃত পাত্রের কী বা প্রয়োজন ছিল। তাঁরা তো দেবতা তাঁরা কি এটুকু জানেন না, প্রয়োজন হলে অঞ্জলি করে অমৃত আহরণ করা যায়।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ : শামুকের খোলের ভিতর থেকে নস্যি বার করে পরম যত্নে নাসারন্ধ্রে স্থাপন করছিলেন। প্রথম ব্রাহ্মণের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ : নিশ্চয়ই জানেন। অবশ্যই জানেন। দেবতারা জানবেন না তা কি হয়? সমুদ্রমন্থনের কথাই ধরা যাক না কেন, মন্দার পর্বত হলেন দণ্ড আর বাসুকি নাগ হলেন রজ্জু। সেই মন্থনে বাসুকির সহস্রমুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত হল তীব্র হলাহল। দেবগণের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে অবশেষে দেবাদিদেব মহাদেব অঞ্জলি ভরে সেই গরল পান করলেন। গরল অমৃত অপেক্ষা অনেক বেশি ভয়াবহ। পাত্র বা আধারের ভূমিকা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হবে দেবাদিদেব জানতেন না যে, গরল পাত্রস্থ অবস্থাতেও পান করা যায়।

পূর্ণিমা বলে সকলেরই আজ গঙ্গাস্নানে যাওয়ার তাড়া ফলে চণ্ডীমণ্ডপের আশেপাশের ভিড়

ইতিমধ্যেই পাতলা হতে শুরু করেছে। তারই মধ্যে একজন লোক তার পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—

প্রথম ব্যক্তি : কী নিয়ে শুরু হয়েছিল?

অপর লোকটি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তর্কযুদ্ধের একনিষ্ঠ শ্রোতা বোঝা যায়। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে উত্তর করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তেল পিদিমের মধ্যে থাকে না পিদিম তেল কে ধরে রাখে?

প্রথম ব্যক্তি : তা কে কোন জন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি এক এক করে বিবদমান দু'জন ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে যথাক্রমে বলে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ও হচ্ছে পিদিমের মধ্যে তেল। আর তেলের মধ্যে পিদিম। দু'জনের কেউই খেয়াল করেনি বাঁশের ছাতি মাথায় দশ বছরের এক ব্রাহ্মণ বালক ইতিমধ্যে তাদের পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। খেয়াল হল বিশ্বরূপের প্রশ্নে।

বিশ্বরূপ : আচ্ছা, এখানে বাগ্‌দী পাড়াটা কোন দিকে?

চার

সদ্য ঘাটে এসে লাগা নৌকাটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল পরাণ। শুধু পরাণ কেন, জেটির বেশিরভাগ লোকই নিজর নিজের কাজ ফেলে নদীরদিকে তাকিয়ে। এমনকী ঘাটের ছোট ছোট শিব মন্দিরের ত্রিশূলখচিত চূড়ায় নিয়মিত দৌরাত্ম্যি করে বেড়ায় যে লম্বা লম্বা লেজওয়ালা হনুমানগুলি, তারাও সাময়িকভাবে দোল খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে রয়েছে নৌকাটির পানে। সূর্য ডোবার মুখে মুখে নবদ্বীপের পশ্চিমে, জোরঘাটে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

নতুন আসা নৌকোটি পাড়ে এসে লাগতেই প্রায় লাফিয়ে তীরে নামলে এক সুঠাম শরীর , মুণ্ডিত মস্তক, রক্তাম্বর মানুষ। সিঁদুর চর্চিত কপাল, হাতে মোটা লাঠি রোমহীন ভ্রূ, এবং কৃষ্ণবর্ণ অতিকায় চেহারা সব মিলিয়ে লোকটিকে দেখলে কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ত্রাসেরও সৃষ্টি হয় মনে। তীরে নেমে এক হাতে লাঠি সামলে নিয়ে অন্য হাতটি বাড়িয়ে দিলে নৌকার দিকে। এইবার নৌকা থেকে নেমে এলো দুই —স্বাস্থ্যবতী, বিশ্রস্তবসনা, অর্ধ নিমীলিত চক্ষে ধীরে ধীরে স্খলিত পদক্ষেপে ঘাটের পিছল সিঁড়ি বেয়ে যেতে লাগল পাড়ের দিকে। দেখেমনে হয় তারা নেশাগ্রস্ত। প্রায় তাদের পিছু পিছু নৌকো থেকে নামানো হল একপাল হরিণ। হরিণের দলকে দেখা মাত্র গাছের ডালে বসা হনুমানগুলি মহা সমস্বরে কিচমিচ শব্দে কোলাহল জুড়ে দিল। ঘাটের নানাবিধ আওয়াজ, হনুকুলের কিচমিচ শব্দ, ঘরে ফেরা পাখিদের অবিরত কাকলি এবং বামাকিঙ্করকে প্রদক্ষিণ করে ঢাকঢোলের প্রবল উচ্ছ্বাসে স্তম্ভিত হয়ে একদল জবুথবু প্রাণীর মতো ঘাটের সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল হরিণের দল। পিছন থেকে ছিপটির বাড়ি পড়তেই সিঁড়ি

বেয়ে উপরের দিকে উঠবার চেষ্টায় পিছল ধারে খুরের ঘষা লেগে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে লাগল ভীত, সন্ত্রস্ত নিরীহ প্রাণীগুলি।

রমণী দু'জন তৎক্ষণে অতি কষ্টে উপরের ধাপে এসে পৌঁচেছে। কৃষ্ণবর্ণ প্রহরী তাদের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্কিতে তুলে দিতে ব্যস্ত। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পরাণ, ভজনকে জিজ্ঞেস করল—

পরাণ : মাগী দুটো ঢুলছে কেন গো? মদ খেয়েছে?

ভজন : মদ না আফিং। খাইয়েছে। ওই কাপালিকগুলো।

পরাণ : কেন? বলি টলি দেবে নাকি?

ভজন : ধ্যাৎ নরবলি কি রোজ হয় নাকি! সে তো অমাবস্যায়। আজ তো পুন্নিমা।

পরাণ : তবে? নিয়ে গিয়ে পাল্কিতে তুলল যে?

ভজন : ভোজ টোজ আছে বোধহয় কিছু। অতোগুলো হরিণ দেখছিস না।

পরাণ : সব কেটে খাবে?

ভজন : কেটে খাবে, চামড়া দিয়ে আসন করবে—মৃগচর্ম।

পরাণ : কী?

ভজন : মৃগচর্ম—মৃগ মানে হরিণ।

পরাণ : আর মেয়ে দুটোকে সঙ্গে আনল যে?

ভজন : ওই কাপালিকদের পুজোয় সব লাগে।

মেয়ে দু'টিকে নিয়ে পাল্কি ততক্ষণে রওনা দিয়ে দিয়ে নদীর ধারের রাস্তা ধরে। অতিকায় রক্তাম্বর মানুষটি তখনও ঘাটে দাঁড়িয়ে হরিণের দলের তদারকি করছে। সে দিকে তাকিয়ে পরাণ নিজের মনে বলল—

পরাণ : মৃগীও লাগে, মাগীও লাগে।

বলে নিজের রসিকতাতেই খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল পরাণ। ভজন একবার পরাণের এই অদ্ভুত উল্লাস দেখল, তারপর ক্লান্তস্বরে বলল—

ভজন : চল। ঘর চল। নয়তো দেরি হয়ে যাবে। এক্ষুণি পালে পালে গঙ্গায় চান করতে আসবে দেখবি সব।

পরাণ : এত শিগগির? এখনও তো চাঁদও ওঠেনি?

ভজন : সেই জন্যই তো বলছি। জলটল যা খাবার, পেচ্ছাব-পায়খানা সারার, সব সেরে নে। একটু পরে গ্রহণ আরম্ভ হয়ে যাবে, না ছাড়া অবধি আর পারবি না।

পরাণ : দেখেছো! ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে। একদম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম।

পাড়ের গা ঘেঁষে একটু নেমে গিয়ে, একটা ঢালের আড়ালে মূত্র ত্যাগ করতে বসে পরাণ।

ভজন তৎক্ষণে আলকাতরার ডিবে, রং লাগানোর নেতি ইত্যাদি নৌকোর খোলের মধ্যে গুছিয়ে রাখতে শুরু করেছে। রাখতে রাখতে বলে—

ভজন : এতোখানি বয়স হলো, তবু পেচ্ছাব করার কথা কাউকে মনে করিয়ে দিতে হয় দেখিনি।

পরাণ তখনও ঢালের আড়ালে। সেখান থেকেই ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে বলে—

পরাণ : ঠিকই বলেছ। আজকের দিনটা বুড়োর মুশকিল আছে। একে পুন্নিমা তায় চন্দ্রগ্রহণ।

ভজন : গেলেই বা কী আর থাকলেই বা কী? যেগুলো আছে, খড়ম খটখটিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সেগুলোই বা কত ছাতা দিয়ে মাথা ধরছে!

প্রায় ভজনের কথায় উপরেই বালককণ্ঠের স্বর শোনা যায়—শোনো।

ভজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। পরাণ ঢালের আড়াল থেকে মুখখানি বাড়ায়। পাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে ছাতি মাথায় বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ : আচ্ছা বাগ্‌দীপাড়াটা কি এদিক দিয়ে যাব?

ভজন কিছু বলার আগেই পরাণ গলা তুলে বলে।

পরাণ : ওপাশে ফেলে এসেছেন ঠাকুর। বাগ্‌দীপাড়ায় কোথায় যাবেন আপনি?

বিশ্বরূপ : কী আমোদগলি আছে, সেখানে।

ভজন এবং পরাণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর ভজন ধীরে ধীরে বলে—

ভজন : তা হলে আর কোনও চিন্তা নেই ঠাকুর। এদিক দিয়ে চলে যান আমোদগলিতে গিয়ে পড়লে আপনিই চিনতে পারবেন। কাউকে চেনাতে হবে না।

ওদের কথার মধ্যেকার শ্লেষটুকু বিশ্বরূপের কানে গিয়ে পৌঁছায় না। বাধ্য ছেলের মতো অন্য দিকে হাঁটা দেয়। ঘাটের ধারে শিবমন্দিরের আড়ালে তার ছোট্ট শরারটা মিলিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর ভজন সবিস্ময়ে বলে ওঠে—

ভজন : বামুনগুলোর হলো কী রে? অ্যাদ্দিন লুকিয়ে লুকিয়ে যেত। এখন একেবারে বলেকয়ে এইটুকু বয়স থেকে বেশ্যাবাড়ি যাচ্ছে। সাধে বলে ঘোর কলি!

পাঁচ

প্রথম প্রথম কোঠাবাড়ির ভিতরের দিকের একটা ঘরে শঙ্করীর বাস ছিল। জগাই-মাধাই নিয়মিত তার ঘরে আসতে আরম্ভ করার পর কোঠাবাড়ির মাসি তাকে খুশি হয়ে রাস্তার দিকে এই ঘরটি দিয়েছে। জগাই-মাধাই-র আসল নাম জগন্নাথ আর মাধব—নবদ্বীপের এক অর্থবান ব্রাহ্মণের দুই কুলাঙ্গার পুত্র। কৈশোর অবস্থা থেকেই সুরা ও নারীর প্রতি তাদের প্রবল আসক্তি এবং সেই সূত্র ধরেই এই বারাঙ্গনা পল্লি-আমাদেগুলিতে তাদের নিয়মিত যাতায়াত। আজ দুপুর

থেকে এই ঘরে বসে একনাগাড়ে সুরা পান করে চলেছে জগাই। ফলে এখন সূর্যাস্তের সময়, আকণ্ঠ মদ্যপানের পর সে প্রায় উত্থানশক্তিরহিত। পালঙ্কের উপর অবসন্নভাবে শুয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়া সুরার শূন্য মৃৎ ভাণ্ডগুলির দিকে লক্ষ্যহীন ভাবে অপলকে তাকিয়ে ছিল বহুক্ষণ ধরে। মাটিতে জায়গায় জায়গায় ছড়ানো সুরার অবশিষ্টাংশের চারপাশ ঘেঁষে থিকথিক করছে পিঁপড়ের দল। মধু গন্ধলোভী একটি বোলতা বহুক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করছে অকারণে।

মাধাই ওরফে মাধব ঘরের অন্যপ্রান্তে ভূমিশয্যায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় তার গা হাত-পায়ে সম্প্রতি সে একটা বেদনা অনুভব করে, ফলে এই পতিতাপল্লিরই অন্য এক বারাঙ্গনাসরলা, আপাতত তার পিঠের উপর নৃত্যসহকারে তার শরীর মর্দন করতে ব্যস্ত। যে কোনও দুষ্কর্মেই এই দুই ভাই পরস্পরের সহচর—এমনকি নারী সম্ভোগেও। ফলে বেশ্যাগৃহে গমন করলে তারা সাধারণত এই ঘরে দু'জন রমণী নিয়ে বিলাস সম্ভোগে মত্ত থাকে।

শঙ্করী সাধারণত জগাইয়ের মনোমতো নর্মসহচরী। আজ যেহেতু জগাই অত্যধিক মদ্যপানের কারণে বহুক্ষণ যাবৎই অবশ ও শয্যামগ্ন, শঙ্করী কিছুক্ষণ হল জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। অদ্ভুত দৃশ্যটি চোখে পড়তে খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসির আওয়াজ শুনে জড়ানো গলায় জগাই প্রশ্ন করে—

জগাই : হাসছিস কেন?

হাসির দমকে শঙ্করীর একপিঠ চুল কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জানলা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—

শঙ্করী : আমোদ গো। আমোদগলিতে নতুন আমোদ।

সরলার মল পরা পা দুটি মাধাইয়ের পিঠের উপর অবিরত নৃত্য করে চলেছে। তারই মধ্যে মুখতুলে মাধাই জিজ্ঞেস করে।

মাধাই : কী আমোদ?

শঙ্করী : দশ বছরের শিশু, এখনো দুধের দাঁত পড়েনি। সন্ধে সন্ধে এপাড়ায় আমোদ করতে এয়েচেন গো।

সরলা : কার ঘরে গেল রে?

শঙ্করী : যায়নি, একনও খুঁজছে। ভ্যাবলার মতো দাইড়ে আছে। মাসির সঙ্গে কতা কইচে।

জগাই হঠাৎ কী মনে হতে বিছানা থেকে নেমে অত্যন্ত বেসামাল পদক্ষেপে জানলার কাছ অবধি গিয়ে পৌঁছোয়। বাইরে উঁকি মেরে কিছুক্ষণ দেখে—বোধহয় ঠাহর হতে সময় লাগে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে।

জগাই : গলায় পৈতে, মাতায় টিকি, হাতে ছাতা—এতো একদম বামন অবতার রে।

জগাইয়ের কথায় সরলা মর্দন ভুলে খিলখিল করে হাসতে থাকে। তারপর মল পরা বাঁ পাখানি মাধাইয়ের পিঠে জোর করে ঠুকতে ঠুকতে বলে—

সরলা : এমন নাতি মারবে না...

মাধাই তারই মধ্যে অদ্ভুত শারীরিক কৌশলে উপুড় অবস্থা থেকে চিত হয়ে শোয়। তারপর শোয়া অবস্থাতেই এক হেঁচকা টানে হাস্যরতা সরলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সরলার কথার জের টেনে বলে।

মাধাই : ...দুনিয়া একেবারে রসাতলে যাবে।

ছয়

নবদ্বীপের আকাশে সূর্য ডুবুডুবু। ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব ধীরেধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখিদের ঘরে ফেরার পালা সারা। ততক্ষণে সূর্য ডুবে আঁধার হয়ে আসবে চারিদিক। তারপর ধীরেধীরে আমোদগলিতে শুরু হবে লোকসমাগম।

পতিতাপল্লির দীর্ঘদিনের মালিকানি চিন্তামণি দাসীর এইটুকুই অবসরের সময়। কোঠাবাড়ির দোড়গোড়ায় বসে থেলো হুঁকোয় সুখ টান দিতে দিতে পিতলের বাটি থেকে মুঠো মুঠো ছোলা নিয়ে গলির পায়রাদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছিল চিন্তামণি। পায়রার ঝাঁকের সঙ্গে জুটে গেছে দু একটা দলছুট ময়ূর।

তারই মধ্যে মাথার ছাতা, গলায় পৈতে, দশ বছরের বিশ্বরূপকে দেখে প্রৌঢ়া চিন্তামণির বুকের মধ্যে কোথায় যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। অমন সুন্দর ছেলে অবেলায় এখানে ঘুরঘুর করে কেন? দ্বারের কাছে দাঁড়ানো কয়েকটি মেয়ে, ছেলেটিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে রঙ্গতামাশা জুড়ে দিয়েছে। ধমকের সুরে তাদের দিকে কড়া হাঁক পেড়ে ছেলেটির দিকে ফিরে তাকাল চিন্তামণি।

চিন্তামণি : আমোদগলিতে কার কাছে যাবে?

বিশ্বরূপ : আমোদগলিতে না। এখানে বাশুলীমন্দির আছে?

চিন্তামণি : সেখানে কী?

বিশ্বরূপ : তার পিছনে দুলালী দাই থাকে। তাকে নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে।

দূরে কোথায় কর্কশ স্বরে একটা ময়ূর ডেকে উঠল। মুখের সামনে থেকে থেলো হুঁকোটা সরিয়ে বিশ্বরূপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো চিন্তামণি।

চিন্তামণি : বাড়িতে? কেউ পোয়াতি?

৫০ বছরের এই পঙ্কিল জীবনে এমন নির্ভীক সুন্দর দুটো চোখ প্রথম চোখে পড়ল চিন্তামণির। তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর করল বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ : আমার মা।

সাত

গঙ্গার স্নানে যাবে বলে কাপড় বদলাচ্ছিল দুলালী। খেয়ালই ছিল না যে, সদর দরজাটা ভালো করে বন্ধ করা নেই। দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শুনে গলা তুলে বলল—

দুলালী : দাঁড়া আসছি।

কাপড় ছাড়ার পর আরও অনেক কাজ বাকি দুলালীর। সন্ধে দিতে হবে। ঘরে পিদিম জ্বালাতে হবে, পোষা বিড়ালগুলোকে দুধ না দিয়ে গেলে সারা সন্ধে ধরে চিৎকার করবে—সেই ভেবে দরজার দিকে গলা তুলে আবার বলল—

দুলালী : ও গিরি, ততক্ষণ বকুলকে ডেকে নিয়ে আয় না। আমি একটু সন্ধেটা দিয়ে নিই।

দরজার আড়াল থেকে মৃদু বালককণ্ঠের আওয়াজ এলো—

বিশ্বরূপ (নেপথ্যে) : আমি বিশ্বরূপ।

দুলালী চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, কবাটের আড়াল থেকে তার দিকে চেয়ে আছে, বছর দশেক বয়সের একটি ছোটো ছেলে। তড়িৎগতিতে গায়ের কাপড় গুছিয়ে নিতে নিতে দুলালীর মনে হলো, কে রে বাবা ছেলেটি, কী চায় এখন এখানে?

দুলালী : কে? ওমা! কে তুমি? ততক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিলছ বুঝি?

বিশ্বরূপ এই ভর্ৎসনায় ভ্রূক্ষেপ করল না। অকপটে জিজ্ঞেস করল

বিশ্বরূপ : এখানে দুলালী বলে কেউ থাকে?

দুলালী : আমি। কেন?

বিশ্বরূপ : আমি মায়াপুরের জগন্নাথ মিশ্রের বড় ছেলে। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

দুলালী : কোথায়?

বিশ্বরূপ : আমাদের বাড়িতে। মা'র ব্যথা হচ্ছে। পাশের বাড়ির খুড়িমা বললেন, এটা বললেই তুমি বুঝবে।

দুলালী অবাক হয়ে যায়।

দুলালী : ও! দেখেছো। আমি ভাবলাম, আমাদের গঙ্গার চানে যাওয়ার কথা, তাই ডাকতে এসেছে।

বিশ্বরূপ : তুমি এখন গঙ্গাস্নানে যাবে?

দুলালী : না। তা হলে আর যাব কী করে? আপনি বসুন।

বিশ্বরূপ চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে বসবার উপক্রম করছিল। দুলালী শশব্যস্তে বাধা দিয়ে ওঠে।

দুলালী : ভিতরে ঢুকবেন না। আমি বাইরে আসন দিচ্ছে।

বিশ্বরূপ থমকে দাঁড়ায়, তারপর ধীরে ধীরে বলে।

বিশ্বরূপ : আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন। দেরি হলে মা'র কষ্ট হবে।

দুলালী দাওয়ায় বেতের চাটাই পেতে দিতে দিতে বলে—

দুলালী : দেরি হবে না। আমি সন্ধেটুকু দিয়ে দিই।

বিশ্বরূপ চাটাইতে বসে দুলালীর ঘরের ভিতর দেখতে থাকে। শিকে থেকে দুধের হাঁড়ি পেড়ে মাটির ভাঁড়ে ঢালতে ঢালতে দুলালী বলে—

দুলালী : বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি?

বিশ্বরূপ : পাশের বাড়ির খুড়িমা বলে দিয়েছিল আমোদগলির পিছনে বাশুলীমন্দির। ওই আমোদগলিতে গেছিলাম, ওরা দেখিয়ে দিল।

দুলালী : ইস! কী পাঁক ঘেটে না এলো ছেলেটা। কতবার মনসবদারের কাছে জানিয়েছি যে, আমাকে ঐদিকে একটুকরো জমি দাও—এটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ও পাড়া দিয়ে আসতে হয় বলে, ডাকহরকরা অবধি আসতে চায় না।

বিশ্বরূপ অবাক হয়ে দুলালীর মুখের দিকে তাকায়।

বিশ্বরূপ : তার মানে তুমি কোনোদিন চিঠিপত্র পাও না?

মাটিতে রাখা দুধের ভাঁড় ঘিরে ততক্ষণে ভিড় করে এসেছে একবার সাদা, কালো বেড়াল। সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে দুলালীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—

দুলালী : ক'দিন হলো এসেছে একটা। পড়াবার লোক পাইনি। একটু পড়ে দেবেন?

বিশ্বরূপ : দাও।

বিছানার তলা থেকে খুঁজে একখানি চিঠি বার করে এনে চৌকাঠের উপর নামিয়ে রাখে দুলালী। বিশ্বরূপ সেটা তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ঘরের বাইরে আলো আর নেই। ভিতরের প্রদীপের আলোয় যতটুকু ঠাহর হয় তাতেই কষ্ট করে পড়তে থাকে বিশ্বরূপ। দুলালী ততক্ষণে জলচৌকির উপর হাত আয়না রেখে চুল বাঁধবার সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। দূরে বাশুলীর মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হলো। বিশ্বরূপ চিঠি থেকে মুখ তুলে বলে—

বিশ্বরূপ : দিগম্বরী কে?

দুলালীর দুই দাঁতের মধ্যে চুল বাঁধার দড়ি, তারই মাঝে ঝাঁঝিয়ে ওঠে—

দুলালী : আমার সতীন। সে লিখেছে বুঝি?

বিশ্বরূপ : তোমার স্বামী...

দুলালী : সে মাগীর কাছে থাকে। কেন?

বিশ্বরূপ : তার খুব অসুখ। তোমার সতীনের হাতে পয়সাকড়ি নেই, তুমি যদি কিছু দিতে পারো।

দুলালী : ব্যস! আর।

বিশ্বরূপ (চিঠি থেকে পড়ে) : ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। বিনীতা।

বিশ্বরূপ চিঠিটা চৌকাঠের উপর নামিয়ে রাখে। দুলালী ক্ষিপ্রহাতে তুলে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে। ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো প্রদীপের মধ্যে গুঁজে দেয়। তারপর হাত আয়নাটা কাছে টেনে নিয়ে চুলবাঁধা শেষ করতে করতে গজগজ করে বলে চলে।

দুলালী : সোমবচ্ছর খবর নাই, ঠেকায় পড়ে সোদরভাই। এখন কেন? আমার মুখে নাতি মেরে সে বেটার কাছে গেছিলি। তাকে অ্যাদ্দিন খাওয়ালি, পরালি, সোহাগ করলি, এখন সে করুক চিকিৎচ্ছে। কী খাই, কী পরি, কোন আঁস্তাকুড়ে থাকি, কোনওদিন তো খোঁজও করিস না।

বিশ্বরূপ : করেছে হয়তো। চিঠি লিখেছে। তুমিই তো বললে, ডাকহরকরা তোমার বাড়ি আসতে চায় না।

এক চিমটে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে লাগাচ্ছিল দুলালী। বিশ্বরূপের প্রবোধ বাক্যে কেমন যেন ফোঁস করে ওঠে।

দুলালী : ছাই লিখেছে। ওকে আর আমি চিনি না। কী হবে অমন স্বামী দিয়ে! ও থাকার চেয়ে যাওয়াই ভালো।

বিশ্বরূপ অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

বিশ্বরূপ : তা হলে সিঁদুর পরছ কেন?

দুলালী : পরতে হয়, নিয়ম, তাই পরি। পিদিমটা জ্বালিয়েই বেরিয়ে পড়ব।

চুল বাঁধবার সরঞ্জাম তুলে গুছিয়ে রেখে কুলুঙ্গি থেকে একখানি ছোট্টো প্রদীপ নিয়ে পিলসুজে রাখা বড় প্রদীপটার কাছে এগিয়ে যায় দুলালী, ধরবে বলে। বিশ্বরূপ একদৃষ্টে তার প্রদীপ জ্বালানো দেখে। তারপর যেন প্রায় নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করে দুলালীকে—

বিশ্বরূপ : বলো তো, তেল প্রদীপের মধ্যে থাকে না প্রদীপ তেলকে ঘিরে রাখে?

দুলালী অবাক হয়ে ফিরে তাকায়।

দুলালী : কী?

বিশ্বরূপ : তুমি ন্যায় জানো?

দুলালীর চোখ দুটো প্রদীপের আলোয় হঠাৎ চিকচিক করে ওঠে। বুকের ভিতর থেকে উঠে আসা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে দুলালী বলে—

দুলালী : অন্যায়টা জানি। এই যে মানুষে মানুষে এতটুকু টান, ভালবাসা—সংসার থেকে যে সব চলে গেছে, এ অন্যায় নয়? সবাই নিজের স্বার্থ আগলাচ্ছে, সুবিধেমতো নিয়ম বানাচ্ছে। এ আর বেশি দিন চলবে না। এ শেষ হতেই হবে—তুমি দেখে নিও।

কুলুঙ্গির প্রদীপটা জ্বালানো হয়ে গিয়েছিল দুলালীর। বেরোনোর আগে এক ফুঁয়ে বড় প্রদীপটা নিভিয়ে দিতেই ঘর জুড়ে নেমে আসে অন্ধকার।

বাগুলীমন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি পুরোদমে চলছে।

আট

কিছুক্ষণ পর। ধানখেতের ওপাশ দিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে গঙ্গার স্নানে যাচ্ছিল একদল মানুষ। উঁচু নিচু আল পার হতে হতে সেদিকে তাকিয়ে দুলালীকে বলল বিশ্বরূপ—

বিশ্বরূপ : মধ্যিখান থেকে তোমার গঙ্গার স্নানে যাওয়া হলো না।

দুলালী : তাতে কী? এটা তো আমার কাজ। চলো, ওদিক দিয়ে।

ধানজমি থেকে নেমে অন্য একটা রাস্তার দিকে এগিয়ে যায় দুলালী। সেটা দেখে অবাক হয়ে বিশ্বরূপ দুলালীকে জিজ্ঞেস করে—

বিশ্বরূপ : তুমি রাস্তা চেনো? আগে গেছ আমাদের বাড়ি?

দুলালী : গেছি। তুমি যখন হয়েছিলে। তার আগে তোমার যে ক'জন বোন—সব কাত্যায়নীর হাতে।

বিশ্বরূপ : সেই আমি হবার পর এই যাচ্ছ? মধ্যে আর কোনোদিন যাওনি আমাদের বাড়ি?

দুলালী : কী করে যাব? আমাদের কি যেতে আছে?

বিশ্বরূপ : কেন? যেতে নেই কেন? খুড়িমাই তো বললেন, তোমাকে ডেকে আনতে, নইলে তোমায় আমি চিনব কী করে?

দুলালী : সে তো এই সময়। আঁতুড়ে নিয়ম নাই। আমি এমনি সময়ের কথা বলছি। আমরা বাগদী তো, বামুনের বাড়িতে ঢোকা আমাদের নিষেধ।

বিশ্বরূপ : কে বলেছে?

দুলালী : ঠাকুরমশাই বলেছেন শাস্ত্রে আছে এসব। তুমি তো এখনও ছোটো, তাই জানো না। যখন বড় হবে, শাস্ত্রর পড়বে, দেখবে তাতে লেখা আছে।

দুলালীর কথায় একরাশ ভাবনার জোয়ার এসে প্লাবিত করে ছোট্টো বিশ্বরূপের অন্তর। নিশ্চুপ হয়ে খুব খানিকক্ষণ কী একটা ভাবে সাত পাঁচ। তারপর ধীরে ধীরে দুলালীকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলে—

বিশ্বরূপ : বড় হলে আমি একটা নতুন শাস্ত্র লিখব। তখন আর কেউ তোমায় বারণ করবে না।

দুলালী : এই যাঃ। বৃষ্টি এসে গেল।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। গঙ্গার তীর জুড়ে সমবেত প্রবল হরিধ্বনির মাঝখানে নবদ্বীপের গলিঘুঁজির কোনও এক অজানা বাঁকে, একটি বাঁশের ছাতার তলায় পরমআত্মীয়ের মতো

একসাথে চলতে থাকে দশ বছরের এক ব্রাহ্মণ বালক, আর বিগতযৌবনা অস্পৃশ্যা এক বাগ্‌দী রমণী।

নয়

বৃষ্টি চলল আরও কিছুক্ষণ সময় ধরে। মায়াপুরের জগন্নাথ মিশ্রের আঙিনা জুড়ে ঝিরঝির বৃষ্টির মাঝখানেই ছোটাছুটি করে গরমজল, পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো নিয়ে আঁতুড়ঘরে পৌঁছে দিচ্ছিল মালিনী আর নারায়ণী। ভিতরে তখন শচীর প্রসব চলছে। বাড়ির ভিতর জানলা ধরে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বরূপ। সমস্ত গঙ্গার বুক জুড়ে বিপুল গঙ্গাস্নানের ধুম চলেছে। ঘনঘন হরিধ্বনিতে আকাশ, বাতাস মুখরিত।

জানলার বাইরে আকাশ অন্ধকার। পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়েছে গ্রহণের কবলে। সেইদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশ্বরূপ জিজ্ঞেস করে—

বিশ্বরূপ : বাবা, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করেছিল বলে তো বিষ্ণু রাহুর গলা কেটে দিয়েছিলেন...

চক্ষুমুদ্রিত করে নিবিষ্ট মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন জগন্নাথ, স্ত্রী এবং আসন্ন সন্তানের মঙ্গল কামনায়। বিশ্বরূপের কথায় ধ্যান ভেঙে বললেন—

জগন্নাথ : হ্যাঁ। সুদর্শন চক্র দিয়ে।

বিশ্বরূপ : সে তো অনেকদিন আগেকার কথা...

জগন্নাথ : সমুদ্রমন্থনের সময়।

বিশ্বরূপ : তা হলে আজও চন্দ্রগ্রহণ হয় কেন?

জগন্নাথ : পুরাণে বলে, সেই থেকে রাহুর চন্দ্রের উপর আক্রোশ।

বিশ্বরূপ : পুরাণের আর কোনও ঘটনা তো আমরা দেখতে পাই না? তা হলে এটাই কেবল বারবার হয় কেন?

জগন্নাথ : ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবকিছুরই একটা কার্যকারণ থাকে বাবা। হয়তো এটাই তাঁর শক্তির সামান্য কোনও ইঙ্গিত। হয়তো মর্ত্যবাসীর জানা দরকার যে, রাহুর মতো কোন দুষ্টগ্রহ যখনই এই পৃথিবীর স্নিগ্ধতাকে, পবিত্রতাকে আক্রমণ করবে, ঠিক তখনই একজন রক্ষাকর্তার আবির্ভাব হবে।

জানলার বাইরে তাকিয়ে বিশ্বরূপ হঠাৎ বলে ওঠে।

বিশ্বরূপ : বাবা, চাঁদ।

জগন্নাথ তাড়াতাড়ি জানলায় এসে মুখ বাড়ান। বাইরে সদ্য গ্রহণমুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নার আলো নিয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। চতুর্দিকে শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি। আর ঠিক তখনি শোনা যায়

নবজাতকের কান্নার শব্দ।

জানলা ছেড়ে বিশ্বরূপ একছুটে গিয়ে দাঁড়ায় বাড়ির দাওয়ায়। উঠোনের ওপাশে আঁতুড়ঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে দুলালী।

দুলালী : ভাই হয়েছে গো তোমার। ফুটফুটে ভাই হয়েছে, চাঁদের মতো।

পর্দা অন্ধকার হয়। শুরু হয় চরিত্রলিপি।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

আচ্ছা, উনি কবে আসছেন গো?

— না, আমি জানি খুব অসুবিধে হবে, তবু যদি পাঁচ মিনিট অন্তর ...

— দেখো, আর কেউ হলে বলতাম না, এই লোকটাকে তো আর ...

— ওসব কিচ্ছু জানি না, এবার কিন্তু আমি যাবই ...

— একটু বোলো কবে ওঁকে নিয়ে কাজ আছে ...

এই উনিটাকে আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপাতত আমার যে ছবিটার শুটিং চলছে, তার প্রধান অভিনেতা-অমিতাভ বচ্চন।

আমার ছবি 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর প্রধান মেরুদণ্ড। শ্রী উৎপল দত্ত'র নাটক 'আজকের শাহজাহান'। ইংরিজি ভাষায় আমার প্রথম চলচ্চিত্র রচনা।

এইসব কটি সত্য কেমন যেন গৌণ হয়ে গিয়েছে কেবল একটিমাত্র তথ্যের সামনে। আমার ছবির অভিনেতা-অমিতাভ বচ্চন।

যেন অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে ছবি করতে পারাটাই শেষমেশ আমাকে চলচ্চিত্রকার হিসেবে একটা কোনওরকম কৌলীন্য দিল।

ওপরের সংলাপাংশগুলি আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের। এবং প্রায় সকলেই এই কলকাতা শহরের সিনেমা কলাকুশলী বা অভিনেতা। যখন, ঐশ্বর্য রাইকে নিয়ে 'চোখের বালি' করেছিলাম, তখন ঐশ্বর্যও নাম, যশ, গ্ল্যামার জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ উচ্চতায়।

ওর কাজ ছিল টেকনিশিয়ন স্টুডিওতে। সেখানে পাছে কোনওরকমভাবে ওকে বিরক্ত করা হয় সেই জন্য আমরা আলাদা করে নিরাপত্তা কর্মীদের দিয়ে একটা বিশেষ বেষ্টনী তৈরি করেছিলাম। কেবলমাত্র ইউনিটের পরিচয়জ্ঞাপক কার্ডধারী ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার ছিল না সেই বেষ্টনীতে।

নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মীদের কাজ সত্যিই বড় নিরাপদ ছিল। টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে আমরা যে ফ্লোরে কাজ করছিলাম তার ঠিক পাশেই আমাদের চলচ্চিত্র কলাকুশলী এবং অভিনেতাদের কার্যালয়। তাছাড়া, পাশের ফ্লোরটাতেই কোনও একটা মেগা সিরিয়াল-এর শুটিং চলছিল। অনবরত যাতায়াত করতে হত সংশ্লিষ্ট মানুষদের।

নিষেধাজ্ঞা বোধহয় সম্পূর্ণ সার্থকতা পায়, যদি সেই নিষেধের কোনও প্রতিরোধ হয়। আমার মনে আছে একবারও, কোনও একমুহূর্তের জন্যও সেই নিরাপত্তা বেষ্টনীর শাসনকে লঙ্ঘন করা তো দূরে থাক, তাকে পাত্তাও দেননি আমার কলকাতার, আমার টালিগঞ্জের অন্য কোনও মানুষ। তাঁদের সেই দৃঢ়, নম্র অবহেলার সামনে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে হতে যখন নিরাপত্তা বলয় নিজের লজ্জাতেই কুঁকড়ে মিলিয়ে যেতে বসেছে প্রায়, তখনও পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কোনও শিল্পী বা কলাকুশলী চোখ তুলেও তাকাননি, একবারের জন্য ঐশ্বর্য রাইকে দেখবেন বলে। মধ্যিখান থেকে আমরা রোজ আমাদের সেই নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে ফ্লোরে ঢুকতাম একটা চরম অস্বস্তিকর গ্লানি নিয়ে।

আমরা যে বিশেষ সিকিওরিটি বসাচ্ছি, তার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট প্রধানদের কাছে আবেদন করে অনুমতি নিয়েছিলাম। একবার ভাবিওনি যে সারা টালিগঞ্জ জুড়ে যে অগণিত শিল্পী এবং কলাকুশলী রোজ কাজ করেন, তাদের একটা মৌখিক সম্মতিও মানবিক সৌজন্যসম্পর্ককে স্নিগ্ধ করে। তাতে কোনও ঔদ্ধত্যও থাকে না আর যে কোনও ঔদ্ধত্যর যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, চূড়ান্ত আত্মগ্লানি, তার সামনে গিয়েও দাঁড়াতে হয় না কাউকে। আমার ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত মানুষ সেদিন তাঁদের পরম নিস্পৃহতা দিয়ে আমার মাথা উঁচু করে দিয়েছিলেন। একবারের জন্য আমাকেও, আমার সহকর্মীদের কোনও অজানিত তারকা কৌতূহল আমাকে মুম্বই-এর কোনও গ্ল্যামারসম্রাজ্ঞীর কাছে ক্ষণেকের জন্যও বিব্রত করেনি। বরং পরম গর্বে, চরম শ্রদ্ধায় আমাকে নূতন করে শ্রদ্ধাবনত করেছে আমার রোজকার সহকর্মী বন্ধুদের কাছে।

সেই মানুষগুলোই আজ অমিতাভ বচ্চনকে কেবল পাঁচ মিনিট দেখবেন বলে বড় উৎসুক, বড় আন্তরিকভাবে ব্যাকুল। অনামিকাদি (সাহা) আমাকে বললেন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে কাজ করছিলাম, শুনলাম অমিতাভ বচ্চনের মেকআপ রুম তৈরি হচ্ছে, একফাঁকে গিয়ে দেখে এলাম।" কী সরল, অকপট স্বীকারোক্তি! আসলে অমিতাভ বচ্চন মানে বোধহয় আমাদের কাছে এক অগ্রগতির ইতিহাস। পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে বারংবার সাফল্যকে স্পর্শ করার এক প্রোজ্জ্বল্যময় দৃষ্টান্ত। ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করতে চাওয়াই তো মানুষের এগিয়ে যাওয়ার নিত্যযাত্রা। কোন নিরাপত্তা বেষ্টনীর সাধ্য তাকে আটকায়!

আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে আমার নতুন ছবির শুটিং শুরু হল। কেবল একটাই কোনোক্তি, প্রযোজকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মিডিয়াকে অনুরোধ করা হবে শুটিং কভার না করতে।

আমি বলতেই পারতাম, রোববার-এর ফার্স্ট পার্সন এর পাতায় আমি শুটিং-এর সাপ্তাহিক ধারাবিবরণী দিয়ে যাব। সৃঞ্জয় তাতে খুশিও হতো খুব। আমার অন্য মিডিয়াবন্ধুরা নিশ্চিত থাকুন, 'চোখের বালি'র সময়ও 'আনন্দলোক'এ সেরকম কিছু ঘটেনি, এবারও ঘটবে না।

আর আমাদের রোববার-এর পাঠক পরিবারের জন্য বলছি— আমি শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও রোববারের আবেদন অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করব।

কাজ করে বাড়ি ফিরে কি বাচ্চা মানুষ করা যায় না, বলুন?

পুনশ্চ : ভাল কথা। আমি ন্যাড়া হয়েছি এমনি। আমার বাবা ভাল আছেন।

১১ মার্চ, ২০০৭

সকাল সন্ধে শুটিং নিয়ে নাজেহাল। তারই মধ্যে প্রচণ্ড তাড়াহুড়োয় 'ফার্স্ট পার্সন' লিখছি। তিতলির সময় ফার্স্ট শট-টা নেয়ার পরেই গোরা (সৌরণ দত্ত), সেই ছবিতে গোরা আমার সঙ্গে পরিচালনা বিভাগে কাজ করেছিল, বলেছিল 'এই তো ছবি শেষ'। কথাটার মানে এখন বুঝতে পারি। একবার শুরু হয়ে গেলে তখন যে একটা অলৌকিক গতিতে প্রায় যেন নিজেদেরও অজান্তে শুটিং-এর মাঝখানে পৌঁছে যাই, ভাবলে নিজেরও আশ্চর্য লাগে।

জাতীয় ভাষার গরিমাকে কোনওভাবে অক্ষুণ্ণ না করেও বলি, ইংরিজিতে ছবিটা করতে আমার অনেক সুবিধে হচ্ছে। রেনকোট বা সানগ্লাস এর সময় হিন্দি ভাষায় ছবি করতে গিয়ে পদে পদে যখন অনুবাদকের শরণাপন্ন হতে হত, মৌলিক সংলাপের মাধুর্য হিন্দি ভাষায় অক্ষুণ্ণ রইল বা রইল না, সারাক্ষণ কেমন যেন নিজের কাজের ব্যাপার নিজেই সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম—তার থেকে যে ভাষায় আমি নিজে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, সেই ভাষাতে কাজ করবার স্ফূর্তি অনেক বেশি, এটা যেন পদে পদে বুঝেছি। আসলে ছবি বানানোটা এখনও বোধহয় ভারতবর্ষে মূলতঃ একটা নাগরিক শিল্প। যেহেতু, এ দেশে ছবি বানানোর পদ্ধতিটা শুরুই হয়েছিল। কোনও একটা মার্কিন মডেল-এর অনুসরণে, স্টুডিওভিত্তিক সিনেমানির্মাণকে কেন্দ্র করে। তাই সিনেমাশিল্প বড় শহরের বাইরে ছড়ায়নি। সারা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের অগণিত মানুষের দাক্ষিণ্যে যে শিল্প পুষ্ট, সমৃদ্ধ, লাভবান হয়েছে, সিনেমা নির্মাণের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই মানুষগুলোর কোনও ভূমিকা নেই। অথচ তাদের পছন্দ তাদের রুচি, তাদের শৈল্পিক চাহিদা চিরদিন মূলধারার নির্মাণকে বাণিজ্যিক দর্পণালোক দিয়েছে।

তারপরও এই চূড়ান্তভাবে নাগরিক শিল্প সহজেই তার নিজের জন্য নিজনির্মিত এক পরিশীলনের ভাষা তৈরি করে নিয়েছে—যার বাইরের সবকিছুই 'গ্রাম্য' বা 'গাঁইয়া'।

'দা লাস্ট লিয়র' এর সাম্প্রতিক নির্মাণ অভিজ্ঞতা থেকে একটা মজার (?) ঘটনা বলি। আমার

চিত্রনাট্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে একটা গ্রামের সার্কাস। অনেক খুঁজেপেতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তীর পথে মালঞ্চ বলে একটা জায়গায় একটা পছন্দসই সার্কাসের তাঁবু খুঁজে পাওয়া গেল।

আমি এখন গড়গড় করে জায়গাগুলোর নাম বলে গেলাম বলে ভাববেন না আমি জায়গাগুলো সঠিকভাবে চিনি বা প্রয়োজন হলে কাউকে চিনিয়ে দিতে পারব।

শুটিং-এর গোড়ার দিকে কেউ ফোন করে 'কোথায় শুটিং করছ' বললে আমরা অনেকেই বারবার বলছিলাম 'ওই তো, বানতলা ছাড়িয়ে গিয়ে কোথায় যেন একটা...।' সে জায়গাটাও যে আমাদের ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যে, এবং প্রচুর বৈধ নাগরিকের বাসস্থান (দেখেছেন, 'অধিবাসী' শব্দটাকেও আমরা কেমন সাংবিধানিকভাবে সিটিজেন বা নাগরিক করে ফেলেছি) -এবং অন্তত সেই হিসেবেও যে কোনও ভূমিখণ্ডরই যে একটা যথার্থ সসম্মান স্বীকৃতি প্রাপ্য, সেই সত্যটযুকু অবধি আমরা খেয়াল রাখি না।

সার্কাসের দৃশ্যে অভিনয় করছিলেন রমেন রায়চৌধুরী, অর্জুন রামপাল, যিশু সেনগুপ্ত এবং জীবন গুহ। প্রথম দিনের কাজটা প্রধানত ছিল যিশু আর রমেনদাকে নিয়ে। প্রথমদিন বেলা দশটা নাগাদ যখন আমরা লোকেশনে পৌঁছলাম, পুলিশ কর্ডন আঞ্চলিক মানুষের সংঘবদ্ধ উপস্থিতিকে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে।

সারাদিন ধরে শুটিং চলল। কখনও সার্কাস তাঁবুর ভেতরে, কখনও বাইরে। আর, দুপুরের প্রোজ্জ্বলিত রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে কাতারে কাতারে মানুষ যে নিশ্চল নীরব ধৈর্যে কীসের জন্য অবিচল প্রতীক্ষায় স্থাণু হয়ে রইল, কে জানে?

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় সার্কাস তাঁবুর সম্মুখ প্রাঙ্গণে একটা শট নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ক্যামেরা বসাতে গিয়ে দেখি মানুষের সংখ্যা আরও অগণিত, সারাদিনের শান্ত ধৈর্য এবার প্রায় অপ্রতিরোধ্য। বাঁশের গায়ে মোটা নারকেল দড়ি লাগিয়ে যে বেষ্টনী তৈরি হয়েছে, সেই লক্ষ্মণরেখা তখন আর কেউ মানছেন না। পারলে প্রায় শটের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

পুলিশকর্মী ক'জন আপ্রাণ চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারছেন না। ইউনিটের ছেলেদের চিৎকার করে করে গলা চিরে গেছে।

সঙ্গীন অবস্থা। একদিকে আলো প্রায় মুমূর্ষু, অন্যদিকে এই অদম্য জনসাগর-ভিড় নত্রা সরালে শট নেওয়া যাবে না।

যাক। অতিকষ্টে শট হল।

এবার ফিরতে হবে।

গাড়িগুলো রাখা ছিল রাস্তার ওপর। অল্প, একটু ঢাল বেয়ে মাঠে নেমে সার্কাসের তাঁবু।

সকালবেলায় অত অসুবিধে হয়নি। যত বেলা বেড়েছে, খবর চাউর হয়েছে দিগ্বিদিকে। ফলে

এখন। অগুন্তি মানুষ যিশুকে ঘিরে ধরেছেন। একটু দেখবেন, একটু ছোঁবেন। মধ্যিখান থেকে যিশু বেচারার নাজেহাল অবস্থা। কোনওক্রমে প্রচুর পাহারাসমেত যিশুকে গাড়িতে চালান করা হল। আমি আঞ্চলিক পুলিশবাহিনীর প্রধানকে একটু রাগতভাবেই বললাম—আপনারা যদি এই ভিড়টুকুও সরাতে না পারেন, তাহলে কী করছেন? ভদ্রলোক খুব কাঁচুমাচু মুখে উত্তর দিলেন—বুঝতে পারিনি স্যার, এত ভিড় হবে।

ফিরছি যখন সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। সাইকেল ভ্যানে বাড়ি ফিরছেন কত মানুষ। কেউ কেউ হেঁটে, কেউ বা সাইকলে, বাইকে।

একটা কথা মনে হল বারবার। 'ভিড়' বলছি কাদের? এই প্রত্যেক ক'টা মানুষই তো ঠিক যিশুর এবং আমার মতো বৈধ ভারতবাসী, সংবিধানের ভাষায় নাগরিক। তাঁরা তো আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে এসে কোনও উৎপাত করেননি। আমরা তো তাঁদের জায়গায় কাজ করতে এসেছি আমাদের প্রয়োজনে। তাঁরা তাঁদের নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন—এর বেশি তো কিছু নয়!

আজ এই মানুষগুলোর যিশুকে নিয়ে এত উত্তেজনা বলেই না ওর বাজারদর! আর আমার হাতে যেহেতু পুলিশ প্রতিরক্ষা আছে, আমি তাঁদের নিজেদের জায়গা ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বলতে পারি: তাহলে যদি কারও হাতে আরও পুলিশ থাকে, তো তাঁর ব্যবহার আরও অসংযত হবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

ভিড় কথাটার মানে 'জনগোষ্ঠী'। আমরা কেবল অসহিষ্ণুতা দিয়ে শব্দটার মানে পাল্টে করলাম 'অপাংক্তেয় মানুষ'।

অভিনন্দন!!!

১৮ মার্চ, ২০০৭

সতেরো বছর আগের কথা। উনিশশো নব্বই সাল।

বিজ্ঞাপনে তখন আমার সাত বছর বয়স। বিজ্ঞাপনের অফিসে সাত বছর অনেকটা সময়। এবার ধীরে ধীরে একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে। ছবি করতে হবে সেটা তো বটেই, কিন্তু কী করে?

চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটিতে তখন শাবনা আজমি চেয়ার পার্সন। বড় ইচ্ছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাগলা সাহেবের কবর' নিয়ে ছবি করব। চিত্রনাট্য করে আবেদনপত্র জমা দিলাম।

মৌণাদি শাবানাকে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, ফলে অন্তত চিত্রনাট্য কমিটির সকলে লেখাটা পড়লেন। কমিটিতে ছিলেন, যতদূর মনে পড়ছে, পার্ল পদমসে, দয়াল নিহালনি, অমিত খান্না, সুধীর মিশ্র, আর মনে নেই।

তারপরে বম্বেতে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির অফিসে খুব মজার একটা মিটিং হল। কমিটির সদস্যরা জানালেন, পাগলা সাহেবের কবর যেহেতু ভূতের গল্প, চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি ছবিটা করতে পারবে না, কারণ ভূত নিয়ে ছবি করা মানে এক ধরনের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তো গুগা বাবা সার্থক ছোটদের ছবি নয়, তাতে খোদ ভূতের রাজা আছে। সদুত্তর পাওয়া গেল না। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ভূত না থেকে গল্পে যদি পরী থাকত তাহলেও কি আপত্তি হত?

তারও কোনও উত্তর নেই। একটাই পরামর্শ—যেহেতু আমার চিত্রনাট্য লেখার ধরন ওঁদের ভাল লেগেছে, আমাকে ওঁরা আরেকবার সুযোগ দিতে রাজি। তবে গল্প পাল্টাতে হবে। কলকাতা ফিরে এলাম। শীর্ষেন্দুদার আরেকটা গল্পও আমার বড় প্রিয়—হীরের আংটি। ভাগ্যক্রমে সেটা কোনও ফিল্মমেকার বুক করেননি। অতএব গল্পটা ফ্রি আছে।

আবার নতুন করে চিত্রনাট্য লেখা। নতুন করে ভাবনা। আমার চিত্রনাট্যে দুর্গাপুজোর একটা বড় ভূমিকা ছিল। সংশয় যে হয়নি তা নয়, ভূত যদি কুসংস্কার বলে ত্যাজ্য হয়, পুজো গ্রাহ্য হবে তো?

যাক, সেরকম কিছু ঘটল না। ১৯৯১-তে আমার প্রথম ছবি 'হীরের আংটি' তৈরি হল। ততদিনে চেয়ারপার্সন বদলে গেছেন। জনতা সরকার চলে গিয়ে রাজীব সরকার আবার ক্ষমতায়। জয়া বচ্চন পুনর্বহাল। ছবিটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হল। কিন্তু রিলিজ হল না। লোকে ব্রেক পায় না, আমি গোটা একটা ফিচার ফিল্মের সুযোগ পেয়ে, ছবিটা বানিয়েও, কিছু করে উঠতে পারলাম না। খুব দুঃখ হয়েছিল।

উনিশে এপ্রিল ছবিটা না হলে একটা অসফল ছবির নির্মাতা হিসাবে আজও হয়তো কোনও বিজ্ঞাপনের অফিসে প্রাত্যহিক চর্বিতচর্বণ করতে হত।

যে কোনও কাজ ক্ষমতাও বটে, যোগাযোগ বা সুযোগও বটে। একথা অস্বীকার করার সত্যিই কোনও উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ সত্যজিৎ জন্ম সপ্তাহে সেই দুই মহাকৃতীর কপাল আর কীর্তির ছলনা নিয়েই এবারের সংখ্যা—টাকা না পাই।

হতোদ্যাম লেখক বা চলচ্চিত্র নির্মাণ অভিলাষী বন্ধুবান্ধব থাকলে তাঁদের অবশ্যই পড়তে বলুন। তাঁদের ভাল লাগবে।

৬ মে, ২০০৭

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে—
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

শ্বেতপাথরের থালা ছবিটিতে এই গানটি ছিল নায়িকা বন্দনার অকালবৈধব্যর গান। গানটির বাণী একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যায় যে গানটি সে অর্থে কোনও বিচ্ছেদ বা বিরহগাথা নয়। হৃদয়ের আকস্মিক প্রণয়োপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথ এই গানে প্রায় এক ঈশ্বরিত মহিমা দিয়েছেন।

ফলে 'চলে গেল কে' শব্দ তিনটিকে বড় বেশি আক্ষরিকভাবে ধরে নিয়ে পরিচালক যখন গানটিকে নাট্যাংশে বন্দনার স্বামীর মৃত্যু অভিঘাতের কেন্দ্রে স্থাপন করেন, রসিকমন হয়তো কিছুটা বিচলিত বোধও করেন বা!

'শ্বেতপাথরের থালা' ছবিটি আমাদের এর বেশি বলে দেয় না। কিন্তু জীবনের অন্য কোনও ক্ষেত্র থেকে হয়তো কখনও বা উঠে আসে মরণোত্তর জীবনের অন্য কোনও পাঠ। কোনও এক বিয়োগাতুর অনাস্বাদিত উন্মোচন।

পরিণয় তাকে এক বন্ধনে বন্দিনী করে, এবং বৈধব্য তাকে ঠেলে দেয় অন্য এক কারাগারে—ফলে যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মেয়েদের মনে স্বামী বিচ্ছেদের বেদনার থেকে বৈধব্যের পারিণতিকল্পনা অনেক বেশি ভয়াবহ।

এ এমনই এক সামাজিক ত্রাস, যার সামনে দাঁড়িয়ে আজও পরাভূত পরমাসুন্দরীরা—বৃক্ষে বরমাল্য দিয়ে মাঙ্গলিকত্বের কাল্পনিকের দোষ খণ্ডান।

ফলে, স্বামীকে ভালবাসে যতটা না, তার থেকেও অনেক বেশি নিজেকে ভালবেসে—বৈধব্যের নিঃসীম নির্বাসনকে মেনে না নেওয়ার নিঃশব্দ প্রতিবাদই যেন স্বামীর জীবনরক্ষার তাগিদে বারবার প্ররোচিত করেছে নানা শঙ্কিতাকে। এবং পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্য সেখান থেকে সুকৌশলে নির্বাচন করে নিয়েছে আদর্শ সতীত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন—সাবিত্রী, বেহুলা...

স্বামীর শবসঙ্গিনী হয়ে মান্দাসের ভেলায় চেপে যে মেয়েটি যাত্রা করেছিল এক অনিকেত অমৃতলোকের খোঁজে, তাকে কি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কেবলই পতিপ্রেম, না এক অজানা অপার পৃথিবীর অভিযাত্রিনীর মুক্তি অভিপ্সা? কারণ, কেবলমাত্র সহমৃতা বা অন্তিমগামিনী হলেই নারী বহির্জগতে বেরতে পারে, নইলে সে তো চিরাচরিতভাবে পথি বিবর্জিতা।

বা, যে সাবিত্রী মৃত স্বামী সত্যবানকে অবলম্বন করেই খুঁজে নেন তার নিজের জীবনতীর্থ, নিবিড় অরণ্যানীর গভীরে ঘন বনস্থলীর ছায়ায় সম্মুখীন হন প্রথম অনাত্মীয় পরপুরুষের, সেই মাহমারূঢ় মেঘবর্ম কালান্তক যমের সামনে দাঁড়িয়ে সমমনস্কার সমমেধার এক রোমাঞ্চকর

প্রশ্নোত্তর খেলার মধ্যে দিয়ে নিজের এতদিনকার নিষ্ফলা অন্তঃপুরিকা জীবনকে অন্তত একবারের মতোও প্রজ্জ্বলিত করে তোলেন—তাঁর তাড়না কি নিছক পতিপ্রেম?

যে পতি নারীকে সমাজে পদবী দিয়েছে, পরিচয় দিয়েছে, বৈধতা দিয়েছে; সেই পতিই বুঝি হতে পারে নারীর রুদ্ধশ্বাস জীবনের বহতা স্বপ্নের যথার্থ বাহন।

সেই স্বামী বা ভূস্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে কবি মীরাবাঈ যখন প্রেমের কবিতা লিখতে চান। তাঁর মনের আদর্শ প্রেমিকটি আপনিই পরেন শিখিপাখা, হাতে তুলে নেন মোহনবাঁশি।

'যাকে সির মৌর মুকুট, মেরো পতি সোই'

বাবা তারকনাথ ছবির নায়িকা স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে বাঁক কাঁধে ছুটে গিয়েছিল তারকেশ্বরের মন্দিরে। বাংলা সিনেমার এই একটি অলৌকিক অভিযান যে কখন কোন যাদু তন্তুকারের মতো প্রায় অদৃশ্য সুতোয় নতুন করে বুনে ছিল বাংলার সাবঅলটার্ন ইতিহাস, তা সত্যিই আশ্চর্য।

দেবী সন্তোষী মা যে সিনেমার সৃষ্টি এতদিনে আমরা প্রায় সবাই তা জানি। 'নাগিন' ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'তন ডোলে মেরা মন ডোলে' আজ যে কোনও সাপুড়ের বাঁশির সুর হয়ে গেছে, তাও আমাদের অজানা নয়।

কিন্তু 'বাবা তারকনাথ'-এর নায়িকা (অভিনয় করেন সন্ধ্যা রায়) যে কখন প্রায় নিজেরই অজান্তে শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরের পথে সম্মিলিত পুরুষকণ্ঠের উচ্চকিত 'ভোলে বাবা পার করে গা'র মধ্যে নারীকণ্ঠের মুক্তি মিশিয়ে দেন, তা যেন নিজেও জানেনা। সেই রমণীকণ্ঠ বছরে বছরে বাড়ে, বাড়তে বাড়তে এক নিজস্ব উদ্দামতায় পুরুষ নারীর যুগ্ম সম্মিলনে এক যৌবনের তীর্থযাত্রায় পরিণত হয়।

ধর্মই যেখানে বন্দিনীদের পথে পা রাখবার অজুহাত, মহাষ্টমীর রাত যেখানে সারা বছরের একটাই তারাভরা খোলা আকাশ—সেখানে বৎসরান্তের এই মুক্তির যাত্রায় আজ বাংলার অনেক মেয়েরা সামিল।

কারণটা বোধ করি, ভেতরের ডাক।

আমরা ছবি বানিয়েরা যখন গ্রামের ছবি, শহুরে ছবির ভাগ করি এবং ভাবি আমাদের কৃত্রিম স্বপ্নরচনার শরিক হওয়ার মধ্যে দিয়েই অনুষ্ঠিত হয় ছবির বাণিজ্যিক সাফল্য, আমরা স্বতই ভুলে যাই যে রোজকার চাপা পড়ে থাকা ইচ্ছেগুলো যখন যার হাত ধরে ডানা মেলতে পারে, সেই হাতটাই বড় নির্ভরশীল সঙ্গী।

হঠাৎই মনে পড়ল, ধরে নিন প্রায় অকারণেই— বাবা তারকনাথ মুক্তি পেয়েছিল এবং অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছিল সাতাত্তর সালে। বামফ্রন্টের গদিতে আসার বছর।

২৯ জুলাই, ২০০৭

টরোন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিফ্যাল-এর সম্প্রতি কয়েকবছর হল একটা কৌলীন্য বেড়েছে। কান-ভেনিস-বার্লিন-আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের এই অবিসংবাদী ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহেশ্বরের পাশাপাশি টরোন্টোর ভূমিকাটা প্রায় যেন দেবরাজ ইন্দ্রের মতো। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এই বিশাল চলচ্চিত্রোৎসব আয়োজন, তার চলচ্চিত্র বাছাইয়ের উৎকর্ষের জন্য যত না জগদ্বিখ্যাত, তার থেকেও অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে পৃথিবীর বিশিষ্টতম সিনেমার বাজার হিসেবে।

মে মাসের কান ফেস্টিভ্যালে দেখা হয়েছিল টরোন্টোর নির্বাচক ক্যামেরন বেইলি-র সঙ্গে। তখন দা লাস্ট লিয়র-এর শুটিং সবে শেষ। জুন মাস নাগাদ ক্যামেরন যখন ভারতবর্ষে আসে ছবি বাছাই করতে, 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর একটা প্রাথমিক এডিট হয়ে ছিল। তার ভিত্তিতেই ক্যামেরন ছবিটা নির্বাচন করে যায় টরোন্টোতে দেখাবে বলে।

টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মূলত প্রতিযোগিতামূলক নয়। এখানে নানা বিভাগে নানা ধরনের ছবি দেখানো হয়। 'Masters' বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ সসম্ভ্রম বিভাগ আছে, যেখানে সারা পৃথিবীর Master ফিল্ম-মেকারদের ছবি দেখানো হয়। এ বছর সে বিভাগে ছিল বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও আদুর গোপালকৃষ্ণণের ছবি।

তাছাড়া আছে স্পেশাল স্ক্রিনিং বা বিশেষ প্রদর্শনীর বিভাগ। সন্তোষ শিবন-এর ছবি দেখানো হচ্ছে সেখানে।

আমি ভেবেছিলাম দ্য লাস্ট লিয়র ওই বিভাগেই দেখাবে ক্যামেরন। ওর কথাবার্তা শুনে অন্তত সেরকমই মনে হয়েছিল।

হঠাৎ অগাস্টের গোড়ায় একটা জরুরি ফোন এল আমার এবং প্ল্যানম্যান-এর শুভ'র (শুভশেখর ভট্টাচার্য) কাছে। ওরা 'গালা' রেড কার্পেট বিভাগে দেখাবে।

গালা বিভাগটা টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এর সবথেকে সাড়ম্বর বিভাগ। সেখানে বড় বড় ছবির প্রিমিয়ার হয়। এই হলিউড অস্কারের অনুকরণে থিয়েটারের সামনে বিছনো কার্পেট বেয়ে সেই প্রিমিয়ারে এসে পৌঁছন ছবির নানা কুশলীরা।

তিনশোটা ছবির মধ্যে কুড়িখানা ছবির কপালে নাকি বিরল সম্মান জোটে। সম্মানটা বিরল হতে পারে, কিন্তু ঝকমারিও বটে। তার মানে হল ছবির যত বড় বড় তারকা তাঁদের উপস্থিতিতে বিশাল এক প্রেক্ষাগৃহে-দু-হাজার দর্শকের মধ্যে প্রথম প্রদর্শনী।

ছবি শেষ হতে না হতেই এমন আমন্ত্রণে প্রাথমিকভাবে সকলেই একটু বেশি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এমনকী অমিতদাও, মা-র প্রবল অসুস্থতা সত্ত্বেও কয়েকবার মাত্র আপত্তি করেও শেষমেশ রাজি হয়ে গেলেন।

৯ সেপ্টেম্বর, রোববার, বেলা দেড়টার সময় রয় অ্যান্ড থমসন্ হলে প্রিমিয়ার শো। আর ৩১ আগস্ট সকালবেলা অমিতদা ছবির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের ডাবিং করে উঠতে পারেননি।

ধম্বেতে অমিতাভ বচ্চনের নানা কাজ। তাছাড়া রামগোপাল ভার্মার আগ রিলিজ করবে, তার নানাবিধ অডিশন প্রোমো করতে অমিতদা ব্যস্ত।

যাক! শেষমেশ হাতে তিনটে দিন সময় পাওয়া গেল ছবি তৈরি করে, ফাইনাল প্রিন্ট করে, সাব টাইটেল করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এই সাবটাইটেল-এর ব্যাপারটায় নানারকম মতানৈক্যের ব্যাপার ছিল। ইংরেজি ভাষার ছবিতে আবার ইংরেজি টাইটেল কিসের! আমার খুব দৃঢ়ভাবে মনে হয়েছিল, যে আমরা ভারতীয়রা যেহেতু নানারকমভাবে ও প্রাদেশিক যত ইংরেজি বলি, বাঙালি ইংরেজি, তামিল ইংরেজি, পঞ্জাবি ইংরেজি যেহেতু অভিন্ন নয়—ইংরেজি ভাষার বৈচিত্র্য যদিওবা বিদেশি কাউকে বিভ্রান্ত করে এবং তদ্দারা মূলরসগ্রহণ ব্যাহত হয়, ছবিজুড়ে সংলাপের একটা সারাংশ সাবটাইটেল প্রায় যেন প্রতিটি বিদেশি দর্শকের একটা আভিধানিক উপকারিতায় লাগতে পারে। ভারতবর্ষ' থেকে টরোন্টো যাওয়ার কথা কয়েকজনের। অমিতাভ বচ্চন এবং প্রীতি জিনটা। ছবির দুই মহাতারকা।

অর্জুন রামপাল ছবিটাই একটা বিশেষ ভূমিকায় বেশ সুন্দর অভিনয় করেছে। অর্জুনের খুব আগ্রহ ছিল একটা বড় জায়গায়, বড় করে ওর অভিনয় সম্বলিত কাজটুকু কেমনভাবে প্রদর্শিত হবে, লোকে ওঁর কাজ দেখে কী বলবে, যারা এতদিন ধরে ওকে 'মাকাল ফল', 'দেখতেই ভাল, অ্যাক্টিং করতে গেলেই কাঠ' এসব বলে এসেছে, তারাই বা কীভাবে ওর কাজ দেখবে? দেখে ভাল বলবে না, ইত্যাদি বহুস্তর এক দুশ্চিন্তা-আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন নিয়ে অর্জুনও আমাদের সঙ্গী হল।

কলকাতা থেকে যাচ্ছে যিশু। হ্যাঁ, আমাদের যিশু সেনগুপ্ত। যিশুর কাছে পুরো ঘটনাটাই স্বপ্নময়। ওর প্রথম ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গে করা ছবিটাতেই অমিতাভ বচ্চন ওর সহ অভিনেতা, ইনফ্যাক্ট মনে পড়ে যিশুর জন্মদিন পালিত হয়েছিল লাস্ট লিয়রের সেট-এ, যেখানে অমিতদা এসে 'হ্যাপি বার্থডে টু যিশু' গেয়েছিলেন এবং প্রীতি শ্যাম্পেনের বোতল খুলেছিল—যিশুর সেই অনাস্বাদিত স্বপ্নতরঙ্গ এখনও অব্যাহত। ওর প্রথম ইংরেজি ছবি অমিতাভ বচ্চনেরও প্রথম ইংরেজি ছবি। আর ওর প্রথম আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালের রেড কার্পেটে হাঁটা ভারতের এই দীর্ঘকায় কিংবদন্তির ক্ষেত্রেও সত্যি—এটা মিলিয়ে নিয়ে কোথায় যেন বারবার একটা সংশয় হচ্ছিল যিশুর। শেষমেশ কানাডায় ভিসা, টরোন্টোর টিকিট সত্যিই যখন ওর হাতে এসে পৌঁছল, যিশু বোধহয় বেশ কয়েকবার নিজেকে চিমটি কেটে বুঝিয়েছে যে ও-ও তাহলে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই যাচ্ছে।

টরোন্টো যাওয়া নিয়ে অরিন্দমেরও খুব উৎসাহ। অরিন্দম মানে অরিন্দম চৌধুরী। প্ল্যানম্যান-এর কর্ণধার, 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর প্রযোজক।

সারা শুটিংটুকু জুড়ে—তা সে কলকাতাই হোক রায়চকেই হোক, আর মুসৌরিতেই হোক—অরিন্দম, ওর স্ত্রী রজিতা আর ওদের ছোট্ট ছেলে চে'কে প্রায়ই দেখা যেত সেট-এর

একাকোণে চুপ করে বসে শুটিং দেখছে।

চে আবার ওর ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলত প্রধানত আমার সদ্য ন্যাড়া হওয়া মাথার।

চে যাচ্ছে না টরোন্টোতে । যাচ্ছে অরিন্দম আর রজিতা।

তাছাড়া যাচ্ছে শুভ, শুভর স্ত্রী সুচেতা। আর ছবির কার্যনির্বাহী প্রযোজক করুণ, আর করুণের স্ত্রী দীপিকা। করুণ দীপিকা আবার এ ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীও বটে।

এবং সবশেষে যাচ্ছি পালের গোদা আমি। রোববারকে যথারীতি অনাথ করে, বাবাকে বাবার নার্স প্রভাতী আর ছবির দায়িত্বে রেখে, ফাইনাল প্রিন্টের দায়িত্ব ইউনিটের হাতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিন তিনটে ঢাউস স্যুটকেস নিয়ে আমি যাচ্ছি। পথে ছোট্ট একটা ডি-ট্যুর আছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে একটা ভারতীয় ছবির উৎসব হচ্ছে—সেটার উদ্বোধন 'দোসর' দিয়ে। আমি টরোন্টো যাওয়ার পথে ওয়াশিংটন হয়ে যাব।

সেপ্টেম্বরের চার তারিখ শুরু হল আমার আমেরিকা ক্যানাডা যাত্রা। সঙ্গে আমার পনেরো নম্বর ছবির প্রথম পথ চলা।...

৭ অক্টোবর, ২০০৭

দুপুর বারোটা নাগাদ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আমেরিকান এয়ারলাইন্স-এর একটা ছোট্ট প্লেন-এ টরোন্টো রওনা দিলাম আমি আর যিশু।

গত দুটো দিন ওয়াশিংটন ডিসিতে ভালয়-মন্দয় কেটে গেল। ছ'তারিখে ভারতীয় ছবির একটা উৎসবের উদ্বোধন হল 'দোসর' দিয়ে। সাত তারিখ সকালবেলাটা অল্প একটু বেড়ানোর সময় পেয়েছিলাম। আসলে ন্যাশনাল মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট আমার ছবির একটা রেট্রোস্পেকটিভ করতে চায়। সেটা নিয়ে একটা মিটিং ছিল।

ভাগ্যিস, যিশু সঙ্গে ক্যামেরা এনেছে। আমি তো ছবি তুলতেও পারি না, ফলে সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। মাঝে মাঝে ভাবি, কতগুলো দেশ বেড়িয়েছি—সত্যি যদি কতগুলো ছবি অন্তত তোলা থাকত!

টরোন্টো এসে পৌঁছলাম বিকেল তিনটে নাগাদ।

এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য টরেন্টো ফেস্টিভাল-এর তরফ থেকে পাঠানো শাটল লিমো অপেক্ষা করছিল।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল-এর পথ তিরিশ মিনিটের। পথে ডানদিকে অন্টারিও লেক-এর একটা ঝলক দেখতে পেলাম।

বিদেশে বেড়ানোর যে জিনিসটা আমার সবথেকে খারাপ লাগে, সেটা হল আমার নিজের লাগেজ-বাতিক। যতগুলো জামাকাপড় আসলে পরি, তার দ্বিগুণ পরব বলে ঠিক করি, আর সঙ্গে নিয়ে যাই তারও দ্বিগুণ। এবং প্রত্যেকবার এর হাতে পায়ে পড়ে 'আমার একটা স্যুটকেস নিয়ে যাবি, প্লিজ?' বলে কাকুতি মিনতি করে, বন্ধুবান্ধবদের ভর্ৎসনা আর নিজের নাক-কান মোলা প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও যাওয়ার আগে স্যুটকেসটা আমার সঙ্গে একটা স্বভাবসিদ্ধ বেইমানি করে কেমন যেন অতিকায় হয়ে ফুলে ওঠে।

ওয়াশিংটন চেক ইন কাউন্টারে বেশ সদয় ধরনের এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা ছিলেন। তাঁর দাক্ষিণ্যে আসার সময়ে তেমন কোনও বেগ পেতে হয়নি।

দেশে কাজের লোকেদের কল্যাণে আমরা আসলে যে কতটা ঠুঁটো এবং পঙ্গু, সেটা বাইরে বেরলে পদে পদে টের পাই।

কারণ এয়ারপোর্ট থেকে বেরলেই চিরাচরিতভাবে আমার ড্রাইভার গোবিন্দ দাঁড়িয়ে থাকে না, যে ট্রলিটা এবার তার হাতে দিয়ে দিলেই নিশ্চিন্তি।

বিশেষ করে আরও লজ্জা করে, যখন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেলে বিমানবন্দরের ফেস্টিভ্যাল কাউন্টার-এর অভ্যর্থনাকারিণীরা আমার ভারি ভারি স্যুটকেসগুলো নিয়ে গাড়িতে তোলেন এবং নিশ্চয়ই বিভিন্ন সময়ে, পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ভাষায় মুণ্ডুপাত করেন—আমি বুঝতেও পারি না।

বা, বুঝতে পারলেও একেবারে না বোঝার ভান করে মুখে এমন একটা স্মিত হাসি ধরে রেখে দিই, যেন সত্যিই ওদের দেশে পা রেখে আমি ওদের কৃতার্থ করেছি এবং ওদেরও যেন প্রায় মেমসাহেব অহল্যার মতো আমার এই পুণ্য পাদস্পর্শের আজীবন চাতক প্রতীক্ষায় বসে থাকারই কথা ছিল।

ভাগ্যি ভাল গাড়ির ডিকিতে সব মালপত্র সহজেই ধরে গেল।

এমনকী আমার গাবদা স্ট্রোলিব্যাগ এবং যিশুর ডাফল ব্যাগটাও।

গাড়ির ভেতরটা পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম। কালো দামি চামড়ার সিট কভার। সিটব্যাক-এ ম্যাগাজিন রাখা রয়েছে—Fashion, People ইত্যাদি।

ড্রাইভারের নাম, গাড়ির নম্বর কিছুই জেনে নিলাম না। আফসোস হচ্ছে।

গত কয়েকদিন ধরেই টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অভ্যাগত সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে।

এয়ারপোর্ট-এ একটা আলাদা ফেস্টিভ্যাল কাউন্টার। সেখানে TIFF বোর্ড লাগানো। এবং উৎসবের ব্যাজধারী দু'জন মহিলা অপেক্ষা করছেন। উৎসব সংশ্লিষ্ট যে যাত্রীই নামছেন, তাঁর প্রথম যোগাযোগ-জায়গা ওই অভ্যর্থনা কাউন্টারটি।

বুম্বা আর অর্পিতা পরশুদিনই এসেছে। বুম্বা দ্য লাস্ট লিয়র-এ ছোট্ট একটা পার্ট করেছে বটে, কিন্তু ফেস্টিভ্যাল-এ ওর আমন্ত্রণ বুদ্ধদার (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত) ছবি 'আমি ইয়াসিন ও মধুবালা'র

অন্যতম নায়ক হিসেবে। অর্পিতা সঙ্গে এসেছে বেড়াতে। বুম্বাকে এসএমএস করলাম। ওরা কোন হোটেল-এ আছে, জানতে পারিনি এখনও। বুম্বা এসএমএস গুলোর উত্তর দিচ্ছে না কেন জানি না। পাচ্ছে না বলে? আমি তো ডেলিভারি রিপোর্ট পাচ্ছি।

বুম্বার সঙ্গে মধ্যে কথা হচ্ছিল শীতকালে যদি সাহেব বিবি গোলাম ছবিটা করা যায়।

বেশ কয়েকজন প্রযোজক উৎসাহ দেখাচ্ছেন। বুম্বার সঙ্গে একজনের কথাবার্তা মোটামুটি অনেক দূরই এগিয়েছে। আর আমারও মনে হচ্ছে, সত্যি কতদিন বাংলা ছবি করি না।

গত দু'মাস প্রায় আমি বম্বেতে। মাঝে দু'তিন দিনের জন্য হয়তো বা কলকাতায় এসেছি। বুম্বা ওর নিজের শুটিং-ডাবিং নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ফলে ফোনেও যে খুব ভাল করে কথা হয়েছে, তা নয়। আমরা ঠিক করেই রেখেছিলাম, টরোন্টোতে গিয়ে যখন দেখা হবে, তখনই না হয় এটা নিয়ে একটু ডিটেলে আলোচনা করব।

পিরিয়ড ছবি করার ঝামেলাটা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। ভাগ্যিস 'চোখের বালি'র সময়ে তিন বছর ধরে আঁতিপাতি করে অনেকটা কাজ করছিলাম। আসলে ভিজ্যুয়াল রিসার্চ জিনিসটা ছবি বানানোর জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার হদিশ পাওয়া ততটাই দুষ্কর।

লন্ডনে যেমন দেখেছি শতাব্দী তো বটেই, প্রায় প্রতিটি দশক ধরে কীভাবে ব্যবহার্য সামগ্রীর চেহারার বিবর্তন ঘটেছে—তার অবিকল অনুকৃতি পাওয়া যায়। আমাদের এখানে এমন অমূল্য সাহিত্যভাণ্ডার সত্ত্বেও দৃশ্যমান বস্তুতালিকার যে কী অভাব, আর সঠিক নমুনা পাওয়া গেলেও বাংলা ছবির বাজেটে তাঁর পুনর্নির্মাণ প্রায় অসম্ভব— সেকথা চোখের বালি করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

'সাহেব বিবি গোলাম'-এ একটা অন্য সমস্যা আছে। গুরু দত্তের হিন্দি ছবিটার কল্যাণে 'সাহেব বিবি গোলাম' নামটা যেন উপন্যাসের মলাট থেকে লাফিয়ে উঠে সিনেমার ক্রেডিট টাইটেল-এ চিরতরে আটকে গিয়েছে।

এটা যে আদতে একটা মূল উপন্যাস, সেই সময়ের পড়তি জমিদারিরর এক অনবদ্য দলিল, সেই সত্যটাই যেন সাদা কালোর দুই মায়ানায়িকা মানাকুমারী আর ওয়াহিদা রেহমানের বাঙালি আঁচলের আড়ালে কেমন করে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে, আমরা ভাল করে বুঝতেও পারি না।

ছবিটা করতে গেলেই ষাটের দশকের সেই মায়াবী সৃষ্টি আজও দর্শক আর আমার মাঝখানে অনড় দেওয়ালের মতো এসে দাঁড়াবে। সেদিক থেকে 'চোখের বালি'র একটা সুবিধে ছিল। সতু সেন-এর বানানো পুরনো ছবিটা আমরা কেউ দেখিইনি প্রায়। ফলে যেটুকু ঝগড়া বিবাদ পুরোটাই ওই দাড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবিটার অনেকটা আবেদনই বোধহয় ক্যামেরার বাইরের প্রণয়পুরাণটুকু। তরুণী ওয়াহিদা রেহমানের জন্য গুরু দত্তর বিধ্বংসী প্রণয়,

এবং ফলত স্ত্রী গীতা দত্ত'র ক্রমে মদ্যপানের শুরু, মীনাকুমারীর নিজের সুরালাঞ্ছিত জীবনের বেদনার ইতিহাস—এতগুলো রসায়নই বোধকরি আজ 'সাহেব বিবি গোলাম'কে এক অমর আইকন করেছে।

ফলে আজ ওই ছবিটা আবার বানাতে গেলে এই ইতিহাসটুকুও যেন আখ্যানভুক্ত হতে চায়।

কেমন হয় যদি গল্পটা আসলে এমন এক পরিচালকের হয় তিনি আদতে ছোটবাবু? একজন নবাগত অভিনেতার হয়, সে আসলে ভূতনাথ! পটেশ্বরী হয়তো বা পরিচালকের নিঃসঙ্গ স্ত্রী, স্বামীর জন্য যার অনেক অপেক্ষায় ইতিহাস আজ কেবল এক তরল আস্বাদের সান্ত্বনা। সেই নবাগতর এক নবীনা প্রণয়িনী যে এই সামন্ততান্ত্রিক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পঙ্কিলতার বাইরে— শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা এক নতুন জবা।

এর পাশাপাশি না হয় মূল কাহিনিটাও চলল। একই অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে। অনেকটা 'দ্য ফ্রেঞ্চ লিউট্যান্টেস উওমেন'-এর অবয়বের মতো।

তাহলে, নতুন করে একটা 'সাহেব বিবি গোলাম'ও হয়। পুরোনোটার সঙ্গে অবধারিত তুলনাও হয় না, আর উপন্যাসের ঐতিহাসিক কলেবরটাকে সঙ্কুচিত করার শৈল্পিক দ্বিধারও একটা সহজ অবসান ঘটে।

ভাবনাটা দু-একদিন হল মাথায় ঘুরছে। বুম্বার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতে ভাল হত। ভাবছিলাম, এখানে এসে দেখা তো হবেই—তখনই কথা বলে নেব না হয়।

গাড়িটা আমাদের পৌঁছে দিল রয়্যাল ইয়র্ক হোটেলে। আপাতত বারো তারিখ অবধি টরোন্টো শহরে এটাই আমাদের আস্তানা।

রয়াল ইয়র্ক হোটেলটা শহরের পুরনো অভিজাত একটা হোটেল। অনেকটা আমাদের গ্র্যান্ড হোটেলের মতো।

সাবেকি পাশ্চাত্য স্থাপত্য, বিশাল একটা লবি, অতিকায় ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো। শ্বেতপাথর, গ্র্যানাইট, দামি মেহগনির প্যানেল, ধ্রুপদী আসবাব আর নক্সাদার কার্পেটে মোড়া।

একবার টার্নস্টাইল দিয়ে লবি এরিয়াতে এসে ঢুকলে দিন বা রাত বোঝার কোনও অবকাশ নেই।

জানা গেল, অমিতাভ বচ্চন এই হোটেলে থাকতে চেয়েছিলেন। ফলে 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর গোটা টিমটাকেই এখানে তোলা হয়েছে।

আমার আর যিশুর ঘর সেভেনথ ফ্লোর-এর। ১৮৮ নম্বর।

ফরাসি শাসনের সব চিহ্ন এখনও ক্যানাডা দেশটা থেকে চলে যায়নি। এয়ারপোর্টে দেখলাম সব নির্দেশিকাই ইংরেজি এবং ফরাসি দুটো ভাষায়। আমাদের ঘরের অন্দরসজ্জা দেখেও অভিজাত ফরাসিয়ানার কথাই মনে হল।

ঘরের দেওয়ালটায় গোলাপী ফুল ফুল ছাপ ওয়ালপেপার। দুটো টুইন বিছানার মাথায় এক একটা স্টিল লাইফ পেইন্টিং। আমার মাথার ওপর ন্যাসপতি, যিশুর মাথায় লিচুর থোকা। অফ হোয়াইট প্লিটেড শেড এর একটা বার্গান্ডি ল্যাম্প দুটো বিছানার মাঝে একটা বেডসাইড টেবিলের ওপর জ্বলছে। মেঝেতে গোলাপি রাস্ট কার্পেট। ঘন পালিশ করা ফার্নিচার, একটু সাবেকি। সবুজ আর অফ হোয়াইট-এর নক্সাবোনা গদি দেওয়া, পুরনো দুটো চিপেনডেল চেয়ার। লেখার টেবিলের সামনের দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমের আয়না। তার পাশে টিভি ক্যাবিনেট।

ঘরে ঢুকেই টিভি চালিয়ে দিল যিশু। কোথায় বাঙালির ছেলে, হাতমুখ ধুবি, পায়ে জল দিবি, না জুতো পরা পা নিয়ে সটান উঠে পড়ল বিছানায়। ঠায় তাকিয়ে রইল টিভির দিকে, আর চোখের কোণ দিয়ে সমানে আমাকে বলে গেল 'একটু খাবার অর্ডার করো না ঋতুদা খুব খিদে পেয়েছে।'

টিভিতে 'ডোন্ট ফরগেট দ্য লিরিকস' বলে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অনেকটা কে বি সি-র মতোই মানে ধাপে ধাপে পুরস্কারমূল্য বাড়বার প্রতিযোগিতা।

খেলাটা মজার। আদতে একটা গানের অনুষ্ঠান। প্রতিযোগীরা সঙ্গীতপ্রিয়, এবং যাবতীয় গান শোনার অভ্যেস আছে। আমাদের অন্তাক্ষরী অনুষ্ঠানে যেমন হয় অনেকটা তেমনই।

মজাটা হচ্ছে, প্রতিযোগীকে তাঁর পছন্দমতো গানের শ্রেণি বেছে নেওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়। ধরা যাক—আমাদের ভাষায় রবি ঠাকুর, নজরুলগীতি, আধুনিক গান, জীবনমুখী গান, বাংলা সিনেমা বা বাংলা ব্যান্ড। এবার যে যার পছন্দসই গোত্র বেছে নিলে, সেই গোত্রের কোনও একটা গান বাজানো হয়। প্রতিযোগী সঙ্গে গলা মেলান, আর পর্দায় গানের বাণীটুকু ফুটে ওঠে। হঠাৎ কোনও জায়গায় এসে গানের কয়েকটি শব্দ উধাও হয়ে যায়। পর্দার পংক্তিতে ড্যাশচিহ্ন পড়ে। প্রতিযোগীকে সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়।

এইভাবে সহজ থেকে কঠিন, অল্প কথা থেকে গোটা স্তবক—যিনি কতটা নিখুঁতভাবে তাঁর স্মৃতি থেকে পূর্ণ করতে পারেন, তাঁর পুরস্কারমূল্য তত চড়চড় করে বাড়ে।

আমাদের চোখের সামনেই এক শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী পঞ্চাশ হাজার ডলার জিতলেন, আর এক কৃষ্ণাঙ্গ প্রৌঢ় এক লহমায় দুই মিলিয়ন ডলার ধনী।

আর আমরা, দুই বঙ্গসন্তান, অমনি সেটাকে চল্লিশ দিয়ে গুণ করে এক বিশাল আনুমানিক বৈভবের হিসেব করে ফেললাম যা দিয়ে চাইলে যিশু গোটা টরেন্টো এয়ারপোর্টের, সবকটা ডিউটি ফ্রি দোকান কিনে ফেলতে পারত।

ঘরে আমার জন্য রাখা ছিল একটা ফেস্টিভ্যাল কিট। তাতে ফেস্টিভ্যাল-এর আনুষ্ঠানিক ব্রোশিওর-এ 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর একটা সুন্দর ছবি দিয়েছে। মুসৌরিতে তোলা একটা দৃশ্যের। ছবিতে অমিতদা আর প্রীতির পেছনে মেরুন সোয়েটার পরা যিশুর চেহারা উঁকি মারছে।

পাতাটা যিশুর দিকে এগিয়ে দিলাম। যিশুর ফর্সা মুখটা যেন আরও একটু উজ্জ্বল দেখাল।

ছবি ছাড়াও ফিল্মের সারাংশ, ফিল্মের বিষয়ে টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের একটা ছোট লেখা

(প্রধানত অমিতদার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে) এবং শিল্পী এবং কলাকুশলীদের একটা তালিকা। সেখানেও যিশু সেনগুপ্ত নামটা জ্বলজ্বল করছে।

যিশুর নাকি কোনও ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আসা এই প্রথম। এবং আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যাল-এ, বিদেশে তো বটেই। দেখা যাক, এই ফেস্টিভ্যালটা ওর ওপর সত্যি সত্যিই কোন আলোছায়া ফেলে কিনা।

ক্যাটালগে দেখলাম বুদ্ধদার ছবির ইংরেজি নাম 'The Voyuers'। বুম্বা আর অমিতাভর একটা ছবি দিয়েছে।

আদুরের ছবির নাম 'Four Women'। সঙ্গে নন্দিতার ছবি দেখলাম।

হোটেল-এর ঘরের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। যাক, 'পাখা' 'পাখা' করে কাউকে জ্বালিয়ে মারতে হবে না।

অমিতদা আর প্রীতি নাকি প্রায় একই সঙ্গে লন্ডন থেকে রওনা হয়েছেন। এবার এসে যাবেন নিশ্চয়ই।

ঘরের ফোনটা বাজল। ফেস্টিভ্যাল-এর সিলেক্টর ক্যামেরন বেইলি। ও আমাদের হোটেল-এ আসছে সন্ধেবেলা, সাড়ে সাতটা নাগাদ। কালকের অনুষ্ঠানটা নিয়ে সকলের সঙ্গে একটা মিটিং করতে চায়।

হোটেলের ঘরের জানলার বাইরেটায় হোটেলটার অন্যদিকটা দেখা যায়। একটা দেওয়ালে কেবল বেলা শেষের পশ্চিমে রোদ।

ওয়াশিংটন ডিসিতে তো সন্ধে হচ্ছিল প্রায় আটটা নাগাদ। এখানে কখন সূর্য ডোবে জানি না!

জানলায় পাতলা সাদা স্বচ্ছ পর্দা লাগানো। তার দুপাশে ভারি পর্দা এবং পেলমেট-এ ভ্যালেন্স; গাঢ় সবুজ পাতা, আর গোলাপি ফুলের নক্সা করা। আলাদা করে পর্দাগুলো হয়তো ভাল নয়, তবে সব মিলিয়ে এই সাবেকি হোটেল ঘরটার সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। যিশুকে বলছি কয়েকটা ছবি তুলে নিতে। অন্তত কোনও একটা চেহারা মনে থেকে যাবে।

আগামিকাল দুপুর একটা নাগাদ আমাদের ছবির প্রিমিয়ার। ছবিটা গালা সেকশন-এ আছে বলে বেশ ধুমধাম করে একটা রেড কার্পেট-এর ব্যবস্থা হয়েছে।

যিশুটা এসে সত্যিই ভাল হয়েছে। টোটার জন্য এখনও আমার খারাপ লাগে। চোখের বালি'র সময় কোনও চলচ্চিত্রোৎসবে এল না ছেলেটা। নিজের কাজের প্রশংসাটা জানতেই পারল না নিজে। আমরা বাঙালিরা কতদিন এত ঘরকুনো হয়ে থাকব!

টিভির দিকে মুখ করে বসলে ডানদিকের খাটটা যিশুর। বাঁদিকেরটা আমার। এখন ছ'টা বাজে। বাইরের আলো পড়ে এসেছে। যিশুও এতক্ষণ টিভির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ সকালে এই সংখ্যার এডিট পাঠিয়ে দিয়েছি অনিন্দ্যকে। 'মাস্টারমশাই' সংখ্যাটার পর 'বন্দিনী' আর 'ভোকাট্টা'—দুটো ফার্স্ট পার্সনই একটু গোঁজামিল হয়ে গেল।

ওয়াশিংটনে মঞ্জুলা বলে এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম আমরা। তার অচল ফ্যাক্স মেশিনকে সচল করে লেখা পাঠানো হল।

সত্যিই, এবার বিদেশে আসার আগে ফার্স্ট পার্সন ছেড়ে দিয়ে আসব। ডেট্রয়েট-এও দেখেছি, এবারও দেখলাম—এই ফ্যাক্স করে এডিট পাঠানোটা বেশ ঝামেলার।

সন্ধে সাতটা নাগাদ ক্যামেরন-এর ফোন এল। ক্যামেরন লবিতে অপেক্ষা করছে। একবার কথা বলতে চায়।

আমার কেমন যেন ধারণা ছিল ক্যামেরন একজন বিশালাকায় গাঁট্টাগোট্টা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। দাড়ি এবং কোঁচকানো চুল।

আমি লবিতে নেমে ক্যামেরনকে মোবাইল-এ ধরার চেষ্টা করছি হঠাৎ দেখি ছিপছিপে চেহারার দাড়িগোঁফবিহীন নেড়ামাথা। আমরা দু'জনে এতটা কাছাকাছি যে প্রায় ধাক্কা খাই আর কী।

দুজনেই দুজনেই দিকে তাকালাম। ক্যামেরন আমায় দেখে বলল—ঋতু! আমি বললাম —ক্যামেরন!

এর মধ্যে আমিও রোগা হয়েছি, মাথা নেড়া হয়েছে চশমা উধাও হয়েছে। ফলে ক্যামেরনের কাছে আমি যতটা অচেনা, আমার কাছেও ও ততটাই। যাক, প্রাথমিক কথাবার্তার মাঝখানেই যিশুর ফেস্টিভ্যাল ব্যাগটা তুলে দিল হাতে। বেচারা কষ্ট করে ব্যগটা বয়ে বয়ে নিয়ে এসেছে।

ও প্রধানত আগামিকাল গালার স্ক্রিনিং-এর আগে আমরা কে কীভাবে, কে আগে বা কে পরে মঞ্চে উঠব, কে কে দর্শকের সঙ্গে কথা বলব—সেটা নিয়েই আলোচনা করতে এসেছিল।

ক্যামেরন চায় মঞ্চে অর্জুন, প্রীতি, অমিতদা তিনজনেই যেন কথা বলেন। আর বিশেষ করে, কারণ পরবর্তী স্ক্রিনিংগুলোর দিন ওঁরা কেউ এখানে থাকবেন না। ফলে দর্শক ওঁদের কথা শুনতে চাইবে।

খবর পেলাম অমিতদা আর প্রীতি সবে এয়ারপোর্টে নেমেছেন। টরোন্টো ফেস্টিভ্যাল বুকলেট-এ অমিতদার অভিনয়ের প্রশংসা পড়ে একটা এসএমএস করেছিলাম। দেখলাম এসএমএস-টা সবে ডেলিভার্ড হল। মানে প্লেন থেকে নেমে ফোন চালু হয়েছে।

অমিতদার মেসেজ এল—জাস্ট ল্যান্ডেড।

অমিতদার মধ্যে সত্যিই একটা শিশু আছে। ওই যে এসএমএস করে জানিয়েছি, যে তোমার নামে অফিসিয়াল বুকলেটে খুব ভাল ভাল কথা লেখা হয়েছে—তাই তৎক্ষণাৎ জানা চাই। চটজলদি এসএমএস এল-Driving towards hotel. Will I be able to see the booklet in the hotel ?

লিখলাম—নিঃসন্দেহে। অবশ্য শুভ যদি কাছাকাছি থাকে, ওকে বল। ও-ই তোমায় বলে দেবে। তোমার ফেস্টিভ্যাল কিটটা ওরই কাছে আছে।

আমি আর যিশু লবিতে অপেক্ষা করছি। যিশুর আর কোনওদিকে মন নেই। এক মনে ফেস্টিভ্যাল বুকলেটের পাতা ওল্টাচ্ছে। নিজের অভিনীত ছবির সঙ্গে কোনও চলচ্চিত্রোৎসবে আসা যিশুর এই প্রথম। ফলে নিজের ফেস্টিভ্যাল কিটও এই প্রথম। সেই সাত রাজার ধন পরম যত্নে আগলে গভীর মনোযোগে ঘাড় ঘুঁজে দেখছিল যিশু। এমন সময় লবিতে একটা শোরগোল শোনা গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি টার্নস্টাইল ঠেলে লবিতে ঢুকছে পালে পালে সশস্ত্র প্রহরী। আর সেই ব্যূহবেষ্টনীর মধ্যে থেকে উঁকি মারছে একটা লম্বা মাথা। কালো চশমা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ডেনিম জ্যাকেট। রয়্যাল ইয়র্ক-এ পা রাখলেন অমিতাভ বচ্চন।

১৪ অক্টোবর, ২০০৭

আসা যাওয়ার পথের ধারে ভবানীপুরের বিজলী সিনেমাটা দেখিতে পাই।

তনুদার (তরুণ মজুমদার) চাঁদের বাড়ি এসেছে। জানি না, এত কাজের মধ্যে দেখে উঠতে পারব কি না।

তনুদা'র গত দুটো ছবি দেখতে গিয়ে তনুদা'র সঙ্গে বিজলীতেই দেখা হয়েছে। শুনেছি চিরকাল নতুন ছবি রিলিজ করলে প্রতিদিন তনুদা ঠিক নাকি একবার হলে পৌঁছে যান।

এখন এটা প্রায় ইন্ডাস্ট্রির কিংবদন্তির মতো। উনিশে এপ্রিল-এর দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল।

এই বিজলী সিনেমাতেই রিলিজ করেছিল উনিশে এপ্রিল। তখন টানা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছে ছবিটা—লোকজনও দেখতে আসছেন নিয়মিত।

আর, সেটা আমার প্রথম রিলিজ পাওয়া ছবি তো! আমারও একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল—ছবিটা কেমন চলছে? প্রায় রোজ দিনই কোনও না কোনও একটা সময় কাজে যাওয়ার পথে, বা বাড়ি ফেরার মুখে বিজলী সিনেমা হয়ে যেতাম। সেই প্রথম দর্শক আমার ছবি দেখছেন, আমি মানুষটা কে—সেটা কেউ জানেনও না। আর আজ থেকে চোদ্দো বছর আগে আমার বয়সও তখন অনেক কম— আমিই যে ছবির পরিচালক, এটাই অনেকের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের আশ্চর্য!

এরকমই একদিন বিজলীর সামনে অপেক্ষা করছি। দুটো শো'য়ের সন্ধিক্ষণে সিনেমা হলের চত্বরে হাজির থাকলে আগের শো'য়ের দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও কিছুটা বোঝা যায়, আর পরের শো'য়ে কত ভিড় হল, সেটারও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

তাই সিনেমা হলের সামনেটায় যেখানে প্রচুর খাবার বিক্রেতারা ভিড় করেন, সেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি।

ঠিক রাস্তায় ফুটপাথের ওপর বিজলী সিনেমার বড় বড় থামগুলো। মনে পড়ে ছোটবেলায় যখন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' দেখতে এসেছি বাবা মার সঙ্গে, তখন সন্ধেবেলা এই থামগুলোয় আলো লাগানো হত, আর আমার শিশুমন কেমন করে জানি, এই থামগুলোকে সেই রূপকথার সিনেমার রাজবাড়ির স্থাপত্যের অঙ্গ বলেই মেনে নিয়েছিল।

তারপরেই যখন বহুবার বিজলীতে এসেছি সিনেমা দেখতে, হয়তো বা দেখেছি শুভ্র ধুতি পাঞ্জাবি পরা তরুণ মজুমদারের একঝলক সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া, সত্যিই কি কখনও ভেবেছি, এই যে অদ্ভুত এক স্বপ্নপুরী, যেখানে আমরা তিন ঘণ্টার এক অলৌকিক ছুটির জন্য আসি—সেটাই কোনওদিন আমার নিজের কাজের সঙ্গে এত সরাসরি জড়িয়ে যাবে।

এই সব সাতপাঁচই হয়তো ভাবছিলাম। আগের শো ভেঙে গিয়েছে, পরের শো'য়ের দর্শকেরা ভেতরে ঢুকে গিয়েছেন। এবার বাড়ি যাব। হঠাৎ সেই ঝালমুড়িওয়ালা একঠোঙা ঝালমুড়ি হাতে এগিয়ে এলেন, এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

আমি স্বাভাবিকভাবেই পয়সা খুঁজছি, প্রায় ফিসফিসে গলায় বললেন—

না, না, পয়সা দেবেন না। এটা আমি খাওয়াচ্ছি আপনাকে।

আমি তো হতবাক। তাঁর হাতে তখনও ধরা ঝালমুড়ির ঠোঙা। চোখে সকাতর অনুভূতি।

—এতদিন পর আবার মোটরগাড়ি করে লোকে বাংলা বই দেখতে আসছে। আপনি এটা খান।

তারপর 'দহন'ও রিলিজ করেছিল বিজলীতে। চলেওছিল বেশ।

ততদিনে ওই ঝালমুড়ি বিক্রেতা ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে।

ফ্রিতে ঝালমুড়ি খেতে সংকোচ হত না।

আমার ষোলো নম্বর ছবির শ্যুটিং শুরু হল।

এবার বাংলা ছবি। বাংলা ভাষা, বাঙালির মন নিয়ে ছবি।

আপনাদের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭

সম্প্রতি দেখছি যে কোনও সিনেমা বন্ধুদের আড্ডায়-ই আমায় কেমন চুপ মেরে যেতে হচ্ছে। হয়, সত্যিই আমি আর সিনেমা বুঝতে পারছি না; নয়, আমি বড্ড বেশি বিরক্তিকর ধরনের খুঁতখুঁতে হয়ে গিয়েছি। যেটা সুস্থ সমালোচনার জন্যই ঠিক নয়, সিনেমাকর্মীর কথা তো ছেড়েই দিলাম।

আমার বয়োকনিষ্ঠ সহকর্মীরা 'তারে জমিন পর' দেখে বিপুল উল্লসিত হয়েছিল। তাদের প্রভূত উৎসাহ বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ছবিটা দেখতে গেলাম। এবং, আমার বেশ খারাপ লাগল।

দাঁড়ান দাঁড়ান। পাঠকদের মধ্যে অনেকের গলায়ই, বিশেষ করে যাঁরা ছবিটা দেখেছেন, একটা সোচ্চার 'হাঁ-হাঁ' শুনতে পাচ্ছি। আমি জানি, বহুদিন পর 'তারে জমিন পর' নাকি প্রমাণ করে দিয়েছে মূলধারার ছবি যদি বানাতেই হয়—তা এইরকম। ভাল!

কেন? না এর মধ্যে বাস্তব সমস্যা আছে এবং তার আবেগজনিত, সরস প্রকাশভঙ্গি আছে। বহুদিন পর একটা বাচ্চা অপূর্ব অভিনয় করেছে। এবং এটি নাকি আদ্যোপান্ত একটি বাস্তবধর্মী বিনোদনী ছবি!

ধরুন, তর্কের খাতিরে এর অনেকটা-ই মেনে নিচ্ছি। তারপর?

—তোমার আবার সবেতেই বাড়াবাড়ি।

—এবার সোজা হয়ে গেল রে! ঋতুদার যে ছবিগুলো ভাল্লাগে না, সেগুলো দেখতে যাবি। সেগুলো-ই ভাল ছবি।

আমার সাউন্ড ডিজাইনার বন্ধু বিশ্বদীপ মুম্বইতে থাকে। ও-ও ছেলে-বউ সঙ্গে নিয়ে ছবিটা দেখে এল। এবং আমায় বেশ দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে বলল!

—কী বলছিস ঋতু! আমরা সবাই কত কাঁদলাম, জানিস?

জানি তো! আমিও তো কাঁদলাম। কিন্তু সে কান্না আর অপরাজিত দেখে কান্না তো এক নয়।

কাঁদাতে পারলেই যদি ছবি ভাল হয়, তা হলে তো উনিশে এপ্রিল-ও ভাল ছবি। ছবিটা দেখে কত মহিলারা কাঁদতেন, জানেন?

'তারে জমিন পর' নিয়ে আমার সমস্যাগুলো একটু বলি!

আপনাদের ভেতরকার 'হাঁ-হাঁ' যদি সামান্য শান্ত হয়ে থাকে, তাহলে একটু মন দিয়ে শুনুন।

ছবিটার প্রধান চরিত্র ইশান অমনোযোগী ছাত্র, শিক্ষাব্যবস্থার কঠিন চাপের শিকার, বা ডিসপ্লেকসিক হতভাগ্য—এটা আমরা ছবিটায় অনেকক্ষণ অবধি বুঝতে পারি না।

ক্লাসের পড়ায় অমনোযোগী মন স্কুলের জানলার বাইরে তার মনের আনন্দ খুঁজে নিচ্ছে এ দৃশ্য তো আমরা 'রবীন্দ্রনাথ'—এই দেখেছি। একটা তথ্যচিত্রে যদি কেবলমাত্র একটি দৃশ্যের অপরিসর অব্যর্থতায় এই আবেগ অমন তীব্রভাবে রচনা করা যায়, তা হলে তার জন্য একটা গোটা ছবি দেখব কেন?

তাতেও আমার আপত্তি নেই। কোনও বিশেষ আবেগের পুনঃপৌনিকতা বর্জিত সম্পূর্ণ সুঠাম, মেদহীন ছবি ঋতুপর্ণ ঘোষের দর্শকারই বা ক'টা দেখতে পান—তাই তা নিয়ে অহেতুক খেদোক্তি, আর যাকেই মানাক, আমার অন্তত সাজে না।

হতেই পারত ছবিটা কোনও স্কুল পালানো, ক্লাসরুম বিমুখ স্বপ্নসন্ধানী বালকের—তা হলে হয়তো বহু বিগত বিড়ম্বিত শৈশবই নিজেদের চিনে নিত—এই ছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চিনে নিচ্ছেও। যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে সম্পূর্ণ সুস্থ, তাঁরাও মনে করতে পারছেন নিজেদের ছেলেবেলা। আর যখনই সেটা হচ্ছে, তখনই আমার মনের ভেতর একটা পুঞ্জীভূত আপত্তি বারবার ধাক্কা মারছে আমাকে যে, তা হলে ছবিতে ডিসপ্লেক্সিয়া অসুখটার নাটকীয় প্রবর্তনটা বড় manupilative হয়ে গেল না। মূল সমস্যাটা যদি ওই বিশেষ অসুখজনিত না হয়, তাহলে এই অসুখটা তো নেহাৎ ফর্মুলামাত্র হয়েই থেকে যায়। সেটা কি 'মূলধারা' বা 'লোকশিক্ষা'—যে কোনও কিছুর অজুহাতেই করা যায়?

আমির খান ছবিটিতে একজন স্কুল শিক্ষক, ছবি আঁকার মাস্টারমশাই। এবং শৈশবে এই ব্যাধির শিকার ছিলেন। ফলে গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে আমরা অপেক্ষা করলাম আমির খান কখন আসবেন, এই ভাগ্য বিড়ম্বিত শিশুর উজ্জ্বল অন্তরকে এক লহমায় চিনে নেবেন, এবং আমাদের দেখিয়ে দেবেন—দ্যাখো, এরাও পারে!! বা, পাঠান্তরে—এরা-ই পারে!

ইশানের বাবা মা কেউ তাকে বুঝল না। যে মা চাকরি ছেড়ে দিয়ে কেবল ছেলের অধ্যয়ন নিয়ে উদ্বিগ্না, তিনিও কখনও একবারের মতোও বুঝলেন না, এমন একটা সহজ অক্ষর উল্টে লেখার অব্যর্থ symptom।

মনে হয়, কতক'টা যেন তাঁরা ইচ্ছে করেই বুঝলেন না। বুঝে যদি ফেলতেন ভুল করে নিজের সন্তানকে তা হলে, ছবিটার দ্বিতীয়ার্ধ আর রচিতই হত না।

'লাগান' দেখে আমার মনে হয়েছিল মেমসাহেব ভুবনের প্রেমে পড়েছেন সে আমির খান বলে—তা ছাড়া আর কোনও কারণ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় না। এখানেও যেন, প্রায় তিনি আমির খান বলেই সেই সব গূঢ়তা জানেন—যা আর কেউ জানেন না।

এই কথাটা যেই বললাম, অমনি আমার বন্ধুবান্ধবরা বলল

একটা মেইনস্ট্রিম ছবিতে তুমি আর কী expect করো? আর দেখিয়েছে তো ওরও ওই অসুখটা ছিল!

বোঝো, তার থেকে বললেই হয় ইশানকে ওর বুঝতে গেলে তো ওর অসুখটা থাকতেই হবে।

সেটাই তো ফর্মুলা।

আচ্ছা, এসব ছেড়ে দিলাম। কোন জায়গাটা আমার সব থেকে খারাপ লেগেছে জানেন? ছবির বক্তব্যের স্ববিরোধ।

যে ছবিটি গোড়া থেকে 'র‍্যাট রেস', 'কম্পিটিশন'কে তুমুলভাবে নিন্দা করে এল, সেই ছবিই শেষ যাত্রায় একটা বিশাল অ্যামফিথিয়েটারে আয়োজিত একটা ছবি আঁকার 'প্রতিযোগিতা'র মধ্যে দিয়ে বালক-নায়ককে প্রথম করল। Competition-কে দর্শনগতভাবে অগ্রাহ্য করে নয়, তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে জিতিয়ে দিয়ে তবেই আমরা বুঝলাম, যে সত্যিই তো! এই শিশুটিকে তো আমরা সঠিক মূল্যায়ন করিনি।

কোনও দুর্বলকে প্রধান মানব করে যখনই কোনও ছবি হয়েছে, তাকে কোথাও না কোথাও কোনও অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তবেই নিজের যথার্থ্য প্রমাণ করতে হয়েছে। সে যদি তার প্রতিবন্ধী দুর্বল জীবনটুকুই যাপন করে যেত, তা হলে বোধহয় কোনওদিন নায়ক হত না। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমির খানের মতো শক্তিশালী জনপ্রিয় নায়ক নিজে ছবিতে সর্বোতভাবে থেকেও যদি সাধারণ শিশুকে কেবলমাত্র অসাধারণ হয়েই জিততে হয়—সেটা কি এই ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ শিশুদের ওপর একটা অসাধারণ বোঝা সৃষ্টি হয় না? আর, সে বোঝা কি কোনও অংশে কম্পিটিশনের বাইরে?

একটি গল্প মনে পড়ল।

আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠা বান্ধবীর বোনঝি শিশুকালে তাঁকে বলেছিল। তিনি বলেছিলেন,

—আমি তো রোজ তোমায় গল্প বলি, তুমি আজ আমায় একটা গল্প বলো।

অনেক ভেবে শিশুটি বলেছিল,

—একটা মেয়ে ছিল। তার মা ছিল না, তার বাবা ছিল না। একদিন একটা বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলল।

আমার কাছে আজও এই গল্পটি হল quintessence of a tearjerker.

আর 'তারে জমিন পর' দেখতে দেখতে আমার বার বার কেন যেন সেই গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

দেখুন, শেষ অবধি কিন্তু আমি আপনাদেরই দলে। আমির খান আমাকেও তো কোনও একটা শৈশব মনে করিয়ে দিতে পেরেছেন।

১৬ মার্চ, ২০০৮

সম্প্রতি মুম্বই শহরে আঞ্চলিক ভাষা এবং সংস্কৃতি অবমাননার জরিমানায় একটি সিনেমার মুক্তিলাভ সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঘটনাচক্রে ছবিটির পরিচালক আমি।

সেই মুহূর্তে নানা প্রচারমাধ্যম ঘটনাটি এবং ঘটনা প্রসঙ্গে আমার ছবিটি নিয়ে অনেক কথা বলেছেন।

আমার ছবির এমন অশোভন প্রচার আমাদের কারওরই কাম্য ছিল না।

আমাকে অনেক টেলিভিশন চ্যানেল বা সংবাদপত্র মন্তব্য করতে বলেছিলেন। আমি করিনি।

প্রথমত, আমার মনে হয়েছিল যে কেবল 'ঠিক বা ভুল' এই মন্তব্য করে বিষয়টিকে লঘু করা হবে কেবল। এবং আমি চাই বা না চাই আমার নিজের ছবির মুক্তি প্রাক্কালে যে কোনও মন্তব্যই আমার ছবির প্রতি নজর টানবে—মূল সমস্যাটির প্রতি নয়।

ফলে আমি চুপ করেছিলাম। আমার কথা বলা খুব অসহজ ছিল না। কিন্তু আমার নির্ভীকতার দায় আমার অন্যান্য সহকর্মীদের ওপর বর্তায়, তা আমি চাইনি।

মুম্বই শহরে আমাদের ছবির প্রিমিয়ার হল না। মুম্বই থেকে আমরা দিল্লি এলাম এগারোই সেপ্টেম্বর।

সেদিন সন্ধ্যায় দিল্লিতে ছবিটির প্রিমিয়ার শো হওয়ার কথা। আমি ঠিক করেছিলাম ছবি দেখানোর আগে একটি প্রতিবাদপত্র পড়ব দর্শকদের উদ্দেশে।

তবে, আজকাল যেভাবে মাল্টিপ্লেক্সে প্রিমিয়ার হয়, সেখানে এমনটা করা মুশকিল।

আর ততক্ষণে মহারাষ্ট্রে ছবি দেখানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

ফলে চিঠিটা আর আসার পড়া হল না। আমার ধারণা, আমার সেদিনের সেই না পড়া বক্তব্যর মূল মর্মার্থ আজও পুরনো হয়ে যায়নি।

ফলে রোববারের পাঠকদের জন্য ইংরেজিতে খসড়া করা চিঠির বয়ানটা ছাপিয়ে দিলাম।

Good evening everybody.

I welcome all of you to what has turned out to be the very first premiere of The Last Lear.

Many of you will know that the last few days have been very stressful for us.

We were disappointed that the Bombay Premiere had to be cancelled.

But equally, we are happy to have Delhi as the first city to hold the Premiere.

Delhi is a city of cinema lovers and we hope that finally, we will talk about the film and not just what has been happening around it.

Let me first clarify that The Last Lear is not an adaptation of King Lear, but it is certainly about Shakespeare.

I grew up meeting Shakespeare in the streets of Calcutta as I witnessed the re-naming of `Theatre Road' into `Shakespeare Sarani' (Shakespeare Street).

The renaming was an attempt to erase residual remnants of the colonial legacy but somehow Shakespeare had been invited to stay. After all, how could Shakespeare and theatre could be separated?

Shakespeare lodged himself permanently in the cultural imagination of Calcutta. He floated around our creative lives, appearing in a multitude of spaces - the classroom, textbooks, stage plays, films and everyday vignettes of urban life. In the multiplicity of Calcutta's many voices, language and accents, Shakespeare stands like a colossus. As a reminder that creativity is never bound to the locations of its origin.

The Last Lear is a film that celebrates language and the power of words.

I am a Bengali filmmaker working with Bengali producers with Hindi, Punjabi and Gujarati speaking actors to make this film in English.

That's why it is supremely ironic that a controversy over language should have stopped the film from being screened in Bombay yesterday. Worse, that it should lead to unwarranted vandalism, destruction of property and the vilification of respected citizens and cultural ambassadors who have contributed richly to the cosmopolitan cultural life of Bombay.

I don't want to dwell on the controversy in any detail except to say that the family of my principal actor, Amitabh Bachchan was targeted - I thought rather unfairly.

Despite repeated apologies, the vandalism continued.

Finally, the Premiere had to be cancelled.

There is an uncanny coincidence here. As you will see, The Last Lear also begins with an ominous film Premiere.

Today, all of us - filmmakers, writers, viewers and every citizen of this country - must decide what kind of a democracy we want to live in.

Should we live by the constitutional tenets that guarantee us life, liberty and free expression? Or should we flout these rights by allowing people to take the law into their own hands and terrorizing the culture industry as well as the ordinary person?

But thankfully cultures and languages do not need permission to travel across borders - either within the country, or outside.

Twenty years back, on a festive August evening, I watched, on the streets of Bombay, athletic young men shout "Govinda Ala Re" as they climbed over each others shoulders and formed a human pyramid. I was transfixed by their vigour and vitality.

In the falling light, in the rain soaked streets of Bombay this seemed like a magic moment.

It was as though I had been transported to watching the mythical cowherds of Vrindavan.

Who among them would emerge the epic hero?

Who knows how this enduring image will find expression in my films or writings?

Who knows how cultures travel and colour our imagination?

Language and ideas are nobody's personal property simply because they do not allow anybody to possess or restrict them.

Least of all groups and individuals with narrow beliefs. All cultures within this country and outside belong to all of us.

Just as Shakespeare belongs to all of us.

That precisely is the story of Last Lear.

I am told that the Last Lear will now be allowed to be released in Maharashtra.

I am personally delighted that I can now share my work with my audiences in there. I am sure my cast and crew feel the same way.

But somewhere we all know, I am sure, that attacks of this nature will not cease. Therefore, the fight is not over. Let us resolve that whenever we are faced with the arrogance of violence and vandalism, we will fight, but with different weapons. We will fight in all humility with words, ideas and reason. In that fight - which concerns each and every one of us - I hope you all will join.

Thank you for being here with us on this very special day.

২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮

পার্স থেকে টাকা বার করলাম। কয়েকটা সেকেন্ড হ্যান্ড নোট।

সেকেন্ড কেন, হানড্রেডথ হ্যান্ড-ও হতে পারে। আমার আগে কতজন ব্যবহার করেছেন ইয়ত্তা নেই।

পুজোর বাজারে দোকানে দোকানে জামাকাপড় কিনছি।

বারবার চোখ যাচ্ছে পাশের কাউন্টারে—ভাল জামাটা কি ওঁরা নিচ্ছেন? না, নিচ্ছেন না। দেখাবেন দাদা?

পছন্দের সেকেন্ড হ্যান্ড হাতবদল হয়ে এল আমার কাছে।

দোকানের বাইরে এলাম। অনন্ত তারাভরা আকাশ। আমার আকাশ নয়। ফার্স্ট হ্যান্ড-ও নয়।

ঠিক আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে এই আকাশ দেখেছেন কতশত মানুষ। কত হাজার হাজার বছর ধরে।

যে বাতাস ঘিরে রেখেছে চারপাশটুকু, তাতে কত মানুষের নিঃশ্বাস।

সেই সেকেন্ড হ্যান্ড বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ভাবলাম—তবে কি 'আমার নতুন', 'আমার প্রথম' বলে কিছু নেই?

'উনিশে এপ্রিল'-এর পর শুনেছিলাম, ওটা সেকেন্ড হ্যান্ড। বার্গম্যানের 'অটম সোনাটা'র নকল।

সম্প্রতি শুনলাম, থুড়ি পড়লাম, 'দোসর'-ও নাকি সেকেন্ড হ্যান্ড। কিওসলস্কি'র থ্রি কালার্স 'ব্লু'-এর কপি।

অবশ্য আমি যতদূর বুঝি, 'ব্লু' ছবিটার আধারটুকুই হল সৃষ্টিশিল্পের মৌলিকতা ও অনুকরণের গূঢ় প্রশ্ন নিয়ে।

ফার্স্ট হ্যান্ড শিল্পী হওয়া সহজ নয় জানি, তা বলে যা কিছু আমার ভাবনায় স্বাধীন, আমার চিন্তায় মৌলিক, তাকে একনিমেষে বাসি, সেকেন্ড হ্যান্ড করে দেওয়ার চেষ্টাটাকেও মেনে নিতে ইচ্ছে করে না সবসময়ে।

কয়েকদিন হল প্রায় সমস্ত কাগজ আমার সাম্প্রতিক ছবি নিয়ে বিদ্রূপতায় তোলপাড়,

—এটা কিচ্ছু হয়নি...এটা যাচ্ছেতাই হয়েছে... ইত্যাদি, ইত্যাদি...

একটা সময়ের পর মনে হতে লাগল, সমালোচনাগুলো যেন অজান্তেই কেমন আক্রমণ হয়ে উঠছে! এতটা বিদ্রূপতা বোধহয় ছবিটার প্রাপ্য নয়?

'লাস্ট লিয়র'-এর থেকে অনেক খারাপ ছবি আমি সম্প্রতি দেখেছি, তাদের সমালোচনাও পড়েছি পত্র-পত্রিকায়। কই, কোথাও সমালোচককে এত নিষ্করুণ মনে হয়নি তো।

তা হলে প্রশ্ন হল, আক্রমণটা এক্ষেত্রে কাকে?

প্রশ্নটার উত্তর দেয় আমার অভিজ্ঞতা আমার প্রাত্যহিক দিনযাপনের নানাবিধ ইতিহাস।

সেই অভিজ্ঞতাই বলে দেয় যে চিত্রনির্মাতা ঋতুপর্ণ এক্ষেত্রে শিখণ্ডী।

তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একজন 'সফল'(?) মানুষ, যার সাফল্যটা 'নাকি' অনেকটাই পড়ে পাওয়া।

একজন 'আত্মপ্রত্যয়ী' প্রান্তিক, যে আসলে 'ভুল করে' মূলস্রোতে ঢুকে পড়েছে, ফলে তার 'প্রত্যয়'টা শাসনযোগ্য ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কী হতে পারে?

এবং, সর্বোপরি একজন নারীসুলভ পুরুষ। যার নাকি সংকোচে, গ্লানিতে, অনুকম্পার জীবন কাটানোর কথা ছিল। তা হলে হয়তো-বা নিজস্ব ঔদার্যে বা করুণায় তার ছবিগুলোকে অন্তত ক্ষমা করে দিতেন প্রগতিশীল বিদগ্ধরা।

আমি যে খুব উঁচুদরের ছবি করিয়ে নই, এ কথা গলা ছেড়ে বলতে আমার কোনও সংকোচ নেই। কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা কথাও, গলা ছেড়ে না বললেও অন্তত মৃদুস্বরে বলতে চাই যে, আমার থেকে অনেক উঁচুদরের ছবি করিয়ে এই মুহূর্তে আশেপাশে অনেকে আছেন, তাও তো নয়।

তবে, মাতামাতিটাই বা কাকে নিয়ে? আর আক্রমণটাই বা কাকে?

মনে হল যাক—এতদিনে অন্তত জীবনে একটা ফার্স্ট হ্যান্ড কিছু পাওয়া গেল। এমন অভূতপূর্ব খাঁটি অপমান ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে!

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি—অবনীন্দ্রনাথকে লেখা। উনিশশো একচল্লিশ সালের ২৯ জুন। মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক আগে।

'যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি, সে দেশে পূর্ণ আসন থাকবে না। এ আশঙ্কা আমি অনুশোচনার বিষয় বলে মনে করিনি। অনেক বারই ভেবেছি আমি নির্বাসিত—এ আমি বার বার মনে স্বীকার করে নিয়েছি।'

বহুবার হয়েছে, আমার মনের কথা প্রায় থটরিডারের নির্ভুলতায় ছাপা অক্ষরে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের কলমে।

আর মনে মনে নালিশ করেছি, আমার সব ভাবনাকে সেকেন্ড হ্যান্ড করে দেওয়ার কি অধিকার আছে এই মানুষটার?

এই প্রথম আমার অপমানকে সেকেন্ড হ্যান্ড হয়ে যেতে দেখলাম আর ভাবলাম, নবীনতা দিয়ে চিরকাল আমার অন্তরকে বিবিধ গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়ে এসেছেন যে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষটি, অপমানের হাতবদলের সান্ত্বনাও বুঝি তাঁর কাছ থেকে এমনভাবে পাবার ছিল?

কোজাগরীর শুভেচ্ছা।

১৯ অক্টোবর, ২০০৮

নৌকোডুবির শুটিং চলছে।

রাসবিহারীর মোড়ের একটা বাড়িতে আমার সাম্প্রতিকতম ছবি নৌকোডুবির শুটিং চলছে।

না, ছাপার ভুল নয়। ছবির নাম ইচ্ছে করেই নৌকোডুবি—উপন্যাসটার হুবহু নামানুকরণ নয়।

সময়টা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। ফলে রাসবিহারীর মোড়ের এই পুরনো বাড়িটার রঙিন কাচের দরজা, বিশাল খড়খড়ি দেওয়া জানলা—সবকিছুই এঁটেসেঁটে রাখা হয়েছে যাতে কোনওরকমভাবে সাম্প্রতিককাল কোনও ফোকর গলে, ফসকে ঢুকে না পড়তে পারে।

শুটিং যখন করি তখন ক্যামেরার লেন্সই পৃথিবীর পরিধি। পিরিয়ড ছবি করলে তো আরও। মেহগনি, মার্বেল, চিনে মাটিতে মোড়া এই আধা-ইতিহাস, আধা-কল্পনার পৃথিবীতে আপাতত আমরা এখন চু কিৎ কিৎ খেলছি।

অনু, ভাল নাম অনুপমা রঙ্গচার—আমার সঙ্গে 'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এ কাজ করেছিল পরিচালনা বিভাগে। এ ছবিতেও কাজ করবে বলে ব্যাঙ্গালোর থেকে চলে এসেছে অনু। সঙ্গে আসার কথা তার দুই ফরাসি বান্ধবীর। তারা সিনেমা ভক্ত। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কাজের মধ্যে দেখতে চায় আমাকে। হয়তো সাক্ষাৎকারও নেবে।

ছবিতে আমাদের একজন শ্বেতাঙ্গিনী অভিনেত্রী দরকার। ওদেরই একজনকে দিয়ে হয়ে যাবে ভেবে ইউনিটের সকলে বেশ উৎফুল্ল।

সেদিন একটা ঝড়ের দৃশ্য তোলা হচ্ছে। প্রতিটি ফুলদানি স্কচ টেপ দিয়ে টেবিলে আটকানো যাতে প্রপেলার ঝড়ে পড়ে না যায়। প্রতিটি মূর্তির ওজন পরীক্ষা করে তবে রাখা হচ্ছে কোণের টেবিলে, যাতে আচমকা উড়ে আসা পর্দার ধাক্কায় কিছু চুরমার না হয়।

ঝড়ের দৃশ্য হয়ে গেল যথাযথ, একটা চিনেমাটির পেয়ালাও ভাঙল না। আঁচড় পড়ল না কোনও মার্বেল টেবিলের গায়ে। ফাটল ধরল না একটিও আয়নায়।

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী অক্ষত রইল। শট ওকে। আমরা খুশি। হঠাৎ অনুর ফোনে খবর এল—কিছুক্ষণ আগেই মুম্বই ওবেরয় সন্ত্রাসকাণ্ডে তার দুই বান্ধবী গুলিবিদ্ধ, মৃত।

আমরা খানিক চুপ করে রইলাম, অনু কান্নাকাটি করল খানিক। আমরা 'আহা!' 'ইস' করতে করতে ভাবলাম এবার নতুন করে একটা মেমসাহেব পেতে হবে।

এক শতাব্দীকে পেছনে রেখে যখন শুটিং শেষে গাড়িতে উঠছি রাসবিহারীর মোড়ে, রাত এগারোটার কলকাতা তখনও যথারীতি ঝলমল, কে বলবে মুম্বই শহর জুড়ে তখনও চলছে নারকীয়তা।

'গজনী' না 'রব নে বনা দি জোড়ি'—

কোনটা আগে দেখবে এই নিয়ে বেজায় তর্ক জুড়েছে দুই অল্পবয়সী ছোকরা। আর গাড়িতে ফিরতে ফিরতে হাই তুলতে তুলতে আমি ভাবছি, কাল আবার সকাল সাতটায় কলটাইম, মানে সাড়ে ছটায় বেরতে হবে।

তার পর আমরা যথারীতি শুটিং করলাম। তার পরদিনও। তারপর এক সপ্তাহ। আমাদের শ্বেতাঙ্গিনী অভিনেত্রী জোগাড়ও হয়ে গেল।

কোনও কিছুই আটকে রইল না।

সত্যিই! 'কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?'

এই যে যেমন এই মুহূর্তে আমি ফার্স্ট পার্সন শেষ করতে করতে ভাবছি লাস্ট লাইনটা তেমন যেন জুতসই হল না।

৭ ডিসেম্বর, ২০০৮

এক

আজ থেকে বছর পঁচিশ আগে, যখন বিজ্ঞাপনের ছবিতে আমার প্রথম হাতেখড়ির পালা চলছে—বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের শট, বিজ্ঞাপনের পরিভাষায় যাকে 'প্যাক-শট' বলে, সেই ছবিটি তোলবার আগে তখনকার আলোকচিত্রীরা একটি অদ্ভুত জিনিস ব্যবহার করতেন, তার নাম—diffusion net

আসলে, এটি হল সূক্ষ্ম একটা stocking-এর আবরণ যেটা লেন্সের সামনে লাগানো হত—যাতে তার ভেতর দিয়ে ছবি নিলে একটা কৃত্রিম পেলবতার মায়াজাল সৃষ্টি হত বিজ্ঞাপিত বস্তুটিকে ঘিরে—তা সে চায়ের পাতার কৌটোই হোক, আর ক্রিমের শিশিই হোক। সাধারণ প্রাত্যহিকতার বাইরে পণ্যদ্রব্যের একটা মায়াময় অস্তিত্ব রচনাই ছিল এই diffusion net-এর প্রধান উদ্দেশ্য।

পরে যখন কাহিনিছবি করতে আসি, তখন জেনেছি যে ঐতিহাসিকভাবে এই diffusion net-এর ব্যবহার হত সুন্দরী নায়িকাদের ক্লোজ আপ নেবার সময়। ভিভিয়ান লে, গ্রেটা গার্বো ইত্যাদি হলিউড উর্বশীদের মোহিনী সৌন্দর্য যাতে প্রায় অপার্থিব মায়ায় চিত্রিত এবং গ্রথিত হয় দর্শকমনে, যে অপার্থিবতার দরজা খুলেই কল্পনা বা ফ্যান্টাসির জগতে পা রাখতে পারে তারা।

বিজ্ঞাপনের প্যাক শট আর নায়িকার ক্লোজ আপ পরিবেশনের ভঙ্গি বা পদ্ধতিটাও যে একইরকম, সেটা তখন মজাদার লেগেছিল কেবল। পরে সিনেমা নিয়ে বইপত্র ঘাঁটতে গিয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে কীভাবে নারীসৌন্দর্য বিশ্বব্যাপী সিনেমার রাজনীতিতে যুগে যুগে পণ্যীকরণের বিষয় হয়ে গিয়েছে।

সুন্দরী নায়িকার মূল ভূমিকা মনোরঞ্জনী—তিনি দর্শকচিত্তে (পড়ুন পুরুষহৃদয়ে) কেবল বিনোদন সঞ্চার করতে পারেন—পাশাপাশি বাড়তি কতগুলো সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি আবেগ

ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই পুরুষমনোহারিণী ভূমিকার সঙ্গে, মানসপ্রতিমাকে কতকটা বাস্তবরূপিনী করার অভিপ্রায়ে হয়তো বা।

হলিউডের এই প্রভাব সারা পৃথিবীর প্রাতিষ্ঠানিক সিনেমাতে ছড়িয়ে পড়েছিল অচিরেই। বম্বে সিনেমার সাদা-কালোর যুগের মধুবালা, বা কলকাতার নিউ থিয়েটার্স-এর সময়কার সাধনা বসু, কানন দেবী, এমনকী পরের দিকে গানের দৃশ্যে সুচিত্রা সেনের ক্লোজ আপ মনে করুন। দেখবেন, নায়কের মুখের মতো অত স্পষ্ট ক্যাটক্যাটে নয়—কেমন একটা ঝাপসামতন সুন্দর যেটার অস্পষ্টতাটাই তার মূল রহস্য।

ধীরে ধীরে রূপোলি পর্দার গল্প বলা বাস্তবানুগ হতে লাগল। নায়িকারা নারীচরিত্রের বিভিন্ন ব্যাপ্তি নিয়েই গরিয়সী হয়ে উঠতে লাগলেন—আলাদা করে তাঁদের রহস্যময়ী করার দায় আর কেবল আলোকচিত্রী বা diffusion net-এর রইল না। তারপর একসময়ে নির্বাক ছবির মতো, সাদা কালো ছবির মতো মোনো সাউন্ড ছবির মতো diffusion net-ও হারিয়ে গেল সিনেমা তৈরির কারখানাঘর থেকে।

ততদিনে মেক আপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কিছুটা। নায়িকার মুখে কমনীয়তার দীপ্তি নির্মাণ করার বিশেষ গোপন প্রসাধন এসে গিয়েছে। ক্যামেরার নানারকমের ফিল্টার আবিষ্কৃত হয়েছে—অতএব সেই সূক্ষ্ম স্টকিং-এর মায়া এখন বাতিল।

তা বলে কি নায়িকারা এখন আর পণ্যা নন? তাঁরা যথার্থই মানবী?

না সেটা বোধহয় নয় ততটা।

সিনেমার শিল্পমাধ্যম থেকে শিল্প হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা এক অজানিত কিন্তু সচেতন পিতৃতান্ত্রিকতার ইতিহাস।

সেখানে এখনও নায়কের নামে ছবি বিক্রি হয়। নায়ক সচরাচর বেশি টাকা পান নায়িকার থেকে। গল্প তৈরি হয় নায়ককে ঘিরে। এবং চিরাচরিতভাবে নায়কের নাম চরিত্রলিপিতে নায়িকার নামের আগে আসে পর্দায়।

এখনও বেশিরভাগ ছবিতে নায়িকা প্রায় একজন সুদর্শনা রোম্যান্টিক পার্শ্বচরিত্র মাত্র। কেবল মাঝেমাঝে বাৎসরিক দুর্গাপুজোর মতো অতিকায়া গরিয়সীদের জন্ম হয় পর্দায়। তিন-চার বছরে একটা 'মাদার ইন্ডিয়া', বা 'অভিশপ্ত চম্বল'।

নায়কদের প্রতিকৃতি চিরকালই ডিফিউশন বিবর্জিত থেকেছে, কিন্তু নায়কদের জন্য আলাদা কোনও প্রসাধন পদ্ধতি ছিল না বহুদিন। ভুরু আঁকা, ঠোঁট আঁকা, কাজল পরা উত্তমকুমারকে কিছু কিছু ছবিতে এখনও অনেকের মনে আছে। প্রদীপকুমার তো শুনেছি মেক আপ করতে নায়িকাদের থেকে বেশি সময় নিতেন। তাই নিয়ে মীনাকুমারীর বা রীণা রায়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যও হয়েছিল।

মেক আপ বিবর্জিত বাংলা সিনেমা শুরু হল যাঁর হাত ধরে সেই সত্যজিতের 'দেবী'তেও বিসর্জনের বাজি পোড়ানো দেখার দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে কাজলের গাঢ় রেখা দেখতে পাই।

সত্যজিতের হাতে পড়ে নারী চরিত্ররা যখন কোনও কোনও ছবির প্রধান প্রাণশক্তি হয়ে উঠলেন দীপ্তি, শ্রী ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে, তখনও কিন্তু তাঁরা শারীরিক সৌন্দর্যবিচ্যুতা নন—সে চারুলতার মাধবীই বলুন, বা সীমাবদ্ধর শর্মিলাই বলুন।

প্রথাগতভাবে সুন্দর নন, কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়ক অনেক এসেছেন—ঋত্বিকের অবনীশ, সতীন্দ্র বা রাজেন তরফদারের নিরঞ্জন রায়। কিন্তু নায়িকার বেলায় সেই সুন্দরীরা—সুপ্রিয়া, মাধবী, সন্ধ্যা রায়।

সিনেমার বোধহয় এটা একটা সোজা নিয়ম। নায়িকারা দর্শনধারী, আর নায়ক গুণবিচারী।

দুই

১৯৭৬ সালে লরা মালভে একটি প্রবন্ধ লিখলেন 'Visual Pleasure and Narrative Cinema'। সেই সঙ্গে উন্মোচিত হল সিনেমার gender Studies-এ নতুন দিগন্ত।

লরার বক্তব্য ছিল সিনেমা বানানো হয় প্রধানত পুরুষ দর্শকের জন্য। ফলে মহিলা দর্শক যখন ছবি দেখেন ছবির নায়িকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয় এক অবচেতনের 'স্যাডিজম' বা 'ম্যাসোকিজম'-এর মধ্যে দিয়ে।

সিনেমায় পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত কাঠামোতে রোরুদ্যমানা, ভাগ্যবিড়ম্বিতা নায়িকাকে দেখে বেশিরভাগ নারীদর্শক হয় নিজেদের প্রাত্যহিক দুর্দশাকে বিনোদনের বস্তু হিসেবে দেখেন, ফলে এটা তাঁর অবচেতনার 'স্যাডিজম'। বা, পুরুষের জায়গায় বসে একজন নির্যাতিতা নারীকে দেখেন এবং উপভোগ করেন পর্দার মেয়েটির সেই ব্যাকুল দুরবস্থা—এবং সেই সঙ্গে প্রশ্রয় দেন এক অন্তর্লীন 'ম্যাসোকিজম'কে।

লরার মতে কাহিনিচিত্রের পটভূমিকায় নারী চরিত্রের রূপায়ণ কখনওই পূর্ণাঙ্গ নয়, বিচ্ছিন্ন পণ্যাঙ্গ মাত্র। যা কেবল পুরুষদের চোখ দিয়ে দেখার, এবং বিনোদন উৎপাদন করার উপাদান।

লরা তাঁর প্রবন্ধটিতে উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন হিচককের 'দ্য রেয়ার উইন্ডো' ছবিটি।

ছবিটির একটি ন্যারেটিভ আঙ্গিকই হল পুরুষের চোখ। নায়ক জেমস স্টুয়ার্ট হুইলচেয়ারে বসে জানলার ওপারে প্রতিবেশীদের জীবন দেখেন লুকিয়ে লুকিয়ে, এবং সেই জীবনধারা কখন যেন পায় চলচ্চিত্রের মতোই রহস্যঘন, টানটান হয়ে যায় উত্তেজনা, সাসপেন্স এবং কাহিনির বিস্তারে। লরার বক্তব্য ছিল, যে পুরুষতান্ত্রিকতার নির্দেশসাপেক্ষে যে সিনেমাশিল্পর সৃষ্টি ও বিস্তার, যেখানে

নারীচরিত্রচিত্রণ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য।

তাই নায়কের দৃষ্টিতে প্রতিবেশিনীরা এক একটি অসম্পূর্ণ প্রতিকৃতি—Miss Torso বা Miss Lonely Heart। ছবির খলনায়ক তাঁর স্ত্রীকে ছিন্নভিন্ন করে কেটে বস্তাবন্দী করে, একটি ভগ্ন মর্মরনির্মিত নারী আবক্ষ-মূর্তি গড়াগড়ি যায়। এবং ছবির নায়িকা কেতাদুরস্ত ফ্যাশনব্যক্তিত্ব গ্রেস কেলি কেবল নায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই জানলার ওপারের নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়েন, কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা আগ্রহ থেকে নয়।

Male gaze-এর এই চূড়ান্ত দৃষ্টান্তীকরণ করে লরা এক বিশাল বিতর্কের উপত্যকায় নামিয়ে এনেছিলেন বিশ্বসিনেমাকে।

দর্শক আসলে পুরুষ না নারী? দর্শকের সত্যিই কোনও gender identity আছে কিনা? কার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আদতে দেখা হয় সিনেমা? বা, সত্যিই যদি নারী আর পুরুষে ভাগ করে ফেলা হয় দর্শককে সেই বিভাগ কি জৈবিক না মানসিক—ইত্যাদি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়ে এসেছে গত অর্ধশতাব্দী ধরে।

একান্তভাবে যা যা পুরুষের ব্যবহারযোগ্য, সেই সব দ্রব্যের বিজ্ঞাপনেও স্বল্পবাস নারীর উপস্থিতি নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে বহুবার, বহু আলোচনায়। প্রচারমাধ্যম নারীকে মানবীর সম্মান দিয়েছে কি না যথার্থভাবে, এই আলোচনার পাশাপাশি এখন উঠে আসছে শুরু করেছে পুরুষদেহের পণ্যীকরণ।

অনেকে মনে করছেন যে বিশ্বায়নের পর বিশ্বজোড়া যে বাজারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার সামনে পুরুষ নারী একইরকমভাবে বস্ত্রহীন ও বিপন্ন।

ফলে পুরুষ নিজের হাতে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে তাকে এমন এক দানবাকৃতি দিয়ে ফেলেছেন নিজের অজান্তে, যে সেখানে দেহমন দিয়ে সেই দানবের দাসত্ব করা ছাড়া আর উপায় নেই।

তার মানে এত বছরের সিনেমার ইতিহাসে নারী পুরুষের পারস্পরিক ভূমিকা কি বদল হতে চলেছে?

তিন

গত কয়েকবছর ধরেই সলমন খানের নিরন্তর নগ্নবক্ষ, বা সাম্প্রতিক কালের শাহরুখ খানের সিক্স প্যাক বা আমির খানের এইট প্যাক নিয়ে যে সামাজিক উদাহরণগুলি তৈরি হচ্ছিল তার ওপর তুরুপের তাসের মতো এসে পড়ল সাম্প্রতিক কালের দু'টি ছবি—'সাঁওয়ারিয়া' এবং 'দোস্তানা'।

'সাঁওয়ারিয়া' ছবিটা সঞ্জয় লীলা বনশালির দর্শকদের সবরকম আশাভঙ্গের মধ্যেও একটি নতুন অভূতপূর্ব উপহার নিয়ে এসেছে—রণবীর কাপুরের তোয়ালে পরিহিত গানটি।

'দোস্তানা' ছবিটির নাম কেন করলাম সকলেই বুঝতে পারছেন। জন অ্যাব্রাহামের অন্তর্বাস পরিহিত সুগঠিত শরীরই এই ছবির অন্যতম ইউএসপি।

উন্মুক্ত বলিষ্ঠ পুরুষদেহ ভারতীয় সিনেমায় আমরা আগে দেখিনি এমনটা নয়। কিন্তু পূর্বে তার প্রধান অনুষঙ্গই ছিল শক্তিমান নায়কের শক্তিপ্রদর্শন (যেমন দারা সিং, পরে ধর্মেন্দ্র, বিনোদ খান্না) পুরুষের যৌন আবেদন প্রায় ঐতিহাসিকভাবে লুকিয়ে ছিল চোরা হাসি, চুলের কেয়ারি, কিংবা পোশাকের কেতায়। পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত পুরুষ সেক্স সিম্বল জেমস বন্ড-ও তার ব্যতিক্রম নন। আজও তাই বন্ড বললে কেতাদুরস্ত কালো স্যুটের নিত্যনব বিবর্তন বোঝায়।

শিল্পে নিবাবরণ পুরুষদেহ বলতে আমরা দু'টো জিনিসই বুঝতাম চিরকাল। হয় বলীয়ান, নয় দরিদ্র। এমনকী একচালার দুর্গা প্রতিমার কথা ভাবলেও একটা সময়ের পর থেকে অন্ত্যজ মহিষাসুরের ঊর্ধ্বাঙ্গ নিবাবরণ থেকে গেল, দেবসেনাপতি কার্তিকের গায়ে পোশাক চড়ল কলকাতার বাবুদের আদলে। আশ্চর্য এই যে ষাট বছরের ওপর সময় ধরে দারিদ্র্যসীমার সঙ্গে হাডুডু খেলতে খেলতেও নিবাবরণ মানবদেহ কেন যে ভারতবর্ষে সম্পদের অসম বণ্টনব্যবস্থার অনুষঙ্গ না এনে কেবলমাত্র পুরুষ নারী বিশেষে দু'টি আলাদা ব্যঞ্জনা এনে দিল, সে কথা বলা দুষ্কর।

ফলে, পুরুষের শরীরকে যখন শারীরিকতার চূড়ান্ত করে দেখানো হল, তখন তাকে যৌনপরিচয় দেওয়ার জন্য তার প্রয়োজন হল মাত্রাতিরিক্ত স্বল্পবাস। শীতপ্রধান দেশের ডেভিড আর গ্রীষ্মপ্রধান কৌপীন পরিহিত সাধুসন্তসন্নিবিষ্ট দেশের জন অ্যাব্রাহাম একই অস্ত্র ব্যবহার করে যৌনপ্রতীক হতে পারেন না, এতো নিশ্চয়ই। এদেশে তো পুরুষদেহের স্বল্পবাস রৌদ্রের মতোই স্বভাবজ।

'দোস্তানা' ছবিটির টাইটেল সিকোয়েন্সটা যদি মনে করেন—স্বল্পবাস শিল্পা শেঠির সঙ্গে অভিষেক বচ্চন এবং জন অ্যাব্রাহামের একটি নাচের দৃশ্য—সেখানে জন অ্যাব্রাহামের পরনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি Canary yellow সুইমিং ট্রাংক (পাতি বাংলায় জাঙ্গিয়া)। জনের ক্লোজ আপগুলোর সময় বেশিরভাগ সময়ই বুঝতে অসুবিধে হয় যে ওকে দেখছেটা কে? কোনও পুরুষ না কোনও নারী? যেহেতু সমকামিতার কৌতুকাচ্ছন্ন ভান এই ছবিটির কাহিনিসূত্রের একটা বড় উপাদান। ফলে দর্শকের লিঙ্গবিচারটা গুলিয়ে দেওয়াটা পরিচালক একটা টেকনিক হিসেবে খুব সফলভাবে ব্যবহার করেন।

পুরুষ শরীরকে ঘিরে এই সোল্লাস সেলিব্রেশন বিজ্ঞাপনের ছবিতে শুরু হয়েছিল, এবার সরাসরি মূলধারার ছবিতে দেখা গেল।

তার মানে কি এই যে এর আগে অবধি ভারতীয় সিনেমা জুড়ে কাজ করে এসেছে শুধুমাত্র male gaze —ফলে নারী শরীর প্রদর্শন এত অনিবার্যভাবে অমোঘ হয়ে উঠেছে সিনেমার পরতে পরতে।

সিনেমার একশো বছরের ইতিহাসে একটা তথ্য অভ্রান্তভাবে স্বীকার্য। বেশিরভাগ পরিচালক

এবং আলোকচিত্রীই পুরুষ। ফলে সাধারণ সামাজিক ভিন্নকামিতার পরিমণ্ডলে চিত্রনির্মাণ প্রক্রিয়ায় এই প্রধান দুই পুরুষের অন্তর্দৃষ্টিও যে দর্শকদের চোখের আয়না হয়ে উঠবে, তা যেন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

কিন্তু কোনও সত্যিকারের শিল্পের সত্তা কোথায় যেন লিঙ্গবৈষম্যের বাইরে গিয়ে সৃষ্টির অর্ধনারীশ্বরকেই যুগলসম্মিলনের সার্থক প্রকাশ করে তোলে, তা যেন স্রষ্টারও অজানা।

উত্তমকুমার যে আসলে কত সুপুরুষ, সত্যজিৎ রায় চিনিয়ে না দিলে কি আমরা জানতে পারতাম? উত্তমকুমারের আজীবনের প্যানকেক শোভিত মুখটার আসল প্রতিকৃতিতে বসন্তের মিলিয়ে যাওয়া দাগগুলো যে কি আশ্চর্যভাবে শরীরী, 'নায়ক' ছবিটা তা আমাদের কাছে প্রথম মেলে ধরল।

'নায়ক' ছবিতে উত্তমকুমারের আবির্ভাবটা মনে করুন। টেলিফোনে কথা বলা বিখ্যাত ম্যাটিনি আইডলের চওড়া কাঁধ, মাংসল ঘাড় আর সেই বিখ্যাত ইউ কাট। কোনও নায়িকাকেও এতখানি যৌনতার আদর মাখিয়ে কোনওদিন পরিবেশন করেছেন কিনা সত্যজিৎ, মনে পড়ে না।

যাঁরা বলবেন এটা আসলে পুরুষের নয়, নায়কের আত্মপ্রকাশ—তাঁরা 'সোনার কেল্লা'টা একবার মনে করবেন দয়া করে।

ফেলুদা, যাঁর যৌনতার কোনও প্রামাণ্য প্রকাশ নেই কোথাও, যাঁর প্রধান আবেদন কেবল তাঁর মগজাস্ত্র, প্রথম দর্শনে সেই ফেলুদার নগ্ন দু'টি পা ফ্রেমের তলা থেকে ঢুকে থাকে—একজন অত্যন্ত বর্ণময় পুরুষের আশু আগমনবার্তা নিয়ে।

সত্যজিৎ যৌনতার ব্যবহারে বরাবরই পরিমিত। কেবল 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে হরি ও দুলির সঙ্গমদৃশ্যে সেই পরিমিতির মধ্যে সাক্ষাৎ শারীরিকতা এসে ভর করে। সেখানেও আলাদা করে হরির টি শার্ট খুলে ফেলার একটা শট যায়। নগ্ন দেহ আর নগ্নীকরণের মধ্যে যৌন অনুষঙ্গের ঘনত্বের মাত্রার যে তফাত তা যেন সচেতনভাবে বুঝে, অনুভব করে তবেই হরি তার পোশাক খোলে—দুলি বরাবরই অনাবৃতা স্কন্ধ, তার পোশাক উন্মোচনের উত্তেজনা দর্শকের চোখে পৌঁছতে দেন না পরিচালক।

তবে যেহেতু সত্যজিৎ মধ্যবিত্ত বাঙালির অত্যাঙ্গ বিশ্বস্ত ঈশ্বর, তাঁর ছবির এই দৃশ্য নির্মাণ নিয়ে ফিল্ম গবেষণার gender study আলাদা করে সচেতন হয় না। হলে হয়তো, আমরা জানতে পারতাম beauty সত্যি সত্যিই beholder এর চোখেই বাসা বাঁধে।

তারজন্য ইতিহাস ঘেঁটে কার বয়স বেশি—নিবাবরণ ভেনাস না উন্মুক্ত দেহ ডেভিড, সে গবেষণায় যাবার দরকার নেই।

১১ জানুয়ারি, ২০০৯

তখন বিকেল

একটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য কাহিনি ও চিত্রনাট্য

চরিত্র :

শশাঙ্কবাবু : পাইস হোটেলের মালিক
মিহির : শহুরে যুবক
শ্যামল : ক্যামেরাম্যান
কাঞ্চন : ফিল্ম ডিরেক্টার
সুজাতা মিত্র : বিখ্যাত অভিনেত্রী
বীথি : হেয়ার ড্রেসার
শৈবাল : ফ্রিলান্স ফোটোগ্রাফার, সাংবাদিক
সন্তু : সহকারী পরিচালক
নান্টু : ইলেকট্রিশিয়ান
নারায়ণ : সাউন্ড কেয়ারটেকার
বাবলু : সহকারী মেকআপম্যান
শুভেন্দু : সহকারী ক্যামেরাম্যান
সুকুমার : প্রোডাকশন বয়
কুঞ্জবিহারী : প্রোডাকশন ম্যানেজার
রিকশাওয়ালা, গ্রাম্য পুরোহিত, ড্রাইভার।

দৃশ্য - ১

পর্দা জুড়ে হাতের ক্লোজ শট। খবরের কাগজের কোণে ডট পেন দিয়ে একটা জায়গার নির্দেশসূচক মানচিত্র আঁকতে ব্যস্ত। আঁকা প্রায় শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ ওভারল্যাপ করে।

নেপথ্য কণ্ঠ : ব্যস, এই হ'ল আপনার ক্যামেলিয়া হোটেল।

কাট্

মফস্বল শহরের একটি ছোট হিন্দু হোটেল গোছের খাওয়ার জায়গায় একটি টেবিলে মুখোমুখি বসে আছেন মিহির এবং শশাঙ্কবাবু। মিহিরের বয়স বছর চল্লিশেক। শহুরে আধুনিক চেহারা, পোড়খাওয়া মুখ—মিহির ভাত খাচ্ছে। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে দোকানের মালিক শশাঙ্কবাবু

মিহিরকে কোনও একটা বিশেষ জায়গায় যাওয়ার নির্দেশ এঁকে দেখাচ্ছেন, খবর-কাগজের সাদা জায়গায়। বোঝাই যায়, মিহির এই দোকানের খদ্দের। শহর থেকে আগত, ফলে এই অঞ্চলটার ভূগোল সম্পর্কে ওর বিশেষ ব্যুৎপত্তি নেই। শশাঙ্কবাবুর ম্যাপ আঁকা শেষ হতেই মিহির বলে।

মিহির : সোজা তো!

শশাঙ্ক : বিনোদিনী গার্লস হাইস্কুলটা মনে রাখবেন। তারপর বাঁদিকে একেবারে সোজা।

মিহির : রিকশা পেয়ে যাব না সামনে থেকে?

শশাঙ্ক : লাইন দিয়ে আপনি যান। আমি ডাকিয়ে দিচ্ছি।

শশাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে উঠে যায়। মিহির খেতে থাকে। খাওয়ার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে মিহির অনেকক্ষণ উপোসী ছিল। শশাঙ্কর গলা ভেসে আসে।

শশাঙ্ক (নেপথ্যে) : ফ্যানটা চালিয়ে দেব? ঘামছেন।

মিহির : দিন।

মিহির মাথার ওপর একটা পুরনো পাখা খট খট শব্দে চলে ওঠে। মিহির মাছের কাঁটা বেছে চুষে চুষে খেতে থাকে। শশাঙ্কর গলা শোনা যায়, বোধহয় দোকানের কোন অল্পবয়সী ছেলের উদ্দেশে—

শশাঙ্ক (নেপথ্যে) : অ্যাই—অ্যাই—একটা রিকশা ডেকে আনতো। বাবু যাবে। ক্যামেলিয়া।

শশাঙ্ক ফিরে এসে মিহিরের কাছে বসে।

মিহির : কতক্ষণ লাগবে রিকশায়?

শশাঙ্ক : মিনিট কুড়ি। কটা বাজে এখন?

মিহির : (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) চারটে বাজেনি। সাত মিনিট বাকি।

শশাঙ্ক : এখন পাবেনও না কাউকে। ঘণ্টাখানেক পর ফিরবে।

মিহির : পাঁচটায় প্যাপ আর হয় বুঝি?

শশাঙ্ক : কী হয়?

মিহির : প্যাক আ...। শুটিং পাঁচটা অবধি চলে?

শশাঙ্ক : না, ওই চারটে-টারটেতেই হয়ে যায়। এখন শীতকালের বেলা। আলোর তেজ নেই। ঝপ করে সন্ধে হয়ে যায়। তারপর, ওই অতগুলো বাস, গাড়ি মালপত্তর, বাংলোয় ফিরতে ফিরতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা।

মিহির : কদ্দুর লোকেশন ? মানে, যেখানে শুটিং হচ্ছে?

শশাঙ্ক : ওই চামুণ্ডেশ্বরী তলায়। দূর আছে। রিকশায় বারো টাকা ভাড়া। সেখানেই যাবেন নাকি? তাই বলব।

মিহির : না, আমি হোটেলেই যাব।

শশাঙ্ক : সেই ভাল। হয়তো এতক্ষণে সব বেরিয়েও পড়েছে। রাস্তায় ক্রশ হয়ে যাবে।

মিহিরের খাওয়া শেষ হয়েছে। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়।

মিহির : হোটেলে গিয়ে কি এখন তালা দেখব? না, কেউ থাকবে?

শশাঙ্ক : দু-একজন থাকে। সবাই তো আর রোজ শুটিং-এ যায় না। (দোকানের একটা বিশেষ কোণের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বলেন) ওদিকে।

মিহির ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই যা খুঁজছিল পেয়ে যায়। দেওয়ালের গায়ে একটা পুরনো বেসিন। হাত ধোওয়ার জায়গা। সেদিকে এগোতে-এগোতে মিহির বলে—

মিহির : বাবা! আপনি তো দেখছি অনেক খবর রাখেন।

শশাঙ্ক বিনয়ের হাসি হাসেন।

শশাঙ্ক : খবর তো রাখতেই হয় মশাই। আমার এখান থেকে খাবার যায় যে। কুঞ্জবাবু বলে একজন আছেন না? কালোমতন—সব দেখাশোনা করেন। রোজ সকালে বলে যান ক'টা মিল হবে। বাংলোয় কয়েকটা পাঠাতে হয়। আর বাকি ওদের লোক এসে নিয়ে যায়।

মিহিরের হাত মুখ ধোয়া শেষ হয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বার করতে করতে বলে—

মিহির : কোথায়?

শশাঙ্ক : ওই যে, কী যেন বললেন এক্ষুনি? লোকেশনে।

মিহির মুখ মুছতে মুছতে আবার চেয়ারে এসে বসে—

মিহির : শুটিং-এ গেস্‌লেন কোনওদিন?

শশাঙ্ক : (আক্ষেপে মাথা নেড়ে) সোমবার একটু হাত খালি ছিল। ভেবেছিলাম বিকেলের দিকে যাব। এমন বৃষ্টি নামল, তারপর তো শুনলাম, শুটিংই হয়নি। যারা গেছিল সব কাকভেজা হয়ে ফিরল।

মিহির : ভিড় হচ্ছে খুব শুটিং-এ?

শশাঙ্ক : হবে না? সুজাতা মিত্রর শুটিং হচ্ছে। চট্টিখানি ব্যাপার? বাসে করে সব লোক আসছে এদিক-ওদিক থেকে।

মিহির : সব খবর পেল কী ক'রে?

শশাঙ্ক : বাঃ কাগজ পড়ে না সব? আপনারা সব খবরের কাগজে লিখবেন ফলাও করে...

মিহির শশাঙ্ককে বাধা দিয়ে বলে—

মিহির : আপনারা মানে?

শশাঙ্ক : এই আপনারা। সব কাগজের রিপোর্টাররা।

মিহির : আমি রিপোর্টার কে বলল আপনাকে?

শশাঙ্ক : বলতে হবে কেন? অ্যাদ্দিনে তো আর কম জনকে দেখলাম না! সকালের ট্রেনে

আসেন। সারাদিন শুটিং দেখেন, বিকেলে ফিরে যান।

বাইরে রিকশায় হর্ন শোনা যায়। শশাঙ্ক ও মিহির দু'জনেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

শশাঙ্ক : রিকশা এসে গেছে।

মিহির : ভাড়া কত দেব?

শশাঙ্ক : এমনি চার টাকা নেয়। আপনার কাছে বোধহয় পাঁচ টাকা চাইবে।

মিহির : কেন?

শশাঙ্ক : শুটিং পার্টির লোক। ওদেরও দু'দিন একটু বাড়তি কামাই হচ্ছে না!

মিহির উঠে দাঁড়ায়। চেয়ারের পিঠে ঝোলানো ছিল চামড়ার সাইডব্যাগ। সেটা কাঁধে তুলে নিতে নিতে বলে—

মিহির : সুজাতা মিত্রর খাবারও কি আপনার দোকান থেকে যায়?

শশাঙ্ক ঠোঁট উল্টে আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে—

শশাঙ্ক : উনি বাজারের জিনিস খান না। ওই প্রাণহরি থেকে দই নিয়ে যান কুঞ্জবাবু।

মিহির : সেটা বুঝি বাজারের বাইরে?

শশাঙ্ক হেসে ফেলে—

শশাঙ্ক : আপনাদের রিপোর্টারদের এই একটা গুণ। কথা ভারি সুন্দর বলেন।

মিহির পকেট থেকে ওয়ালেট বার করতে করতে বলে—

মিহির : আমি রিপোর্টার-টিপোর্টার নই। নিজের দরকারে এসেছি। শুটিং পার্টির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। রিকশাঅলাকে একটু বলে দিন চার টাকাই নিতে।

(ওয়ালেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে দিয়ে বলে) খাবারের দামটা।

শশাঙ্ক টাকাটা নেয়। ক্যাশের টেবিলে গিয়ে খুচরো খুঁজতে থাকে। মিহির টেবিলের কাছে এগিয়ে আশে।

মিহির : লাস্ট ট্রেন ক'টায়?

শশাঙ্ক : আজই ফিরবেন?

মিহির : কাজটা বেশিক্ষণের নয়। হয়ে গেলে আগেও ফিরে যেতে পারি।

শশাঙ্ক : যদি কোনও অসুবিধে হয়, কুঞ্জবাবুকে আমার নাম করে বলবেন—বিশ্বেশ্বরী হোটেলের শশাঙ্কবাবু। অসুবিধে হবে না।

শশাঙ্ক মিহিরকে টাকা ফেরত দেয়। মিহির টাকাটা নিয়ে ওয়ালেট ভরতে ভরতে বলে—

মিহির : থ্যাঙ্ক ইউ।

শশাঙ্ক : কিছু কিনবেন?

মিহির সাইডব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে চোখে পরে নেয়।

মিহির : দই। অবশ্য যদি দামটা খুব বেড়ে গিয়ে না থাকে।

শশাঙ্ক : কেন?

মিহির রিকশায় উঠতে উঠতে বলে,

মিহির : সুজাতা মিত্র দই খেয়ে কিছু লিখেটিখে দিয়েছে বলে জানেন? প্রাণহরির পয়োধি খাইয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

শশাঙ্ক একটু বোকা বোকা মুখ করে বলে—

শশাঙ্ক : না! সেরকম কিছু লিখে দিলে ওরা অ্যাদ্দিনে সেটা দিয়ে সাইনবোর্ড করে ফেলত।

মিহিরের রিকশাটা বেরিয়ে যায়। দৃশ্য ডিজলভ্ করে। কালো পর্দায় চরিত্রলিপি ফুটে ওঠে।

কাট্

দৃশ্য - ২

গাছপালা, ঝোপঝাড় লতাগুল্মর ওপর দিয়ে ক্যামেরা ট্রলি করে। প্রাচীন একটা অশ্বত্থ গাছতলায় বাঁধানো চত্বরে, সিঁদুর-লেপা প্রাচীন বিগ্রহ মূর্তি। ঝুরিতে বাঁধা প্রচুর ঢিল, অসংখ্য পুণ্যার্থীর মানসিকের চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান। হঠাৎ আচম্বিতে ট্রলি শটটি থেমে যায়।

ক্যামেরার পিছন থেকে ক্যামেরাম্যান শ্যামলের বিস্মিত মুখ উঁকি মারে। শ্যামল ঠোঁট ওল্টায়।

পরিচালক কাঞ্চন। বছর চল্লিশেক বয়স। মাথায় একটা বেতের টোকা। ভ্রু কুঁচকে শ্যামলের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

শ্যামল : আর রাইটে যাওয়া যাবে না। দেওয়ালে ঘুঁটে।

কাঞ্চন : ঘুঁটে তো ভাল। রিয়ালিস্টিক।

শ্যামল : কিন্তু ঘুঁটে থেকে কেটে নায়িকার মুখে গেলে ভাল্লাগবে? এর পরের শট তো সুজাতার ক্লোজ। গেলে ভাল্লাগবে? এর পরের শট তো সুজাতার ক্লোজ।

কাঞ্চনকে একটু চিন্তিত দেখায়—

কাঞ্চন : দাঁড়াও, দেখি একবার। (এগিয়ে এসে ক্যামেরায় লুক থ্রু করে) ঘুঁটেটা বাদ দিয়ে হয় না?

শ্যামল : তা হলে গাছও বাদ দিতে হবে।

কাঞ্চন উত্তেজিত ভাবে ক্যামেরা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—

কাঞ্চন : গাছ বাদ দেবে কি? ওই অশ্বত্থ গাছের তলায়ই তো নায়িকা এসে পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাইছে। স্টোরি পাল্টে দাও আর কি।

শ্যামল : তা হলে।

কাঞ্চন : দাঁড়াও। (একটু ভেবে নিয়ে) অ্যাঙ্গেলটা যদি বদলাও একটু। ধরো, যদি ট্রলি এরকম ভাবে পাতো।)

কাঞ্চন আঙুল দিয়ে ট্রলি লাইনের একটা অন্য সম্ভাব্য অবস্থান নির্দেশ করে।

শ্যামল : টাইম পাব না। লাইট চলে যাবে।

কাঞ্চন : এক কাজ কর। (একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।) এদিকে এসো। ট্রলি ধর বাদ দিলাম...

শ্যামল : দিয়ে?

কাঞ্চন : ধর, ওপেনিং শটটা তো সুজাতার পয়েন্ট অফ ভিউ। শট স্টেডি নিলাম এখান থেকে।

শ্যামল : ট্রলি প্যাক আপ?

কাঞ্চন : বলছি। স্টেডি শট্...পড়ন্ত আলোয়...শার্প ফোকাসে আরম্ভ করলে। আস্তে অস্তে বাষ্পাচ্ছন্ন।

শ্যামল : তা হলে তো ফগ মেশিন লাগবে।

কাঞ্চন : (ঈষৎ বিরক্ত ভাবে) ধ্যাৎ, ওই বাষ্পাচ্ছন্ন নয়। শার্প ফোকাস থেকে ব্লারড্ হল।

শ্যামল : হয়ে?

কাঞ্চন : কাটব। বিগ ক্লোজ আপ। সুজাতার মুখ। চোখে জল।

কাট্

দৃশ্য - ৩

সুজাতা মিত্রর বিগ ক্লোজ শট। চোখে গ্লিসারিন দেওয়া হচ্ছে। ক্যামেরা চুরি করে পেছিয়ে পিছলে গেলে দেখতে পাই হেয়ার ড্রেসার বীথি অতি সযত্নে সুজাতার চোখে গ্লিসারিন দিচ্ছে। সুজাতার পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি, লাল ব্লাউজ, কপালে সিঁদুরটিপ, খোলা চুল, সিঁথিতে সিঁদুর। মাঠের মাঝখানে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে সুজাতা। বোঝা যাচ্ছে এটাই লোকেশন। আর চারপাশে শুটিং দর্শনার্থী লোকজনের ভিড়। বীথি সন্তর্পণে গ্লিসারিন দিচ্ছিল সুজাতার চোখে। হঠাৎ সুজাতা বলে—

সুজাতা : দাঁড়া।

বীথি থমকে দাঁড়ায়। হাত নামিয়ে নেয়।

একজন ফটোগ্রাফার, ধরা যাক তার নাম শৈবাল। সুজাতার ছবি নেওয়ার জন্য ক্যামেরা তাক করছিল।—ক্যামেরা নামিয়ে নেয়।

সুজাতা : (কঠোর ভাবে) আপনি কীসের ছবি নেবেন? বীথি অবাক হয়ে শৈবালের দিকে তাকায়। শৈবাল কিছুটা অপ্রস্তুত।

শৈবাল : মানে, আপনার একটা...

সুজাতা : (কঠোর নির্দেশের ভঙ্গিতে) গ্লিসারিন দেওয়ার ছবি নেবেন না। লোক ঠকানোই তো আমাদের কাজ, না? সেটা আমি আপনার ক্যামেরার সামনে কেন করব বলুন? (সোজা হয়ে বসে) নিয়ে নিন। শৈবাল ঘাবড়ে গিয়েছিল। প্রায় হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার মতো ক'রে ক্যামেরার শাটার টেপে।

সুজাতা : থ্যাঙ্ক ইউ! এবার আপনি আপনার ক্যামেরাটা সরান। আমাদের কাজ করতে দিন। (বীথির উদ্দেশে) বীথি!

বীথি আবার গ্লিসারিন দেওয়ার জন্য নিচু হয়। সুজাতা গভীর মনোসংযোগ করার চেষ্টা করে। হঠাৎ বীথি বলে—

বীথি : দাঁড়াও।

সুজাতা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকায়—

বীথি : আঃ নোড়ো না।

সযতনে সুজাতার গাল থেকে কী যেন একটা কুড়িয়ে নেয় বীথি।

বীথি : হাত পাত।

সুজাতা : (সবিস্ময়) কী রে?

বলতে বলতে হাতের পাতা মেলে ধরে সুজাতা। বীথি তাতে অদৃশ্য কিছু রেখে বলে।

বীথি : চোখের পাতা। উইশ কর।

সুজাতার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

বীথি : উইশ কর।

সুজাতা হাতের পাতা মুঠো করে। মুখে মৃদু হাসি। একবার সামনের দিকে তাকায়।

কাট্

সুজাতার দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া শট। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় অগণিত মানুষের ভিড়। সবাই সুজাতার শুটিং দেখতে এসেছে।

কাট্

ক্লোজ-আপ্। সুজাতা চোখ বন্ধ করে। মৃদু অনুচ্চারিত প্রার্থনায় ঠোঁট নাড়ে। তারপর চোখ মেলে হাতের মুঠো ফুলে ফুঁ দেয়।

কাট্

বীথি ঝুঁকে পড়ে বলে—

বীথি : কী বললে?

কাট্

দৃশ্য - ৪

উত্তেজনায় রুমাল চিবোচ্ছে কাঞ্চন। আর চলন্ত ক্যামেরার আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে সুজাতার আকুতিভরা প্রার্থনা।

সুজাতা (নেপথ্যে) : লোকে তা তোমার কাছে কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, আকুতি নিয়ে আসে, ঠাকুরে কাউকে তো তুমি ফেরাও না। আমি তবে কী দোষ করলাম?...

আমরা সুজাতাকে দেখতে পাই। বাঁধানো অশ্বত্থ গাছতলায় সিঁদুরলেপা বিগ্রহের সামনে বসে প্রার্থনারত সুজাতা, চোখ দিয়ে দরদর ধারা। শুটিং চলছে—

সুজাতা : বল ঠাকুর, তবে কি আমার সেবায় কোনও ত্রুটি থেকে গিয়েছে? লোকে তোমার কাছে অর্থ চায়, ক্ষমতা চায়, যশ চায়—আমি কেবল এসেছি আমার সন্তানের জীবন ভীক্ষা চাইতে...

তার ওপর কাঞ্চনের গলা ভেসে আসে—

কাঞ্চন (নেপথ্যে)

কাট্

সুজাতার মনঃসংযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে বলে—

সুজাতা কী হ'ল?

কাঞ্চন মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে, তারপর বলে—

কাঞ্চন : সন্তু! আচ্ছা, এইসব ডিটেলগুলোও কি আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?

সন্তু ব'লে একটি অল্পবয়সী ছেলে এগিয়ে আসে। হাতে একটি খাতা—সন্তু, সহকারী পরিচালক।

সন্তু : ডায়লগ তো ঠিক ছিল। আমি অল অ্যালং স্ক্রিপ্ট দেখছি।

কাঞ্চন : ঘোমটাটা কে বলে দেবে?

সন্তু : ঘোমটা?

সুজাতাও বোধহয় একটু অবাক হয়েছে। কাঞ্চনের কাছে এসে দাঁড়ায়—

কাঞ্চন : মা ঈশ্বরের কাছে সন্তানের প্রাণভিক্ষা করছে, মাথায় ঘোমটা থাকবে না?

সুজাতা : কেন, ঘোমটা থাকবে কেন? ঈশ্বর কি ভাসুর ঠাকুর নাকি?

কাঞ্চন সুজাতার দিকে ফেরে। তারপর যথাসম্ভব স্বর নরম করে বলে—

কাঞ্চন : না—সুজাতা, একটা মাতৃমূর্তির ব্যাপার আছে না। টিপ পরা, ঘোমটা দেওয়া।

সুজাতা : সেটা গৃহবধূ হতে পারে,

কাঞ্চন : বাড়িতে। কিন্তু জঙ্গলে একা একা এসেছে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে—টায়ার্ড, এক্সজস্টেড। সেখানে ঘোমটা-টোমটা দিলে একটু বেশি ড্রেসড্ আপ লাগবে না?

কাঞ্চন : ড্রেসড্ আপ লাগবে কেন? এটা তো ট্র্যাডিশনের ব্যাপার।

সুজাতা : আমার মা বেশ ট্র্যাডিশনাল ছিলেন। আমি তো কখনও আমাদের সামনে ঘোমটা দিতে দেখিনি।

কাঞ্চন : না সুজাতা, এটা মানতে পারলাম না। ভিসুয়ালি একটা তফাত হতে বাধ্য। ঘোমটা দেওয়া মায়ের একটা আলাদা মাধুর্য থাকতেই হবে।

সুজাতা : তাহলে ধর...বিদেশি মহিলারা তো ঘোমটা দেন না। তার মানে তাঁরা যথেষ্ট মা নন?

কাঞ্চন : কেন দেবে না? তুমি মাদার মেরির ছবি দেখনি?

সুজাতা : ওটা ঘোমটা না। হুড। মিডিভ্যাল যুগে কুমারী মেয়েরাও মাথা কভার করত।

সুজাতা ও কাঞ্চনের উত্তেজিত আলোচনার মাঝখানে শ্যামলের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে আসে।

শ্যামল : শট হবে? লাইট কিন্তু যাচ্ছে। আরও দু'টো শট বাকি।

সুজাতা : (শ্যামলের দিকে তাকিয়ে) হবে। আমি ঘোমটা দিয়ে নিচ্ছি। (গলা তুলে) বীথি গ্লিসারিন আর সেফটিপিন দিস তো।

কাঞ্চনকে একটু আশ্বস্ত দেখায়। এত তাড়াতাড়ি সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে ও ভাবেনি।

কাঞ্চন : সুজাতা, পিন করার দরকার নেই। এমনি থাক।

সুজাতা : মানে?

কাঞ্চন : মানে, জাস্ট লুজ টানা রইল। তারপর ধরো, কাঁদতে কাঁদতে খসে গেল, আলুথালু চুল, ভাল লাগবে।

বীথি মেক-অপের ট্রে-টা নিয়ে আসে। সুজাতা তার থেকে সেফটিপিনের গোছাটা তুলে নেয়। কাঞ্চন চুপ করে যায়—মনে হয় ও বারণ করা সত্ত্বেও সুজাতা পিন ব্যবহার করছে দেখে ওর একটু খারাপ লেগেছে। সুজাতা বোধহয় সেটা বুঝতে পেরেছে—গোছা থেকে একটা সেফটিপিন খুলতে খুলতে মুচকি হেসে কাঞ্চনকে বলে।

সুজাতা : ঘোমটা পিন করব না। তুমি গৃববধূ চাইছ তো, তাই করছি (হাতের বালায় সেফটিপিনটা লাগিয়ে নেয়) আমি রেডি।

কাট্

দৃশ্য - ৫

শট হয়ে গিয়েছে। টেপ রেকর্ডারে সুজাতার গলাটা চালিয়ে শুনে নিচ্ছে সাউন্ড কেয়ারটেকার নারায়ণ। ইলেকট্রিশিয়ান নান্টু এসে দাঁড়ায়।

নান্টু : প্রোগ্রাম কি আরও বাড়বে নাকি রে?

নারায়ণ : (মুখ না তুলে) মনে হয়।

নান্টু : ক'দিন।

নারায়ণ : দিন জানি না। তবে বাড়বে।

নান্টু : কী ক'রে বুঝলি?

নারায়ণ : বাঃ! হড়কালো না দু'দিন? বৃষ্টিতে।

নান্টু : মিঠুদি'র ডেট আছে?

নারায়ণ : ওর কাজ তুলে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

নান্টু : তবে কাজ করবে কাকে নিয়ে?

নারায়ণ : শোভেনদা, আহামাদির সিনগুলো আছে না—গ্রামের ভিতর?

নান্টু : (চিন্তিত মুখে) মুশকিল হল।

নারায়ণ : কেন?

নান্টু : আসার সময় ছেলেটার জ্বর দেখে এলাম। বাড়ল না কী হল, কেমন রইল, কোনও খবর পাচ্ছি না।

নারায়ণ : কাল তো সুশান্ত যাবে। কলকাতা। স্টক আনতে। বলে দাও, জেনে আসবে।

নান্টু : হ্যাঁ। ওর বয়ে গেছে, আমার বাড়ি গিয়ে ছেলের খবর নিয়ে আসতে।

নারায়ণ : তাহলে এক কাজ কর।

নান্টুকে আশান্বিত দেখায়—

নারায়ণ : এই চামুণ্ডেশ্বরী-তলায় মানসিক করে একটা ঢিল বেঁধে দাও।

নান্টু : ইয়ার্কি মারিস না।

নারায়ণ : (নান্টুর দিকে চোখ তুলে তাকায়) মাইরি। এমনিতেই তো সবাই বলে খুব জাগ্রত। তার ওপর সুজাতা মিত্র রোজ দু'বেলা এইখানে মাথা কুটছে—ডবল জাগ্রত হয়ে গেছে।

কাট্

দৃশ্য - ৬

লোকেশন। চারপাশে ভিড়। তারই মধ্যে একটা ম্যাগাজিন খুলে ক্রসওয়ার্ড করছে সুজাতা। মাথায় চুলে দু'পাশে লম্বা ক্লিপ লাগানো। পাশে বসে সহকারী মেকআপ-ম্যান বাবলু। অল্পবয়সী ছেলে, সুজাতাকে সাহায্য করছে ক্রস ওয়ার্ডের সমাধান খুঁজে দিতে।

সুজাতা : মণিপুর রাজবংশী অর্জুনের যম, পারস্যে লড়েন যথা সোহরাব রুস্তম। পাঁচ অক্ষর।

বাবলু : কী?

সুজাতা : চিত্রাঙ্গদার ছেলের নামটা কী যেন রে?

বাবলু : চিত্রাঙ্গদা তো ডান্স ড্রামা।

সুজাতা : (প্রায় নিজের মনে) মণিপুর রাজবংশী-মণিপুরের রাজপুত্র। অর্জুনের যম—অর্জুনকে যুদ্ধে মেরেছিল। পারস্যে লড়েন যথা সোহরাব রুস্তম—পারশিয়ায় যেমন সোহরাব রুস্তম। বাবা-ছেলের লড়াই হয়েছিল, এটাও সে রকম।

বাবলু : অর্জুনকে মেরেছিল?

সুজাতা : হ্যাঁ। মনে পড়েছে। বভ্রুবাহন।

বাবলু : কবে, কুরুক্ষেত্রে?

সুজাতা ম্যাগাজিনে ক্রসওয়ার্ডের ছকে লিখতে লিখতে বলে—

সুজাতা : কুরুক্ষেত্রের পর। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে যখন মণিপুরে যায় তখন।

বাবলু : কোন এপিসোডে দেখিয়েছিল গো?

সুজাতা : জানি না। অশ্বমেধ পর্বে আছে। ১৯ পাশাপাশি...

বসিলেন গৌতম বোধিবৃক্ষমূলে।

বোধিবৃক্ষ অবস্থিত যেই নদীকূলে।।

যে নদীর ধারে বুদ্ধদেব তপস্যা করেছিলেন। বল্।

বাবলু : নদী?

সুজাতা : হুঁ। চার অক্ষরের।

বাবলু : অঞ্জনা।

সুজাতা : (অধৈর্যভাবে) চার অক্ষরের?

বাবলু : অ-ন-জ-না।

সুজাতা : ভ্যাট্।

বাবলু : সত্যি তুমি দেখো দিদি। ক্রসওয়ার্ডে এরকম অনেক থাকে। জোর করে মেলায়।

সুজাতা : মনে পড়েছে। নৈরঞ্জনা। থ্যাঙ্ক ইউ।

সুজাতা লিখবে বলে মাথা নিচু করে। কাঞ্চন এসে পাশে দাঁড়ায়—

কাঞ্চন : সুজাতা, আমরা রেডি।

সুজাতা মুখ তুলে কাঞ্চনের দিকে তাকায়—

সুজাতা : হঠাৎ?

সুজাতা ম্যাগাজিন বন্ধ করে। কলমটা ম্যাগাজিনের ভেতর গোঁজে। কিছু একটা ভাবে। তারপর বলে—

সুজাতা : তোমার মেয়ে কখন হয়েছিল, কাঞ্চন?—মানে ক'টার সময়?

কাঞ্চন : বিকেলের দিকে। এইরকম সময়। নাম পরে হবে, চল শট্‌টা শেষ করে নিই। লাইট যাবে।

পড়ন্ত সূর্যের দিকে ফিরে তাকায় সুজাতা। মাথা থেকে লম্বা ক্লিপগুলো খুলতে খুলতে স্বগতোক্তির মতো বলে—

সুজাতা : সায়ংকালে জাতা। সায়ন্তনী। সায়ন্তনী নাম দাও না কাঞ্চন, সুন্দর নাম।

কাঞ্চন সুজাতাকে কিছুক্ষণ দেখে। তারপর প্রশ্রয়পূর্ণভাবে হেসে প্রশ্ন করে—

কাঞ্চন : কাজ করতে ইচ্ছে করছে না? প্যাক আপ করে দিই?

সুজাতা উঠে দাঁড়ায়। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করে।

সুজাতা : তুমি ভগবান বিশ্বাস কর কাঞ্চন?

কাঞ্চন : হঠাৎ?

সুজাতা : না মনে হল, কর না?

কাঞ্চন : কেন মনে হল?

সুজাতা : ঠাকুরের কাছে গিয়ে কখনও কিছু চেয়েছ কোনও দিন?

কাঞ্চন : হুঁ। ছবি রিলিজ করার দিন এখনও যাই। কালীঘাটে।

সুজাতা : ঠাকুরের কাছে এরকম কেঁদে কেঁদে কাউকে চাইতে শুনেছ কিছু ?

কাঞ্চন : কেঁদে কেঁদে মানে?

সুজাতা : এই যেমন আমায় দিয়ে করাচ্ছ?

কাঞ্চন : কী করাচ্ছি?

সুজাতা : (অনুনয়পূর্ণ স্বরে) ডায়লগগুলো একটু চেঞ্জ কর কাঞ্চন, প্লিজ। আমি একদম অ্যাকটিং করতে পারছি না।

কাঞ্চন : চেঞ্জ করে কী করব?

সুজাতা : স্বাভাবিক কিছু কর। এটা ভীষণ মেকি। কীরকম সাজানো—ভীষণ আনরিয়ালিস্টিক লাগছে।

কাঞ্চন : আনরিয়ালিস্টিক কী? মা তার মনের দুঃখের কথা জানিয়ে ঠাকুরের কাছে ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইছে।

সুজাতা : অত কথা বলে? অত কথা বললে ঠাকুরকে ডাকবে কখন কাঞ্চন? আর তাও সব ওরকম কেতাবি। বুকিশ কথা।

কাঞ্চন এতক্ষণ সুজাতার সঙ্গে ধীর পায়ে এগোচ্ছিল। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় রাঙা আকাশের প্রেক্ষাপটে দু'জনকে প্রায় সিল্যুয়েট দেখায়। কাঞ্চন ঘাড় ঘুরিয়ে অস্তমিত সূর্যকে দেখে। তারপর সুজাতার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে।

কাঞ্চন : সানসেটের ছবি দিয়ে তো কত ক্যালেন্ডার হয়। তা বলে এই যে সূর্য রোজ তোমার চোখের সামনে অস্ত যাচ্ছে—এটা কি মিথ্যে? নাটক, নভেল, গল্প, সিনেমা এসবের বেসিস

কোথায় বল, সুজাতা! লাইফ থেকেই তো? কত লোকের জীবনে কত কী ঘটে, কত রকম ট্র্যাজেডি—আমরা কি সব জানি? কী অবস্থায় পড়লে মানুষ কী কথা বলে, কীভাবে বলে, কতটা ইমোশন নিয়ে, সেটা কি সুস্থ অবস্থায় নর্মাল ফ্রেম অফ মাইন্ডে সব সময় অ্যানালাইজ করা যায়?

সুজাতা : ওই জায়গার লাইনগুলো তোমার ঠিক লাগছে?

কাঞ্চন : তুমি চরিত্রটার ক্রাইসিসটার কথা একবার ভাব—তার সন্তান মৃত্যুশয্যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সে কী করবে, কীভাবে কথা বলবে সেটা কি তোমার আমার পক্ষে সম্যক বোঝা সম্ভব? আমরা কি তার মধ্যে দিয়ে গেছি যে ঠিক জানব—কী বলতে হয়। হতেই তো পারে যে এই পার্টিকুলার মুহূর্তের মানসিক অবস্থায় তার বইয়ে পড়া কথা ছাড়া কিছু মনে আসছে না।

সুজাতা কাঞ্চনের কথা শুনতে শুনতে নিজের হাতের গয়নাগুলো নিবিষ্ট ভাবে দেখছিল। বেলা শেষের রক্তিমায় স্বর্ণাভ চুড়ি—বা তাম্রবর্ণ ধারণ করেছে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সুজাতা মৃদু স্বরে বলে।

সুজাতা : বুদ্ধদেবের গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

কাঞ্চন (ঈষৎ হেসে) কোনটা? নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের তলায় বুদ্ধদেব তপস্যা করছেন, সুজাতা পায়েস এনে দিল?

সুজাতা : না। ওই যে বলেছিলেন না—'বাড়ি বাড়ি গিয়ে দ্যাখো, যে বাড়িতে কেউ কখনও মারা যায়নি, সে বাড়ি থেকে একমুঠো সর্ষে নিয়ে এস, তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব।'

কাঞ্চন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুজাতার দিকে প্রায় সস্নেহে তাকিয়ে বলে—

কাঞ্চন : ডায়ালগটা একটু চেঞ্জ করে দিলে তোমার সুবিধে হবে?

সুজাতা মাথা নাড়ে—মানে হ্যাঁ।

কাঞ্চন : সন্ধেবেলা চানটান করে একবার বসব'খন তোমার সঙ্গে। এই সিনটা যদি অন্তত কিছুটা রি-রাইট করে নেওয়া যায়।

সুজাতা কৃতজ্ঞতা ভরে হাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের হাতটা ছোঁয়।

সুজাতা : থ্যাঙ্কস্ কাঞ্চন। সূর্যের শেষ কিরণের একটা নাম আছে জানো—সুন্দর নাম। এখন মনে পড়ছে না। কলকাতায় ফিরে তোমায় বলে দেব।

কাঞ্চন : তা দিয়ে আমি কী করব?

সুজাতা : তোমার মেয়ে সূর্যাস্তের সময় হয়েছিল বললে।

কাট্

দৃশ্য - ৭

সন্ধে হয়ে এসেছে। ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলোর রেশ আকাশে। মাঠ-ঘাট শেষবেলার আলোয় ঝলমল করছে। শুটিং শেষ। একটু দূরে বড় ভ্যানের মাথায় আলোর সরঞ্জাম, ট্রলি তোলা হচ্ছে।

টাল রেলগুলোর গায়ে ঝিকিয়ে উঠছে দিনশেষের মুমূর্ষু রোদ। শুটিং দর্শনার্থীদের ভিড় পাতলা হচ্ছে। প্রায় সিনেমার শো শেষ হওয়ার মতো। তাদের পায়ের ধুলোয় দিগন্ত আচ্ছন্ন।

টাল প্ল্যাঙ্ক-রে উপর বসেছিল ক্যামেরাম্যান শ্যামল। এবং পাশে বসে নিবিষ্ট মনে বসে গান গেয়ে চলেছে সহকারী পরিচালক সন্তু। শ্যামল সন্তুকে সকৌতুকে দেখছে। সহকারী ক্যামেরাম্যান শুভেন্দু এসে সন্তুকে একটা ছোট কালো বান্ডিল ধরিয়ে দেয়।

শুভেন্দু : নাও। তোমার কাট ফিল্ম। সন্তু গান থামায় না। হেসে ফিল্মের টুকরোটা নেয়। শ্যামল পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে টাকা বার করে দেয় শুভেন্দুর উদ্দেশে।

শ্যামল : ফেরার পথে একটা কিনে নিস্ তো।

শুভেন্দু : তুমি?

শ্যামল : আমি কাঞ্চনদার গাড়িতে যাচ্ছি। শুভেন্দু চলে যায়। সন্তু একমনে গান গেয়ে চলেছে। শ্যামল সন্তুর দিকে ফেরে।

শ্যামল : কাল ক'টা সিনের?

সন্তু গাইতে-গাইতে মাথা নাড়ে—জানে না।

শ্যামল : দু'টো না?

সন্তু আবার গাইতে গাইতে কাঁধ ঝাঁকায়, অর্থ—'হতেও পারে'।

শ্যামল : আবার অশ্বত্থতলা?

সন্তুর গানের মাঝে ইঙ্গিত—উত্তর 'হ্যাঁ'। শ্যামল কিছুক্ষণ সন্তুকে দেখে, তারপর বলে—

শ্যামল : ফিরে গিয়ে দিন-টিন দেখে একটা বিয়ে করে ফ্যাল।

সন্তু হাসতে হাসতে গেয়ে চলে—

শ্যামল : ওই পুরুতমশাইকে বল, দিন বলে দেবে।

শ্যামলের কথায় সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। দূরে আঁধার হয়ে আসা অশ্বত্থগাছতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছেন একজন বৃদ্ধ পুরোহিত। সন্তু গান থামিয়ে উঠে বসে। একদৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখে। তারপর বলে।

সন্তু: কত এক্সপোজার দিলে উঠবে রে শ্যামলদা?

শ্যামল : চারশো তো। ৫.৬ দিয়ে দ্যাখ।

পুরোহিতের প্রদীপ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। গাছতলা জুড়ে ঝিকমিক করতে থাকে প্রদীপের আলো। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু বলে।

সন্তু: নান্টুদাকে কি তোর লাগছে?

শ্যামল : কেন?

সন্তু: ছেলেটার শরীর খারাপ বলছিল। জানত না হঠাৎ এক্সটেনশন হবে।

শ্যামল : কাল দেখি। গাছতলার সিনগুলো উঠে যাক, গ্রামের মধ্যে ঝামেলা নেই বেশি।

সন্তু : (আক্ষেপের সুরে) সিন আর উঠেছে? হিরোইনের সঙ্গে কনটিনিউয়াস ফুসুর ফুসুর করলে—শুটিংটা কি ভোজবাজিতে হবে?

শ্যামল : আজ কিন্তু টেনশন কম করেছে।

সন্তু: আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামল : কী, সুজাতা মিত্র?

সন্তু: উইথড্রয়াল। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে না? হঠাৎ গাছতলা থেকে ভেসে আসে ঘণ্টার শব্দ। পুরোহিতের সন্ধ্যারতি শুরু হল। সন্তু অন্যমনস্ক ভাবে কপালে হাত ঠেকায়। শ্যামল সেটা লক্ষ করে বলে।

শ্যামল : ও ব্যাটা! এদিকে খুব বলো ঠাকুর-দেবতা মানো না।

সন্তু একগাল হেসে বলে—

সন্তু: এটা স্থানমাহাত্ম্য।

কাট্

দৃশ্য - ৮

ঘরে ফেরা পাখির কাকলির মাঝখানে ছোটো নদীর ওপর সূর্য ডুবে গেল। আশপাশের গাছপালা জুড়ে আঁধারের ছোপ। তার ওপর সুজাতার গলা ভেসে আসে।

সুজাতা (নেপথ্যে) : অদ্ভুত নাম না জায়গাটার? কুসুমডিঙা।

এয়ারকন্ডিশন গাড়ির পেছনের সিটে বসে সুজাতা আর বীথি শুটিং সেরে বাংলোয় ফিরছে। সুজাতার পরনে তখনও অভিনয়ের পোশাক। বীথি শালপাতার ঠোঙা থেকে কাঠি দিয়ে আলুকাবলি খাচ্ছে। ছোট একটা খালের ওপর কালভার্ট পার হয়ে সুজাতার গাড়ি।

বীথি : ডিঙা না ডাঙা।

সুজাতা : ডাঙাই ছিল হয়তো ওরিজিন্যালি। কুসুমডাঙা। ফুলের গাছ ছিল হয়তো অনেক।

বীথি : কুসুমডিঙা কী যেন? বিয়েতে হয়, না?

সুজাতা : বাসি বিয়েতে। বর কনেকে সিঁদুর পরায় আসল কথাটা কুশণ্ডিকা।

বীথি : (সবিস্ময়) তুমি কত কী জানো।

সুজাতা : এটা তো সবাই জানে।

গাড়িটা এবার ডানদিকে মোড় ঘুরে কাঁচা রাস্তায় পড়ে। এটাই বোধহয় বাংলো যাওয়ার পথ।

বীথি : না, এটা ছাড়াও। কত কিছু বলে দাও টকটক করে। কেউ পারে না।

সুজাতার দৃষ্টি তখনও জানলার বাইরে।

সুজাতা : ওধারের জঙ্গলটায় অনেক বকুলগাছ আছে। সেখান থেকেই নাম হয়েছিল বোধহয়—কুসুমডাঙা।

বীথি : নদীর ওপাশে জঙ্গলে বাঘ আছে জান?

সুজাতা : কে বলল?

বীথি : ড্রাইভারজি, শের হ্যায় না উধার জঙ্গল মে?

ড্রাইভার : হাঁ মেমসাব।

সুজাতা : সাচ?

ড্রাইভার : হাঁ মেমসাব। কভি কভি রাতকো নদী মে পানি পিনে আতা হ্যায়।

সুজাতা : একদিন গেলে হয় জঙ্গলটা দেখতে। পরশু অফ থাকলে যাবি?

গাড়ি বাংলোর দিকে এগোচ্ছে। বাংলোর সামনে রাস্তার দু'পাশে সারি দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে। সুজাতা মিত্রকে দেখবার জন্য।

বীথি : কখন?

সুজাতা : দুপুরের দিকে যাব। খেয়ে দেয়ে।

বীথি : দুপুরে কেন, সকাল সকাল চল। সন্ধের আগে ফিরে আসব।

সুজাতা : কেন তাড়া কীসের?

বীথি : তাড়া নেই? সন্ধে অবধি থাকবে জঙ্গলে?

সুজাতা : কেন? বাঘে ধরবে?

গাড়ি বাংলোর গেটের মধ্যে ঢুকল। ঢোকা মাত্র দারোয়ান গেট বন্ধ করে দেয়।

বীথি : বলে না,—সন্ধে হলেই বাঘের ভয়?

সুজাতা : না।

বীথি : বলে না?

সুজাতা : বলে—যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে...সুজাতার মুখের কথা শেষ হয় না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু একটা দেখার ধাক্কায় ওর বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মিহির বাংলোর রোয়াকে বসে সিগারেট ধরাচ্ছিল। সুজাতার গাড়ির আওয়াজে মুখ তুলে তাকায়।

কাট্

দৃশ্য - ৯

ঘণ্টাখানেক পর। বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। আর অবিরত ঝিঁঝির ডাক। বাংলোয় কাঞ্চনের

ঘর। শৈবাল, মানে লোকেশনে যাকে আমরা ছবি তুলতে ডেকেছিলাম, কাঞ্চনের সাক্ষাৎকার নিতে ব্যস্ত। কাঞ্চন খাটের ওপর বসে। সামনে টেপ রেকর্ডার। শৈবাল একটা চেয়ার টেনে এগিয়ে এসেছে খাটের কাছটিতে। হাতে মাইক্রোফোন ধরা।

শৈবাল : আপনার তো প্রায় সাতদিনের কাজ হয়ে গেল!

কাঞ্চন : তা গেল। বৃষ্টিটা না হলে আরও দু'দিন হত।

শৈবাল : এখনও তো চার-পাঁচ দিন বাকি শুনলাম।

কাঞ্চন : ডিপেন্ড করছে।

শৈবাল : এতদিন সবাই মিলে বাইরে, আর্টিস্টরা আপত্তি করছে না?

কাঞ্চন : কেন? কত লম্বা লম্বা আউটডোর করেন কত লোক। আমার তো বারো দিনের একটা ছোট্ট শেডিউল।

শৈবাল : না, সবাই তো আর এত বড় স্টার নিয়ে কাজ করে না।

কাঞ্চন : সুজাতার কথা বলছেন? ও খুব কো-অপারেটিভ।

শৈবাল : বলছেন?

কাঞ্চন : নিশ্চয়ই। যা বলা হচ্ছে, হাসিমুখে করছেন।

শৈবাল : আপনি ডিরেক্টর, আপনি বেটার জানবেন। তবে আমার আজকের শুটিং দেখার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য রকম।

কাঞ্চন : দেখুন, হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান হয় না। মতভেদ সামান্য থাকবেই। সকলের সঙ্গেই থাকবে। আমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের সঙ্গে নেই? ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে নেই? প্রত্যেকেই চাইছেন ছবিটা ভাল করতে। সেখানে ডিরেক্টর বলে আমি যদি একটা জেদ ধরে বসে থাকি...

শৈবাল : সুজাতা দেবীর কাজ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

কাঞ্চন : বলব। অসাধারণ।

শৈবাল : এই রোলটা তো ওনার ইউশুয়াল আরবান সোফিস্টিকেটেড ইমেজের বিরোধী। একটা গৃহস্থ মাদারলি চরিত্রে। হঠাৎ এরকম চরিত্রে ওনাকে কাস্ট করলেন কেন?

কাঞ্চন : গৃহস্থ মাদারলি তো অভিনয়ের ব্যাপার। ওর এবং আমার কাজ হচ্ছে চরিত্রটাতে একটা গৃহস্থ মাতৃরূপ প্রজেক্ট করা। তার মানে অভিনেত্রীকে সত্যি সত্যি গৃহস্থ মাতা হতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই।

শৈবাল : না, তা নেই। তাহলেও একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স তো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে হেল্প করে।

কাঞ্চন : শোভেনবাবু যে চরিত্রটা করছেন ছবিতে, তিনি মারা যান। এ ব্যাপারে কাস্টিং নিয়ে আপনার কোনও সাজেশন আছে?

দরজা থেকে একটি ছেলের গলার আওয়াজ ভেসে আসে—

নেপথ্যে : কাঞ্চনদা!

শৈবাল টেপরেকর্ডার বন্ধ করে।

কাঞ্চন সাক্ষাৎকার স্থগিত রেখে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে—

কাঞ্চন : কাম ইন।

সুকুমার বলে একটি ছেলে ঘরে ঢোকে।

সুকুমার : সুশান্ত এক্সপোজড় নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। স্টকও নিয়ে আসবে। তুমি কোনও খবর পাঠাবে বৌদিকে?

কাঞ্চন : আগামিকাল যাওয়ার কথা ছিল না সুশান্তর?

সুকুমার : হ্যাঁ। কিন্তু শ্যামলদা বলছে হাই স্পিড স্টক ফেলে না রাখতে।

কাঞ্চন : সুজাতাকে বল। ওর ঘরে তো এসি আছে, ওখানে রাখতে। একটা রাত্তিরে কী আর এমন হবে?

সুকুমার : মিঠুদির কাছে একজন গেস্ট এসেছে। কথা বলছে। যাক, কাঞ্চনদা। চলেই যাক। কাল তো যেতেই হত।

কাঞ্চন : যাক্। না, আমার কিছু পাঠানোর নেই। বীথিকে বল সুজাতাকে একবার জিগ্যেস করে নিতে।

শৈবাল হঠাৎ প্রশ্ন করে—

শৈবাল : উনি কি গাড়িতে যাবেন?

কাঞ্চন : কে?

শৈবাল : মানে, যিনি কলকাতা যাচ্ছেন।

কাঞ্চন : হ্যাঁ, আপনি যাবেন সঙ্গে?

শৈবাল : অসুবিধে হবে?

কাঞ্চন : না। (সুকুমারের দিকে ফিরে) সুশান্তকে একটু বলিস ওনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

সুকুমার : আচ্ছা।

সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ কী মনে হতে ফিরে আসে।

সুকুমার : আজ লেট নাইটে তোমার ছবি দিয়েছে। সীমান্তরেখা।

কাঞ্চন : (নির্লিপ্তভাবে) দিক। কারুর দেখার দরকার নেই। কাল সকালে ওঠা আছে। সব খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে বল।

সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সামনে টানা বারান্দা। আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে কাঞ্চনের ঘরটি বাংলোর দোতলায়। বারান্দায় এক কোণ ঘেঁষে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে

ছিল নান্টু। সুকুমারকে ঘর থেকে বেরোতে দেখে নিচু গলায় সসংকোচে ডাকে।

নান্টু : অ্যাই।

সুকুমার ফিরে তাকায়। নান্টুকে দেখতে পায়।

সুকুমার : কী?

নান্টু : (হাত নেড়ে) শোন্ না।

সুকুমার নান্টুর কাছে এগিয়ে আসে—

সুকুমার : কী?

নান্টু : সুশান্ত কলকাতা যাচ্ছে?

সুকুমার : হুঁ!

নান্টু : কোথায় রে?

সুকুমার : ঘরে।

নান্টু : তুই যাচ্ছিস ঘরে?

সুকুমার : হ্যাঁ, কেন?

নান্টু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে, একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় সুকুমারের দিকে।

নান্টু : খা, বলছি।

কাট্

দৃশ্য - ১০

ক্যামেরা গ্রাউন্ড লেভেলে। মোরাম বিছোনো বাংলোর বাগানের রাস্তায় শুয়ে ছিল চৌকিদারের পোষা নেড়ি কুকুর। পিছনে অ্যাম্বাসাডরে হেডলাইট জ্বলে ওঠে। ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়ার শব্দে কুকুরটি তন্দ্রা ভেঙে উঠে সরে যায়।

দোতলার বারান্দা থেকে নেওয়া টপ শপ। হেডলাইটের আলোয় বাংলোর দারোয়ানকে দেখা গেল গেট খুলে দিতে। সশব্দ গর্জনে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যাম্বাসাডার।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বীথি আর শুভেন্দু (সহকারী ক্যামেরাম্যান)। আমরা আগের শটটা ওদের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছি। বীথি'র পরনে একটা সস্তার লুজ কাফতান। শুভেন্দু স্নান সেরে এসেছে বোঝা যায়। ভিজে চুল আঁচড়ানো। বোতাম খোলা জামার ভিতর দিয়ে পাউডার মাখানো বুকে একটা লকেট দেওয়া চেন ঝুলছে।

বীথি : এত রাত্তিরে কলকাতা গেল?

শুভেন্দু : রাত্তির কোথায়। এখন তো সোয়া ছ'টা।

বীথি : বাবা! কী অন্ধকার না। আমি তো ভেবেছি অনেক বাজে।

শুভেন্দু : নভেম্বর মাস শেষ হতে চলল...

বীথি : কলকাতায় বোধহয় একটু পরে সন্ধে হয়।

শুভেন্দু : হত। দশদিন আগে। ফিরে গিয়ে দেখবি এখনই হচ্ছে।

বীথি : ঠান্ডাটা কিন্তু এখনও পড়ল না। দেখেছ। ভেবেছিলাম ফাঁকা জায়গা, এদিকটাতে শীত পাব।

শুভেন্দু বারান্দার রেলিং-এ হাত দিয়ে একটু ঝুঁকে আকাশের দিকে তাকায়—

শুভেন্দু : কুয়াশাও নেই। আকাশ কীরকম পরিষ্কার দ্যাখ।

বীথি : চাঁদটা দ্যাখো (শুভেন্দু'র পাশে ঘেঁসে আসে) আজকে কী গো?

শুভেন্দু : কী গো মানে?

বীথি : মানে পূর্ণিমা টুন্নিমা আছে?

শুভেন্দু : জানি না।

বীথি : শটের জন্য বসে আছি। অশ্বত্থতলার ঠাকুরমশাই এসে প্রসাদ দিয়ে গেল।

শুভেন্দু : একাদশী-টেকাদশী হবে জিগ্যেস করলেই পারতিস।

বীথি : কী মজা হয়েছে জানো। দিদিকে চিনতে পারেনি। মাথায় বেলপাতা ঠেকিয়ে বলল—ভাল করে পাশ করো, ভাল বিয়ে হোক।

শুভেন্দু : ন্যাকা। বাংলাদেশে থাকে সুজাতা মিত্রকে চেনে না। শুটিং-এর সময়তো খুব গোল গোল চোখ করে দেখে।

বীথি : যাঃ, লোকটা ভাল।

শুভেন্দু বীথি'র দিকে তাকায়—

শুভেন্দু : তোকে বিয়ে হবে টবে বলেছে বুঝি?

বীথি : (ঘাড় নাড়ে) হুঁ!

শুভেন্দু : তুই কী বললি?

বীথি হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বলে—

বীথি : তোমার খিদে পায়নি?

শুভেন্দু : হুঁ। খাওয়াবি?

বীথি : ডালমুট খাবে?

শুভেন্দু : কোথাও যেতে পারব না।

বীথি : যাবে কেন? দিদির ঘরে আছে। (হঠাৎ কী মনে হতে) ও! দিদির ঘরে তো এখন লোক।

শুভেন্দু : কে? কাঞ্চনদা?

বীথি : না। কে একটা এসেছে। আমি আগে দেখিনি।

শুভেন্দু : তোর দিদি কী বলছে রে? কাঞ্চনকে কেমন লাগছে?

বীথি : কী বলবে?

শুভেন্দু : না। প্রথম কাজ তো।

বীথি : ভালো।

শুভেন্দু : না লোকটা ভালো। একটু বেশি বকে।

বীথি : বকা ভালো। যারা বেশি বকে তাদের মন পরিষ্কার হয়।

শুভেন্দু : আমি তো বেশি বকি না। আমি মিচ্‌কে? বীথি হঠাৎ ঝোঁকা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বারান্দার একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে বলে—

বীথি : আমার একটা ছবি তুলে দেবে বলেছিলে। দিলে না?

শুভেন্দু : কী করবি ছবি দিয়ে?

বীথি : দরকার আছে। তোমায় দিতে বলেছি দাও।

শুভেন্দু : সম্বন্ধ এসেছে?

বীথি : হুঁ।

শুভেন্দু : কোত্থেকে?

বীথি : তোমার কী?

শুভেন্দু : আমার দরকার। ঠিকানাটা বল।

বীথি : কী করবে?

শুভেন্দু : ভাঙচি দেব।

বীথি : কী?

শুভেন্দু : লিখব-যে, তুই আসলে আমার সঙ্গে প্রেম করিস।

বীথি (কপট অভিমানে) উঁ।

শুভেন্দুও সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বীথির কাছে এগিয়ে যায়। একটা হাত থামের ওপর রেখে বীথিকে আড়াল করে।

শুভেন্দু : করিস না?

বীথি : বেশ করি। ছবিটা তুলে দিও।

শুভেন্দু : আমায় প্রেম করিস। অন্য লোককে বিয়ে করবি কেন?

বীথি : আউটডোরে এসে সবাই প্রেম করে। তাই বলে বিয়ে করে নাকি সবাই? অ্যাদ্দিন ইন্ডাস্ট্রিতে আছ, জানো না?

শুভেন্দু : বেশ। কাল চল। চামুণ্ডেশ্বরী তলায় গিয়ে বিয়ে করব তোকে।

বীথি : শুটিং-এর সময়?

শুভেন্দু : কেন? আপত্তি আছে?

বীথি : না। খালি কুঞ্জবাবুকে বলে দিও দু'টো মালা লাগবে।

একটু দূর থেকে কাঞ্চনের গলা ভেসে আসে—

কাঞ্চন : বীথি!

বীথি চাপা গলায় বলে—

বীথি : কাঞ্চনদা।

শুভেন্দু সরে আসে.। যেদিক থেকে ডাকটা এল ফিরে তাকায়। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা দেখি বারান্দা বেয়ে কাঞ্চন এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। কাঞ্চনের স্নান সারা। পরনে পাজামা, পাঞ্জাবি। কাছে এগিয়ে এসে বীথিকে বলে।

কাঞ্চন : সুজাতার স্নান হয়ে গেছে?

বীথি : জানি না।

কাঞ্চন : রেস্ট নিচ্ছে?

বীথি : না। কে একজন এসেছে দিদির কাছে। কথা বলছে।

কাঞ্চন : কে?

বীথি : জানি না। কলকাতা থেকে।

কাঞ্চন : প্রোডিউসার?

বীথি : না মনে হচ্ছে বাড়ির কেউ।

কাঞ্চন : ও! দিদির হয়ে গেলে আমায় একটু বলিস তো।

কাট্

দৃশ্য - ১১

সুজাতার ঘর। বড় গোছানো, ছিমছাম। ডাবল বেড পাতা। সামনে ছোট বসবার জায়গা—সোফা সেট, সেন্টার টেবিল। বিছানা এবং বসার জায়গার মাঝখানে একটা কাশ্মীরি কাজ করা পার্টিশন। ওপাশে সুজাতার ড্রেসিং টেবিল, লেখার টেবিল-চেয়ার। ইন্টারকম, একটা মিনি ফ্রিজ। সামনে বসবার জায়গায় মিহির বসে। জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দেয় অ্যাশট্রেতে। কাশ্মীরি পার্টিশন-এর আড়াল থেকে সুজাতা বেরিয়ে আসে—স্বাভাবিক পোশাক, তবে শুটিং-এর গয়নাগাটিগুলো আর খোলা হয়নি, মুখ থেকে অভিনেত্রীর চড়া মেক-আপটা তুলে ফেলেছে। সুজাতা দু'টো ছোট কাচের প্লেটে দই এনে নামিয়ে রাখে সেন্টার টেবিলে। প্লেটের পাশে চামচ। মিহিরের উদ্দেশে একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলে।

সুজাতা : খাও।

মিহির (ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে) : আমায় দিলে কেন? তুমি ভালবাসো বলে আনলাম।

সুজাতা : খাও। আমি খাচ্ছি তো। কলকাতা থেকে আনলে?

সুজাতা সোফায় বসে নিজের প্লেটটা হাতে তুলে নেয়—

মিহির : ওই বাগবাজারের দোকানটা থেকে। তুমি ভালবাসতে।

সুজাতা এক চামচ দই মুখে দেয়, তারপর বলে—

সুজাতা : তুমি কি ট্রেনে এলে তো?

মিহির : (দই খেতে খেতে) হুঁ!

সুজাতা : অত ভিড়ের মধ্যে আবার আনতে গেলে কেন কষ্ট করে?

মিহির : কষ্ট আর কী। তুমি তো আর এখানে পাও না। সুজাতা আর এক চামচ দই মুখে দেয়। তারপর বলে—

সুজাতা : হুঁ, পাই। বাগবাজারের ওই দোকানটা বোধহয় একটা প্রাণহরি বলে ব্রাঞ্চ খুলেছে। স্টেশনের কাছেই। রোজ খাই। অরুচি হয়ে গেছে।

কথা শেষ করে সুজাতা স্থিরদৃষ্টিতে মিহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুজাতার কথার মধ্যে যে শ্লেষটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল সেটা বোধহয় মিহিরকে স্পর্শ করে। তাই মিহিরকে একটু অপ্রস্তুত দেখায়। ও খাওয়া বন্ধ করে প্লেটটা টেবিলে নামিয়ে রাখে।

মিহির : ও।

সুজাতা মিহিরের এই আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করে, তারপর বলে—

সুজাতা : তুমি খাও। তুমি তো আর রোজ খাও না।

মিহির : আমার দই বেশি না খাওয়াই ভাল। সিজন চেঞ্জ তো, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ক'দিন আগেই জ্বর থেকে উঠলাম।

সুজাতা যেন হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

সুজাতা : ও! তুমি চাদর-টাদর গায়ে দেবে কিছু? আমি এসি বন্ধ করতে পারছি না জানো। সারাদিন রোদ্দুরে তো। ভীষণ গরম লাগছে। স্যরি, হ্যাঁ?

মিহির : না, ঠিক আছে। তোমার শুটিং কেমন চলছে?

সুজাতা : চলছে। আর বোধহয় দিন দু'য়েক কাজ বাকি।

(হঠাৎ মিহিরের ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলে) আনন্দলোকটা কিনলে?

মিহির সুজাতার কথায় নিজের সাইড ব্যাগটার দিকে তাকায়। সেখান থেকে উঁকি মারছে একটা ভাঁজ করা সিনেমা পত্রিকা। মিহির ব্যাগ থেকে সেটা টেনে বার করতেই প্রচ্ছদে সুজাতার ছবি দেখতে পায়। মিহির হেসে বলে—

মিহির : ট্রেনে। কভারে তোমার ছবি দেখলাম। ভাবলাম, যদি ভেতরে কোনও খবর থাকে।

সুজাতা : কী আর খবর। ওই থোড় বড়ি খাড়া। খাড়া বড়ি থোড়। তোমার খবর বলো।

মিহির ম্লান হাসে।

সুজাতা : হাসছ:

মিহির : কী বলব বলো?

সুজাতা : বলার কিছু না থাকলে বলবে না। অ্যাদ্দুর ছুটে এসেছ যখন—আমি ভাবলাম বলার কিছু আছে। মিহির মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সুজাতা টেবিল থেকে আনন্দলোকটা তুলে নেয়। পাতা ওল্টায়। হঠাৎ মিহির মুখ তুলে তাকায় সুজাতার দিকে।

মিহির: রুমকির অসুখটা আবার বেড়েছে, মিঠু। গত মঙ্গলবার হাসপাতালে দিয়েছি।

কাট্

দৃশ্য - ১২

দোতলার বারান্দা থেকে বাংলোর ছাতে উঠে গিয়েছে যে সিঁড়ি তারই অন্ধকার একটা কোণে বসে শুভেন্দু আর বীথি। এটা এমনই একটা জায়গা যেখানে চট করে কারও নজর পড়ার কথা নয়। অথচ দোতলার বারান্দায় কে আসছে—যাচ্ছে তার ওপর একটা লক্ষ রাখা যায় এখান থেকে। বীথি সিঁড়ির যে ধাপে বসে, শুভেন্দু তার নিচে। বীথির সামনে শুভেন্দুর পিঠ। দৃশ্য শুরু হতে দেখতে পাই, শুভেন্দুর পিঠে আঙুল বুলিয়ে বীথির আঙুলের স্পর্শ অনুভব করছিল চোখ বুজে। হঠাৎ চোখ খুলে বলে—

শুভেন্দু : বীথি অবধি বুঝলাম। তারপর?

বীথি : কা। বীথিকা।

শুভেন্দু : সেটা আবার কে?

বীথি : আমি। আসলে আমার নাম বীথিকা। দিদির নাম যূথিকা। আমি ক-টা বাদ দিয়ে দিয়েছে।

শুভেন্দু : বীথিই ভাল। ছোট।

বীথি : সরো, আরেকটা লিখি।

শুভেন্দু : দাঁড়া।

শুভেন্দু শার্ট-টা খুলে ফেলে পাশে রাখে।

বীথি : এ কী?

শুভেন্দু : এবার লেখ। শার্টের ওপর দিয়ে লিখলে বোঝা যায় না।

বীথি : ইস্। ঘেমো পিঠে আমি লিখব না।

শুভেন্দু : ঘেমো? ফিরে এসে চান করে পাউডার মেখেছি। বীথি ঝুঁকে পড়ে শুভেন্দুর খোলা পিঠে আঙুল দিয়ে লিখতে আরম্ভ করে। শুভেন্দুর চোখ বুজে আসে।

শুভেন্দু : তোর নখটা দিয়ে আলতো করে লেখতো। বেশ সুড়সুড়ি লাগছে।

বীথি : নখ কেটে ফেলেছি। দিদির লাগে। দিদি বকে। বলো তো কি লিখলাম?

শুভেন্দু : সুজাতা।

বীথি : ইস্। মোটেই না। তোমার নাম লিখেছি। শুভেন্দু ঘাড় ঘুরিয়ে বীথির দিকে তাকায়—

শুভেন্দু : শুভেন্দুতে কোন 'স'?

হঠাৎ বীথি ঠোঁটে আঙুল দেয়—

বীথি : চুপ।

শুভেন্দু : (অবাক হয়ে) কী?

বীথি : শোনো।

শুভেন্দু : কী?

বীথি : শেয়াল।

শুভেন্দু : তো পাড়াগাঁয়ে শেয়াল ডাকবে না তো কি? মেট্রো রেল চলবে?

বীথি : ওই নদীর ওপাশে বাঘ আসে জানো?

শুভেন্দু : ভ্যাট্।

বীথি : সত্যি! আমাদের ড্রাইভার বলল। ও শুনেছে।

শুভেন্দু : যতসব গুল!

বীথি : বিদ্যা বলল—প্রতি পূর্ণিমার রাতে নাকি ওই নদীতে জল খেতে আসে।

শুভেন্দু : তারপর চামুণ্ডেশ্বরী তলায় পুজো দেয়, বলেনি?

বীথি : সবসময় ইয়ার্কি মারো। এই জন্য ভাল্লাগে না। সব লিখব।

বীথি শুভেন্দুর খোলা পিঠে লিখতে আরম্ভ করে। শুভেন্দু চোখ বন্ধ করে ওর লেখার সঙ্গে সঙ্গেই এক-একটা অক্ষর বলে যায়।

শুভেন্দু : অ-ন্-জ-না।

বীথি : তুমি অঞ্জনা নদী জান?

শুভেন্দু : জান মানে?

বীথি : দেখেছ?

শুভেন্দু : হ্যাঁ।

বীথি : কোথায়?

শুভেন্দু : বইয়ে। সহজপাঠে। পড়িসনি? অঞ্জনা নদীতীরে খঞ্জনী গাঁয়ে/পোড়ো মন্দিরখানা

গা...র বাঁয়ে/জীর্ণ ফাটল ধরা এককোণে তারই/অন্ধ নিয়েছে বাসা, কুঞ্জবিহারী...

হঠাৎ কুঞ্জবাবুর গলা শোনা যায়—

কুঞ্জ (নেপথ্যে) : বীথি!

বীথি তাড়াতাড়ি শুভেন্দুর পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নেয়—

বীথি : কুঞ্জবাবু।

শুভেন্দু শার্টটা তুলে নিয়ে পরতে থাকে। পরতে-পরতে গলা তুলে কুঞ্জবাবুর উদ্দেশে বলে—

শুভেন্দু : এখানে।

কুঞ্জবাবু শুভেন্দুর গলার আওয়াজ অনুসরণ করে ফিরে তাকান। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে আসেন।

শুভেন্দু : অনেকদিন বাঁচবেন। এক্ষুনি আপনার কথা হচ্ছিল।

কুঞ্জ : হঠাৎ?

শুভেন্দু : কালকে দু'টো মালা লাগবে। সন্তু বলেছে?

কুঞ্জ : বলেনি তো।

শুভেন্দু : বলবে'খন তাহলে। খাবার কত দেরি?

কুঞ্জ : চলে যান। একটা ব্যাচ হয়ে গেল। (বীথির দিকে ফিরে) ম্যাডামের গেস্টের জন্য ডিনার বলব তো?

বীথি : জানি না।

কুঞ্জ : একটু জেনে দাও। আর শোনো, কাঞ্চনবাবু জিগ্যেস করতে বলেছেন স্ক্রিপ্টটা নিয়ে ম্যাডামের সঙ্গে কী বসবার কথা ছিল। আজ রাত্রে পারবেন, না কাল সকালে বসবেন?

কাট্

দৃশ্য - ১৩

কাঞ্চনের ঘর। কাঞ্চন খাটে বসে স্ক্রিপ্ট খাতা নিয়ে কাজ করছে। পাশে ড্রিংকসের গ্লাস। খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে সন্তুর দরাজ গলার গান। হঠাৎ টেলিফোনটা বাজে। কাঞ্চন রিসিভার তোলে।

কাঞ্চন : হ্যালো...বলছি...ভালো...হ্যাঁ কাজ ভালো হয়েছে...আজ কী বার?...অ্যাঁ এই ধরুন, বুধবার অবধি।...অ্যাঁ...এক মিনিট...

কাঞ্চন রিসিভার রেখে জানলার পাল্লাটা ভেজিয়ে দেয়—বোঝা যায় সন্তুর গানে ওর ফোনে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। ফিরে এসে ফোন তোলে।

কাঞ্চন : হ্যাঁ বলুন...সুজাতার...হ্যাঁ...ওর হয়ে এসেছে...দু-তিন দিন...সোমবার পাঠিয়ে দেব

ভাবছি...হ্যাঁ...সুশান্ত গিয়েছে এক্সপোজড় নিয়ে...হ্যাঁ, একটু আগে গেল...বীরেশবাবুকে দিয়ে কাল সকালেই ল্যাব-এ পাঠিয়ে দেবেন...হ্যাঁ, ও বম্বে থেকে ফোন করেছিল?...কী বলল?.... আচ্ছা...তাহলে ১৭ থেকে ২৪ অবধি গ্যাপ রাখি...হ্যাঁ টিকিট কাটতে দিয়ে দিন ২৫ কীসের ছুটি...ও বড়দিন? তাহলে ২৬ থেকে রাখি...আচ্ছা আমি সুজাতার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।

বীথির দরাজায় এসে দাঁড়ায়।

বীথি : কাঞ্চনদা।

কাঞ্চন ফোন থেকে চোখ তুলে তাকায়। বীথিকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে।

কাঞ্চন : আচ্ছা...হ্যাঁ, দেখি যদি বলতে পারে...কাল ফোন করুন...অ্যাঁ...হ্যাঁ শুনেছি...আপনারা দেখুন লেট নাইট...আমি শুয়ে পড়ব...ভোরে শুটিং আছে...ওকে।

কাঞ্চন ফোন নামিয়ে রাখে। বীথির দিকে তাকিয়ে বলে—

কাঞ্চন : বল্।

বীথি : দিদি ডাকছে।

কাঞ্চন : আচ্ছা! ভদ্রলোক চলে গিয়েছেন?

বীথি : না আছেন। এবার যাবেন।

কাঞ্চন : তা হলে যাক। তারপর আসব।

বীথি : না, দিদি এক্ষুনি আসতে বলল।

কাঞ্চন : আসছি। (হঠাৎ কী মনে পড়ে) ছাব্বিশ থেকে দিদির অন্য কোথাও ডেট আছে?

বীথি : ছাব্বিশ মানে?

কাঞ্চন : ডিসেম্বর।

বীথি : জানি না—ডাবিং আছে বোধহয়। (হঠাৎ মনে পড়তে) ও। ২৮ তারিখ ফাংশন আছে। কোন্নগরে।

কাট্

দৃশ্য - ১৪

সুজাতার ঘর। বসবার জায়গায় সুজাতা একা। সামনে খালি দু'টো দইয়ের প্লেট। সুজাতা চোখ তুলে তাকায়, যেন দরজায় কেউ নক্ করেছে। তারই প্রত্যুত্তরে।

সুজাতা : এসো।

কাঞ্চন ঘরে ঢোকে। হাতে স্ক্রিপ্ট-এর খাতা।

সুজাতা (হেসে) : এসো কাঞ্চন। স্যরি! আমার দেরি হয়ে গেল।

কাঞ্চন : ঠিক আছে। আমিও একটা ফোন সারছিলাম।

কাঞ্চন সুজাতার পাশের সোফায় বসে—

সুজাতা : কলকাতার?

কাঞ্চন : হ্যাঁ। প্রোডিউসার ফোন করেছেন।

সুজাতা : কী? এক্সটেনশন হচ্ছে কেন?

কাঞ্চন : না। এই কাজ-টাজ কেমন চলছে?

সুজাতা : কী বললে?

কাঞ্চন : নিজের প্রশংসা শুনতে খুব ভাল্লাগে না?

সুজাতা : যাঃ বৃষ্টির কথাটা বললে না?

কাঞ্চন : বললাম।

সুজাতা : কী বললেন?

কাঞ্চন : ও ভাল কথা। ১৮ থেকে ২৫ গ্যাপ দিচ্ছি। বম্বে যেতে হবে। গান রেকর্ডিং-এর দিন ফিক্সড হয়ে গিয়েছে।

সুজাতা : বেশ।

কাঞ্চন : ২৬ থেকে আবার। তোমার ডেটটা একটু চেক করে নাও।

সুজাতা : অসুবিধে হবে না। কবে যেন একটা ফাংশন আছে—তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিও।

ঘরের বাথরুমের দরজাটা খুলে যায়। একঝলক আলো এসে পড়ে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে মিহির। কাঞ্চন মিহিরকে দেখে একটু অবাক হয়—ও বোধহয় ভেবেছিল সুজাতার অতিথি চলেই গিয়েছে।

সুজাতা : আলাপ করিয়ে দিই। মিহির...মিহির সরকার আর কাঞ্চন লাহিড়ী, ছবির ডিরেক্টর।

মিহির : নমস্কার!

কাঞ্চন মৃদু হেসে হাত জোড় করে—নীরব প্রতিনমস্কারে। সুজাতা মিহিরের দিতে তাকিয়ে বলে—

সুজাতা : তাহলে তুমি একটু বোসো। আমরা একটু কাজ করি।

কাঞ্চন টেবিল থেকে স্ক্রিপ্টের খাতা তুলে নেয়। ওঠার উদ্যোগ করে।

কাঞ্চন : (সুজাতাকে) তোমার কথা থাকলে সেরে নাও—সুজাতা—আমি পরে...বা কাল সকালে—

সুজাতা কাঞ্চনের পাঞ্জাবিটা ধরে বসায়।

সুজাতা : না, না। কথা হয়ে গিয়েছে। তুমি বোসো। পুরোটাই করবে এখন?

কাঞ্চন : কালকের সিনগুলো করে নিই। পুরো স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আরোকদিন বসব'খন।

সুজাতা : ও! কাল কোন্ কোন্ সিন। একবার চট করে বলে দাও।

কাঞ্চন : এই গাছতলাতেই। তোমার এসে পৌঁছানোর দৃশ্যটা। মানে আজ যেটা করলাম, ছবিতে তার আগের সিনটা।

ওদের আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ মিহির বলে ওঠে—

মিহির : সুজাতা।

কাঞ্চন সুজাতা দু'জনেই ফিরে তাকায়।

সুজাতা : উঠবে?

মিহির : উঠি। রাত্তিরবেলা স্টেশন অবধি পৌঁছোতে সময় নেবে।

সুজাতা : ও! কাঞ্চন, একটা গাড়ি বলে দেওয়া যায়? স্টেশন অবধি ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

কাঞ্চন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

মিহির : না, না, ঠিক আছে। ব্যস্ত হবেন না। আমি রিকশা নিয়ে নেব।

মিহির উঠে দাঁড়ায়—

সুজাতা : ও আচ্ছা! আমি তাহলে আর উঠলাম না মিহির।

সুজাতা স্ক্রিপ্টের খাতায় মনোনিবেশ করে, মিহির দরজার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। সুজাতা সেটা দেখে বলে।

সুজাতা : কি হল?

মিহির : (আমতা আমতা করে) না...একটু...

সুজাতা : বল।

মিহির : তুমি কি একটু বাইরে আসবে?—দু মিনিট। কাঞ্চন উঠে দাঁড়াতে চায়। সুজাতা হাত দিয়ে ওর পাঞ্জাবি টেনে ধরে। মিহিরের দিকে ফিরে বলে।

সুজাতা : তুমি এখানেই বলো।

মিহির : তোমার পক্ষে কি কিছু দেওয়াই সম্ভব নয়?

সুজাতা : না, মিহির, বললাম তো তোমাকে। আউটডোরে কেউ অত টাকা নিয়ে আসে না।

মিহির : তাহলে।

সুজাতা : তাহলে কলকাতা ফেরা অবধি অপেক্ষা করতে পারো।

মিহির : কবে ফিরছ তাও জান না?

সুজাতা : এখনও। ওয়েদারের ব্যাপার। এর মধ্যে বৃষ্টিতে দু'দিন শুটিং নষ্ট হয়েছে।

মিহির : (চিন্তিত মুখে) কী হবে তাহলে?

সুজাতা : দ্যাখো। অন্য কোথাও। কী করতে পারো।

মিহির : কোথায় দেখব মিঠু? পাঁচ হাজার টাকা—অন্য কে আমায় অত টাকা দেবে বলো?

মিহিরকে বেশ অসহায় শোনায়। সুজাতা তবু অবিচলিত।

সুজাতা : বেশ, আমি কী করতে পারি বল?

মিহির : মেয়েটা তো তোমারও, মিঠু। আমার একার তো নয়। শুনছ যে হাসপাতালে—তুমি কলকাতায় ফেরা অবধি হয়তো রুমকির আর টাকার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

সুজাতা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। কাঞ্চন নীরব দর্শকের মতো এই ব্যক্তিগত অস্বস্তিকর বার্তালাপের মধ্যে পড়ে, কী করবে বুঝতে পারে না। একবার মিহিরের দিকে তাকিয়ে বলে।

কাঞ্চন : কখন লাগবে টাকাটা আপনার?

সুজাতা এক হাত তুলে কাঞ্চনকে থামায়। চোখের জলে মুখ ভেজা। ধীরে ধীরে হাতের বালা থেকে সেফটিপিনটা খোলে। তারপর বালাটা হাত থেকে খুলে মিহিরের দিকে এগিয়ে দেয়।

সুজাতা : আপাতত এটা ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই। কাল কোনও স্যাকরার দোকানে নিয়ে যেও। খাদ-টাদ বাদ দিয়ে যা পাবে, তাতে আশা করি তোমার কাজ হয়ে যাবে।

মিহির : তুমি?

সুজাতা : প্লিজ মিহির। আর আমার কিছু করার নেই। এটুকু করতে পারো কর। নইলে আমায় কলকাতা ফেরা অবধি সময় দাও।

মিহির : ঠিক আছে। (হাত বাড়িয়ে বালাটা নেয়, সাইডব্যাগে ভরে) চলি। কেমন থাকে জানাব।

সুজাতা : এস।

মিহির : (কাঞ্চনকে) নমস্কার।

কাঞ্চন নীরবে হাত দু'টো তোলে। মিহির বেরিয়ে যায়। সুজাতা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকে। তারপর কাঞ্চনকে বলে।

সুজাতা : একটা ড্রিংক নেবে?

কাঞ্চন : না থ্যাঙ্কস।

সুজাতা : নিতে পারো। আমি নিচ্ছি।

কাঞ্চন : ঠিক আছে।

সুজাতা : সরি! তুমি সিনগুলো বের করো। আমি আসছি। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হিলতোলা জুতোর আওয়াজ তুলে সুজাতা পার্টিশনের আড়ালে যায়। ফ্রিজ খুলে বোতল বার করতে করতে বলে—

সুজাতা : আজকে যেন একটু বেশি গরম না?

কাঞ্চন চুপ করে বসে থাকে। কোনও উত্তর দেয় না। সুজাতা বরফ বার করে, গ্লাসে ঢালে। ড্রিঙ্ক ঢালতে ঢালতে কাঞ্চনকে বলে—

সুজাতা : তোমারও গরম লাগছে?

কাঞ্চন উত্তর দেয় না। হতভম্ব ভাবে সুজাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুজাতা গ্লাস হাতে এসি-র নবটা ঘুরিয়ে দেয়।

সুজাতা : নাকি আমার প্রেশার, ট্রেশার বেড়েছে? সুজাতা এসে নিজের জায়গায় বসে। স্ক্রিপ্টের খাতাটা তুলে নিয়ে বলে—

সুজাতা : চলো।

কাঞ্চন স্থিরদৃষ্টিতে সুজাতার মুখের দিকে তাকায়।

কাঞ্চন : তোমার মেয়ের নাম রুমকি?

সুজাতা কাঞ্চনের দিকে তাকায়, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। ড্রিঙ্কের গ্লাসে অল্প চুমুক দিয়ে বলতে থাকে।

সুজাতা : আর মিহিরকে দেখলে। ও আমার স্বামী, এক্স হাজব্যান্ড। আমরা ইলোপ করে বিয়ে করি—ধরো আট বছর আগে। তখন ওকে খুব ভাল দেখতে ছিল। ভাল গান গাইত, থিয়েটার করত। আর আমিও তখন ছোট। সেটা দেখেই প্রেমে পড়েছিলাম। বিয়ের দু'বছর পর রুমকি হয়। তখন আমরা কলকাতায় চলে এসেছি। আমি সবে অ্যাকটিং আরম্ভ করেছি। মিহির একটার পর একটা চাকরি ছাড়তে লাগল। আমি এদিকে আস্তে আস্তে কাজ করছি, একটু আধটু নামডাক হচ্ছে। একটা পয়েন্টে গিয়ে মিহির কাজকর্ম প্রায় ছেড়ে দিল—সারাদিন নেশা করত, বেশির ভাগ দিন অফিস যেত না। তিক্ততা বাড়তে বাড়তে আমি শেষে ঠিক করলাম—আর একসঙ্গে থাকব না। ডিভোর্স হয়ে গেল। এখন তো ও প্রায় হার্ডকোর অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়েছে।

কাঞ্চন : তোমার মেয়ে?

সুজাতা : ওর ঠাকুমার কাছে রইল। আমি বলেছিলাম, আমায় দাও! ওরা দিতে চায়নি। আমি আর কোর্ট কাছারি করিনি। আর ভাবলাম আমায় যদি দাঁড়াতে হয়—তা হলে আর বোধহয় রুমকির যত্ন হবে না, জানো। তার থেকে ওর ঠাকুমারই কাছেই থাক। আমার শাশুড়ি খুব যত্ন করতেন ওকে। ছোটবেলা থেকেই অসুখের ধাত। ওষুধ খাওয়াতেন, সেবা করতেন।

কাঞ্চন : আর তুমি?

সুজাতা : অর্থ সাহায্য—যতটা পেরেছি, করেছি। আমার যেটুকু, সামর্থ্য, যেটুকু পেরেছি।

কাঞ্চন : মিথ্যে কথা বলো না।

সুজাতা কাঞ্চনের কাছে এরকম কিছু আশা করেনি। চোখ তুলে তাকায়।

কাঞ্চন : তোমার সামর্থ্য কতখানি সেটা তোমার স্বামী না জানলেও ইন্ড্রাস্ট্রির সবাই জানে। মেয়ের অসুখে পাঁচ হাজার টাকা তুমি দিতে পারো না?

সুজাতা : আউটডোরে অত টাকা আমি সঙ্গে আনিনি, কাঞ্চন।

কাঞ্চন : তুমি আমার কাছে চাইতে। একবার মুখ ফুটে বলতে। আমি প্রোডাকশন থেকে চেয়ে তোমায় দিতাম। দরকার হলে কাল শুটিং বন্ধ থাকত। তোমার মেয়ের জীবন আগে...না শুটিং আগে?

সুজাতা : থ্যাঙ্কস কাঞ্চন, তুমি যে বলেছ, এর জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কেউ বলে না।

কাঞ্চন : ন্যাকামি কোরো না। তুমি খুব ভাল করে জানো সুজাতা, যে বালাটা তুমি মিহিরবাবুকে দিলে সেটা তোমার কস্টিউমের বালা—ইউনিকের। ওটার দাম দেড়শো টাকার বেশি নয়।

সুজাতা আক্ষেপের গলায় বলে—

সুজাতা : ইস্! ওটা তোমার কনটিনিউইটি, না?

কাঞ্চন ঘৃণায় রাগে ক্ষিপ্ত ভাবে বলে—

কাঞ্চন : লজ্জা করছে না তোমার? তুমি না মা? তোমার মেয়ে মৃত্যুশয্যায়।...তুমি বলছিলে না একটু আগে? ডায়লগগুলো তোমার সাজানো লাগছে, আনরিয়ালিস্টিক। তোমার লাগবে না তো কার লাগবে? সন্তানের জীবনভিক্ষা করার কোনও মানে আছে তোমার কাছে? কোনও তাৎপর্য আছে? ...আমি একটা লাইনও চেঞ্জ করব না, তাতে তোমার অভিনয় করতে হয় করবে...নইলে করবে না।

স্ক্রিপ্টের খাতা কুড়িয়ে নিয়ে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ায় কাঞ্চন। সুজাতা হাত বাড়িয়ে কাঞ্চনের পাঞ্জাবিটা ধরে। তারপর ধীরে ধীরে ওকে ধরে বসিয়ে দেয় প্রায় নিস্তেজভাবে। সুজাতার দু চোখে জল টলটল করছে। গলার কাছে জমে থাকা কান্না চেপে বলতে থাকে প্রায় স্বগতোক্তির মতো...

সুজাতা : রুমকির ভাল নাম অহনা। অহনা মানে জানো, কাঞ্চন? সূর্যের প্রথম কিরণ। রুমকি জন্মেছিল ভোর রাত্রে। তারপর আমাদের প্রথম সন্তান। আমিই দিয়েছিলাম নামটা। সবাই বলেছিল খুব সুন্দর নাম। মিহির মানে তো সূর্য, যেন সূর্যের প্রথম কন্যা অহনা। গ্লাস থেকে অল্প একটু চুমুক দেয় সুজাতা। তারপর বলে—

সুজাতা : রুমকি মারাও গিয়েছিল ভোররাত্রে।

কাঞ্চনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়—বুঝতে পারে না সুজাতা কী বলছে। সুজাতা সেটা দেখে বলে চলে।

সুজাতা : আমার স্পষ্ট মনে আছে, ওকে যখন দাহ করা হয়, তখন সূর্য উঠেছে—

কাঞ্চন নির্বাক তাকিয়ে আছে সুজাতার দিকে।

সুজাতা : চার বছর আগে মারা গিয়েছে রুমকি। তখনও ওর ঠাকুমার কাছে থাকে। আমি লখনউতে—শুটিং করছিলাম। মিহির আর আমার এক বন্ধু খবর দিয়েছিল আমায়। মাঝরাতে ফ্লাইট ধরে চলে এসেছিলাম কলকাতা। এসে আর দেখতে পাইনি। শ্মশানে যারা ছিল তারা বুঝতেই

পারেনি একটা বোরখা পরা মেয়ে এখানে কী করছে। রুমকির মৃত্যুসংবাদ মিহির আমায় দেয়নি। তারপরেও না। আজ অবধি না। মাঝে মাঝেই রুমকির অসুখের নাম করে ও আমার থেকে টাকা নিয়ে যায়।

কাঞ্চনের গলা থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে আসে—

কাঞ্চন : কেন?

সুজাতা : ওরও তো টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়। নিজের জন্য বলতে বোধহয় মুখে বাধে। ও তো কিছু করে না, কাঞ্চন। বললাম যে।

কাঞ্চন নির্বাক হয়ে বসে থাকে। মাথা নিচু করে। সুজাতা চোখের জল মোছে।

সুজাতা : চলো। স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বসি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

কাঞ্চন তখনও নির্বাক। সুজাতা মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলে—

সুজাতা : একটু দই খাবে কাঞ্চন। ভাল দই। মিহির ভালবেসে এনেছে আমার জন্য। কলকাতা থেকে।

ঘরের মধ্যে নির্বাক মানব-মানবী। কেবল সন্তুর দরাজ গলার গান ভেসে আসে।

পর্দায় চরিত্রলিপি ভেসে উঠতে থাকে।

এই খসড়া চিত্রনাট্যটির প্রথমে নাম ছিল 'তখন বিকেল'। পরে এটিকে পরিমার্জন করা হয়। এক বেসরকারি চ্যানেলে 'অভিনয়' নামে একটি টেলিফিল্মও তৈরি করেন লেখক।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

ভয়ের সিনেমা দেখলে আপনাদের ভয় করে?

আমার তো খু-উ-ব করে। হাড় হিম হয়ে যায় যাকে বলে।

আচ্ছা, এটা আবার কি বোকা প্রশ্ন হল বলুন তো?

ভয়ের ছবি দেখলে ভয় করারই তো কথা। সেই উদ্দেশ্যেই তো ছবিটা বানানো। তবেই তো এটা সার্থক সিনেমা—কে কাকে বোঝাবে এসব?

কতগুলো ছবি আছে, যেমন হিচককের 'সাইকো', পোলানস্কির 'রোজমেরিজ বেবি'—চিরটা কাল বিশ্ব সিনেমার ইতিহাসে এই ধরনের সিনেমা পরম ভীতি সহকারে আদৃত হয়ে এসেছে।

এই ছবিগুলো এমন একটা আতঙ্কপুরাণ নিয়েই বেঁচে আছে আমাদের মনে যে, ছবিগুলো

দেখাতে শুরু করার আগেই কেমন একটা গা ছমছমে ভাব শুরু হয়ে যায়। তারপর, একসময়ে পর্দায় টাইটেল পড়ে। ছবি শুরু হয়। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাঁতরে যায়।

তারপর 'সাইকো'র সেই বিখ্যাত স্নানঘরের পর্দার আড়ালের আততায়ী, বা শেষের দিকে রকিংচেয়ারে বসে থাকা ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধা দর্শকদের দিকে ঘুরে তাকালেই নিরভিব্যক্তি কঙ্কাল মুখ—এই দৃশ্যগুলো কে যেন কোনও কারণে আমাকে আলাদা করে তেমন ভীত করেনি।

ছবিটার প্রথম থেকেই মনে হয় যেন এটা একটা নিত্যকার গল্প, সেখানে নিরুদ্দিষ্টা বোনকে খুঁজতে রওনা দেয় নায়িকা—এবং তারপর জড়িয়ে পড়ে পথের ধারের সরাইখানার মালিকের এক বিচিত্র মনোজগতের সঙ্গে।

সেখানে অপরিচয়ের অনিশ্চয়তা আছে, অনিশ্চয়তার গা ছমছম আছে। এবং একজন বিকলমনা মানুষের অন্তিম হাহাকার এমনভাবে ধাক্কা মারে এসে যে, দু-একটি দৃশ্যের অতর্কিত ভিস্যুয়াল ধাক্কা বা আবহের আক্রমণ তো আমাদের প্রতিদিনকার পথচলতি যে কোনও রাস্তায় বেমক্কা বেখেয়ালে রাস্তা পার হওয়া পথচারীর গা ঘেঁষে সজোরে গাড়ি ব্রেক করার অভিজ্ঞতারই অনুরূপ। তারপরে পর্দার দৃশ্যের মতো সেই পথচারী একটু অপ্রস্তুত মুখ করে নিজেকে সামলে নিয়ে নির্দ্বিধায় রাস্তা পার হয়ে যান। আর গাড়িতে বসে চালক গোবিন্দ এবং আমি হাপরের মতো বুকের ওঠাপড়া থেকে স্বাভাবিক হতে হতে অজান্তে কপালের ঘামের বিন্দু মুছে নিই। অধিকাংশ সময়ই তারপর গাড়িটাকে রাস্তার সাইডে নেওয়া হয়। আমরা দুদণ্ড জিরোই। গোবিন্দ ওর জলের বোতল থেকে জল খায় এক ঢোঁক। তারপর আস্তে আস্তে ঘোর কাটা পৃথিবীকে ঠেলে আমরা আবার রওনা দিই।

এ তো গেল সিনেমার সেইসব ভয়গুলো, যেগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের রোজকার ছোটবড় আশঙ্কারই মতো, সেটাকে আলাদা করে ভয় বললে জীবনটাও কেমন যেন পানসে নিরুত্তেজ হয়ে যায়। এই সব ছোটবড় ভয়ের আড়াল থেকেই আবার স্বস্তি আসে, আশ্বাস আসে—এমনকী সাহসও আসে।

কিন্তু জীবনবিচ্যুতও যে ভয়, যে কেবল যেন শরীরী বা অশরীরী আততায়ীর ছায়ার মতো যখন তখন এসে গ্রাস করতে পারে আমাদের।

তেমনটিও যে সিনেমার উপকরণ হয়ে ওঠে না কখনও—তা তো নয়। বরং আকছারই হয়।

একসময়ে মনে আছে, রামসে ব্রাদার্স-রা একধরনের ভয়ের ছবি করতেন। তার গল্পগুলোও বেশ একইরকম হত।

একদল যুবকযুবতী সপ্তাহান্তের প্রমোদভ্রমণে কোনও একটা পুরনো বাড়িতে গিয়ে উঠত। অবধারিত ভাবে, তাদের মধ্যে, কোনও একটি মেয়ের মনে হত যে, বাড়িতে গন্ডগোলের কিছু একটা আছে।

তারপর সেই ছবিতে এক একজন করে আক্রান্ত হত কোনও অদৃশ্য আততায়ীর হাতে।

মেয়েদের মৃতদেহ, বিশেষ করে স্নানঘরে বা সুইমিং পুলে—মোদ্দা কথা, স্বল্পবাস অবস্থায় আবিষ্কৃত হত। দর্শক ভয়ের সঙ্গে যৌনতা ফ্রি পেতেন।

তারপর একসময়ে এই দলটির মধ্যে যে সবচেয়ে সৎ, বলিষ্ঠ ও নির্ভীক—সেই যুবকটির সঙ্গে ওই আততায়ীর একটা মোলাকাৎ হত। এবং অধিকাংশ সময়ই যুবক তার গলার চেনে ঝোলানো ওঁ বা ক্রুশচিহ্ন দেখিয়ে আততায়ীকে পরাভূত করত।

এই গাঁজাখুরি গল্পের সম্পূর্ণ অবাস্তবতা সম্পর্কে কারুর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু আমার যে কী ভয় করত এই ধরনের ছবি দেখতে, সে কী বলব?

একবার মনে আছে, আমি তখন মাঝকলেজে, কলকাতা শহর জুড়ে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছে। বিকেলের দিকে জমা জলে থইথই শহরে ফুর্তি করে কয়েকজন জল দেখতে বেরিয়েছে। তার মধ্যে যথারীতি আমিও আছি।

বসুশ্রী সিনেমার ম্যাটিনি শো ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে। ছোট পাম্প এনে একতলা থেকে জল বার করে তবে সন্ধেবেলার শো হবে। সেখানে চলছে ওই ধরনের একটা ছবি—নামটা এখন সঠিক মনে নেই।

শো শুরু হওয়ার সময় হল, একতলার জল পুরোটা বার করা গেল না। ফলে দর্শকদের দোতলাতেই বসানো হল—যাকে আমরা বলতাম 'ব্যালকনি'। দর্শকের সংখ্যা হাতে গোনা—ছয়-সাত জন হবেন।

আমার রো-তে আমি একা। আমার সামনের রো-তে বসেছেন একজন বছর চল্লিশেকের বড়সড় চেহারার উত্তর ভারতীয় মানুষ। ধুতি, টেরিকটের পাঞ্জাবি, পায়ে মুজরি, পাকানো গোঁফ, গালে পান এবং তদুপরি অনবরত খৈনি খেয়ে চলেছেন।

ছবি শুরু হল। যুবকযুবতীর দল হানাবাড়িতে এসে পৌঁছল। দু-একবার অকারণে ক্যাঁচ করে দরজা খুলল, মাকড়সার জালে ছাওয়া ঝাড়লণ্ঠন থেকে অতর্কিতে চামচিকে উড়ে গেল। আর আমি একা সেই লম্বা জনশূন্য সিটের রো-তে বসে একটু উশখুশ করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর ধীর ভীরুপায়ে উঠে গিয়ে সামনের রো-এর সেই উত্তরভারতীয় মানুষটির কাছে গিয়ে বললাম,

—আমি একটু আপনার পাশে বসতে পারি?

যদিও তখন চোখে কাজল পরি না, তবু অল্পবয়সী একমাথা কোঁকড়া চুলের মেয়েলি একটি তরুণের কাছ থেকে এ প্রস্তাব অন্যরকমও শোনাতে পারত একজন অপরিচিত মানুষের কাছে। ভদ্রলোক কিন্তু অবিচলিত ভাবে বললেন,

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

গোটা ছবিটা আমি কাঠ হয়ে বসে দেখলাম। যতবার একটা খুন বা তার পূর্বাভাস হল, আমি

ভদ্রলোকের হাত খিমচে ধরলাম। আর ভদ্রলোক খৈনি-জর্দা মিশ্রিত জড়ানো কণ্ঠে আমাকে সমানে প্রবোধ দিয়ে গেলেন,

—আরে, ইয়ে তো সিনিমা হ্যায়। হকিকৎ থোড়িই হ্যায়!

আজও যখন ছবি বানাতে গিয়ে, রিয়্যালিজম-এর তাড়নায় পড়ে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত লাগে, কোনও এক অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ থেকে একটি বিস্মৃত কণ্ঠস্বর আশ্বাস দিয়ে চলে,

—আরে, ইয়ে হকিকৎ থোড়িই হ্যায়।

ভয়ের সিনেমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় সেই শেষ।

এখন ডিভিডি-তে ছবি দেখার প্রভূত সুবিধে। খুব ভয় পেলে রিমোট দিয়ে ছবি স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার দেখলে অতটা ভয় আর করে না। ফলে রিমোট নামক যন্ত্রটি এখন আমার ব্রহ্মাস্ত্র—রামসে ব্রাদার্স থেকে রামগোপাল বর্মা সৃজিত কোনও আততীয়ই আর অকস্মাৎ আমাকে কাবু করতে পারে না।

এ তো গেল ছবি দেখার গল্প। এবার একটা ছবি বানানোর গল্প বলি। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।

'চোখের বালি'র শুটিং চলছে বেনারসে। প্রায় নিশ্চুপেই কাজ শুরু করেছিলাম আমরা। কারণ দীপা মেহতার 'ওয়াটার' কেলেঙ্কারির ত্রাস সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত শিরদাঁড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে। 'চোখের বালি'-ও যেহেতু এক বিধবার প্রণয়কাহিনি, হয়তো একটু বেশিই সাবধানী ছিলাম আমরা।

প্রথম দু'দিন শুটিং হয়ে গিয়েছে। ঐশ্বর্য এসে কাজ শুরু করেছে সবে। রামনগরের রাজবাড়ির সুরক্ষিত ঘাটে কারুর প্রবেশাধিকার নেই। তা ছাড়া, আলাদা সিকিওরিটির ব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয় দিন সকালবেলা মনে আছে বজরার মধ্যে শুটিং করছিলাম আমরা, ঐশ্বর্য ও বুম্বা পাত্রপাত্রী। এবং আমরা—অন্য কুশলীরা।

হঠাৎ মোবাইলে ফোন এল। ঘাট থেকে ফোন করছেন আমার প্রযোজক।

—ঋতুদা, এখানে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। পুরো বেনারসের প্রেস এখানে দাঁড়িয়ে, শুটিং-এর ছবি তুলতে না দিলে ভাঙচুর করবে।

বজরার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কাতারে কাতারে লোক। একটাই সমবেত স্লোগান,

—বিশ্বসুন্দরীকে বার করে দাও, নইলে গদর মচা দেঙ্গে। (অর্থে, দাঙ্গা বাধিয়ে দেব।)

ঐশ্বর্য দেখলাম, এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বেশ সিদ্ধহস্ত। আমাকে বলল,

—ভেবো না ঋতুদা। দেখছি।

ওর হেয়ার ড্রেসার নুরীর থেকে রঙিন একটা দোপাট্টা দিয়ে গায়ে জড়াল, সাদা থানের ওপর। নুরীর হাতে কতগুলো রঙিন কাচের চুড়ি ছিল। চট করে পরে নিল। তারপর মাঝকপালে বড় একটা মেরুন সোয়েড টিপ আটকে নিয়ে বলল,

আমি রেডি, চলো।

ফিসফিস করে কেবল আমায় বলল,

—আমি ওদের বলব, এটাই আমার কস্ট্যুম। আমি ছবিতে বিধবা বটে, তবে সেটার শুটিং এখন হচ্ছে না।

ধীরে ধীরে সবাই পাড়ে নামলাম আমরা।

মনে হল রাজবাড়ির সিঁড়ির ধাপগুলো সব মানবসমুদ্র হয়ে লাফাচ্ছে, মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সমবেত 'বজরঙ্গ বলী'র জয়ধ্বনি। তারই মধ্যে শুনতে পেলাম ইউনিট-এর কেউ বাংলায় কাকে যেন একটা বলছে,

—আজাদকে কেউ আজাদ বলে ডাকবে না। অজয় বলবে।

আজাদ আহমেদ আমার দশটি ছবির মেক-আপ শিল্পী। আমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। হঠাৎ তাকে 'অজয়' বলে ডাকতে হবে?

শিরদাঁড়া বেয়ে যে ঠান্ডা স্রোতটা নামল সে কি উত্তুরে হাওয়া না গঙ্গার বাতাস!

আমার, মনে হল আমার সামনে একটা ভয়ের সিনেমা শুরু হয়ে গিয়েছে।

আমি সেটার টিকিট কাটিনি। আর, সেটা কখন শেষ হবে, তাও জানি না।

২২ মার্চ, ২০০৯
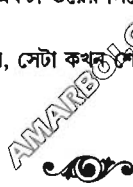
একেই বলে গ্রহের ফের! প্রায় আক্ষরিকভাবে।

নইলে বেছে বেছে উনিশে এপ্রিল রোববার পড়ে? আর আমরা রোববার দপ্তরের আমার অফিসঘর-কাম-আড্ডাখানায় বসে বসে প্রচ্ছদকাহিনির লিস্ট করতে করতে হঠাৎ 'উনিশে এপ্রিল'-এর ঘায়ে বধ হয়ে যাই।

পরে দেখা হল আমি 'উনিশে এপ্রিল' ছবিটা না বানালেও তারিখটা বাংলার কেন, বিশ্ব ক্যালেন্ডারেই বহুদিন ধরে স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করছে।

তাই এই সংখ্যা কেবল মাত্র আমার দ্বিতীয় ছবির গল্প নয়।

এক

আমার প্রথম ছবির নাম হীরের আংটি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে বানানো। শুরু হয়েছিল নব্বই সালে—সেন্সর হল একানব্বই-এর এপ্রিল। ঠিক তার ক'দিন আগে সত্যজিৎ রায়

আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

এক অপাংক্তেয় একলব্যর সাহস বা সুযোগ কোনওটাই হল না বীরশ্রেষ্ঠকে গিয়ে নিজের প্রথম কাজ দেখানোর।

একদিক থেকে হয়তো ভালই হয়েছে।

আমার পরের পর নানা ছবি দেখে সত্যজিৎ রায় কী কী বলতে পারতেন—ভাল বা মন্দ—সেটাই যেন আমার আর আমার না দেখা কিংবদন্তি অরণ্যদেবের একটা কাল্পনিক সংলাপ হয়ে থেকে গিয়েছে আমার মনে।

হীরের আংটি মুক্তি পেল না। বেশ কয়েকজন পরিবেশক দেখলেন। ছোটদের ছবি রিলিজ করতে সাহস পেলেন না। আর আমার প্রযোজক যেহেতু একটি সরকারি সংস্থা, এবং তাঁদের মূল অফিস বম্বেতে—তাঁরাও উদ্যোগ নিলেন না বিশেষ। বছরের খাতে একটা খরচা ধরা ছিল, 'সবুজদ্বীপের রাজা'র পর বহুদিন বাদে আরেকটা বাংলা ছবিও করা হয়ে গিয়েছে—অতএব তাঁরা প্রায় নাকে তেল দিয়েই ঘুমোলেন।

আর আমি এদিকে একা কলকাতায়—'হা ডিস্ট্রিবিউটর, যো ডিস্ট্রিবিউটর' করে দোরে দোরে ঘুরলাম।

তখন আমার কতটুকুই বা বয়স, আর কে-ই বা আমায় চেনে।

ক্ষয়ে যাওয়া শুকতলাগুলো একদিন যথারীতি পুকুরপাড়ে ডাঁই করে ফেলে দেওয়া হল, আর কলকাতাশুদ্ধ সবাই জেনে গেল যে, মানুষে ছবি করার সুযোগই পায় না। আর এই ছেলেটা (তখনও ছেলেই ছিলাম, লোক হইনি) একটা গোটা ছবি বানানোর টাকাও পেল, কিচ্ছু করতে পারল না।

হীরের আংটি সত্যিই আমার প্রথম সন্তানের মতো। ব্যাকবেঞ্চার, ফেলু ছেলে—কিন্তু প্রথম সন্তান তো বটেই।

দুই

রবীন্দ্রসদনে একটা নাচের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। রীণাদি (অপর্ণা সেন) প্রধান অতিথি, রেণুদি (রেণু রায়) আর আমি সঙ্গে গিয়েছি।

প্রথম সারিতেই বসেছি তিনজন। রেণুদির তখন সাংস্কৃতিক জগতে নিজেরই বেশ নামডাক। আমিই কেবল ল্যাংবোট হয়ে সঙ্গে এসেছি। অনুষ্ঠান শেষ হল। রীণাদিকে মঞ্চে ডাকলেন আয়োজকরা—কী ফুলের তোড়া-টোড়া দেবেন বলে। আর সেই ফাঁকে কেন জানি না, রেণুদি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল

—আচ্ছা, পনেরো লাখ টাকায় একটা ছবি করে দিতে পারবে?

আমি ভাবলাম ভুল শুনছি, নিশ্চয়ই অন্য কাউকে বলছে। তারপর বুঝলাম—না। এটা আমাকেই বলা।

আজকে যাঁরা প্রথম ছবি করতে আসবেন বলে ভাবছেন, তাঁদের কাছে পনেরো লাখ টাকাটা একটা অবিশ্বাস্য সংখ্যা।

সেদিনের সেই তিরানব্বইয়ের সন্ধেয় হিসেবটা অন্যরকম ছিল। আমার প্রথম ছবিই শেষ হয়েছে বারো লক্ষ টাকায়। অতএব ভরসা একটা ছিল কোথাও।

তবু ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম

—পনেরোটা সতেরো করা যায়, তা হলে অন্তত...

উনিশে এপ্রিল শেষ হয়েছিল পনেরো লাখ, ষোলো হাজার কত টাকায়। বহুদিন অবধি অঙ্কটা হুবহু মনে ছিল, আজ লিখতে গিয়ে দেখলাম গুলিয়ে যাচ্ছে।

তিন

টিভিতে জলসাঘর দেখাচ্ছিল একদিন বিকেলবেলায়। তখন টিভি বলতে দূরদর্শন কেবল। তাতেই জলসাঘর দেখানো হচ্ছিল।

দেখতে দেখতে টেলিভিশনের পর্দা হঠাৎ করে এতবার দেখা ছবিটাকে যেন অন্য একটা মানে দিতে লাগল।

টেলিভিশনের ছোট পর্দাতে এই পড়ন্ত বেলার একাকী মানুষটার গল্প, তার বাড়িটার সঙ্গে তার সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা আমি আগে কোনওদিন বুঝিনি।

দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল এরকম যদি একটা ছবি বানাতে পারি—কেবল একটা মানুষ আর তার বসতবাড়ি। ধরা যাক মানুষটি এক বিগতযৌবনা নর্তকী। আর বাড়িটা যেন তার স্মৃতির জাদুঘর।

পরে অনেকেই বলেছেন যে, 'উনিশে এপ্রিল' আসলে ইংগমার বার্গম্যান-এর 'অটাম সোনাটা'র কপি।

আমি 'উনিশে এপ্রিল'কে মৌলিক বলে দাবি করছি না। কিন্তু অন্তরালের অনুপ্রেরণার ছবিটি কিন্তু অটাম সোনাটা নয়, জলসাঘর।

মনে আছে স্ক্রিপ্টটা পড়ে শোনানোর পর রীণাদি স্মিত হেসে বলেছিল

—It has pale shades of Autumn Sonata. দেখেছ নিশ্চয়ই ছবিটা।

আমি উজবুকের মতো মাথা নাড়লাম—না। রীণাদি বলল

—তা হলে এখন আর দেখো না, ছবিটা করে নাও।

এই করে আজ অবধি আমার অটাম সোনাটা দেখা হল না।

পাছে বার্গম্যানের 'অবিনশ্বর আত্মা' আমার দ্বিতীয় ফেলে আসা দ্বিতীয় ছবির সঙ্গে সেই মরণদাবাটা খেলতে চায়।

চার

তখন আমি রেসপন্স-এ কাজ করি। ছবিতে ব্যবহার করা অর্ধেক জিনিসই অফিস থেকে চেয়েচিন্তে এনেছিলাম। তার মধ্যে সবথেকে জ্বলজ্বলে দু'টো জিনিস হল একটা সাদা-কালো ব্যথাতুর মেয়ের মুখের ছবি, ছবিতে অদিতির (চুমকী, মানে দেবশ্রী যে পার্টটা করেছিল) লেখার টেবিলের ওপরে সেটা সাজানো থাকত। আর ছিল একটা কালো-সাদা ক্যালেন্ডার, যেটা সারাক্ষণ তারিখটাকে ধরে রেখেছিল বিভিন্ন ক্লোজ আপে।

মনে আছে, একদিন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন রেসপন্স অফিসে। পুজো সংখ্যা পত্রিকা তখন সবে চালু হয়েছে। এটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছর হবে। আমার কাছে এলেন উপন্যাস চাইতে। আমি তো হতভম্ব—আমাকে উপন্যাস লিখতে বলবে কেউ, ভাবিইি নি কখনও। রঞ্জনদাই বা কেন ভেবেছিলেন, আজও জিগ্যেস করা হয়নি।

আমার তখন সামনে পুজো বিজ্ঞাপনের চাপ। রোজ আটটার পর অফিস থেকে বেরতে পারি। উপন্যাস লিখব কখন?

রঞ্জনদাকে বললাম

—আমার একটা চিত্রনাট্য লেখা আছে, ছাপবেন?

ততদিনে ধরে নিয়েছি চিত্রনাট্য লেখা সার। এটা ছবি করে বানানোর টাকা আর কে-ই বা দেবে? তার থেকে বরং ছেপে বেরলেও তো পাঁচটা লোক পড়বে। চিত্রনাট্যটা ছেপে বেরলো। অনেক ভেবেচিন্তে নাম দেওয়া হল—বাৎসরিক। মনে আছে, বইটা হাতে পেয়ে ইলাস্ট্রেশনের মহিলা দু'জনকে দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমি তো সরোজিনী-অদিতিকে এমন করে ভাবিনি।

এ-ও মনে আছে—শারদীয়া পত্রিকা আমাকে পঁচিশ হাজার টাকার চেক দিয়েছিল।

উনিশে এপ্রিল ছবিটা থেকে আমার সেটুকুই রোজগার।

আর বাকি রোজগারটা অনেক পরে। জাতীয় পুরস্কারের পঞ্চাশ হাজার টাকা।

রেণুদি সেদিন সন্ধেবেলা যে প্রস্তাবটা দিয়েছিল, সেটা যে আসলে বেশ সিরিয়াস একটা কথা, প্রথমটায় আমি ভাবিনি।

বুঝতে পারলাম যখন কয়েকদিনের মধ্যেই অনেকটা কাজ ঝটপট করে এগিয়ে গেল। তখন এপ্রিল মাস প্রায় মুমূর্ষু। শুটিং-এর শেডিউল যা দাঁড়িয়েছে তাতে চৌঠা জুন শুটিং শুরু হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে মে মাসের পয়লা তারিখ দেবশ্রী প্রসেনজিৎকে বিয়ে করে ফেলেছে। নতুন সংসারের দায়িত্ব নিয়ে ওর ছবির কাজ কিছুটা হাল্কা।

ফলে ওর ডেট পেতে সময় লাগল না। রীণাদির একটু ঝামেলা ছিল। মে মাসের শেষের দিকে সোনার, (রীণাদির বড় মেয়ে) বিয়ে। সাতাশে বিয়ে, উনত্রিশে বউভাত। সেইসব সামলে উঠতে

উঠতে শুটিং-এর দিন এসে ভীষণ জোরে জোরে বেল বাজাচ্ছে। আর আমি দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছি। কারণ ছবির নামটাই তখনও ঠিক হয়নি।

পাঁচ

'বাৎসরিক' নামটা সিনেমার নাম হিসেবে এক ফুৎকারে উড়ে গেল।

সবাই নাক কুঁচকে বলল—পোস্টার থেকে নাকি বাসি মালার গন্ধ পাওয়া যাবে।

কিচ্ছুতেই নাম মাথায় আসছে না, হঠাৎ মনে হল একটা দিনের গল্প যেহেতু, তারিখটাই তো ছবির নায়ক হতে পারে। চিত্রনাট্যে তারিখটা ছিল আঠেরোই এপ্রিল। অতএব কয়েকদিন সেটাই ঘুরঘুর করল সবার মাথায়।

তারপর, আমারই মনে হল যে শব্দছন্দ হিসেবে 'উনিশে এপ্রিল' কথাটা অনেক শ্রুতিমধুর।

বন্ধু শৌভিক, সে আবার ছবির কার্যনির্বাহী প্রয়োজকও বটে, তার একটা অন্য ব্যাখ্যা দিল। যে দিনটা কেটে, রাত পার হয়ে যখন পরের দিন সকাল হয়, ক্যালেন্ডারের পাতা বদলে দু'টো সংখ্যাই বদলে যায়। এক আর নয় যথাক্রমে হয়ে দাঁড়ায় দুই আর শূন্য। সত্যিই সার্বিক পরিবর্তন।

তখন আর নাম নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে ভাল লাগছে না।

ক্ল্যাপবোর্ডে লেখা হয়ে গেল—উনিশে এপ্রিল।

টিটোদার (দীপঙ্কর দে) খুব অপছন্দ ছিল নামটা।

টিটোদা তখন অনুপের (সেনগুপ্ত) একটা ছবি করছেন, যতদূর মনে পড়ছে, নাম—সিঁদুরের প্রতিজ্ঞা। আমার আবার সেই নামটা খুব অপছন্দ, রোজ টিটোদাকে বলি,

—অনুপকে বলো না নামটা বদলাতে, ও কি এই নামটা শেষ অবধি রাখবেই?

টিটোদা নির্বিকার মুখে বললেন

—তুমিও কি 'উনিশে এপ্রিল' নামটা রাখবেই?

আমি একটু থতমত খেলাম।

—কেন?

—মনে হচ্ছে বলশেভিক রেভোলিউশন নিয়ে ছবি হচ্ছে।

ছয়

রীণাদি, বুম্বা একটা পয়সাও নিল না। উল্টে রীণাদির নিজের পোশাক, বাড়ির জিনিস, ছবি, আসবাব সব এল সেটে। চুমকী, টিটোদা, বোধিদা, চিত্রাদিকে যা টাকা দেওয়া হল—সেটা ধরে নেওয়া যাক শুটিং-এ আসার পেট্রল খরচ।

শুটিং এর মধ্যে চুমকীর জনডিস হল। রীণাদিকে বিদেশ যেতে হল একবার।

শেষ অবধি তিরানব্বই সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর উনিশে এপ্রিল সেন্সর হল। আর একত্রিশে ডিসেম্বর আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে দশ বছরের গাঁটছড়া কেমন করে যেন খসে গেল।

সাত

মনে আছে অনেক কিছুই।

প্রথম দৃশ্যে সদ্যমৃতর বাড়িতে ভিড় লাগবে বলে সব বন্ধুবান্ধবরা এসে দাঁড়াল।

এখনও নজর করলে দেখা যায় একটু দূরে সাদা সালোয়ার কামিজ পরে কঙ্কনা দাঁড়িয়ে আছে ভিড়কুমারী সেজে। সোহাগদি বসে আছে বোধিদার মৃতদেহের সামনে।

বিবিদি উঠে যাচ্ছেন সিঁড়ি বেয়ে। আর আপাদমস্তক পেছন ফিরে সাদা দোপাট্টা ঘোমটার মতো করে মাথায় জড়িয়ে বসবার ঘরে অভ্যাগতদের মধ্যে বসে আছে রীণাদি নিজে, অবশ্য আমরা ছাড়া সেটা আর কেউ বুঝতে পারে না।

আট

মনে আছে, নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্কোরিং-এ কত প্রোজেকশন হয়েছে ছবিটার।

পরিবেশকদের জন্য। সবাই দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, ডিস্ট্রিবিউট করার সাহস দেখাননি।

গোটা প্রোজেকশনের সময়টা আমি বাইরে পায়চারি করছি অধীর আগ্রহ এবং অধৈর্য সংবরণ করে। ঠাট্টা করে বললাম—এটা মেয়ে দেখতে আসা। আমার তো কালো মেয়ে।

তারপর যখন শিকে ছিঁড়ে স্বর্ণকমল পড়ল একদিন, রীণাদি বলত

—এবার আমাদের কালো মেয়ের সোনার গয়না হয়েছে। এবার আর বিয়ে দিতে বেগ পেতে হবে না।

নয়

মনে আছে, রঞ্জাবতী আর মঞ্জুশ্রীদি কত ভালবেসে নাচের শাড়ি গয়না পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ছবি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সেই শাড়ি গয়না মায়ের আলমারিতে তোলা ছিল কতদিন।

মনে আছে, এক রোববার সকালে ইউনিটের সবাই এবং তাঁদের বাড়ির লোকেরা ছবি দেখলেন 'বিজলী' সিনেমার দোতলায়।

আর আমি গোটা সময়টা জুড়ে ওপর-নীচ করলাম আর মনে মনে ভাবলাম, এত খারাপ প্যানপ্যানে একটা ছবি লোকে দেখবে কেন?

আর শো'টা যেই শেষ হল, হলে যিনি Usher তিনি বেরিয়ে এসে আমায় একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললেন

—আপনি একদিন গৌতম ঘোষ হবেন।

মনে আছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণার পর হঠাৎ একদিন গভীর রাতে চুমকীর ফোন এল গোয়া থেকে। খালি কাঁদছে

—কী হয়ে গেল, ঋতু!

ভেবেছিলাম, ছবির দু-দু'টো পুরস্কার আমাদের সবাইয়ের মতো ওর কাছেও অবিশ্বাস্য ঠেকছে।

তখনও জানি না, ওদের এক বছরের দাম্পত্য এর মধ্যেই শীর্ণ, শুষ্ক, বাসি হয়ে গিয়েছে।

কেবল মনে নেই, বা জানতেও চাইনি কোনওদিন যে রবীন্দ্রসদনে নাচের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে পনেরো লাখ টাকার ছবির অফারটা বেছে বেছে আমাকেই দিয়েছিলেন কেন রেণুদি?

শুভ উনিশে এপ্রিল!!

১৯ এপ্রিল, ২০০৯

ছিল লেখার পাতায়, কলমের আঁচড়ে। অলঙ্কারে, উপমায়। কখনও গল্প বলার তোড়ে, কখনও অবসরের অন্তরচিন্তায়। বহু মানুষ পড়লেন সেই কলমকাহিনি। কাহিনির পাত্রপাত্রী, পটভূমির উচ্চাবচ, নিজের কল্পনা দিয়ে ধরে রাখলেন নিজের মনের ভেতর। প্রত্যেকেই মনের চোখে নতুন করে অন্তত একটু আলাদা করে দেখলেন বইয়ের পাতার সেই মানুষগুলোকে।

বইয়ে পড়েছি বিমলা শ্যামাঙ্গী। আবার বইয়ে পড়েছি দ্রৌপদী কৃষ্ণা। ঠিক কতখানি কালো হলে বিমলা আমাদের মনের মতো হয়, তা নয় নাই বা হল রবি ঠাকুরের মতো, হয়তো বা পাড়ার মোড়ের বাড়ির সেই ভাল লাগা মেয়েটার মতো—বিয়ের পর যে নাকি ভুপালে চলে গিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। কে জানে, মধ্যপ্রদেশের খররোদে আজও তার শরীর জুড়ে বেঁচে আছে কি না বাংলার সেই শ্যামলিমা?

আবার মহাকাব্যের অযোনিসম্ভূতা যাজ্ঞসেনীর দৃপ্ত কৃষ্ণবর্ণ যখন কখনও মল্লিকা সারাভাই, কখনও রূপা গাঙ্গুলিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল চোখের সামনে, এবং শেষমেশ থিতু হল রোববার-এর সকালের দূরদর্শনের সামনে ভক্তিভরে বসবার বৎসরকালের অভ্যেসে—তখন যেন রূপা গাঙ্গুলির গায়ের রংই অজান্তে ঠিক করে দিল, দ্রৌপদী কেমন হবেন। মহাকাব্যের (অনন্ত রহস্যনায়িকা) বাক্সবন্দি হয়ে চিরবন্দিনী হয়ে গেলেন অপামর ভারতবাসীর মনে একজন বিশেষ চিত্রতারকার অবয়ব হয়ে।

সাহিত্যে যে বর্ণনা থাকে অস্পষ্ট, ছায়াছবির পর্দার এসে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়, যে পাঠক নতুন কোনও গল্প উপন্যাস পড়লেও মনে মনে তার কাস্টিং করেন পরিচিত চলচ্চিত্রশিল্পীদের কথা ভেবে। বইয়ের খোলা পাতার সামনে সকলেই তখন একজন চিত্রপরিচালক, নিদেনপক্ষে কাস্টিং ডিরেক্টর।

থিয়েটারের মঞ্চ যে বিমূর্তের আভাস দেয়, বা দর্শকের কল্পনার আলোছায়া নিয়ে খেলা করে, সিনেমা স্পষ্টতই তার বিরোধী। বেশ অনেকটা বয়স অবধি তৃপ্তি মিত্র স্বচ্ছন্দে নন্দিনী করেছেন, তাঁকে চিরযৌবনের প্রতীক হিসেবে মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়নি। অথবা তিজনবাই-এর প্রথম প্রদর্শনী দেখতে যাওয়ার কথা মনে করি। পর্দা খুলে যে মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন, প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল আড়াই ঘণ্টা এঁকে দেখব কি করে, পারব তো? অভিনয় যখন শেষ হল সেদিন থেকে আজ অবধি তিজনবাই আমার দেখা শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের একজন।

কিন্তু সিনেমা সবসময় আলোছায়ার মায়া দিয়েও বাস্তবকে যেহেতু নিয়ে যেতে পারে না বিমূর্ততায়। ক্লোজ আপ-এর প্রকটতায়, বাস্তবানুগ চিত্রণের একনিষ্ঠতার তাড়নায়, তারকারা কেবলমাত্র রূপসজ্জা দিয়েই বদল করেন বাইরের আকৃতি। আদতে তাঁরা সেই উত্তমকুমার, বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আবার মাঝে মাঝে সেই তারকাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিংবা পরিচালকের ক্যামেরায় তাদের প্রকাশভঙ্গি এমনভাবে রঞ্জিত করে দর্শকমন, যে আমরা তারপর শ্রীকান্ত উপন্যাসটা পড়তে গেলে রাজলক্ষ্মী শব্দটা আসামাত্র কেবল সুচিত্রা সেনকেই দেখি, আর সারাজীবনের মতো যেন আর কোনওদিনও 'নষ্টনীড়' পড়তে পারি না চারুলতা-মাধবীর সেই অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতিকে অস্বীকার করে।

কলম থেকে ক্যামেরায় যাতায়াতটা ধীরে ধীরে এমনই এক অদৃশ্য নাগরদোলার মতো, যে কলমে আঁকা একটা চরিত্র ক্যামেরাবন্দি হয়ে আবার কলমের ভাষাকেই আকৃতি দেয়।

সোনার কেল্লা ছবি হওয়ার আগে শারদীয়া 'দেশ'-এ সত্যজিতের illustration গুলো মনে পড়ে? বাক্স রহস্যর লালমোহনবাবু—গোঁফবিহীন মাঙ্কিক্যাপ পরা একটা চেহারা। যে দূরদর্শীরা তখনই মনে মনে ভাবছেন বা চাইছেন ফেলুদাকে নিয়ে ছবি হোক, হয়তো বা তাঁরা ছবি দেখে লালমোহনের চরিত্রে ভাবছেন কোনও এক অভিনেতাকে (আমিই তো ভাবতাম রবি ঘোষ, তিনি স্রষ্টার প্রিয় অভিনেতাও বটে)।

সোনার কেল্লা মুক্তি পেল। আজ পঁচিশ বছর পরেও সব দর্শক একটা ব্যাপারে একমত—যে ফেলুদার বিকল্প হয়তো বা খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু সন্তোষ দত্ত'র থেকে ভাল লালমোহন আর হল না।

নিজের ছবির এই কাস্টিং লেখক সত্যজিৎকেও আচ্ছন্ন করল নিশ্চয়। বা, তিনি বিজ্ঞাপনের

মানুষ—জানেন print আর audio-visual-এ একটা সাযুজ্য থাকলে তবেই brand পোক্ত হয়ে বসে কনজিউমার মানসে। ফলে এবারের 'দেশ'-এর illustration-এ বদলাতে লাগল লালমোহনের প্রতিকৃতি। মাঙ্কি ক্যাপ-এর তলায় চকচকে টাক, কেবল কানের পাশ দু'টিতে চুলের গোছা এবং নাকের তলায় গোঁফ এসে বসে গেল। লেখক বুঝলেন যে এক্ষেত্রে পরিচালকের নির্বাচন তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে—তাঁর নিজের আঁকা ছবি না বদলে তাঁর আর উপায় নেই।

ব্যাপারটা আরও পোক্ত হল যখন ছবির সাফল্যের পর 'সোনার কেল্লা' বইটা আবার পুনর্মুদ্রিত হল। এবার প্রচ্ছদে উঠে এল সিনেমার স্থিরচিত্র। ফেলুদা, তোপসে এবং লালমোহন প্রতিকৃতির ত্রিভুজ এবার নিশ্চিত নির্ধারিত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল জয়সলমির দুর্গের আড়াল থেকে বন্দুক হাতে ফেলুবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চেহারায়। এবং আমরা সিনেমা সাহিত্যের এই 'হাঁসজারু'কে সানন্দে হজম করলাম—সদ্য দেখা সোনার কেল্লার তৃপ্তির আনন্দরসে ডুবিয়ে। ভুলে গেলাম যে এক কেবল স্রষ্টার কল্পনা বা বাসনা নয়—এর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিপুল শক্তিস্রোত, যার নাম 'বাজার'।

'বাজার' ততদিনে জেনে গিয়েছে 'ফেলুদা'র পণ্যীকরণ হয়ে গিয়েছে। অতএব সিনেমা আর সাহিত্যের এই চু-কিতকিতটা এবার খেলা হবে বাজারের নিয়মে।

সম্প্রতি, তখনও ব্যোমকেশ নিয়ে ছবি করার কথা ভাবছি—একটি বইয়ের দোকানে কোনও এক বিশেষ প্রকাশনা সংস্থার কতগুলো ব্যোমকেশ কাহিনির ইংরেজি অনুবাদ বিক্রি হচ্ছে। প্রচ্ছদে ব্যোমকেশবেশী রজিত কাপুরের ছবি।

মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ল জাতীয় টেলিভিশন ধারাবাহিকে ব্যোমকেশ করেছিলেন রজিত কাপুর। অতএব বাঙালি হিসেবে 'আমাদের শরদিন্দু' 'আমাদের সত্যজিতের বানানো চিড়িয়াখানা' এবং 'আমাদের ব্যোমকেশ উত্তমকুমার' এক নিমেষে লজ্জায়, অভিমানে মাথা নিচু করে কুঁকড়ে গেল ভেতরে।

সেই ঝাঁ-চকচকে বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে জানলাম সিনেমা আর সাহিত্যের মধ্যে শিল্পের সই পাতানোটা মিথ্যে। আসলে চাইলে 'বাজার' নামক কর্তাটি এদের চিরসতীন করেও পুষে রাখতে পারে এক অন্দরমহলে।

কলম থেকে ফিলিম। ফিলিম থেকে কলম। এই দুই বউকে পুষে রেখেছে 'বাজার' বলে একটা লোক যার দিকে আঙুল উঠলেই সে পাল্টা দেখিয়ে দেয় অনুরাগী দর্শক আর পাঠকদের।

৮ নভেম্বর, ২০০৯

মনে মনে প্রায় একরকম ঠিক করেই রেখেছিলাম যে, যেহেতু আমি ফিল্মমেকার, এবং পাঠকমাত্রেই আমার কাছ থেকে বিষয় হিসেবে সিনেমা-ই জানতে চান, তাই সিনেমা নিয়ে ফার্স্ট পার্সন লিখব না।

অবশ্য এর উত্তরে অনেকেই বলবেন—তুমি তো বাপু তোমার কত ছবির কথাই লিখেছ এই তিন বছরে। সেটা সিনেমা নিয়ে লেখা নয়? বরং সেটা তো তোমার ছবির পাবলিসিটি-ই একপ্রকার।

এরকম ভাবার স্বাধীনতা পাঠকমাত্রেরই আছে। যদিও আমার তরফ থেকে বিন্দুমাত্র সাফাই না গেয়ে বলবার আছে, যে, আমি আমার ছবি বানানোর অভিজ্ঞতা হিসেবে যা যা লিখেছি সেগুলো আমার জীবনেরই নানারকম নুড়িপাথর। ঠিক যেমনটি আমার পাড়ার পুজো, আমার মাস্টারমশাই, আমার ছেলেবেলা, আমার মা...

আর একটা সত্যি কথা বলি, যখন ছবি বানাই, তখন প্রায় সেটাকেই বিষয় করে ফেললে ঝট করে একটা ফার্স্ট পার্সন-ও লেখা হয়ে যায়, আর টাটকা টাটকা নির্মীয়মাণ ছবিটার স্থিরচিত্র পেলে দপ্তরে অনিন্দ্য, বিপুলদা (গুহ) সবাই খুশি হয়ে যায়। যাক, শিবের গীত একটু বন্ধ থাক। কী বলছিলাম যেন? সিনেমা নিয়ে লেখা...

'হিট লিস্ট' দেখলাম। বাবুদা-র (সন্দীপ রায়) সাম্প্রতিক ছবি।

পথে আসতে-যেতে কোনাকুনি গ্রাফিক্স-এ সাদার ওপর লাল দিয়ে হিট লিস্ট-এর লোগো-টা বেশ কয়েকদিন হল নজর কাড়ছিল।

তারপর একসময়ে দেখলাম 'বিষে নক্তেশ্বর'। মুক্তির দিন।

'ষ'টা যে বানান ভুল নয়, তাই বোঝাতে লাল-এ। তাতে লাল রক্তের সঙ্গে একটা সম্পর্কও থাকে, একটা সহজ (Pun)-এ ছবির জাতটাও বেরোয়।

'চিড়িয়াখানা দেখুন' মনে আছে? 'দেখুন'-এর 'খুন'টুকু লাল রঙে।

বাবুদা-র পরপর বেশ কয়েকটা ছবি শীতকালের জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বোটানিকাল বাগান দেখতে যাওয়ার অভ্যেসে দেখতে গিয়েছি। একটা নতুন দ্রষ্টব্যও চোখে পড়েনি।

পরের বছর আবার গিয়েছি—না কি অভ্যেস, বা 'ফটিকচাঁদ'-এর নির্মাতার কাছ থেকে কোনও লুকনো প্রত্যাশা টেনে নিয়ে গিয়েছে—মনখারাপ নিয়ে ফিরে এসেছি।

'হিট লিস্ট' দেখব জানতাম, একেবারে গোড়াতেই দেখে ফেলব ভাবিনি। প্রথম দিনই দেখা হয়ে গেল। 'প্রিয়া' সিনেমায় বিশেষ এক প্রদর্শনীতে। ছবিটা দশ মিনিট চলে বন্ধ হয়ে গেল কোনও এক যান্ত্রিক গোলযোগে। চালু হল আবার মিনিট দশেক পর। ছবিটা প্রথম ফ্রেম থেকেই থ্রিলার। আর বন্ধ যেখানে হল, সেখানে ছবির একজন সৎমানুষ তার 'দুষ্টুলোক' সহকর্মীদের চক্রান্ত ফাঁস করে দিতে চলেছে। ছবি বন্ধ। মিনিট পনেরো পর আবার ছবি সেখান থেকে শুরু। থ্রিলারের সমস্ত টেনশন দু'মুঠোয় চেপে ধরে বসে থাকা। আঙুল আলগা করলেই যদি ফসকে যায়!

ছবিটা কখন শেষ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। তার মধ্যে প্রেম আছে, প্রতিহিংসা আছে, বিরহ আছে।

মিলন আছে, ভাল মানুষ আছে, দুষ্টু লোক আছে, বয়স্ক ফেলুদা-মার্কা ধৃতিমান আছেন, তাঁর মধ্য-ত্রিশ-অনুচর শাশ্বত আছেন। সকলের কী স্বচ্ছন্দ অভিনয়! কী চমৎকার দৃশ্যরচনা! সহজ সটান, গল্প বলার ভঙ্গি। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর, ঘটনা থেকে ঘটনাক্রম—ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ স্পষ্ট হয়েও কোথাও যেন মানবিকতার জেরার সামনে পড়ে অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ। এবং পুরোটাই পরিচালকের সচেতন অভিপ্রায়ে। বহুদিন পর একটা ছবি দেখলাম, যেটা পরিচালক ঠিক যেভাবে বানাতে চেয়েছেন, সেভাবেই বানিয়েছেন। এবং হল-এ ছবি দেখতে বসে সেই বানানোটাই আমাদের কাছে প্রতি মুহূর্তে সত্যি জীবন্ত।

আমি কিন্তু 'হিট লিস্ট'-এর রিভিউ করতে বসিনি।

বহুদিন পর একটা বাংলা ছবি আবার এত ভাল লাগল। 'অপরাধ'-কে বিষয় করে এমন যে একটা অনাবিল ছবি বানানো যায়, আমি কোনওদিন ভাবিনি। মনে হল, সেটা আপনাদের জানাই।

২৯ নভেম্বর, ২০০৯

২০০৯ শেষ হল মুম্বইয়ের এক চূড়ান্ত বক্স-অফিস হিট দিয়ে। থ্রি ইডিয়ট্স। বিধু বিনোদ চোপড়া প্রযোজিত রাজকুমার হিরানি পরিচালিত এবং আমির খানের শীর্ষ ভূমিকায় অভিনয়-খচিত এই ছবিটি এক বিপুল সাফল্যের ছায়া ফেলেছে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। যুবামননের প্রতিটি সূক্ষ্ম অনুরণন এই ছবি জুড়ে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে মুগ্ধ করে চলেছে দর্শকদের।

আমি ছবিটি দেখেছি। তার গুণাগুণ, উৎকর্ষ-দুর্বলতা (আমার মতে অন্তত যা যা মনে হয়েছে) আলোচনার জন্য আজকের 'ফার্স্ট পার্সন' নয়।

সাম্প্রতিক কালে ইংরেজি উপন্যাস লিখে যুবজগতে কিছুটা নাড়াচাড়া ফেলেছেন যে যুবক গদ্যকার, চেতন ভগত—থ্রি ইডিয়ট্স ছবিটা 'নাকি' আদতে তাঁর 'ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান' আশ্রিত। পাঠকরা একটু লক্ষ করবেন আগের বাক্যের 'নাকি' শব্দটা কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বেশি জরুরি।

ছবি মুক্তি পাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম—খবরের কাগজের পাতা জুড়ে ভীষণ বিতর্ক। চেতন ভগত দাবি করছেন মূল উপন্যাসটি এবং সেহেতু, প্রধান কাহিনিসূত্রটি তাঁর কল্পনাপ্রসূত; ছবিতে কাহিনিকার হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। প্রযোজকরা তা না করে কাহিনিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন রাজকুমার হিরানি ও অভিজাত যোশিকে। প্রযোজকদের পক্ষ থেকে পাল্টা যুক্তি, যে-ছবিটি মূল সাহিত্যকর্মের একটি ম্লান প্রচ্ছায়া মাত্র, ফলে কাহিনি যেহেতু উপন্যাস থেকে অনেক দূর সরে এসেছে—এই নবনির্মিত কাহিনির দাবিদার যথার্থভাবেই রাজকুমার হিরানি ও অভিজাত যোশি। চেতন ভগতের নাম ছবির অন্তিম চরিত্র-লিপিতে দেখা গিয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের নামও—এই ছবির 'ক্ষীণ অনুপ্রেরণা' হিসেবে।

তারপর লেখক আলাদা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, প্রযোজক-পরিচালক উভয়েই অনড় থেকেছেন নিজেদের অবস্থানে। চুক্তিপত্র, পারিশ্রমিক সব কিছু দিয়ে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে কাগজে-কলমে যে—চেতন ভগত 'থ্রি ইডিয়ট্স' যতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছেন পর্দায়, কেবল ততটুকুই তাঁর প্রাপ্য। তার বাড়তিটুকুর জন্য পারিশ্রমিক তো আছেই।

বস্তুত ছবিটি উপন্যাসটি থেকে অনেকটা আলাদা—প্লটিং-এর দিক থেকে সম্পূর্ণ একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে ছবির কাহিনি বর্ণনায় যা মূল উপন্যাসে অনুপস্থিত ছিল। অতএব ঔপন্যাসিকের অবদান এক্ষেত্রে গৌণ। পরিচালক, প্রযোজক স্বচ্ছন্দে ছবিটিকে নিজেদের কাহিনি রচনা বলে দাবি করতে পারেন।

আমরা 'নষ্টনীড়' পড়েছি। আমরা চারুলতা দেখেছি। আমরা 'অপরাজিত' পড়েছি এবং দেখেছি। দু'টি মহৎ চলচ্চিত্রের কাহিনি রচয়িতারাও সমান মহৎ ছিলেন। একজন বিভূতিভূষণ, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এবং আমরা এ-ও দেখেছি ছবিগুলি সিনেমার নিরিখে প্রায় প্রথম শ্রেণির Masterpiece হলেও, কোনও অর্থেই মূল সাহিত্যকর্মের সেলুলয়েড জেরক্স নয়।

আমি নিজে রবীন্দ্র উপন্যাস নিয়ে কাজ করেছি। যতদিন রবীন্দ্রনাথ কপিরাইট-বন্দি ছিলেন বিশ্বভারতীর কড়া প্রহরার বাইরে তাঁকে নিয়ে কোনওরকম মুক্তির কথা ভাবাটাই প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশ্বভারতী সাধারণত এই 'মুক্তি'গুলিকে 'প্রক্ষেপণ' হিসেবে দেখতেন।

তারপরেও 'চারুলতা' তৈরি হয়েছে। যথেষ্ট মৌলিক প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কাহিনিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নামই গিয়েছে। সত্যজিৎ শিল্পীসুলভ বিনম্রতায় কেবল চিত্রনাট্যকার-এর ভূমিকাটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন। পরে যখন তাঁর এই মৌলিক উপাদানগুলি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তিনি চিত্রনাট্যকারের জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। কখনও লেখকের আসনটি কায়েম করেননি।

সব সাহিত্যকর্মই সম্পূর্ণভাবে সিনেমা অনুকূল নয়। সিনেমা অনুযায়ী, বা চলচ্চিত্রকারের চাহিদার সামনে সব সাহিত্যকারই মনে করেছেন যে তাঁর মূল রচনার কিছু না কিছু অঙ্গহানি

ঘটেছে—কিন্তু তা হলেও তিনি কাহিনির মূল স্রষ্টা। এ নিয়ে কোনও বিতর্ক ওঠেনি।

'অপরাজিত' থেকে লীলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে কাহিনিটি আর বিভূতিভূষণের রইল না এমন দাবি সত্যজিৎকে তো কখনও করতে শুনিনি। এমনকী, 'দেবী' ছবির প্রথমে আমরা দেখতে পাই আদত কাহিনিকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর এই উদ্ধৃতি যে, এই কাহিনির মূল আখ্যানভাগ রবীন্দ্রঠাকুর মহাশয় তাঁকে দান করেছিলেন।

আমি কোনও ক্ষেত্রেই সত্যজিতের বিশেষ বদান্যতার কথা বলছি না। সিনেমার মূল ethics-এর কথা বলছি। সিনেমা একটি মিশ্র এবং জটিল মাধ্যম। সেখানে এই জটিলতার বিবর্তনগুলি বহু উপাদানের সমষ্টি। তার মধ্যে সিনেমার গোড়ার দিকে নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট ভিত্তিসোপান ছিল সাহিত্য।

ফলে 'ক্ষীণ' বা 'প্রবল' যাই হোক—কাহিনিকার একজনই। অন্যান্যরা সেই কাহিনির নানা পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, নিজেদের শিল্পের দাবিতে। কিন্তু তাঁরা কাহিনিকার হয়ে উঠতে পারেন না।

পরিচালক রাজু হিরানিকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। তিনি যথেষ্ট সৃষ্টিশীল, সংবেদনশীল মনের মানুষ। এই অদ্ভুত ব্যবহার তাঁর কাছে আশা করিনি আমি।

তবে কি মুম্বই সিনেমা ক্রমশ সাহিত্যবর্জিত হতে হতে, নানা প্রযোজকের অফিসে-অফিসে ঘুরে বেড়ানো কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকারের নিয়ত সংস্পর্শের কারণে সাহিত্যকর্মকে শ্রদ্ধা করতে ভুলে গিয়েছে?

না কি কেবল পিরিয়ড ফিল্ম যেহেতু এই নবীন চিত্রকাহিনিকারদের আয়ত্তাধীন নয়, সেহেতু এখনও 'দেবদাস', 'পরিণীতা'-য় তাঁরা শরৎবাবুর নাম দেখতে চান? পরিচালক বিধুবিনোদ চোপড়া বাংলা সাহিত্যের সেই উজ্জ্বল নামটিকে শেষের চরিত্রলিপিতে ঠেলে যে দেন না সেটা কি নামটার প্রতি শ্রদ্ধায়? না, এই নামটা থাকলে অন্তত Bengal Circuit-এ ছবিটি ব্যবসা করতে পারে এই আশায়?

১৭ জানুয়ারি, ২০১০

আমরা, 'রোববার' টিম-এর অনেকে দল বেঁধে দিল্লি গিয়েছিলাম গত সপ্তাহে। জাতীয় পুরস্কার নিতে।

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী-র ছবি, সেটা শ্রেষ্ঠ সিনেমার সম্মান পেয়েছে এবার; সেই ছবির গীতিকার জুটি অনিন্দ্য-চন্দ্রিল এ বছরের সেরা গীতিকার। আর সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার নিতে

গিয়েছিলাম আমি—'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এর জন্য। তা ছাড়া টোনি (অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী), 'অন্তহীন'-এর যুগ্ম প্রযোজক ইন্দ্রাণী (ও আবার টোনি-র স্ত্রী-ও বটে) এবং জিৎ ব্যানার্জি। অভীক, আমার পুরনো বন্ধু আর আমার পনেরোটা ছবির চিত্রগ্রাহক, সে-ও শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার পেল 'অন্তহীন'-এর জন্য। বুম্বা-ও (প্রসেনজিৎ) গিয়েছিল বিশেষ অতিথি হিসেবে—'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এর জন্য; যেমন রাহুল বোসও নিমন্ত্রিত ছিল 'অন্তহীন'-এর অতিথি হিসেবে।

সব মিলিয়ে বেশ জম্পেশ বঙ্গ-সমাবেশ। খোদ রাজধানীর বুকে।

অচেনা পরিবেশে গিয়ে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে যেমন একটা আলাদা বন্ধুত্ব হয়— তেমনটাই লাগছিল অনেকটা।

অনিন্দ্য-চন্দ্রিল। তাদের গিন্নিরা—মধুজা ও সঞ্চারী। সবাই মিলে একটা আধা ছুটি, আধা কাজ, তার ওপর খোদ রাষ্ট্রপতির নেমন্তন্ন!

সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে জাতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের এক ব্যারাম হয়েছে। বিরাট একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তোলে পুরস্কার-প্রাপকদের। সে-হোটেলের এমন ভাড়া যে, ঘরে একগ্লাস জল গড়িয়ে খেতেও ভয় করে— পাছে তার জন্য একটা লম্বাচওড়া বিল ধরিয়ে দেয়।

সরকারের তরফ থেকে রাহাখরচের একটা ব্যবস্থা আছে বটে, তবে দিল্লি শহরটার তুলনায় তা যৎসামান্য। সেই শহরে একটা সামান্য খাবারের দোকানে, যে কোনও সাধারণ খাবারও—বেশ অগ্নিমূল্য। ওই সামান্য টাকায় দু'দিন, দু'টো রাত চালানো মুশকিল।

আর, আগে যেমন হত—গোটা অনুষ্ঠানটার একটা রিহার্সাল হত অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলা—'বিজ্ঞানভবন' মঞ্চেই। যাতে সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানটা, যেটা নাকি দূরদর্শন-এ দেখানো হবে, সেটার মধ্যে কোনও ভুলচুক না-থাকে।

গত বছর থেকেই দেখছি, এই পুরো রিহার্সাল-এর ব্যাপারটা অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধেবেলা হয়। এবং কর্তৃপক্ষ যেহেতু চান প্রত্যেকেই রিহার্সালে উপস্থিত থাকুন—সবাইকে দু'টো সন্ধের জন্য দিল্লিতে থাকতে হয়। তার মধ্যে কেবলমাত্র ব্রেকফাস্ট-টুকু ছাড়া এই বাকি দু'দিনের পুরো খরচটাই পুরস্কার-প্রাপকের নিজের।

কেরল-এর প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যে ছেলেটি তথ্যচিত্র বিভাগে কোনও বিশেষ পুরস্কার পাচ্ছে— সে কী করে পাঁচতারা হোটেলে থেকে, দু'দিন নিজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তারপর পুরস্কার নিয়ে ফেরার বিড়ম্বনাটুকু সামলাবে। সেদিকে কর্তৃপক্ষ হয় তেমন মনোযোগী নন, নতুবা আদৌ ভেবে দেখেননি। পাঁচতারা হোটেলে রাখা, আর তিনশো টাকা রাহাখরচের প্রবল অসাম্যটুকু তাঁদের চোখে তো ধরা না-পড়ার কথা নয়!

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তার কৌলীন্য হারিয়েছে, এ-কথা বেশ ক'বছর ধরেই বহুলচর্চিত।

জাতীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটিও যে সঙ্গে-সঙ্গে বদলাচ্ছে, সেটা নিয়ে তেমন কথাবার্তা

অবশ্য এখনও শুনিনি।

'বিজ্ঞানভবন'-এর এই অনুষ্ঠানটায় আমি অংশগ্রহণ করলাম এই নিয়ে বারোবার। বরাবরই মনে হত, এটা সারা ভারত-জুড়ে আমার যে সিনেমাতুতো আত্মীয়রা ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের সঙ্গে একটি বার্ষিক রি-ইউনিয়ন। সেখানে বলিউড-এর দাপট ততটা প্রবল ছিল না। ফলে আঞ্চলিক ছবি-করিয়েরা নিজেদের সংকুচিত, ব্রাত্য মনে করতেন না।

গত বছর থেকে হাওয়াটা বেশ পাল্টেছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে গান গাওয়া ঢুকেছে, বিনোদিনী-বিরতি হিসেবে।

চিরকাল অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতেন দূরদর্শন-এর সংবাদ-পাঠিকারা। এ বছর দেখলাম অভিনেতা আশুতোষ রানা এবং অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে সঞ্চালনার কাজটুকু করছেন।

কর্তৃপক্ষ-ও যেন নীরবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, মুম্বইয়ের ফিল্মি অনুষ্ঠানের ধরনটাই আমাদের রোলমডেল।

প্রিয়ংকা চোপড়া, অর্জুন রামপাল, কঙ্গনা রানাওয়াত, ফারহান আখতারের পাশে এবার বাকি ভারতবর্ষ ম্লান। কোথায় কেরল-এর গ্রামের ছেলে, কোথায়-বা উত্তর-পূর্ব ভারতের ছবি-করিয়ে!

এমনকী যখন জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শেষে হচ্ছে, বিজ্ঞানমঞ্চ-এর বড়পর্দায় তখন রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী আর এই মহাতারকাদেরই ক্লোজ আপ।

বাকিরা কেবল ভিড়।

সত্যমেব জয়তে।

২৮ মার্চ, ২০১০

আমার দ্বিতীয় অভিনয়ের পর্ব শুরু হল।

প্রথম অভিনয় নিয়ে ফার্স্ট পার্সন-এ কিছু লিখিনি। লিখতে ইচ্ছে করত মাঝে-মাঝে। নিজেকে যখন চরম অসহায়, অক্ষম মনে হত—তখনই বারবার ইচ্ছে করেছে এই হতাশা আমার রোববার-এর 'ফার্স্ট পার্সন'-বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

কিন্তু ছাপার অক্ষরে নিজের গ্লানি ভাগ করে নেওয়ার একটা অন্য বিপদ আছে।

ঘটনাচক্রে, আমার অভিনয়-জীবনের প্রথম পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলিও সেই পাঠক-বন্ধু-গোষ্ঠীর একজন। তাঁর নিশ্চয়ই কোনও এক রোববার সকালবেলা 'ফার্স্ট পার্সন'-এর পাতায় মুদ্রিত হরফে এটা পড়ে জানতে ভাল লাগত না যে, তাঁর ছবির সাদর-নির্বাচিত প্রধান অভিনয়শিল্পী আসলে ভিতরে ভিতরে এক গভীর অনিশ্চয়তা বোধে ভুগছে।

তারপর একসময় দেখলাম, এই অনিশ্চয়তা-ই অভিনেতার এক প্রচণ্ড শক্তি।

আমাদের জীবন যেমন অনিশ্চিত, আমাদের প্রতিটা দিন চলে যেমন এক সুপরিকল্পিত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে, যেখানে যে কোনও মুহূর্তে আমাদের চেনা প্রতিকৃতির সবটুকু বদলে গিয়ে নিমেষে আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এক অন্য আমি, যে-আমিকে আমি কখনও দেখিনি, বা দেখলেও সেভাবে যত্ন করে আপ্যায়ন করিনি নিজের মধ্যে; অভিনয়ের ক্ষেত্রে তো তা হওয়ার নয়।

সেখানে একটা কাহিনি-স্রোত আছে, যার নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা প্রায় পুরোটাই আগে থেকে জানা। যেখানে সব চরিত্র অনুপুঙ্খ জানে তার সংলাপ, প্রতি-সংলাপ, প্রবেশ-প্রস্থান—সব। ফলে, অনেক সময়ই চরিত্ররা এমন একটা বিশেষ জানার জায়গা থেকে অভিনয় করেন, যাতে প্রায় তাঁদের মনে হয়—দৈবজ্ঞ। তার নিজের সংলাপখণ্ড, তার প্রত্যুত্তরে কী বলতে পারেন সহ-অভিনেতা সবই তার জানা—পুরোটাই বলে দিয়েছে চিত্রনাট্য। নানা রিহার্সাল শিখিয়ে দিয়েছে তাকে নিশ্চিত করে। এখানে অনিশ্চয়তা মানে একটু থমকে-থমকে বলা হয়তো, বা সংলাপের গতিটাকে সামান্য আলগা করে নেওয়া।

কিন্তু যতটাই প্রাঞ্জল করে দিক না চিত্রনাট্য-বর্ণনা, কিংবা পরিচালকের নির্দেশ—অভিনেতা যে সংলাপ বলবেন বা কীভাবে শুনবেন প্রতি-অভিনেতার প্রত্যুত্তর, সে-ও তো এই দু'ঘণ্টার কালখণ্ডের মধ্যেই ঘটা এই অনিশ্চিত জীবনেরই গল্প। ছবি শেষের দিকে যত এগোবে, তত ধীরে ধীরে কাটবে অনিশ্চিতি, কিংবা সারা ছবি জুড়ে রয়েই যাবে কোনও অলীক কুয়াশার আস্তরণের মতো।

সেখানে প্রতিটি অভিনেতার প্রতিটি বাক্য বা সহ-অভিনেতার প্রতি-বাক্য, পুরোটাই নিজেদের মধ্যে বহুচর্চিত হয়েও পর্দার জন্য তো সেই প্রথমবারের মতোই অনিশ্চিত। সেই মুহূর্তে অভিনেতাকে বোধহয় ক্ষণেকের জন্য ভুলে যেতে হবে, চিত্রনাট্য অর্জিত ভবিষ্যৎদ্রষ্টার জ্ঞান, বা পরিচালক নির্দেশিত প্রতিটি অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম-শক্তি। মনে যদিও বা রাখতে হয়, তাকে এমভাবে মিশিয়ে দিতে হবে অনাঘ্রাত অনিশ্চয়তার সঙ্গে, যেন পর্দায় মনে হয়, অভিনেতা জীবনে প্রথম এই সংলাপটি বললেন, বা শুনলেন।

নিজে পরিচালক বলে অনেক সময় বোঝা যায় না। যেমন বিধাতাপুরুষ; যিনি নির্মাণ করে রাখেন আমাদের জীবনের সমস্ত গতিপথ, তিনিও হয়তো মাঝে-মাঝে বিস্মৃত হন যে, কেন তাঁর নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করতে গিয়েও আমাদের এত সংকুচিত অনিশ্চয়তা বোধ? পরিচালক হিসেবে আমারও মনে হত—কেন? এই তো বলে দিলাম, দেখিয়ে দিলাম। তারপরেও কেন? অভিনয় করতে গিয়ে এতদিন পর তার উত্তরটা পেলাম। আসলে, নিজেকে যে শিল্পের সফল অংশীদার মনে করতে শিখেছি এতদিন, তার কতখানি যে আমার অজানা—তাকে আবিষ্কার করার মধ্যেও

এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ আছে। দ্বিতীয় ছবিটা শেষ হওয়ার পর আরও অনেক কিছু হয়তো শিখব অভিনেতা হিসেবেই। তা নিয়ে গল্প করব আবার আপনাদের সঙ্গে কোনও একদিন।

তার মানে, যদি কোনও পাঠক ভাবেন যে, অচিরেই 'রোববার' একটা অভিনয়-সংখ্যা বার করবে—সেটার কোনও দায়িত্ব আমি নিচ্ছি না। যদি সত্যিই আপনাদের ইচ্ছে হয়, ইচ্ছেটা আমি সম্পাদক অনিন্দ্য চাটুজ্যে মশাইকে জানিয়ে দেব'খন।

এই অনিশ্চয়তার অভিযানে আপনাদের প্রভূত শুভেচ্ছা কাম্য।

৪ এপ্রিল, ২০১০

লাল নীল ডোরাকাটা পাড়ের খাম। এদেশ থেকে ওদেশ। ওদেশ থেকে এদেশ। খামের ভিতর ছটফট করে দুই প্রাণভোমরা। খাম খুললেই এ ওর কাছে যেতে চায়। ও উড়ে এসে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে এর মুখে। সেই খামের পর খাম সাজিয়ে তৈরি হয় এক স্বপ্নের বাসরঘর—যার পুবের জানলা দিয়ে নিরন্তর বয় জাপানের প্রথম সূর্যের আলো আর যার পশ্চিমের জানলার কাছে ছলাৎছলাৎ করে মাতলার জল।

আর আছে দুই মানব-মানবী। যারা তাদের সমস্ত আকুতি, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নগুলোকে ওই খামের ভিতর ভরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চুপ অপেক্ষায় যোজন-যোজন দূরত্বে বসে একাকী কাটিয়ে দেয় সতেরোটা বছর। কয়েকটি অচেনা হস্তাক্ষরের অঙ্গীকারের সামনে নতজানু হয়ে। দুই একাকী মানুষের একসঙ্গে থাকার ইচ্ছেটুকুকে পবিত্র বিবাহমন্ত্র মনে করে নিয়ে।

রাত, দিন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত এসে ক্রমশ পাল্টায় বাইরের পৃথিবী। কেবল খামের ভিতর থেকে নিরন্তর বেরিয়ে আসে নিষ্কলুষ প্রেম, অকপট স্বীকারোক্তি, এবং অনাবিল অভিমানের সুঘ্রাণ।

সুন্দরবন অঞ্চলের ইস্কুলমাস্টার অঙ্কশিক্ষক স্নেহময় আর জাপানি মেয়ে মিয়াগী 'ভাব করে' বিয়ে করেছিল। এ-কথা আমাদের নয়—বাপ-মা মরা স্নেহময়ের একমাত্র স্নেহময়ী ধাত্রী স্নেহময়ের বিধবা মাসিও যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন এই অদ্ভুত 'ভাব করা' বিয়েতে।

পাত্র-পাত্রীর চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়নি কখনও। অর্ধপৃথিবী দূরত্বকে অগ্রাহ্য করে, এক দুর্বল দো-ভাষী ইংরেজি ভাষাকে অবলম্বন করে দক্ষিণবঙ্গের এক স্কুলশিক্ষক কোন বাল্যকালে চিঠি-বন্ধু করেছিল জাপানভাষী এক গৌরী-কন্যাকে। সেই বাল্যের বন্ধুত্বে একসময় এল বর্ষাকালের ভরা মাতলানদীর মতো টলোমলো আবেগ। সে উচ্ছলতা থিতু হল কেবলমাত্র বিবাহে। চিঠি লিখে বিয়েতে। যৌতুক হিসেবে কন্যা পাঠিয়েছিল পাত্রকে একটি আংটি, আর পাত্র পাঠিয়েছিল নববধূকে শাঁখা সিঁদুর আর বেতের চুপড়িতে একগুচ্ছ চাঁপা ফুল।

পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছেন যে আমি আমাদের শহরে, এই বাংলায়, ভারতের বুকে সদ্যসৃজিত নবীনতম রূপকথাটির কথা বলছি। সিনেমার পর্দায় যার নাম 'দ্য জাপানিজ ওয়াইফ'। এই নতুন রূপকথার জাল বুনতে শুরু করেছিলেন লেখক কুণাল বসু। চিত্রনাট্যকার পরিচালক অপর্ণা সেন সেই জালের প্রতিটি ফোকর দিয়ে ঢেলে দিয়েছেন অনর্গল ভালবাসা এবং অফুরন্ত স্বপ্ন।

কোনও ছবি খুব ভাল হলে তাকে 'কবিতা' বলার একটা রেওয়াজ আছে। 'দ্য জাপানিজ ওয়াইফ'-এর প্রথম প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণপত্রেও দেখলাম A Love poem by Aparna Sen। ছবিটা দেখার পর সেটিকে বর্ণনা করার কাছাকাছি কোনও শব্দ যদি আমাকে খুঁজতে হয় আমি বলব—স্বপ্ন।

যে স্বপ্ন নির্ভার, কোমল এক মায়াময় পৃথিবী থেকে নেমে আসে মানবমনের কল্পনার কোষ বেয়ে, অথচ যার ভিত্তি প্রোথিত হয়েছে দৈনন্দিনের আবহমান পুরাণে।

স্নেহময় এবং মিয়াগীর তীব্র আকুতি আজকের অনেক নির্জন মনের ছবি। যে মনগুলোকে আমরা প্রতিনিয়ত খুঁজে পাই ইন্টারনেট-এর চ্যাট রুম-এ বা ফেস বুক-এর বন্ধু নির্বাচনে। প্রেম মানেই প্রাচীন নয়, সরলতা মানেই অপাংক্তেয় নয়—বা নিষ্কলুষতা কেবলমাত্র বাস করে না কলুষ-অস্পৃষ্ট অতীতে; আজকের সমকালীন পৃথিবীও যে ভালবাসতে পারে, স্বপ্ন দেখতে পারে, 'দ্য জাপানিজ ওয়াইফ' তারই একটি বড় মূল্যবান চিত্রগাথা। স্বপ্নকে বারবার সত্যি করে কাছাকাছি এনেও তাকে স্পর্শাতীত স্বপ্ন হয়ে থাকার পবিত্র অনুমতি বড় বেশি কেউ দিতে পারে না আজকের সময়। অপর্ণা সেন তাঁর সাম্প্রতিক ছবিতে সেই স্বপ্নসৃজন করলেন কী জাদুকরী দক্ষতা এবং জীবনের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে! দুঃস্বপ্নের পৃথিবীর এই নতুন করে স্বপ্ন দেখবার এবং দেখাবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বারবার করে নতমস্তক হতে হয়। সেই সঙ্গে উচ্চশিরও হই এ-কথা ভেবে যে, আমরা যারা সিনেমার ছাত্র, তারা নতুন করে আবার টের পাই আমাদের মাধ্যমের প্রবল শক্তির আভাস।

কুণাল বসুর গল্পের মধ্যে নিহিত ছিল এক প্রণয়জ লোককথার সারল্য, যার মূল আবেদনটুকুই এক সম্পূর্ণ স্বপ্নিল সম্পর্কের আখ্যান। এই রূপকথার আবাস্তবতা সিনেমায় এল বাস্তবের অনেকগুলো পরত বেয়ে বেয়ে—তখন বাস্তব আর অবাস্তব মিলেমিশে সৃষ্টি হল এমন এক মনোগ্রাহী সত্যের কথা, যার সঙ্গে বাস্তবের যোগ না-থাকলেও কিছু এসে যায় না। আসলে সত্যের মধ্যে যে চিরন্তনতা আছে, তা যে সবসময়েই বাস্তবের থেকে অনেক মহান। এই মহার্ঘ উচ্চারণটুকু করার সময় হয়ে গিয়েছিল বহুদিন। আমাদের এই তৃষিত প্রতীক্ষাকে আকণ্ঠ নির্বাপিত করল 'দ্য জাপানিজ ওয়াইফ'।

'ফাস্ট পার্সন' কোনও চিত্র সমালোচনার পাতা নয়। আমার নিজস্ব ভাবের, অনুভূতির

বিচরণক্ষেত্র। বহুদিন পর একটা ছবি আমাকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিল যে, আপনাদের সঙ্গে সেটা ভাগ করে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

রূপকথার জগতে ঢুকতে যাঁরা ভালবাসেন, সেইসব আজন্ম শৈশবপিপাসু পাঠকদের জন্য আমাদের শহরে এখনও অপেক্ষা করছে এক আশ্চর্য রূপকথা।

টিম বার্টন-এর 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' নয়। বাংলা ছবি 'দ্য জাপানিজ ওয়াইফ'।

১৮ এপ্রিল, ২০১০

কেবল পনেরো মিনিট দেরি হয়েছিল আমার।

সবে কোনও একটা শারদীয়া সংখ্যায় সুনীলদার উপন্যাস 'মনের মানুষ' পড়া শেষ করেছি। তখনও একটা ঘোরের মধ্যে। প্রায় যেন অজান্তেই সুনীলদার বাড়ির নম্বর ডায়াল করে ফেললাম। ফোন ধরলেন স্বাতীদি,

—সুনীল তো একটু ঘুমোচ্ছে। তুমি কি একটু পরে করবে? এই ধরো, সাড়ে চারটের নাগাদ?

আমি বসে আছি, কোলের ওপর আশ্বিনের রোদ জড়ো করে জানলার দিকে চেয়ে। সে-দিন পঞ্চমী বা ষষ্ঠী, দূরের কোনও প্যান্ডেল থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। আর আমি প্রহর গুনছি।

চারটে বাজল, সোয়া চারটে, সাড়ে চারটে।

ভাবলাম,

—আহা রে! হয়তো ঘুমোচ্ছেন মানুষটা। স্বাতীদি সাড়ে চারটে বলেছেন বলে সাড়ে চারটেতেই তুলে দেব? আরও কিছুক্ষণ নয় অপেক্ষা করি।

পাঁচটার সময় ফোনটা করলাম। স্বাতীদিই ধরলেন।

—হ্যাঁ, সুনীলকে দিচ্ছি ধরো।

সুনীলদা ফোনে এলেন। আমি তো শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত এবং শিশুর মতোই আবদার নিয়ে বললাম,

—সুনীলদা, কি অপূর্ব লিখেছ তুমি উপন্যাসটা। এটা তুমি আর কাউকে দিও না—এটা আমি ছবি করব।

আমার কোনও প্রযোজক নেই, মাথায় লালন করার মতো কোনও শিল্পী নেই, তবু মনে হয়েছিল এরকম বিষয় নিয়ে, এই পটভূমির বিশাল জটিলতায় তো আমি কোনও কাজ করিনি। এটা আমার জন্য একেবারে নতুন হবে।

সুনীলদা স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন হাসিটি হেসে বললেন,

—এমা! এই তো একটু আগে মিনিট পনেরো হবে—গৌতম ফোন করে এটা চেয়ে নিয়েছে। ওর বোধহয় কোনও পরিকল্পনা আছে।

স্বাভাবিকভাবেই বিষণ্ণ হল মন। গৌতমদার ওপর একটু হিংসেও হল স্বভাবতই। আবার মনে হল—সত্যিই তো! আমি আমার নতুন নিরীক্ষার জন্য যে নবপ্রান্তর আবিষ্কার করতে চাইছিলাম, সেটা তো গৌতমদার অনায়াস, স্বতঃস্ফূর্ত চারণভূমি। তা হলে 'মনের মানুষ' গৌতমদারই প্রাপ্য।

তারপর, তিনটে পুজো কেটে গিয়েছে। তারপর আরও দু'টো মাস। গত সপ্তাহের গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব সত্যিই প্রমাণ করে দিল সুনীলদার 'মনের মানুষ'-এর আসল দাবিদার গৌতমদাই। লালন সম্পর্কে কমবেশি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আজ এই ধর্মবিদ্বেষের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে মানবধর্মের এই নীরব উপাসনা আর যৌনাশ্রমের এক নিরুচ্চার উল্লাস যে বিদেশি বিচারকদের কাছেও আমাদের সনাতন ভারতবর্ষকে পৌঁছে দেয়, তার কৃতিত্ব ভাবলে 'মনের মানুষ' আর নিছক সিনেমা থাকে না।

আর, লালন অজান্তেই হয়ে যান চিরন্তন ভারতের সংস্কৃতি-দূত।

সাবাস গৌতমদা। সাবাস বুম্বা।

১২ ডিসেম্বর, ২০১০
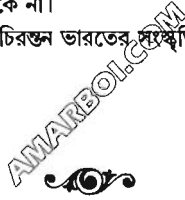
পুতুল খেলার ইতিকথা

কৌশিক (গাঙ্গুলি) এসেছিল ওর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'জ্যাকপট' নিয়ে কথা বলতে। ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। 'জ্যাকপট' নিয়ে কথা বলতে-বলতেই বোঝা গেল কৌশিক অন্য কথা বলার জন্য ভিতরে-ভিতরে উসখুস। তারপর একসময়ে পেড়েই ফেলল কথাটা।

কথাটার সারবস্তু কী, আজ আর নতুন করে বলছি না। এই দু'বছরে অনেকেই সেটা জেনে গিয়েছেন—বস্তুত আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সেই দু'টো ফেব্রুয়ারি মাসের আগের কথোপকথনের ফলাফল আপনাদের কাছে শিগগির-ই পৌঁছে যাবে নানা রুপোলি পর্দায়।

বহু বছর আগে কৌশিক একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল-এর জন্য একটা টেলিফিল্ম করেছিল—'উষ্ণতার জন্য'। সেখানে ছিল এক মহিলা-দম্পতির গল্প। এবং সেখানে ছিলেন চপল ভাদুড়ি, এক কাল্পনিক চরিত্র সারদসুন্দর নামে।

কৌশিক সেই গল্পটা পাল্টে এক পুরুষ-দম্পতির কাহিনি বানিয়েছে—এবং চপল ভাদুড়িও থাকছেন, তবে স্বনামে।

আমি বহু বছর, আমার বহু ছবিতে, আমার বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দিয়ে অভিনয় করে এসেছি—যদি কৌশিককে 'হ্যাঁ' বলি তা হলে যেন আমার নানা শিল্পীকে বকুনি দেওয়ার সেই দিনগুলো অলক্ষ্যে ফিরে আসবে, অদৃশ্যে অতগুলো অভিনেতা-অভিনেত্রী কখন যেন কোমরে হাত দিয়ে এসে দাঁড়াবে মজা দেখতে, যে, আমি পরিচালকের কাছে কেমন বকুনিটা না খাই।

একটু ইতস্ততভাব বা দোনামনা ছিল না, বলব না—তবু কৌশিকের গল্পের চরিত্রটা এত লোভনীয় ছিল, বা সত্যি কথা বলাই ভাল, আমার জন্য খুব একটা কঠিন মনে হল না।

কৌশিক যেন আমার স্বস্তিটা কতকটা পড়ে নিয়েই দ্বিতীয় প্রশ্নটা করল—ঋতুদা, তুমি তোমার শহুরেপনাটা একটু কমাতে পারবে?

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। এতক্ষণ যা শুনলাম, তাতে তো একজন তথ্যচিত্র-নির্মাতার চরিত্র, সে দিল্লিবাসী, আধুনিক—তার তো শহুরে হওয়ারই কথা।

এর মধ্যে আবার শহুরেপনা ঝেড়ে ফেলার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

কৌশিক নিজেই কতকটা খোলসা করল—তা হলে চপলদার যৌবনের অংশগুলোও তোমায় দিয়ে করাব, ভাবছি। অতুলনীয় চ্যালেঞ্জ নিঃসন্দেহে। অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব। কোনও নবাগত অভিনেতা সুযোগ পান একই ছবিতে দু'-দু'টো চরিত্র জুড়ে বিস্তার করতে? আমতা-আমতা করে বললাম,

—চপলদা তো শহুরে মানুষ। তুই কি সাবেকি সময়টার কথা বলছিস? আধুনিকতাটা কম না শহুরেপনা? একটু বুঝিয়ে বল। কৌশিক গভীর আশ্বাস দিয়ে বলল,

—তোমার একটা শহুরে সফিস্টিকেশন আছে, সেইটার কথা বলছিলাম।

আমি বললাম,

—ভাবিস না। ওটা পুরোপুরি এক্সটার্নাল। ঝেড়ে ফেলতে দু'-মিনিটও লাগবে না।

স্থির হয়ে গেল আমি দু'টো চরিত্রই করছি। তার মধ্যে একটা কৌশিকের মানসসৃষ্টি—দিল্লিবাসী ফিল্মমেকার অভিরূপ সেন, যে একটা তথ্যচিত্র বানাতে এসেছে কলকাতায় একসময়ের বিখ্যাত যাত্রা-নায়িকা চপলরানি ওরফে চপল ভাদুড়ির ওপর। অন্য চরিত্রটি খোদ চপলরানি-র যৌবনবেলা।

এখন, দু'-বছর পর, ভাবতে অবাক লাগে যে, যেখানে সমস্ত রুপোলি স্ক্রিন প্রায় দু'টি মহৎ জীবনের চলচ্চিত্রায়ণে অধিকৃত—লালন ফকির আর সূর্য সেন—তারই কোনও এক ফাঁকে আমার প্রথম পর্দাবতরণও এক জীবনী-আলেখ্য নিয়ে। এক নিন্দিত, অবহেলিত, আবার করতালি-নন্দিত এক অদ্ভুত জীবনের হাত ধরে।

দুই

কৌশিক বাড়ি চলে গেল। তারপর অনেক ভেবেছিলাম যে, কেন রাজি হলাম হঠাৎই? চ্যালেঞ্জিং? দু'টো চরিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে? না কি, নারীসুলভ দুই পুরুষের চরিত্র আমি অনায়াসে অভিনয় দিয়ে করে দেব এই ভাবনা থেকে? না, বহুদিনের কোনও সুপ্ত অভিনয়ের আত্মপ্রকাশের প্রলোভনে? পরে ভেবে দেখেছি, কোনওটাই না।

তেমন হলে, নিজেকে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের ছবিতেই একটা চরিত্র-রচনা মোটেই কঠিন ছিল না আমার জন্য। দৃপ্ত পৌরুষের থেকে নারীসুলভ কমনীয়তা আমার সত্যিকারের জীবনে সহজে আসে বলে কখনও পৌরুষকে অভিনয় দিয়ে প্রকাশ করতে পারব না—এটাও কথা নয়। অন্তরমহল-এর জ্যাকি শ্রফের অভিনয়টা প্রায় পুরোটাই আমার দেখিয়ে দেওয়া—এমনকী শেষ দৃশ্যের দরজা ভেঙে গুলি করতে গিয়ে থমকে যাওয়াটাও (সেই দৃশ্যে আমার অনেক ছবি উঠেছিল, মনে আছে)। আসল কারণটা বোধহয়, যে প্রান্তিক চরিত্র দু'টি আমি করতে চলেছি, সেটা আমার নিজের হাতে নিজের জন্য তৈরি না-হয়ে অন্য কোনও পরিচালকের আমন্ত্রণে এল, এটার একটা শৈল্পিক এবং মানবিক মর্যাদা আছে—সেই মুহূর্তে সেটাই আমাকে আপ্লুত করেছিল। রাজি হতে-হতেও একবারের জন্য মনে হল যে মা দেখে গেল না—আমি ছবিতে অভিনয় করছি, বা, মা হয়তো সবই দেখছে, আর মিটিমিটি হাসছে।

তিন

এরপর এল প্রস্তুতিপালা। অভিরূপ সেন, মানে বর্তমানের চরিত্রটির বয়স কৌশিক ভেবেছিল বছর পঁয়ত্রিশ। রোগা-পাতলা চেহারা। ফলে একটা মারাত্মক ওজন কমানোর পালা চলল—খাওয়া কমিয়ে, জিম-এ গিয়ে, এবং শেষমেশ যখন রোগা হলাম পেটের কাছে ঝুলে থাকা চামড়া অপারেশন করে দৃঢ় করতে—তার নাম নাকি 'অ্যাবডোমিনোপ্লাস্টি'। সে এক মারাত্মক জেদের পর্ব। আঠাশ ইঞ্চি কোমরের জিন্স্ আলগা হচ্ছে দেখে শিশুর মতো আনন্দ। লেজার করে দেহরোম মসৃণ করা হল। বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করত বটে যে—এ কেবল ছবি করার ছুতোয় নিজেকে একটু সাজিয়ে নেওয়া, আমার ব্যক্তিগত ভ্যানিটি। বোঝাতে পারিনি, সেটার চরিতার্থতার জন্য আমার কোনও ছবির ছুতো লাগে না—আমার ইচ্ছেটাই যথেষ্ট।

চপলরানি-র ভূমিকার জন্য আলাদা করে কোনও প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভাবিনি আমি। চপলদার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটানো, বা কাছ থেকে বসে ওঁকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা—কোনওটাই করতে চাইনি আমি। আমি অনুকরণধর্মী প্রতিকৃতিতে বিশ্বাস করি না, আমি চেয়েছিলাম মানুষটাকে আমার মতো করে বর্ণনা করতে।

ছোটবেলা থেকে দীর্ঘদিন মহিলা-চরিত্রে অভিনয় করতে-করতে চপলদার কণ্ঠস্বরটাই

নারীসুলভ, টেলিফোনে কথা বললে পুরুষ মনেও হয় না। চপলদার চরিত্রায়ণে ঠিক করেছিলাম তাঁর কণ্ঠস্বর, আর তাঁর সুরেলা বাচনভঙ্গিটুকুই ব্যবহার করব, এছাড়া একসঙ্গে অভিনয় করতে-করতে আরও যদি অন্য তেমন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তখন সেটা চরিত্রে ব্যবহার করা যাবে'খন।

যে-কারণে শুটিংয়ের সময় আমি ইচ্ছে করেই চপলদার খুব ঘনিষ্ঠ হতাম না। ভাবতাম, কী জানি অনেকক্ষণ কাছাকাছি থাকার ফলে আমার যদি মানুষটাকে অনুকরণ করতে ইচ্ছে হয়—সে ভারি লজ্জার হবে!

অনুকরণ-নির্ভর অভিনয় আমার অভিনয়-দর্শনের মধ্যে পড়ে না।

চার

'আরেকটি প্রেমের গল্প' করতে গিয়ে যদি আমার সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক কোনও অভিজ্ঞতা থাকে, তা বোধহয় শাড়ি পরে অভিনয় করার।

ছবিতে আমার (চপলের) শাড়ি পরিহিত দৃশ্য দু'টি। একটিতে জমকালো জরির বেনারসি। অন্যটিতে ভারী একটি গরদের শাড়ি।

মা, পিসিমণি, বা বাড়ির অন্যান্য মহিলাকে আজীবন শাড়ি পরতে দেখে, এবং যে-পোশাকই আমি পরি সেটাকে বহন করার স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ততা আমার কখনও-ই অসুবিধাজনক মনে হয় না বলেই হয়তো শাড়িটাকে পোশাক হিসেবে ম্যানেজ করাটা সমস্যা হতে পারে—এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রথম যেদিন বেনারসি শাড়িটা পরতে হল, মনে হল এর মতো দুরূহ কাজ আর নেই। কেবল শাড়িকে শাড়ির মতো করে বহন করাই নয়, এ যেন এক বিশাল বোঝা। তার ওপর, শাড়ি এবং গয়নার যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, কোনও গয়নার খোঁচায় শাড়ির সুতো বেরিয়ে আসতে পারে আনাড়ির শরীরে, এবং অভিনয়ের পক্ষে যে সেটা কত বড় অন্তরায়, সেদিন হাড়ে-হাড়ে বুঝলাম, আর মনে-মনে নাক-কান মুললাম, ২৮ ইঞ্চি জিন্স-এর পিছনে না-দৌড়ে শাড়ি পরাটা অভ্যেস করাও বোধহয় দরকার ছিল। তারপর, একদিন শাড়ি-পরিহিতা চপলদার একটা দৃশ্য ছিল আমারই সঙ্গে। যেভাবে রানির মতো শাড়ি পরে ঘরে ঢুকলেন চপলদা, নিপুণভাবে শাড়িটি গুছিয়ে নিয়ে বসলেন কেদারায়, আমি তো বিমূঢ়। প্রচুর অভিনেতার সঙ্গে তো কাজ করেছি, শাড়ির মহিমাকে এইভাবে আমার সামনে বিকশিত করতে কাউকে দেখিনি।

পাঁচ

শুটিংয়ের মাঝখানে আমার জন্মদিন পড়ল। সেদিনও শুটিং। সকাল-সকাল বাড়িতে মেক-আপ করে বেরোচ্ছি। অভিরূপের চরিত্র ছোট চুল, চশমা—নানা পত্রপত্রিকায় ছবিতে আপনারা দেখে থাকবেন।

মা চলে যাওয়ার পর থেকে জন্মদিনের দিনগুলো বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে একটা সংকোচ হত। এবার আবার মেক-আপ করা। চেষ্টা করছিলাম বাবাকে এড়িয়ে বেরিয়ে পড়তে।

ঘর থেকে বেরতেই দেখা হল বাবার সঙ্গে। বাবা বোধহয় আমার কাছেই আসছিল।

বাবাকে প্রণাম করলাম। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বাবা। তারপর বলল,

—তোমাকে ইরার (মা) মতো দেখাচ্ছে। তুমি হওয়ার আগে ওর চুল পড়ে যাচ্ছিল, চুল কেটে ফেলতে চেয়েছিল—আমি কাটতে দিইনি।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম,

—এটা উইগ বাবা, আসল চুল নয়। বাবা আর কোনও কিছু বলল না বিশেষ। নিজের মনে অন্য ঘরে চলে গেল।

ছয়

আমার বেনেপুতুল সাজার দু'বছর পার হয়ে গিয়েছে। অভিরূপ দিল্লিতে ফিরে গিয়েছে—আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। আর চপলদা তাঁর ধার-দেওয়া যৌবনের মুহূর্তগুলো আবার গাঁটরি বেঁধে নিয়ে ফিরে গিয়েছেন উত্তর কলকাতার বাড়িতে।

কৌশিক পরের ছবি শুরু করেছে। আমার প্রথম ছবির প্রাত্যহিক দৃশ্যমান স্মৃতি এখন আমার পেটের অপারেশনের দাগটুকু।

আমার প্রথম পর্দাবতরণের প্রাক্কালে আপনাদের শুভকামনা প্রার্থনা করি।

১৯ ডিসেম্বর, ২০১০

দু'বছরেরও বেশি আগে 'ক্যামেরা, অ্যাকশন' বলেছিলাম। এই আবার গত সপ্তাহ থেকে বলছি। আমার নতুন ছবি 'চিত্রাঙ্গদা' শুরু হল।

২০০৮-এর শেষ দিন, ৩১ ডিসেম্বর 'নৌকোডুবি'-র শুটিং শেষ হয়েছিল। শেষবারের মতো 'কাট' বলেছিলাম। তারপর 'প্যাক আপ'। পরিচালক সারণ দত্ত 'তিতলি' ছবিটাতে আমার পরিচালনা বিভাগে ছিল। প্রথম শটটা নেওয়ার পরই বলল,

—এই তো! ছবি শেষ!

গোরার (সারণ) কথা শুনে আমি একটু থমকেছিলাম। কিছুক্ষণ লেগেছিল কথাটা হৃদয়ঙ্গম

করতে। তারপর ভাল করে ভেবে দেখেছি যে, মোদ্দা ব্যাপারটা তাই। ছবিটা ভেবেচিন্তে, আয়োজন করে শুরু করাটাই আসল। একবার শুরু হয়ে গেলে ছবি নিজেই কেমন করে যেন একটা গতিসঞ্চার করে। তারপরে, কোনও বিরাট বিভ্রাট না-ঘটলে, কখন যেন শেষ হয়ে যায়।

আসলে ওই শুরু থেকে শেষের সময়টা অবধি আমরা সবাই তখন একটা ঘোরের মধ্যে থাকি যে, শেষ হয়ে আসাটা বুঝতে পারি না।

একটা সময় ছিল, বেশ ঘন ঘন ছবি করেছি। দু'বছরে তিনটে। তখন সবাই বলত,

—এত তাড়া কীসের তোমার? পরপর ছবি করছ! সময় নাও। ভাবো। দেখোনি, সত্যজিৎ রায় বছরে একটার বেশি ছবি করতেন না।

আমি অপরাধীর মতো ঘাড় নাড়তাম। বোঝাতে পারিনি ওই ক্রমান্বয়ে ছবি করে যাওয়ার মধ্যেই কিন্তু আমার প্রিয় ছবিগুলো আমি বানিয়েছি—'অন্তরমহল', 'দোসর', 'আবহমান'...।

এখন, এই যে গত দু'বছর ছবি বানালাম না, কেবল দু'টো ছবিতে অভিনয় করলাম—'আরেকটি প্রেমের গল্প' আর 'মেমরিজ ইন মার্চ'; তখন আবার পাল্টা অভিযোগ,

—তুমি কি আর ছবিটবি করবে না? আমি আবার অপরাধীর মতো ঘাড় নাড়লাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ...।

'চিত্রাঙ্গদা'-য় আবার আমি অভিনয়ও করছি। পরিচালনা এবং মূল চরিত্রে অভিনয় করা—সত্যিই একটা দুরূহ চাপ। আস্তে আস্তে সেটাও সয়ে যাচ্ছে।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি অবধি শুটিং চলবে। আমি জানি, আপনারা এইটুকু পড়েই মনে মনে ভাবছেন,

—বুঝেছি, ভনিতাটার দরকার ছিল না। তার মানে 'ফার্স্ট পার্সন'গুলো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হবে।

সত্যি! হতেও পারে, আগাম মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

সম্প্রতি আমার একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল। আমার ছবি 'চিত্রাঙ্গদা'-র শুটিংয়ের সময়। সব দুর্ঘটনাই দুর্ঘটনা এবং ভয়ঙ্কর, তবে এটি আরও অনেক বিপজ্জনক হতে পারত—ভাগ্যক্রমে হয়নি।

সেদিন সকালে আমরা সল্টলেক-এর একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করছিলাম। আমাকে স্ট্রেচারে করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার শট।

স্ট্রেচারের মাথায় ক্যামেরাটা আটকানো হয়েছে। আর ঠিক তার তলায় আমি শুয়ে। স্ট্রেচার

চলবে আর আমার ছাদের আলোগুলোর দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকার কথা।

আমার মাথার ওপরেই একটা আলো লাগানো হয়েছে। কাটার (ইংরেজিতে cutter, সিনেমার আলোকসম্পাতে একটি বিশেষ উপাদান—আলোর তীব্রতা আড়াল করার জন্য একটি পাতলা কালো কাঠের চ্যাপ্টা টুকরো তার সামনে ধরা হয়) দিয়ে সেই মাথার ওপর লাগানো আলোটা মাঝে-মাঝে ঢেকে আলোছায়ার খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে আমার মুখের ওপর। একপ্রস্থ রিহার্সাল হয়ে গেল। একজন রোগিণীকে স্ট্রেচারে করে লিফ্‌ট থেকে বার করা হচ্ছে, ফলে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

এবার শট। স্ট্রেচারটা ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল। আমি অভিনেতা হিসেবে আপ্রাণ এক্সপ্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি—স্ট্রেচার এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা বিরাট আওয়াজ, কপালে বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো একটা প্রচণ্ড আঘাত। দেখলাম ক্যামেরাটা আমার বুকের ওপর।

কোনও একটা কারণে ক্যামেরাটা পিছলে পড়েছে আমার কপালে। তারপর গড়িয়ে চলে এসেছে বুকে।

আমার কপালে অসহ্য ব্যথা, তবু আমার ভিতরের পরিচালক প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত উৎকণ্ঠায় চিৎকার করে উঠল,

—ক্যামরাটা কি ভেঙেছে?

কোনও উত্তর নেই। কে যেন এসে ক্যামেরাটা তুলে নিল আমার শরীরের ওপর থেকে। আর প্রায় তক্ষুনি কপালের ওপর কে একজন বরফের ব্যাগ সজোরে চাপা দিয়ে ধরল। আমি দেখছি, আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সমগ্র ইউনিট আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে, কয়েকজন এগিয়ে আসছে।

তখনও আমি সত্যিই কিছু বুঝিনি। এবার হঠাৎ চোখ পড়ল গায়ে বিছানো সাদা চাদরটার দিকে। চাদরটা দেখলাম ধীরে ধীরে রক্তের ছোপে লাল হয়ে উঠছে। এবারের উৎকণ্ঠাটা অভিনেতার। তক্ষুনি জিগ্যেস করলাম,

—কোথায় কেটেছে?

—কাটেনি দাদা, ফেটে গিয়েছে।

উঠে বসার চেষ্টা করলাম,

—আয়নাটা আন।

সবাই জোর করে শুইয়ে দিল, অনেকক্ষণ বরফ চাপার পর যখন সত্যিই আয়না ধরা হল আমার মুখের সামনে, দেখি কপালের মাঝখানে কোনাকুনি একটা রক্তদাগ। ঠিক যেমনটি আমরা পার্বতীর কপালে আজীবন কল্পনা করে এসেছি দেবদাসের ছিপের ঘায়ে।

এবার বলি, সত্যিই কেন এটা আরও বিপজ্জনক হয়নি।

আমরা শুটিং করছিলাম একটা হাসপাতালে। তাই সেই স্ট্রেচার ঠেলে আমাকে ইমার্জেন্সি-তে নিয়ে যাওয়া হল।

আমার সঙ্গে অভিনয় করছিলেন কৌশিক ঘোষ, যিনি আদতে একজন ডাক্তার এবং সুদক্ষ সার্জন।

মিনিট দশেকের মধ্যে কপালে পাঁচটা এবং বাঁ চোখের পাতায় একটা সেলাই নিয়ে যখন বেরলাম, তখন পরিচালকের উৎকণ্ঠাটা আবার ফিরে এসেছে।

শুটিংয়ের তা হলে কী হবে?

এখানে ইউনিট-প্রধানের কর্তৃত্ব চিকিৎসকের নিদানের কাছে হেরে গেল। দশদিন বিশ্রাম নিয়ে সেলাই কেটে শেষ অবধি শুটিংয়ে ফিরলাম।

আমি এখন ভাল আছি।

১৩ মার্চ, ২০১১

'নৌকোডুবি' মুক্তি পাওয়ার পর থেকে নানারকম এসএমএস পাচ্ছি—ভাল, মন্দ, প্রশংসা, অসন্তুষ্টি—নানারকম।

তারই মধ্যে একটা এসএমএস এসে পৌঁছল যার সারমর্ম হল,

—রমেশ যাকে বিবাহ করে সেই অদেখা নববধূটি শিফনের শাড়ি পরেছে। এবং হেমনলিনী পরেছে নকল গয়না। রবীন্দ্রোত্তর চিত্ররূপে এত বড় অজ্ঞতা এবং অমনোযোগ ভাবা যায় না।

আমি এসএমএস-এর উত্তর দিলাম। প্রত্যুত্তর এল। বুঝলাম প্রেরক / প্রেরিকা তাঁর নিজস্ব রবীন্দ্রপাঠের ডিটেলগত বিচ্যুতিতে চরম অসন্তুষ্ট।

অজ্ঞতা বা অমনোযোগ যে কোনও অবস্থাতেই রসোত্তীর্ণ শিল্পের প্রধান অন্তরায়—তার জন্য বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনার দরকার নেই।

যেহেতু 'রোববার' আমাকে প্রতি সপ্তাহে একটা পাতা বরাদ্দ করে দেয় আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্য, সেটা আমি এক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজে লাগাচ্ছি না।

আমার বক্তব্য সিনেমা-দর্শকদের প্রতি।

প্লাস্টিকের ফুল-পাতা, গাছের প্রেক্ষাপটে স্টুডিও-সিনেমাকে প্রথম হাত ধরে টেনে বার করে এনেছিল 'পথের পাঁচালী'।

বাঙালি, তথা ভারতবাসীর কাছে সিনেমার একটা নতুন ভাষার জন্ম হল—Realism বা

বাস্তবানুগ সিনেমা।

কিন্তু অনভ্যস্ত দর্শক সিনেমায় বাস্তবের এই নির্ভেজাল চিত্ররূপ দেখতে-দেখতে গুলিয়ে ফেললেন যে, সিনেমার বাস্তব আর বাস্তবের বাস্তব এক নয়। তাই 'পথের পাঁচালী'-র মতো আদর্শ realistic সিনেমাতেও দরিদ্র পুরোহিত-বধূ গ্রাম্য সর্বজয়া যে ব্লাউজ পরে আছেন, সেটা আমরা লক্ষ করলাম না।

যিনি সচেতন ভাবে করেছিলেন তিনি নির্মাতা সত্যজিৎ রায়। ফলে পরবর্তী সময় যখন আমরা 'চারুলতা' দেখছি, এবং নিখুঁত Period Cinema? দেখে মুগ্ধ হচ্ছি, তখন অমল 'আমি চিনি গো চিনি' গানটি শুরু করেছে পিয়ানোর সামনে এবং একটা পর্যায়ে পিয়ানো ছেড়ে চারুর সঙ্গে নাচছে। এবং আবহে বেজে চলেছে এক অপূর্ব সংগীত। যা হয়তো বাস্তব-বিরুদ্ধ, কিন্তু সিনেমার জন্য অনির্বচনীয় এক মুহূর্ত।

আসলে সিনেমা যে-ধর্মীই হোক, realistic বা অন্য কিছু—সিনেমা আদতে real নয়, representation. ফলে শিফন শাড়ি আর নকল গয়নার শিকলে সিনেমা আটকে থাকে না।

এবং সেই বিশেষ পর্যবেক্ষকের জন্য জানিয়ে রাখি, 'সবক'টা গয়নাই আসল (আমাদের in-house করে ব্যবহার করতে হয়েছিল) এবং শিফন শাড়িটা আসলে মাথার চেলি—শাড়ি নয়।

এবার অন্য এসএমএসগুলোয় আসি। প্রচুর মানুষ আমায় জানালেন—প্রসেনজিতের মায়ের ভূমিকায় আপনার অভিনয় অনবদ্য। এমনকী বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ আলাদা করে আমি কেমন চমৎকার বৃদ্ধার চরিত্রটি করেছি, তা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

কারণটা আমার কণ্ঠস্বর (আমি ক্ষেমংকরী-র ডাবিং-টা করে দিয়েছিলাম), না কি আমার সম্প্রতি গজানো ছোট চুল?

অভিনেত্রীটি আসলে আম্মু চ্যাটার্জী। জন্মসূত্রে তামিল। ধৃতিমান চ্যাটার্জির স্ত্রী। তাঁর বাংলা উচ্চারণটি তেমন সড়গড় নয় বলে আমি ডাবিংটা করে দিয়েছিলাম।

এই এসএমএসগুলো পড়ে প্রথমে খুব হেসেছিলাম।

পরে মনে হল, আমরা শুধু-শুধুই Public Imagination কে ছোট করে দেখি—তাঁরা আমাকে, ঋতুপর্ণ ঘোষ-কে, একজন বৃদ্ধার চরিত্রে কেবল অবলীলায় মেনেই নেননি, প্রশংসাও করে চলেছেন। কোথাও ক্ষেমংকরীর পোশাকে আমার গ্রহণযোগ্যতা তাঁদের কাছে কমেনি।

এটাই বোধহয় সিনেমার জয়। যে realism-এর অনেক ঊর্ধ্বে গিয়ে representation কে বিজয়মালা পরাতে পারে।

৩ জুলাই, ২০১১

১৯৯৪ এর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের রেজাল্ট বেরিয়েছিল ৪ জুন। 'উনিশে এপ্রিল' শ্রেষ্ঠ ছবির 'স্বর্ণকমল' পেয়েছিল।

যে-স্বপ্ন নিয়ে সব শিল্পীই কাজ শুরু করেন, কর্মজীবনের গোড়ার দিকেই তার এক আকস্মিক স্বীকৃতি স্বাভাবিকভাবেই আমার স্বপ্নবিস্তারের জাল বোনাকে চকিতে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তখনও বুঝিনি যে, এই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার মানে কেবল একটা মানপত্র। একটা সোনার মেডেল, পঞ্চাশ হাজার টাকা (হ্যাঁ, তখন শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার ছিল প্রযোজক এবং পরিচালক পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা) আর আমার রাতারাতি সেলিব্রিটি হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর ধীরে-ধীরে জাতীয় পুরস্কার পাওয়াটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। আমার সতেরোটি ছবির মধ্যে তেরোটি ছবি পুরস্কৃত হল। আমার বাবা উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন। আবার একটা নতুন মেডেল ছুঁয়ে দেখবেন বলে। যে-যে সংবাদপত্র আমার পুরস্কার-প্রাপ্তির খবর ফলাও করে ছাপত না, তাদের ওপর অভিমান করে আমাকে ভীষণ বকতেন,

—এই জন্য বলি খবর কাগজের সঙ্গে ঝগড়া কোরো না।

আমি নিজে ততদিনে সাংবাদিকতায় ঢুকে গিয়েছি—কোনওদিন বোঝাতে পারিনি যে এই বিশেষ কার্যকারণ সম্পর্কটা অত সরল নয়।

যাক গে, 'উনিশে এপ্রিল'-এর পুরস্কারটা যে উদ্দীপনা তৈরি করেছিল মনের ভিতর, পরবর্তীকালে প্রতিটি জাতীয় পুরস্কারের সঙ্গে ধীরে-ধীরে সেটা হ্রাস পেতে লাগল।

কারণ ততদিনে আমি বুঝে গিয়েছি, যে, যতই মেডেল জিতি না কেন—আমি কোনওদিন সত্যিকারের বড় চলচ্চিত্রকার হব না।

হয়তো কলকাতায়, বা বড়জোর দিল্লি, মুম্বই, পুনে—কিংবা কয়েকটা বিদেশি ফেস্টিভ্যালে আমার ছবি দেখে লোকে ভাল বলবে—কিন্তু আমার চলচ্চিত্রকার হওয়ার মোক্ষম রেজাল্টটা ততদিনে বেরিয়ে গিয়েছে—সেটার মধ্যে এক ক্লান্তিকর মালিন্য ছাড়া আর কিছু নেই।

একটা মজার ঘটনা বলি। ঘটনাটা মজার হলেও আমার খুব প্রিয়।

একবার মুম্বইতে শ্যাম বেনেগাল-এর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে গিয়েছি। শ্যামবাবু, ওঁর স্ত্রী নীরা, এবং আমি।

খাবার বেড়ে দেওয়া হল রুপোর থালায়। আমি একটু অবাক। শ্যামবাবুর বাড়িঘর, গৃহসজ্জা, জীবনযাপনের সঙ্গে রুপোর থালাটা কেমন যেন বেমানান ঠেকল। আমি কিছু বলিনি, নীরা বুঝতে পেরেছিল। আসলে শ্যামবাবু যতগুলো 'রজতকমল' পেয়েছেন সেগুলো গলিয়ে ফেলে থালা বানানো হয়েছে, তাতে অতিথিদের খেতে দেওয়া হয়।

আমার থালাটা উল্টে দেখলাম, পিছনে লেখা আছে 'মন্থন', 'ভূমিকা', আরও কী-কী ছবি।

শ্যামবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার বারবার করে মনে হয়েছিল, এটাই হয়তো বা শ্রেষ্ঠ উপায়। নিষ্ফলা সাফল্যের ব্যর্থতাকে সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া।

৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১

জোড়াসাঁকো-র ঠাকুরবাড়িতে শুটিং করলাম টানা দশ দিন।

অসুবিধে ছিল অনেক, বাইরের অংশটুকু পুরোটাই মিউজিয়াম হয়ে গিয়েছে। বারান্দার দেওয়ালে চওড়া তার, cable। fine extiagnisher—ফলে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে শট নিতে হয়। আর তাই, বারান্দাটা আর সেরকম ভাবে প্রশস্ত থাকে না।

মিউজিয়ামে যে দ্রষ্টব্য অনেক কিছু আছে, তা নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ কক্ষটাতে গিয়ে দাঁড়ালে এখনও বুকটা হু হু করে ওঠে।

মাঝে-মাঝেই কিছু গুলিয়ে গেলে, মনে না-পড়লে, বা সংশয় হলে একবার চুপ করে ঘরটায় গিয়ে দাঁড়াতাম শেষযাত্রার ছবিটার দিকে তাকিয়ে। ভাবটা এই—দেখতে তো পাচ্ছ বুঝতে পারছি না, বলে দাও না।

মনে আছে, মা চলে যাওয়ার পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আগে নিমন্ত্রিতের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে বারবার মা'র ওপর রাগ হত। কাকে-কাকে ডাকা উচিত। সে তো মা-ই বলে দিয়েছে এতদিন!

রবিঠাকুরও যেন তাঁর বিশাল, বিচিত্র, অগাধ জীবনের কতগুলো ঝলক দেখিয়ে, বাকি মণিরত্নগুলো অবলীলায় তাঁর জোব্বার পকেটে লুকিয়ে রেখে নানা ছবি থেকে নানা ভঙ্গিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন—আর আমরা নাকাল, গলদঘর্ম হচ্ছি।

জোড়াসাঁকো তো কেবল রবীন্দ্রনাথের বাড়ি নয়। তাঁর তেরোজন অগ্রজ—মা, বাবা, ভৃত্যদের সংসার ছিল বাড়িটা।

আপাতত আলোচনা থেকে বাড়ির হিন্দু অংশটা—অর্থাৎ ৫ নং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন বাদই দিলাম। সে-বাড়িতে তো আবার প্রচুর মানুষ।

এখন ৬ নং বাড়িটা দেখলে অবাক লাগে। বুঝতেই পারা যায় না, কে কোথায় থাকতেন। বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার পর, তাদের সংসার হওয়ার পর, এবং মহর্ষিকন্যারা সসন্তান মাঝে-মাঝে পতি-সহ এই বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করার পর, বিশাল বারান্দাগুলো, উঠোনের ব্যাপ্তি সারাদিন নানা কাজে গমগম করত—অনুমান করতে পারি।

মাঝে-মাঝে যখন সন্ধে অবধি শুটিং গড়াত, মেঘলা আকাশ কেমন ঝপ করে আঁধার হয়ে যেত, আর আমি হয়তো দোতলার বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে বসে, বাড়ির অন্য প্রান্তে সৌমিক তখন

আলো করছে—কেমন যেন মনে হত কান খাড়া করে শুনলে কোনও একটা ঘর থেকে ভেসে আসবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের টুংটাং পিয়ানোর শব্দ—কিংবা এস্রাজের ঝংকার। কোথাও থেকে শুনতে পাব কবিতা পাঠ, এবং পাঠান্তে সাধুবাদ ও চুড়ি পরা কয়েকটি হাতের রেকাবিতে সন্দেশ সাজানোর আওয়াজ।

ধীরে-ধীরে এই কয়েক দিনেই জোড়াসাঁকোর বাড়িটা আমার ক্ষুধিত পাষাণ হয়ে উঠল। দোতলায় উঠেই লাল বারান্দাটায় একটা করুণ কাঠের লেটার বক্স আছে। শোনা যায় কাদম্বরীর আত্মহত্যায় বিহ্বল, ঘোরগ্রস্ত, সাময়িক মতিচ্ছন্ন যুবক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মহর্ষি লিখেছিলেন,

—রবির বায়ুরোগ হয়েছে, ওকে পশ্চিমে পাঠাও।

যতবার শুনতাম, দেবেন ঠাকুরকে কেমন যেন নিষ্ঠুর লাগত। বাক্সটার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে মনে হল, পিতার দু-দু'টি সন্তান মানসিক ভারসাম্যহীন, সোমেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ—এমনকী বীরেন্দ্রনাথের এক চামচ ভাত আর পটলপোড়া খেয়ে পাগলাগারদে থাকার গল্প যখন তাঁর স্ত্রী-র লেখায় পড়ি, তখন পিতার এই স্বাভাবিক দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি বোধ করি তাঁর সর্বাপেক্ষা জাগ্রতমনা কনিষ্ঠ সন্তানটিকে সচেতন জগৎ থেকে হারাতে চাননি। বাড়ির অন্দরমহলটা আরও অনেক বেশি রহস্যময়। পুরনো বাড়ির শুটিং করার অভিজ্ঞতা আমার কম নয়। কিন্তু দশ দিন শুটিং করার পরও এই বাড়িটার ভিতরমহলটাকে ঠিক করে বুঝে উঠতে পারিনি।

নানা রকম সিঁড়ি—হঠাৎ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে—যেন উচ্চতার সুড়ঙ্গ। তারপর একচিলতে বারান্দা। আবার একটা সরু পথ। এধারে-ওধারে নানা ঘর। দু'ধাপ উঠে অন্য একটা জায়গা।

মীরা দেবীর (কবির কনিষ্ঠা কন্যা) একটা লেখায় পড়ছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ সমান মেঝে পছন্দ করতেন না। থেকে-থেকেই সিঁড়ির দু-একটা ধাপ দিয়ে তাতে বৈচিত্র আনতেন। আর মীরার ছোটবেলা থেকেই চোখ খারাপ ছিল বলে মাঝে-মাঝেই শান্তিনিকেতনের দেহলী বাড়িতে হোঁচট খেতেন।

এই যে নানারকম সিঁড়ির ধাপের প্রতি এক অদ্ভুত অজানা প্রীতি—তা কি কেবল কবির নিজস্ব আবিষ্কার? না জোড়াসাঁকোর ফসল? গগনেন্দ্রনাথের ছবিতেও সেই মায়াময় সিঁড়ির খেলা দেখতে পাই যে!

কাদম্বরীর আত্মহত্যা বা রবির সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত রহস্যময় ঘনিষ্ঠতা তাঁকে চট করে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের নায়িকা বানিয়ে দিয়েছে।

সেই কাদম্বরীর মৃতদেহও নাকি দু'দিন নীচে, অন্দরের কোনও একটা ঘুপচি ঘরে রাখা ছিল।

অন্দরের একতলায় শুটিং করতে-করতে যখন শীতের পড়ন্ত বিকেলে কুয়াশা ভারী হয়ে আসত, তখন কোথাও যেন তার সঙ্গে মিশে থাকত এক হতভাগিনীর দীর্ঘশ্বাস বাষ্প। ছড়িয়ে যেত

বাইরের উঠোনে, বিশাল ঠাকুরদালানে। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় মঞ্চে—গোটা বাড়ি জুড়ে।

আর আমরা বলতাম,

—আজ আবার কুয়াশায় আলোটা চলে গেল। প্যাক আপ।

১৫ জানুয়ারি, ২০১২

ইছামতীর ধারে ছোট্ট মফস্‌সল শহর টাকী। সেই অঞ্চলের দু-একজনকে জিগ্যেস করলাম, টাকী শহরের বুৎপত্তি। কেউ ঠিক করে বলতে পারলেন না।

এই টাকী-ই আমার 'রবীন্দ্রনাথ' ছবির শিলাইদহ। প্রায় ন'বছর আগে এমনই এক শীতকালে একবার এসেছিলাম টাকীতে মনে পড়ে—মৃণালদার (সেন) 'আমার ভুবন'-এর শুটিং-এ।

কিন্তু সেবার ওঁরা যেখানে উঠেছিলেন, সেই আবাসনটা আর চিনতে পারলাম না। অবশ্য নদীকূলবর্তী এই শহরটা খুঁজে দেখার সময়ও হাতে ছিল না বললেই হয়। গিয়ে যখন পৌঁছলাম আকাশের মুখ নিতান্তই গোমড়া, আর থেকে-থেকে ছিঁচকাদুনের মতো কাঁদছে।

মেঘ-বৃষ্টির একটা আগাম ঘোষণা ছিলই। ফলে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম বললে ভুল হবে—আমার তো বরং ভেতরে-ভেতরে আনন্দই হচ্ছিল—যে, কেমন করে যেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর প্রিয় ঋতু বর্ষাকে অকালঞ্জশীতে পাইয়ে দিলেন।

নইলে যে কোনওমতেই সম্পূর্ণ হবে না রবীন্দ্র-জীবনকথায় তাঁর পদ্মাবোটে বাসের আনন্দ। অসমাপ্ত থেকে যাবে 'ছিন্নপত্রাবলী'।

আমাদের পদ্মাবোটটা বানাতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগেছে। মধ্যবর্তী পর্যায়ের ছবি কলকাতায় এসে পৌঁছোচ্ছিল, কিন্তু যেদিন টাকী শহরে বিকেলবেলা গিয়ে নামলাম আর ফেরিঘাটে দেখি আটকে আছে কবির সেই নদীবক্ষ বাসের তন্বী বজরা, সেদিন সত্যিই কেমন একটা ধক করে উঠল বুকের ভেতর।

বজরা-নির্মাণ আমার ছবিতে এই প্রথম নয়। 'চোখের বালি'-র সময় দু-দু'টো বজরা ছিল—আমার ভাই ইন্দ্রনীল বেনারসের ঘাটে বলে নৌকো জোগাড় করে। অক্লান্ত পরিশ্রমে সেগুলোকে বজরা-য় রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু সেগুলো তো ছিল নেহাতই কাল্পনিক। ফলে বজরাটা সুন্দর হয়েছে কি না প্রশংসাটাও তত দূর অবধি। এই বজরাটি কেবল সুদর্শন বলে নয়, যেন স্মৃতির জাদুঘর থেকে বেরিয়ে এসে টাকীর ফেরিঘাটে নোঙর ফেলেছে।

মোবাইল-এ ছবি তোলা সাধারণত আমার ধাতে সয় না। তবু কী মনে হতে, নদীতে ভাসমান বজরাটার একটা ছবি তুললাম। ভাবটা এমন যে, আর যদি দেখতে না পাই!

সেই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি, আমাদের আগামী ক'দিনের শুটিং এই বজরাটিকে ঘিরেই। এ-ও ভুলে গেলাম যে, আমরাই ছবি দেখে, নকশা বের করে এই বজরাটি বানিয়েছি।

দুই

নদীর সঙ্গে ভাব পাতাতে যে এতটা সময় লেগে যাবে, ভাবিনি। জোয়ার-ভাটা, কতক্ষণ থাকবে, কখন জল বাড়বে, কখন কমবে, কখন কতটুকু ডুবে যাবে বজরা থেকে মাটিতে নামার বাঁশের তৈরি পাটাতন—কিছুই জানি না। ধীরে-ধীরে শিখছি।

পাটাতনটি এসে জুড়েছে একটি বাঁশের সাঁকোয়। সেই সাঁকো বেয়ে পাড় থেকে নীচে নেমে যেতে হয়। ইউনিটের অন্যান্যরা সহজেই এটা রপ্ত করে ফেলল—কেবল আমি ক্যাবলাকেষ্টর মতো কারও একটা হাত ধরে নামতাম। সাঁকো-র বাঁশ কখনও বা কাদামাখা, কখনও তাতে কচুরিপানা লেগে আছে। সেগুলো বাঁচিয়ে চলাটা রীতিমতো একটা শিল্প।

তারপর একবার বজরায় উঠে গেলে—আবার অন্য সমস্যা। খোলা ডেকে হু হু করে বইছে ঠান্ডা হাওয়া। তখন কোথায় মোজা রে, কোথায় কানঢাকা টুপি রে—তার মধ্যে দুই রবীন্দ্রনাথ সমদর্শী আর সঞ্জয় সুতির পাঞ্জাবি, গায়ে সুতির চাদর আর ধুতি মাত্র পরে এসে দাঁড়াচ্ছে।

প্রথম দু'দিনের শুটিং কিছুটা মেঘলা। কিছুটা বৃষ্টির মধ্যেই হল। চিত্রগ্রাহক সৌমিক কায়দা করে সেটাকে অন্তরায় হতে না-দিয়ে একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে বদলে ফেলল প্রায়।

চারিদিক, থেকে-থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন। ওপারের বাংলাদেশের সবুজ তীররেখা ধূসরতায় আবৃত। কেমন যেন কুয়াশার পর্দার মধ্যে একখানি বজরা, তার মধ্যে আমরা। মনে পড়ছিল 'মহাভারত'-এর গল্প। পরাশর আর মৎসগন্ধার নৌকামিলন। পরাশর মুনি যোগবলে সত্যবতীর নৌকা ঘিরে কুজ্ঝটিকার ঘেরাটোপ সৃষ্টি করেছিলেন। তার ভাল দিকটা ছিল এই যে—বেদব্যাসের জন্ম। আর আমরা কতগুলো শহুরে মানুষ, জলমাটির সংস্পর্শবিহীন জীবন থেকে আলটপকা উঠে এসে, শিব গড়ার ইচ্ছেয় কোন বাঁদর গড়ব, তা কেবল ইছামতীই জানে।

আমার, রবীন্দ্রনাথের নদীবক্ষে সাঁতার কাটার একটা দৃশ্যগ্রহণ করার বড় ইচ্ছে ছিল। সমদর্শী সাঁতার জানে, রাজিও ছিল। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরিয়ে শেষমেশ জলে নামামাত্রই কোনওক্রমে হুড়মুড়িয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল। ঠান্ডায় পা-দু'টো অবশ। আর ইছামতীর স্রোত যে এত ভয়ংকরী, সে যে সুইমিং পুল-এর সাঁতারুদের তোয়াক্কা করে না—আগে বুঝতে পারিনি।

দ্বিতীয় দিনের পড়ন্ত বিকেলের শেষ শট। ওই অঞ্চলের কিছু মানুষকে সংগ্রহ করা হয়েছিল যাঁরা নৌকোয় পাটের বান্ডিল তুলবেন। কারণ, তাঁরা কাজটা রোজ করেন, স্বাভাবিক দেখাবেও।

শট-টা চলছিলও বেশ সুন্দর, যে যার মতো সারি বেঁধে এসে তার বোঝাটা নৌকোয় তুলে আবার ফিরে যাচ্ছিল অন্য বোঝার জন্য।

হঠাৎ দেখলাম পুরো লাইনটা থেমে গিয়েছে। কী ব্যাপার! তারই মধ্যে একজন, মাথায় পাটের

বোঝা, হঠাৎ করে তার মোবাইল বেজে উঠেছে। সে বেচারা সিনেমার মানুষ নয়। মোবাইলে ফোন এলে কথা বলাটাই তার কাছে যুক্তি-সংগত, ফলে সে পাটের বান্ডিল মাথায় উৎফুল্ল মুখে মোবাইলে কথা বলে চলেছে, আর তার পিছনে অপেক্ষা করছে অন্য পাট-বাহকদের সারি।

সৌমিক শট-টা কাটতে যাচ্ছিল। আমি বললাম—থাক। তৈরি করা জীবনে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্ত ক'জন পরিচালক পায়? নাই বা আমার ছবিতে লাগল! (চলবে)

২২ জানুয়ারি ২০১২

আমি বোলপুরে।

বেশ কয়েক দিন হল এখানে শুটিং করছি। শীতকালে লাল মাটির দেশটা যেন পুরোটাই লালচে খয়েরি। ধুলোর রং থেকে গাছের পাতা অবধি। শুটিং-শেষে হোটেলে ফিরে স্নান করলে, বাথরুমের মেঝে গেরুয়া হয়ে যায়। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের গায়ের জোব্বাটির রং।

চারদিকে ছড়িয়ে আছে আমারা প্রিয় মানুষটির নানা জীবন্ত স্মৃতি। যেগুলো আমাদের নিত্য মরণশীল জীবনকে প্রাণ দেয়। এরকম বুঁদ হয়ে থাকা বহুদিন অনুভব করিনি।

সংক্ষিপ্ত 'ফার্স্ট পার্সন'-এর অজুহাত দিচ্ছি না। তবে একবার যদি আপনারা সত্যি মেনে নেন, আর সব কিছুর থেকে বোধহয় রবীন্দ্রনাথকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, তা হলে এটা অজুহাত ঠেকবে না।

বোলপুরের ভোরের ঠান্ডা হাওয়া, এবং অনেক শুভেচ্ছা পাঠালাম।

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

বোলপুরে আমার রবীন্দ্রনাথের ছবির শেষ দিনের শুটিং।

বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণে বা বোলপুরের আশপাশে যা-যা শট নেওয়ার ছিল, হয়ে গিয়েছে।

পড়ে আছে বীরভূমের টানা বিষণ্ণ খেতগুলো।

এর আগেই গিয়েছে শিলাইদহ পর্ব। সুজলা, শ্যামল, যেখানে নদীবক্ষে মেঘ বা রৌদ্র, দুই-ই তরল—সেখান থেকে এক রাঙামাটির দেশ।

আমাদের শটগুলোর অভিপ্রায় ছিল ট্রেনের জানলা থেকে রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত প্রকৃতি নতুন করে দেখছেন অনগ্রসর গ্রামীণ ভারতের চিন্তায় তাঁর কবিমন ভারাক্রান্ত।

সঠিকভাবে ট্রেনের উচ্চতাটা পাওয়া যাচ্ছিল না বলে আমরা সবাই মিলে একটা বড় বাসের ছাদকে আশ্রয় করলাম। দু'টো ক্যামেরা, দুই চিত্রগ্রাহক, ক্যামেরার জন্য নিয়োজিত কলাকুশলী, এবং সর্বোপরি আমি। 'সর্বোপরি' কথাটা এই কারণে নয় যে—আমি পরিচালক; সবারই আশঙ্কা ঋতুদা কোনওক্রমে যদি বাসের ছাদে উঠতেও পারে, যে কোনও মুহূর্তে টাল সামলাতে না-পেরে বাসের মাথা থেকে কুপোকাত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অতএব আমার সুরক্ষানিমিত্ত একদিকে লেন্স বক্স, অন্যদিকে স্যান্ড ব্যাগ—তা ছাড়া দু'জন আলোকসম্পাত বিভাগের ছেলে তো রয়েইছে।

আমি আর এদের কাউকে জনে-জনে বোঝানোর চেষ্টা করলাম না যে, 'আরেকটি প্রেমের গল্প'-তে আমার অভিনীত গোটা একটা দৃশ্য ছিল বাসের ছাদে—সেখান থেকে আমি পড়েও যাইনি। মরেও যাইনি।

আমাদের বাস চলা শুরু হল। বেশ ঝাঁকানি, আর রাস্তার অবস্থাও তথৈবচ। আর সত্যিই ট্রেনের জানলা থেকে নয়, গাড়ির কাচের ভিতর দিয়ে নয়—ওপরে খোলা আকাশ, আর অল্প নীচে পার হয়ে যাচ্ছে চষা খেত, ছোট-ছোট পুকুর, জলা, কখনও-কখনও গ্রামের কয়েক ঘরের বসতি—এ দৃশ্য সত্যিই অভূতপূর্ব। কৌশিকের ছবিতে অভিনয় করার সময় আমাকে পরিচালকের নির্দেশমতো তাকাতে হয়েছে বা মুখ ঘোরাতে—তাতে এই নতুন নিসর্গ দেখার সুযোগ হয়নি।

বাস চলেছে—একছাদ শহুরে মানুষ আর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে। খেতে কাজ করা মানুষরা অবাক হয়ে ফিরে চাইছেন, বাসের মাথা থেকে আমার চেঁচিয়ে বলছি—'দয়া করে এদিকে দেখবেন না। আপনারা যেমন কাজ করছিলেন করে যান।' এটা আমাদের যে কোনও শুটিং-এ, শুটিং-দর্শকদের প্রতি গৎ বাঁধা নির্দেশ। একটা সময়ে আমার মনে হল, দেখলেনই বা গ্রামের মানুষরা আমাদের দিকে ফিরে। যদি এগুলো রবীন্দ্রনাথের ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা দৃশ্য হয়, তা হলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ট্রেন গেলে খেতের মানুষদের তো অত বড় আশ্চর্য দৈত্যযান দেখে কাজ ফেলে ফিরে তাকানোরই কথা।

কিছুক্ষণ পর বাসের তলায় এসে দাঁড়াল গুটিকয়েক বাচ্চা। এমন আজব জিনিস বোধহয় দেখেনি আগে—ফলে দল বেঁধে দৌড়তে লাগল খেত বেয়ে, আমাদের বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অস্নাত, নাকের তলায় জমে আছে সর্দি, শীতের প্রকোপ গালের নরম ত্বকে খড়ির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। সেই কোন ভোরে ঠান্ডায় একটা সোয়েটার পরেছিল, এখন বেলা তিনটে, সেটা পরেই আছে। প্রবল উত্তেজনায় হাসি আর হাততালিতে মশগুল।

বাসের ছাদ থেকে তাকিয়েছিলাম তাদের দিকে। হঠাৎ যেন কোনও জাদু ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে গেলাম 1969-এ? 'বিজলী' সিনেমার অভ্যন্তরে। গুপি-বাঘা'র দেশে। সেই আমার গুপি-বাঘা'র সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

সেখানেও গুড়ির বাচ্চারা তালি দিচ্ছিল গুপি গাইন বাঘা বাইন-কে দেখে—তখন গুপি-বাঘা বুঝতে পারেনি যে তারা মূক ও বধির।

তারই সঙ্গে কোথায় যেন ফিরে এল বড় চেনা একটা পঙ্‌ক্তি—'এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'। আর পুরোটাই যেন গুলিয়ে গেল এক্কেবারে—সে এমন ধাক্কা যে, বাসের ছাতে কেন, খাটে বসেও পড়ে যাওয়ার উপক্রম।

সত্যিই তো গুপি গাইন বাঘা বাইন-কে এমন করে পড়িনি কখনও। অ্যান্টি-ওয়ার ফিল্ম হিসেবেই যার প্রধান পরিচয়, তার মধ্যে কোথাও লুকিয়েছিল, কেবল গানের বাজি জিততে আসা দুই অপটু সংগীতকার কীভাবে এই মূঢ় ম্লান মুখে শেষ অবধি নিজের ঘর, নিজের কথা ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। এবং কোনও ভাষণ দিয়ে নয়, কোনও অস্ত্র দিয়ে নয়, কেবল গান দিয়ে, বাংলা গান দিয়ে। তাই বুঝি গানের সভায় ওরা কোনও কালোয়াতির ধার ধারে না। সহজ সুরে বলে,

—সে যে সুরেরই ভাষা, ছন্দেরই ভাষা
প্রাণেরই ভাষা, আনন্দেরই ভাষা।

উপেন্দ্রকিশোরের সরল গ্রাম্য রূপকথার ফাঁক দিয়ে কখন যে ঢুকে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আমি এতদিনে চিনিনি কেন? কেউ তো বলি না আমরা যে, গুপি গাইন বাঘা বাইন সত্যজিতের রাবীন্দ্রিক ছবিগুলোর অন্যতম। হঠাৎ পাশে বসা সঞ্জু হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে দিল আমায়। বাসের মাথার ওপর একটা ঘন বৃক্ষশাখা—একটু হলে আমার মাথায় লাগছিল আর কী!

একটু ধাতস্থ হয়ে দেখি, আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি, অন্য একটা জায়গায়। আর ক্যামেরার পিছন থেকে সৌমিক বলছে,

—অনেকটা পেয়ে গেছি ঋতুদা! আরও নেবে?

সেই শিশুগুলো কোথায় পড়ে রইল কে জানে, গ্রামের ভাঙা রাস্তা দিয়ে আমরা ফিরছি। সঙ্গে রয়েছে জাদু-জুতো পরা গুপি-বাঘা, আর শূন্য সমান্তরাল ট্রেন লাইনের এক অদৃশ্য ট্রেন থেকে আমাদের যেন একদৃষ্টে দেখছেন রবীন্দ্রনাথ!

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

এই বছরটা যে ক্রমশ এত ঘটনাবহুল হয়ে উঠতে থাকবে, বর্ষারম্ভে বুঝতে পারিনি। তখন জানতাম, আমার আপাতত একটাই লক্ষ্য—রবীন্দ্রনাথের ওপর ছবিটা মনপ্রাণ দিয়ে বানানো এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা, সে যেভাবেই হোক।

বাকিটুকুর কথা জানি না, তবে ওই 'সে যেভাবেই হোক'-এর জন্য যে পদে-পদে পরীক্ষা দিতে হবে, ভাবিনি।

গত বছর পুজোর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল টানা অসুস্থতা—ওটাকে 'ক্যাল্‌কাটা ফিভার'

বলে চিকিৎসকরাও তেমন আমল দিলেন না। সব ক'টা উৎসব গেল সেই ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে। থেকে-থেকে জ্বর, কাশি, আর অসম্ভব শারীরিক ক্লান্তি। কলকাতার শেষ উৎসব 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-ও আমার এই দুর্বল অপারগতা থেকে রেহাই পেল না।

তারপর, আস্তে-আস্তে রবীন্দ্রনাথের কাজ শুরু হল। অর্ধেক দিন আমি শুয়ে, গায়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে, দু-একটা 'না বললেই নয়' এমন নির্দেশ বাতলে আবার চোখ বুজে ফেলছি।

এদিকে কলকাতা সিনেমা-জগৎ জুড়ে নানা উৎসব, নানা ঘটনা, নানা নতুন ছবির প্রথম প্রদর্শনী। নিমন্ত্রণপত্র জমা হচ্ছে বাড়িতে একের-পর-এক। বন্ধুদের তরফে, বেশির ভাগই অনুজ, অনুরোধ আসছে—'ঋতুদা এসো'।

একেবারে নিরাশ করব না বলে বলছি 'চেষ্টা করব রে', জামাকাপড়ও বার করে রাখছি—তারপর বিকেল ঘনিয়ে এলেই শীতের মশার মতো পিলপিল করে আক্রমণ করছে একরাশ অবসাদ আর ক্লান্তি। আবার চেয়ারে হেলান, আবার কাঁথা টেনে নেওয়া—ব্যস। যাচ্ছেতাই লাগছিল। একা একটা বাড়িতে দিনের-পর-দিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে থাকার অদ্ভুত যন্ত্রণা। এদিকে আবার চোখের একটা সমস্যা শুরু হল—ফলে টানা বই পড়া, ডিভিডি-তে নানা ছবি দেখা—একেবারে মাথায় উঠল।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের শুটিংয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। আপ্রাণ জোর করে, অন্তত দিনটুকু চালিয়ে নেওয়ার মতো শক্তি সংগ্রহ করে, এবার 'প্রি-প্রোডাকশন'এ ঢুকতে হল। তা-ও—আমার অন্য কোনও ছবির জন্য যে পরিমাণ ছুটোছুটি অক্লান্তভাবে আমি নিজে করি—সেটা আর হয়ে উঠল না। বেশির ভাগ দৌড়োদৌড়ি আমার সহকারীরা করল। দেবপ্রিয়া, পিনাকী, বিজন। আর আমায় ছুটে-ছুটে এসে দেখাত। কখনও পছন্দ, কখনও নাকচ—এই খেলার মধ্যে দিয়ে একদিন শুটিংয়ের দিন এসে পৌঁছল। শুটিং শুরু হল। একটা সুখের কথা, শুটিং চলাকালীন আমার শীত-গরম-রোগভোগ-ব্যথা-যন্ত্রণার অনুভূতিটা আশ্চর্যভাবে কমে যায়। তখন ক্যামেরাটার থেকে বেশি সত্যি আর কিছু থাকে না।

এবার দেখলাম, আমার শরীর ক্যামেরার এই মহার্ঘ উপস্থিতিকেও হারিয়ে দিল। সারা শুটিং জুড়ে হয় মাথা ধরার ওষুধ আনাচ্ছি, নয় জ্বরের; কিংবা আই ড্রপ্‌স। তা ছাড়া, হাতে-পায়ে ক্র্যাম্প। পা ঝুলিয়ে বসলে ফুলে ঢোল হয়ে যাচ্ছে। ঘ্যানঘ্যানে সর্দি, বিশ্রী অ্যালার্জি।

শেষ অবধি আমার সামনে দু'টোই চয়েস—হয় 'রবীন্দ্রনাথ' ছবিটার ঘ্যানঘ্যানে সমাপ্তি, নয় নিজেকে শেষ করা। এমন বিশ্রী স্বয়ংবরের সামনে দাঁড়াইনি কোনও দিন। এবার দাঁড়াতে হল।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

পাহাড় থেকে ফেরার গল্প পরে না-হয় হবে কোনও দিন। সেটা তো এমনিতেই অতীত—তারও পর আপনারা যখন পড়বেন, ততদিনে সেই গল্পের পূর্বাপর সকলের স্মৃতিতেই ম্লান হয়ে গিয়েছে।

আপাতত, তুলনামূলক ভাবে আরেকটু কাছের একটা ঘটনা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

সৌমিত্রদা (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার পেলেন—এ খবর ততদিনে বাসি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আনন্দ যখন আমাদের জীবনে এত বিরল ও ক্ষণায়ু, সেটাকে একটু দীর্ঘায়িত করতে দোষ কী?

সরকারি এই বিশিষ্ট খেতাবগুলো কোন-কোন অচেনা মগজের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে, কোন অজানিত গলিঘুঁজি দিয়ে, কখন কার কাছে পৌঁছে যায়—তা আমরা বুঝতেও পারি না, কেবল খবরটুকু পাই।

এই নির্বাচনে যেহেতু সাধারণের কোনও ভূমিকা নেই, তাই কাগজের বা টিভি-র এই সংবাদ শিরোনামটুকু নীরবে গ্রহণ করে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনও উপায় থাকে না।

যেহেতু, 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার ভারতের চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চতম রাষ্ট্রীয় সম্মান, এবং তার কদর মূলত চলচ্চিত্র জগতেই সীমিত; তাই সিনেমাপাড়ার বাইরের মানুষরা এতে খুব পুলকিত বা হতাশ কোনওটাই হন না।

সৌমিত্রদা'র বেলায় অনেকদিন পর এই নীরব নিস্পৃহতার অবসান ঘটল। 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার এক মুহূর্তে চলচ্চিত্রের আঙিনা ছাপিয়ে প্রবল জয়োচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

খবরটা প্রথম আমায় দিল বিশু—ও বহুদিন এ বাড়িতে আছে। ওর ঘরে টিভিতে কোনও সংবাদ চ্যানেলে এই সুসংবাদ দেখে এক দৌড়ে আমার ঘরের দরজায় ঘা দিল, তারপর বলল,

—দাদা, সৌমিত্রদা কী একটা প্রাইজ পেয়েছেন!

কী সুবাদে যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওর 'সৌমিত্রদা' হয়ে গেলেন, জানি না। এটা 'মিঠুনদা', 'বুম্বাদা' কিংবা 'দাদা' (অর্থে সৌরভ) অবধি ঠিক ছিল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তো ঠিক ওর কাছাকাছি বয়সি নন, আর সত্যি বলতে, ওঁর কাজ আর বিশু দেখেছেই বা কতটুকু! কিন্তু আমার একটা শিক্ষা হল।

বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে এই নামটা কতটা উজ্জ্বল, আমি প্রথম বুঝতে পারলাম। সাধারণত, কোনও কর্মরত শিল্পীর কপালে এই পুরস্কার জোটে না।

পুরস্কার-নির্ধারক কমিটি এটিকে 'অবসরপ্রাপ্ত মহান'দের পেনশন-পুরস্কার করে ফেলেছেন। ফলে, যে-শিল্পী আশির পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আজও নিজের ভেতরের 'অভিনেতা'-টাকে রোজ ভাঙচুর করছেন, মোকাবিলা করছেন নিত্যনব কঠিনতম পরীক্ষায়—তাঁর কাছে এই পুরস্কার এসে পৌঁছনো চরম আনন্দের হলেও—পরম আশ্চর্যের বটে।

তবে সৌমিত্রদার জীবনটাই বোধহয় আশ্চর্যে গড়া! জীবনের প্রান্তভাগে এসে মাত্র কয়েক বছর

আগে প্রথম 'শ্রেষ্ঠ অভিনেতা'-র জাতীয় সম্মান পেলেন যে-মানুষটি, তার কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর জন্য ভেসে এল 'দাদাসাহেব ফালকে'-র সম্মান।

এরপরেও কি সৌমিত্রদা কেবল 'সত্যজিৎ-মানসপুত্র' বা 'উত্তম-প্রতিদ্বন্দ্বী' হয়েই বেঁচে থাকবেন?

যাঁরা এখনও মনে-মনে আমার সঙ্গে একমত নন, দয়া করে সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা লিয়র' দেখে আসুন। মঞ্চে ঢোকার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই 'দাদাসাহেব ফালকে'-র সম্মান তাঁর মাথার মুকুটটার মতোই নির্জীব হয়ে যায়।

কারণ বাকি অভিনয়টা তো ওই মুকুটটাকে বাদ দিয়েই।

১ এপ্রিল, ২০১২

আগামী আর এক সপ্তাহের মধ্যে, মানে আপনি যখন আজকের এই 'ফার্স্ট পার্সন' পড়ছেন, ততদিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার ঘর করার পালা শেষ।

তথ্যচিত্রটির নাম নিয়ে অনেক ভাবলাম। আপাতত স্থির হয়েছে : 'জীবনস্মৃতি'।

কবির নিজের হাতে দেওয়া কবিজীবনীর নাম।

গত কয়েক মাস ধরে আমার পড়ার ঘর, শোওয়ার ঘর, এমনকী রোগশয্যার পাশটিতেও ছিল কোনও না কোনও বই কিংবা গানের সিডি।

এখন তাদের গুছিয়ে তাকে তোলার সময় হল।

এর নাম বিচ্ছেদ, না কি আরও গভীর মিলন—জানি না।

আপাতত মনের কোণে এতটুকু ছিদ্র অবধি পাই না, যেখান থেকে অন্য কোনও ভাবনা প্রবেশ করতে পারে।

তারপর ধীরে-ধীরে হয়তো একদিন কবি আমার হৃদয়ে তাঁর নিজের তাকটি খুঁজে নেবেন।

আমাকে আর রানি সুদর্শনার মতো অদর্শনের হতাশায় ছটফট করে মরতে হবে না।

তবে তাই হোক।

শান্ত হোক এই দাবদাহ, নামুক বর্ষা। আর আমার এই দেড়শো বছর বয়সি প্রণয়ীটির সঙ্গে চলতে থাকুক আমার সকল রসের ধারার খেলা।

২৯ এপ্রিল, ২০১২

যাক! এতদিনে শেষমেশ 'চিত্রাঙ্গদা' মুক্তি পেল। ২০১১-র গোড়ার দিকেই প্রায় অনেকটা হয়ে গিয়েছিল 'চিত্রাঙ্গদা'-র কাজ। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে 'চিত্রাঙ্গদা' অন্তরালবর্তিনী। তখন আমি রবীন্দ্র-তথ্যচিত্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।

এ বছর মে মাস নাগাদ রবীন্দ্রনাথের ছবিটির কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকেই 'চিত্রাঙ্গদা'-র মুক্তির তোড়জোড়।

এটা ব্যক্তিগত আফসোস। কলকাতার আগেই নিউ ইয়র্ক, মেলবোর্ন, দিল্লিতে ছবিটা দেখানো হয়ে গেল নানা উৎসবে। আর কলকাতায় এসে—অজস্র মানুষের প্রায়-অধৈর্য প্রতীক্ষা-sms ভর্তি করে ফেলেছে আমার মোবাইল।

আমরা যখন সিনেমা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছি, তখন Censor হওয়া অবধিই ছিল পরিচালকের এক্তিয়ার।

এখন মুক্তি পাওয়ার আগেই দিনটুকু পর্যন্ত নানা খবরের কাগজ। টেলিভিশন চ্যানেল, এমনকী FM রেডিও-তেও জড়িয়ে থাকতে হয় পরিচালককে।

ফলে, আজকালকার পরিচালকরা আর মোটেই নেপথ্যচারী নন। সকলেই নিজের মতো করে এক-একজন পারফর্মার।

সেদিন Bioscope mall-এ দু'টো শো-এর মাঝখানে ঝাঁকিদর্শন দেওয়ার জন্য বিকেল নাগাদ যাচ্ছিলাম বাইপাস ধরে।

দেখলাম, বেলাশেষের পুব আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ফুলে-ফুলে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ আর 'চিত্রাঙ্গদা'-র ফাঁক দিয়ে কখন যেন শরৎ এসে গেল, বুঝতেই পারিনি।

৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২

নতুন ছবি শুরু করার সময় হয়ে এল। শরদিন্দু-'সত্যান্বেষী' ব্যোমকেশ অবলম্বনে।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ইতিমধ্যে হয়তো আপনাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, আমার ছবিতে ব্যোমকেশ-এর ভূমিকায় সুজয় ঘোষ—সাম্প্রতিক কালে 'কহানি' ছবিটি পরিচালনা করে যাঁর প্রভূত খ্যাতি হয়েছে ভারতজুড়ে।

ব্যোমকেশ-সহকারী অজিতের ভূমিকায় আছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, আমাদের 'রোববার'-এর অনিন্দ্য, 'চন্দ্রবিন্দু'-র অনিন্দ্য, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গীতিকার অনিন্দ্য আর আমার 'শুভ মহরত'-এর অনিন্দ্য।

আমার নতুন চিত্রনাট্যে অজিত ব্যোমকেশের সহকারী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তেমনটি নন। তিনি মেধা, মনীষা ও বুদ্ধিতে প্রায় ব্যোমকেশের সমকক্ষ। অর্থাৎ, যথার্থ সহকর্মী।

আমার সেই সম্পাদক-সহকর্মীর হাতে আপাতত কাগজের দায়িত্ব ফেলে আমি চললাম উত্তরবঙ্গে। শুটিং লোকেশন দেখতে। জানি না, সেখানে থাকার ব্যবস্থা কীরকম হবে।

তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় হলে একটা ডাকবাংলা নিশ্চয়ই পেয়ে যেতাম।

অতএব, দুধের স্বাদ ঘোলে।

ডাকবাংলো 'রোববার'-এর পাতাতেই ছুটির নিয়ন্ত্রণ জানাক।

১০ মার্চ, ২০১৩

৬০ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ফলাফল ঘোষিত হয়ে গেল। আমার কপালে জুটল 'চিত্রাঙ্গদা'-র জন্য 'বিশেষ জুরি পুরস্কার'।

সংবাদমাধ্যম থেকে জানলাম যে, 'চিত্রাঙ্গদা'-র এই বিশেষ পুরস্কার প্রাপক আমি—পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতার কাজের স্বীকৃতি। চমৎকার!

আমার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'উনিশে এপ্রিল'। সেটা ছিল ১৯৯৩। তারপর 'দহন'। এরপর গোটা এক দশক ধরে আমি ছিলাম বাঙালি দর্শকের 'নয়নের মণি', বাংলা সিনেমার 'পোস্টার বয়'।

বাংলার এবং ভারতের নানা অগ্রণী, চলচ্চিত্র গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক বিশিষ্টরা আমার কাজ দেখে 'ভাল' বলেছেন, 'বাহবা' দিয়েছেন, 'পিঠ' চাপড়েছেন। এবং এই করে দশটা বছর শান্তিতে কেটে গিয়েছে।

২০০৩-এ 'চোখের বালি'। আমার সঙ্গে আমার দর্শকের সর্বোত্তুঙ্গ সেতু। কেবলই নিখাদ প্রশংসার নয়, অনেক সমালোচনারও বটে। 'কেন, বিনোদিনী কি কলকাতায় পাওয়া যেত না?' ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও, সবথেকে intense কোনও সম্পর্ক যদি আমার দর্শকদের সঙ্গে স্থাপিত হয়ে থাকে—তা হলে সেটা 'চোখের বালি' দিয়ে।

তারপর ধীরে-ধীরে ঋতুপর্ণ ঘোষ বদলাতে লাগল। বাংলা সিনেমার নিটোল আবেগঘন পারিবারিক উপভোগের আয়োজনে কোথায় যেন প্রবেশ করল অস্বস্তি। 'যৌনতা নিয়ে আবার এত বাড়াবাড়ি কেন?' ঋতুপর্ণর ছবি মানেই নিত্যনতুন বলিউড আমদানি। তবু, আমার দর্শকের নির্জলা বাঙালি-ভজনায় বাদ সাধলেও তখনও আমার নতুন ছবি বাঙালি দেখছেন।

এইবার সেই কঠিনতম অধ্যায়। ঋতুপর্ণ পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পর-পর তিনটে ছবিতে পৃথিবীর মূলধারার অন্যতম গোপন সিন্দুকটা খুললেন—যার নাম 'সমকাম'।

আমার দর্শকরা কিছুটা হলেও হতচকিত হলেন।

সবথেকে নিরাশ হলেন বাংলার মার্কসবাদী বিদগ্ধ বিশিষ্টরা। এবং আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, এই অগ্রজরা, যাঁদের আমরা নানাভাবে সমাজ বদলানোর কথা বলতে শুনেছি—বিকল্প যৌনতার সামনে এসে তাঁরা আসলে যে কী করুণভাবে চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী এবং রক্ষণশীল!

তাঁদের সমস্ত প্রতিবাদগুলোই কেবল অর্থনৈতিক অসাম্যের, গণতন্ত্রের এবং ধর্মনিরপেক্ষতার। তাঁদের বিপ্লবের মধ্যে যৌনতার স্থান নেই কোথাও।

গত বছর অগাস্ট মাসের শেষদিনে 'চিত্রাঙ্গদা' মুক্তি পেল কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে। অল্প কিছু মানুষের খুব ভাল লেগেছিল, তাঁরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, একদল আবার ছবি দেখে গুম হয়ে গিয়েছেন। আর, বেশির ভাগ মানুষই বিষয়-বিতৃষ্ণা থেকে ছবিটা দেখতেই যাননি। আজ জাতীয় পুরস্কারের স্বীকৃতির কারণে যত 'এসএমএস' বা অভিনন্দন পাচ্ছি, তার ক্ষুদ্র একটি সংখ্যাকেও যদি দর্শক-সংখ্যার প্রতিনিধি বলে ভাবতে পারতাম, তা হলে 'চিত্রাঙ্গদা'-কে কয়েক সপ্তাহ মাছি তাড়িয়ে উঠে যেতে হত না।

একটাই অনুরোধ। যাঁরা তখন ছবিটিকে খারাপ ভেবেছিলেন, দয়া করে আজ সরকার-প্রদত্ত রজতকমলের দ্যুতিতে নিজের মতামত জোর করে সংশোধন করবেন না।

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি 'চিত্রাঙ্গদা'-র জন্য পুরস্কার লাভ আমার কাছে আমার বাকি সব ক'টি জাতীয় পুরস্কারের থেকে অনেক মূল্যবান।

সমাজের একটি বিরাট অংশ—এই মূলধারা যৌনতার বাইরে বাস করেন, এবং অধিকাংশ সময়েই নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত কামনা-বাসনার কথা মুখ ফুটে জানান দিতে ভয় পান। সাফল্যের একটা বর্ম না-থাকলে, হতেই পারত আমিও ওঁদের মতো সংশয়াকুল নির্বাক হয়েই থাকতাম।

'চিত্রাঙ্গদা' আমাদের, এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষের, অনেক না-বলতে-পারা কথার উচ্চারণ।

তাই এই ছবির রাষ্ট্রীয় সম্মান আমার এবং আমার মতো অনেক মানুষের আশা। কোথাও একটা আলোর চিলতে দেখা দিলে সব ক'টি মুখই সেই আলোটা পেতে চায়।

৩১ মার্চ, ২০১৩
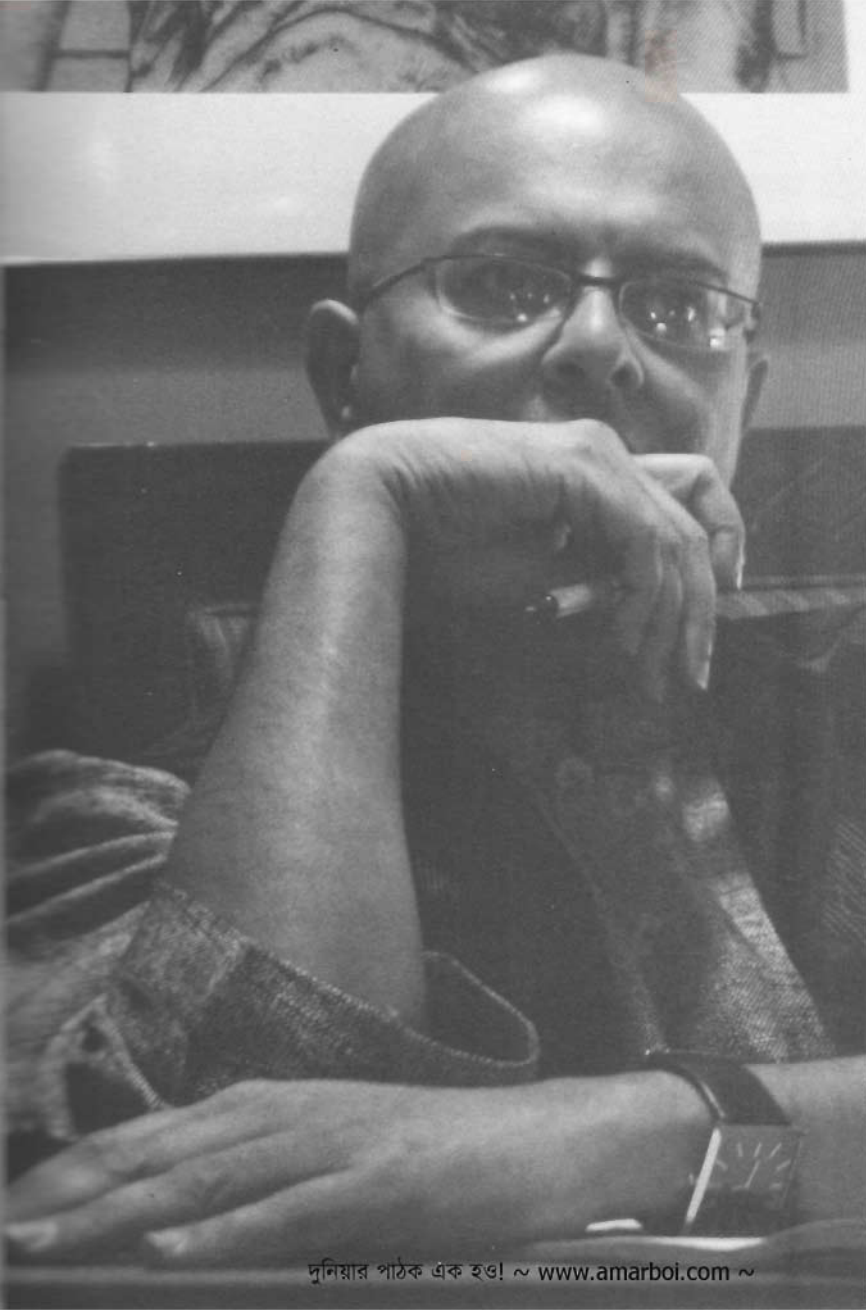
নব আনন্দে জগৎ জ্যোতির্ময়

দিগন্ত জুড়ে কালোর পর্দা ঢাকা
আলো দেখা যাবে একটুকু ফাঁক হলে,
মাথার ওপরে রাত্রির শামিয়ানা
চাঁদ নিবুনিবু, ধিকিধিকি তারা জ্বলে।

তারার আলোয় ঘুমোয় বেগুনি আভা
আকাশ ছাড়িয়ে নিকষ নেমেছে মাঠে,
কোন আলো বেশি আঁধারের কাছাকাছি!
সেই কথা ভেবে একজনা পথ হাঁটে।

যে কোনও আঁধারই সয়ে গিয়ে হয় আলো,
সেই আলোতেই ধীরপায়ে পথ চলা—
অনুমানে দুটি চরণ চক্ষুমান
নিচু মুখখানি ঢেকেছে মলিন ঝোলা!

কী আছে ঝোলায়? ন্যুব্জ কেন হে দেহ?
নির্বাক দুটি চোখ জ্বলে উত্তরে—
'জানো না রিক্ত সব থেকে বেশি ভারি
তাই নিয়ে চলি নতপিঠে, ঝোলা ভরে।'

বেগুনি আকাশে গোলাপি রঙের আভা
কে এক তরুণ আসছে উল্টোমুখে,
দিগন্ত থেকে অনন্ত আলো নিয়ে

আবির মেখেছে সিংহদরজা বুকে।

আলো আঁধারের মাঝখানে প্রান্তরে
যে পথে ক্লান্ত মাথা নিচু হেঁটে যায়
যে পথে দৃপ্ত আলো মেখে ধেয়ে আসে
মাঠের মাঝেতে দেখা হ'ল দুজনায়।

বিদায়ীকে যেন চিনতে পেরেছে, তাই
ক্ষণেকের তরে থামল নবীন বিভা।
কবে কোনদিন সূর্য ঘোরার পথে
পরস্পরের দেখা হয়েছিল কিবা?

বারোমাস আগে এমনই একটি দিনে
যাওয়ার মানুষ এসেছিল গৌরবে।
আজকে তাহ'লে শরীরে আঁধার মেখে
চুপিসারে কেন পথ চলে যেতে হবে?

মাঠের ওধারে সোনা ধানে লাল ছোপ—
রাজা বলেছেন, যত লাল হবে আরও,
ঠিক করে নাকি খোলতাই হবে সোনা।
তাই সব ধানে লাল—থকথকে, গাঢ়!

ভুলে গেছে রাজা উন্নয়নের দিনে
পৃথিবীর পথ দ্রুত থেকে দ্রুততর,
শিল্পও বড় বাসি হবে তাড়াতাড়ি
ভূমি তো আজকে ব্যস্ত হয়েছে বড়।

মরামাঠ বেয়ে আজকে নবীন আসে
ফিরে যাবে যবে একটি বছর পরে—
কারখানা-বাঁশি শাসনের বিউগল
এই কথা ভেবে মনে বড় ভয় করে!

যে জীবন আজ দিগন্ত ফুঁড়ে এল
নব বছরের কৃষ্ণচূড়ার ভোরে,

সে কি ফিরে যাবে এমনই দৃপ্তপায়ে
নাকি, জীবনের কাছে মাথা নিচু করে।

জীবনের কাছে তিল তিল করে পাওয়া
আস্ত একটা বছর ফেলনা নয়,
সবে মিলে যদি আগলে রাখতে পারি
সব কালো মুখে অমনি আলোকময়—
নব আনন্দে জগৎ জোতির্ময়।।

১ বৈশাখ ১৪১৪

মহাভারতের বনপর্বে অগ্নির সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় করাতে গিয়ে ঋষি বলেছিলেন 'যে অগ্নি আশ্রম রক্ষা করেন, তিনি বৈশ্বানর; যে অগ্নি বিবাহকালে বধূর সঙ্গে পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে আসেন তাঁর নাম দক্ষিণ অগ্নি; আর যে অগ্নি আত্মাকে দহন করে প্রজ্জলিত হন, তিনি কবি।'

এমন মহৎ অর্থের একটি শব্দ কালক্রমে জগৎসংসারে অজাগতিক, ভাবালু এবং পেলবতা-আক্রান্ত একটি বর্ণনায় পরিণত হয়েছে। তবু, কবি শব্দটি আজও নিমেষে এক স্বতন্ত্র সামাজিক গোষ্ঠির নির্ণায়ক, যাঁদের ভাষা মৌলিক এবং ভাব অনুকরণযোগ্য।

বিবেকের এক বিশেষ বিশুদ্ধীকরণই কবিতার আরেক নাম। আর, অনাবিল অগ্নিস্পর্শ আমাদের কাছে চিরকাল যাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরাই আমাদের কবি।

কবিদের ভাষা আলাদা, ভঙ্গি অন্য। বুঝিবা, প্রাত্যহিক মালিন্যের বাইরে যে সদাজায়মান পূর্ণবিকচ জীবন তার সন্ধান দেওয়ার জন্য বারবার করে এক অনন্যতার নূতনতর ভাষা ভঙ্গির প্রয়োজন হয়ে এসেছে।

ঋগ্বেদে কবি কথাটির অর্থ ঋষি।

কবিরা মানুষের অন্তরের কথা বলেন, আহার-মৈথুন-নিদ্রায় অচেতন আমাদের ভেতরের কথা এমন করে বলেন যে আমরা সতত উল্লিসিত হই—'একথা তো আমারও' ভেবে, আবার শ্রদ্ধাবনত হই যে 'এ প্রকাশভঙ্গি আমার দৈনন্দিনতার' উর্ধ্বে কল্পনা করে।

যে কোনও সামাজিক সংকটে অন্তরের কোনও একটি বিশেষ পংক্তি বহিঃপ্রকাশের মূলমন্ত্র হতে দেখেছি আমরা বহুবার। 'বন্দে মাতরম্-ই' হোক, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'ই হোক, 'হেঁই সামালো

ধান-ই' হোক আর শান্তিপুরের ধুতির পাড়ে বুনে দেওয়া 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে'ই হোক।

আমার এক বড় প্রিয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেক কবিতার মতো 'আর যুদ্ধ নয়' ও আমার বড় প্রিয় কবিতা। আমি আবৃত্তিকার নই। কিন্তু জোরে জোরে কবিতা পড়তে ভালবাসি। সুনীলদার এই কবিতাটি আমি বহুবার নিজে নিজে পড়েছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঘরোয় আড্ডায় পড়ে শিহরিত হয়েছি, মনে জোর পেয়েছি, ভেতরে যদি কোনও শক্তি থেকে থাকে মুহূর্তের জন্য হলেও তা জাগ্রত হয়েছে।

আমরা তো আমাদের আয়ুষ্কালে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা সক্রিয় নজরুলকে পাইনি। সুনীলদার এই কবিতাটি আমাদের অনেক তরুণের গোপন মনের বিদ্রোহের বিজয়কেতন হয়ে আছে।

সুনীলদার একটি সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ আছে 'সাদা পৃষ্ঠা, তোমার সঙ্গে'। তার পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় কবিতাটি মুদ্রিত আছে। সঙ্গে সুনীলদার নিজের লেখা ভূমিকা। ভূমিকাটি পড়লে কবিতাটির অন্তর্দাহ অনেক বেশি প্রোজ্জ্বল-প্রাঞ্জল হয়, তাই ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি। এবং তারপর কবিতাটি তুলে দিলাম। ল্যাটভিয়ার রিগা শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে, জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আমার মতন কঠোর লোকেরও কান্না এসে গিয়েছিল। চল্লিশ বছর আগে ওই স্থানটিতে আশি হাজার শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। আমি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অনেক বর্ণনা আগে পড়েছি। কিন্তু বইতে পড়া আর নিজে সেরকম কোনো স্থানে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে উপলব্ধির অনেক তফাত। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়ল, একটি বিখ্যাত চেকোশ্লোভাক যুদ্ধ-বিরোধী উপন্যাসের লাইন, "কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ।" বাকি লাইনগুলি সেই অনুষঙ্গে লেখা। হয়তো ঠিক সুললিত কবিতা হলো না। কিন্তু লাইনগুলি এইভাবেই আমার মনে এসেছিল। ঠিক সেইরকমই লিখে গেছি।

'কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ।'
তুমি কে, তুমি কি গ্রহান্তরের দল-ছুট?
তোমার কখনো ছিল না কি শৈশব?
তুমি কি কখনো দেখোনি মাটিতে ঘুমন্ত কোনো শিশু?
জানলার ধারে দাঁড়ানো, একলা, শূন্যদৃষ্টি নারী?
কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!
নামাও রাইফেল
এ পৃথিবী তোমার একলার নয়
এ পৃথিবী লোভের, ঘৃণার উন্মত্ততার নয়

আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে, আমি তোমার দিকে
আর তাকাতে পারিছ না।

কী গভীর নিঃস্ব বন চারদিকে
ওরা জানে, ওরা সব দেখেছে
ধোঁয়ায় গ্রাস করেছে নিষ্পাপ বাচ্চা ও ব্যাকুল মহিলাদের
ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিতদের দিকে উদ্যত মুষ্টি তুলেছে যারা
তারা কে?

কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছো হে, এখনে সবাই মানুষ!

লাটভিয়ার রিগা শহর থেকে নন্দীগ্রাম অনেক দূরে,
সুনীলদা?

২২ এপ্রিল, ২০০৭

বেছে নিতে হলে দু'টোই তো মাত্র প্রতিবেশী স্বর্গ বা নরক।
কারণ, মর্ত্য মানে যদি হয় পৃথিবী
গোটা পৃথিবীটাই তো আমার পাড়া।
নাকি বাড়ি?
এজমালি উঠোন ঘিরে আট কুঠুরি নয় দরজা দালান।

সকালে বোষ্টম ভিখিরি গান শুনিয়ে যায়
সিমেন্টের রোয়াকে তার বসবার জায়গা নিত্যবরাদ্দ,
কবে কোন বর্ষারাতে মিটারবক্সের তলায় এসে সেঁধিয়েছিল
ভিজে বেড়ালটা
ছানাপোনা নিয়ে দিব্যি কেমন থেকে গেছে,
উল্টোদিকের দেয়ালে লেটারবক্সের বিবর্ণ সংসার
একজন কি অপরের প্রতিবেশী? নাকি বাড়ির লোক?
কার বাড়িতে টিভি চললে
বুঝি তবে চা বসাতে হবে?

কার বাড়ির রেডিও বলে
ঘড়ি মেলাও, ঘড়ি মেলাও—

খড়খড়ির ওপাশ দিয়ে দেখি
কার বাড়িতে ঢুকল প্রমাণ সাইজ মিষ্টির বাক্স,
বুঝি এবার আবার পাত্রপক্ষ আসবে।
নিজের কালো মেয়েটাকে মনে মনে দুষি
আর লক্ষ্মীর ভাঁড় নেড়েচেড়ে দেখি
হঠাৎ বিয়ের উপহারের টাকাটুকু মজুত আছে তো?

লোডশেডিং-এ সব জানলায় মোমশিখা
তখন কেবল দূরের আলোই প্রতিবেশী,
বৃষ্টিতে শান দিচ্ছে উঠোনের পেছল—
ফোনে শুনি অফিস পাড়ার খটখটে রোদ্দুর!
একনিমেষে রোদপোয়ানো সবকটা মানুষ যেন প্রতিবেশী

রাত হয়
আঁজলা ভরা ধেনো মদ দেহের ভেতর ভরে নিয়ে
সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে যে মানুষটা
তার পায়ের শব্দ চিনি, কিন্তু তাকে তো চিনি না
কেন তাকে চৌকাঠ ডিঙোতে দেব?
তবু কড়ানাড়ার আগেই খিল খুলি
আর দাঁত চেপে বলি
'তুমি প্রতিবেশী আমার সংসারে।'

রাত বাড়ে
টালমাটাল পা, বেসামাল হাত, জড়ানো গালিতে
ভিজতে ভিজতে ঢোঁক গিলি আর বলি
'কেন তুমি প্রতিবেশী হলে, নরক?
আমি তো তোমার সাথেও ঘর বাঁধতে রাজি ছিলাম!'

রাত কাটে, মেঘ কাটে
রোদ ফোটে, সামনের মাঠে পুজোর প্যান্ডেল ফোটে সহস্রদল পদ্ম
পাড়ার ছেলেরা আলো দিয়ে সাজিয়ে দেয় সবকটা জানলা

আলোর স্বর্গে আমরা একঘর কিন্নরদল।

সেই যে পড়েছিলাম ভিনদেশি মহাকাব্যে
ঘোর যুদ্ধকালে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন
অনির্বচনীয়া গ্রিকসুন্দরী,
অমনি ক্ষণিকের তরে স্থাণু হল যুদ্ধক্ষেত্র।
সমস্ত হানাহানি চিত্রার্পিত নতজানু সুন্দরের পাদপীঠে
বল্লমধারীর উদ্যত বল্লম নির্জীব মুহূর্তের জন্য
আর বল্লমের তলার মুমূর্ষুও
সেই রূপসাগরে ঢেলে দিয়েছে সমস্ত প্রাণভয়।
সুন্দর, যে এতক্ষণ ছিল প্রতিবেশী,
যেন সরাসরি আসন নিল হানাহানির হৃদয়স্থলে

কিংবা মহাভারতের সেই সেই মানুষটা,
কূপের ভিতরে উল্লম্ব
ওপরে মত্ত দাঁতাল হাতি, নীচে বিষধর সর্প
আর বৃক্ষলতার গায়ে মধুক্ষরা চাক
টুপটুপ করে গড়িয়ে পড়ছে অমৃতধারা
অন্তিমকে দিচ্ছে অখণ্ড পরমায়ু
মধুময় হচ্ছে আকাশ, বাতাস, মহাসিন্ধুবারি।

দেখি আর ভাবি,
মনে হয় একতুড়িতে স্বর্গকে ডেকে বলি,
'যারে, ব্যাটাচ্ছেলে!
আজ থেকে তোকে আর প্রতিবেশী ভাবব না।
তোকেও আমাদের বাড়িতে জায়গা দিলাম।
দ্যাখ, আমাদের এই ছোট্ট সংসারে
মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারিস কি না!'

৩ জুন, ২০০৭

ছবির শুটিং-এর প্রথম কিস্তি শেষ হল।
আপাতত কয়েকদিনের বিশ্রাম।

অনেকদিন পর রোববার দপ্তরে বসে ফার্স্ট পার্সন লিখছি।

ছবিটার নাম শেষ অবধি 'সব চরিত্র কাল্পনিক' থাকবে কি না জানি না।

বহুদিন অবধি সেটাই চিত্রনাট্যের নাম ছিল। ছবিটা তাড়াহুড়োয় শুরু হ'ল বলে সেটাই শেষ অবধি নাম হিসেবে রয়ে গেল। দেখা যাক!

পত্র পত্রিকায় নানা জায়গায় আমার, প্রসেনজিৎ-এর, বিপাশার ছবি বেরচ্ছে। বিপাশা বসুর প্রথম বাঙলা ছবি নিয়ে খবরও হচ্ছে অনেক।

এত খবরের মধ্যে একটা খবর বোধহয় চাপা পড়ে গিয়েছে। সিনেমার জার্নালিজম খবরটাকে বোধকরি ততটা গুরুত্বের হিসেব দিয়ে মাপেনি। কারণ, সিনেমার খবরের পাঠকদের কাছে হয়তো সেটা অতটা মনোযোগের নয়। এটা আমি আমার নিজের একসময়ের সিনেমা-পাক্ষিক সম্পাদনার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি।

আর হেঁয়ালি করব না। এই খবরটা আপনাদের কাছে পৌঁছেছে কিনা জানি না। আমার সাম্প্রতিক ছবির নায়ক একজন কবি। বাংলা কবি। তাঁর নাম ইন্দ্রনীল মিত্র। অভিনয় করছেন প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিতের কবি সাজা কেবলমাত্র অভিনেতার নতুন ছদ্মবেশ নয়।

সব চরিত্র কাল্পনিক-এর আখ্যানের অনেকখানিই গড়ে উঠেছে ইন্দ্রনীলের কবিতাগুলোকে ঘিরে।

ইন্দ্রনীল এবং তার স্ত্রী রাধিকার (বিপাশা বসু) জীবনের অনেক মিলন বিরহ, বিচ্ছেদ-পুনর্মিলনের সেতু এই একেকটি কাব্যাংশ।

না, সেটা খবর নয়।

কবিতাকে অবলম্বন করে একটা কাহিনি নির্মিত হতেই পারত। তার মধ্যে অভূতপূর্ব কিছু নেই। ফলে, সেটা খবর নয়।

খবর বলে যেটা আমি মনে করি, সেটা হ'ল এই কবিতাগুলোর রচয়িতা প্রসঙ্গ। দুর্ভাগ্যবশত 'সব চরিত্র কাল্পনিক' এর নানাবিধ ডামাডোলে সেই উজ্জ্বল নামটি অত্যন্ত দীনভাবে অনুপস্থিত।

কবিতাগুলো জয়ের লেখা। জয়, মানে আমাদের জয় গোস্বামী।

জয় গোস্বামীর সঙ্গে বাংলা সিনেমার সম্পর্ক নবীন নয়।

'সাঁঝবাতির রূপকথারা' এবং 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'র স্মৃতি এখনও অনেক বাঙালি দর্শক অতিক্রম করতে পারেননি।

কিন্তু এই দুটি ছবির ক্ষেত্রেই জয়ের ভূমিকা কবির থেকেও বেশি কাহিনিকারের।

'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এ জয় আছেন স্বমহিমায়, স্বগরিমায়। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা নিয়ে।

ছবিতে সেগুলো নায়কের রচনা।

কয়েকটি কবিতা আমরা আগেও পড়েছি বা শুনেছি।

কয়েকটি কবিতা কেবলমাত্র ছবির জন্যই লেখা।

বাংলা সিনেমায় ব্যবহৃত হবে বলে একজন কবি নতুন করে কবিতা লিখে দিয়েছেন, সেটা নিশ্চয়ই খবর।

চিত্রনাট্যটির প্রথম খসড়া লেখা হয়েছিল আজ থেকে বহুবছর আগে। উনিশে এপ্রিল আর 'দহন'-এর মধ্যবর্তী সময়ে।

জয়-কাবেরী তখন যোধপুর পার্কে থাকে। বুকুন তখন নেহাৎ-ই শিশু। তখনও জয়ের সঙ্গে আমার অকপট বন্ধুতা গড়ে ওঠেনি। আমি জয়ের কবিতার গুণমুগ্ধ ভক্ত, আর 'উনিশে এপ্রিল'-এর সুবাদে জয় আমার নামটুকু জানে মাত্র।

চিত্রনাট্যে, এখন সিনেমায়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আছে—নন্দর মা।

অভিনয় করেছেন সোহাগ সেন। নায়ক কবি ইন্দ্রনীল নন্দর মাকে নিয়ে একটি কবিতা লেখে।

ছবিতে সেই কবিতার একটা আদরাচ্ছন্ন, মায়াময় ভূমিকা আছে।

কবিতাটি লিখে দেওয়ার পর জয়কে আমি একটা অনুরোধ করেছিলাম—ছবিটা না হওয়া অবধি কবিতাটা কোথাও ছাপিও না, জয়।

আজ বারো বছর পর ছবিটা হল। জয় অঙ্গীকারভঙ্গ করেনি।

করলাম আমি।

এই সংখ্যায় নন্দর মা কবিতাটি ছাপিয়ে দিলাম।

রোববার-এর তরফ থেকে এটা দুহাজার আট-এর একটি অনবদ্য উপহার।

ও! একটা কথা মনে পড়ে গেল। কবিতাটি লিখে দেওয়ার পর, খামের ওপর জয় একটা কথা লিখে দিয়েছিল—

ঋতু, আমি তোমার গৌরীপ্রসন্ন!

নন্দর মা

জয় গোস্বামী

সেই কোন দেশে আমরা যাচ্ছিলাম
কোন দেশ ছেড়ে আমরা যাচ্ছিলাম
পেরিয়ে পেরিয়ে উঁচু, নিচু, ঢালু মাঠ
শিশির ভেজানো কাঁটাতার, গাছপালা

আলপথে নেমে আমরা যাচ্ছিলাম
ধানক্ষেত ভেঙে আমরা যাচ্ছিলাম
ছোট বোন আর মা বাবা, গ্রামের লোক
তার পাশে আমি, দুলালী? না প্রিয়বালা?

বাবা-মার-র ডাক বাড়িতে দুলালী ব'লে
প্রিয়বালা নাম দিয়েছিল পাঠশালা
দু-তিন ক্লাসের লেখাপড়া সবে শুরু
গ্রামে কে বলল ঃ 'পালা রে সবাই, পালা...'
সারা গ্রাম নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম

মা-বাবা, দু-বোন, পালিয়ে যাচ্ছিলাম
ঝোপঝাড় ঠেলে, হাজামজা নদী ঠেলে
পথে ঘুমন্ত দাঁড়িয়ে খড়ের চালা

ঘুমন্ত বেড়া, চালে ঘুমন্ত লাউ
উঠোনে শোয়ানো গরুর গাড়ির চাকা
শোয়ানো লাঙল, দাওয়ায় শিউলি গাছ
ঘোড়া নিমগাছে চাঁদ অর্ধেক ঢাকা।

শব্দ না করে চলে যাই, তবু ডাল
নিচু হয়ে এসে ছুঁয়েছে কপাল, মাথা
শিশিরে ঠান্ডা, ভেজা আর খসখসে
হাতের পাতার মতনই গাছের পাতা

কত কত মাঠ পার হয়ে তারপর
জিরিয়ে নিয়েছি গাছেরই তলায় বসে
যে যার পোঁটলা খুলে চিঁড়ে গুড় মুড়ি....
শেষে চোখ লেগে এসেছে ক্লান্তি-দোষে।
আচমকা দেখি ছুটোছুটি করে লোক
কীভাবে আগুন লেগে গেছে গ্রামে গ্রামে
কইরে আদুরী? ও দুলালী, তোরা কই?
মা-বাবা ডাকছে আমাদের ডাক-নামে।

আমি রইলাম, আদুরী ছিটকে গিয়ে
কোথায় পড়ল, কেউ জানল না কিছু
আমরা সবাই কাঁটাতার পেরোলাম
আমরা সবাই, ঘাড় নিচু, মাথা নিচু

খাতা পেরোলাম, ইমিগ্রেশন খাতা
লঞ্চ পেরোলাম, তারপর ট্রেন পথ
কোন এক দেশে আমরা যাচ্ছিলাম
যত গেছি তত ছিঁড়ে ছিড়ে গেছে পথ

কোথায় সে দেশ? অতীতে? ভবিষ্যতে?
সে কোন বয়স আমরা ছেড়ে এলাম
দুলালী, দুলালী—প্রিয়বালা, প্রিয়বালা
রাস্তায় পড়ে হারিয়ে গিয়েছে নাম।

খানিকটা নাম ধানক্ষেতে পড়ে গেছে
খানিকটা গেছে নদীজলে, আঘাটায়
খানিকটা নাম নিয়ে নিল পাঠশালা
খানিকটা গেল রাস্তার দাঙ্গায়।

যে গাছের নীচে জিরোতে বসেছিলাম
খানিকটা নাম সেই গাছটায় আছে
খানিকটা নাম মাঠের শিশির নিল
খানিকটা গেছে রাতপড়োশির কাছে...

খানিকটা নাম বেড়ায় আটকে গেল
খানিকটা গোঁজা রইল খড়ের বাতায়
খঅনিকটা নাম কাঁটাতারে-তারে বেঁধা
খানিকটা যায় ইমিগ্রেশন খাতায়
একটা বয়স সে দেশে ছেড়ে এলাম
একটা বয়স নিয়ে ছেড়ে দিল স্বামী
একটা বয়স ছেলে বড় করে শেষ
ছেলে নামেই আজ চেনা দিই আমি।

আজ চারিদিকে ফ্ল্যাট বাড়ি, ফ্ল্যাট বাড়ি
আজ চারিদিকে বস্তি বস্তি লোক
লাইনের পাশে বাঁশ দরমার ঘর
ঘর থেকে আসে কাজ করা মেয়েলোক।

ঠিকে ঝি ছিলাম, এখন রাতদিনের
খাওয়া পরা পাই এখানে, ফাইভ সি-তে,
ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়েছে, আমি
এখানেই থাকি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে...

এইখানে বসে, আমি নন্দর মা,
ছেলেকে ভাবি না, ভাবি না স্বামীরও নাম
শুধু মনে পড়ে আমরা যাচ্ছিলাম
সেই কোন দেশে পালিয়ে যাচ্ছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল গাছপালা
যাচ্ছিল চাঁদ, সার সার চালাঘর
ঘরে কে আগুন দিয়ে বলেছিল, 'পালা'—
পর পর লোক, পোড়া গ্রাম পরপর

পর পর ছাদ, পর পর অ্যান্টেনা
ছাদের মাথায় ভাসছে চাঁদের থালা
থালা কে বলেছে? তোমরা কি জানতে না
পোড়া গ্রাম ওই একচোখে চাঁদে জ্বালা?

না কেউ জানে না, ভুলে গেছে, ভুলে যায়
পরপর বাড়ি উঠে যায় মাটি ফুঁড়ে
পরপর গাড়ি ছুটে যায় বোবা কালা
গ্রাম-পোড়া ছাই এখনো আসছে উড়ে।

দোয়ালে লাগছে, জানালায়, দরজায়
ফুলঝাড়ু হাতে কে পরিষ্কার করে?
কে বাজারে যায়? কে আনে ভাতের থালা?
কে এত কালের রোদ, বৃষ্টিতে, ঝড়ে

অযত্নে বাঁচে? যে নিজেই গাছপালা?
কী গাছ? কী গাছ? বলো বলো ফ্ল্যাট বাড়ি,
বলো পোড়া চাঁদ, বলো সব বোবা কালা
নন্দর মা কি দুলালী, না প্রিয়বালা?

১৩ জানুয়ারি, ২০০৮

কুয়াশায় মোড়া আকাশের দিকে চেয়ে পাহাড়ি রাস্তার ধারে ক্লান্ত ভিজে বেঞ্চটায় বসেছিল উর্মি। আপাতত চারপাশে আর কেউ নেই। দূর আকাশের গায়ে নেমে আসছে মেঘ। থমথম করছে চারদিক। হয়তো বা বৃষ্টি আসবে।

সাতই জুন বর্ষারম্ভের অফিশিয়াল তারিখ। আজ ষোলো। আষাঢ়ের প্রথম দিন।

আজ প্রায় কুড়ি বছর হল উর্মি এই পাহাড়ি অঞ্চলের চা বাগান গৃহিণী। সবুজের নানা স্তর, কুয়াশায় ঝাপসা করে দেওয়া দিগন্তই তার কারাগার।

হ্যাঁ, কুড়ি বছর তো হবেই। মেয়ে তিতলির বয়সই তো আঠেরো হতে চলল প্রায়!

সেদিন বাগডোগরা যাওয়ার পথে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল একজন মানুষ। অনেক কাকুতি মিনতি করে গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছিল এক মধ্যবয়সী সুদর্শন যুবককে।

মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল চারদিক। ভাসমান মেঘ থমকে দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের গায়ে। ভিজে গাছের পাতা থেকে ঝরে যেতে গিয়েও নির্নিমেষ টলটল করছিল গাছের শিশির। গাড়িতে এসে বসেছিল রোহিত রায়।

দেশজোড়া সমস্ত মেয়ের বুক-ধক-করে ওঠা স্বপ্নপুরুষ। যার কাছে গচ্ছিত আছে হাজার হাজার নারী হৃদয়।

উর্মির মেয়ে তিতলির। বুঝিবা উর্মিরও।

তারপর পাহাড়ের আঁকাবাকা রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছিল এক অদ্ভুত যাত্রায়।

তিতলির যাত্রা স্বপ্নের। উর্মির যাত্রা স্মৃতির।

মধ্যে মিনিট দশেক জিরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে দূর আকাশের দিকে চেয়ে হঠাৎ অনেক হারিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়েছিল উর্মির।

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে

পরাঙ্মুখ নতুন নালিঘাস দুয়ার চেপে ধরে

কেবল এই লাইনগুলো হিন্দি, ইংরিজি আর কোনও ভাষায় এমনটি করে পাব না বলে আমি অনেক প্রলোভন সত্ত্বেও হিন্দিতে 'তিতলি' ছবিটা করার নানা সুযোগ ফিরিয়ে দিয়েছি বারবার।

বহুদিন অবধি তিতলি ছবিটার নাম ভেবেছিলাম 'পয়লা আষাঢ়'।

ছবির গোড়ায় মেঘদূত থেকে একটা ছোট্ট উদ্ধৃতি আছে। তার বাংলা খুঁজতে গিয়েই প্রথম জানতে পারি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মেঘদূত অনুবাদ আছে।

পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন আমার অলৌকিক লেগেছিল।

দুই

রেনকোট ছবিটা প্রথম লিখেছিলাম বাংলায়।

তারপর ওটা হিন্দি ছবি হিসেবে ভাবা হল। বাংলায় হলে ছবিটায় আনন্দ ভৈরবী কবিতাটা ব্যবহার করতাম।

বর্ষার দিনের দুই বিচ্ছিন্ন অভিমানী হৃদয়ের গল্প বলার জন্য এই কবিতাটাই আমার কাছে ছিল এক অমোঘ আশ্রয়।

শেষ পর্যন্ত ছবিটা যখন হিন্দিতে হল, ভেবেছিলাম একটা চেষ্টা করে দেখা যাক না—কবিতাটা হিন্দি করা যায় কিনা।

গুলজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তিনি পরম উৎসাহ ভরে হিন্দি অনুবাদে রাজি হয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম, অনুবাদটা উৎরে গেলে মীনাক্ষীদির থেকে অনুমতি নেব।

গুলজার বাংলা ভাষাটা জানেন। ফলে ওঁর পক্ষে হিন্দি অনুবাদের কাজটা তুলনামূলকভাবে সহজ।

তবু আমায় বলেছিলেন একটা চলনসই ইংরেজি অনুবাদ করে পাঠাতে। কোথাও হোঁচট খেলে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন।

শেষমেশ হিন্দি কবিতাটা দাঁড়াল না। গুলজার নিজেই একটা কবিতা লিখে দিলেন।

মধ্যিখান থেকে আনন্দ ভৈরবীর একটা কাঁচা ইংরেজি অনুবাদ রয়ে গেল।

সে কি জানিত না এমন দুঃসময়-এর সর্বনামটা ইংরেজি অনুবাদে She করলাম। এটা he-ও হতে পারত।

এইজন্যই বোধহয় সব বাংলার ইংরেজি হয় না।

প্রতিবার প্রতিটি পাঠক প্রত্যেকবার পড়ার সময় তার মনের মতো করে এই 'সে'-কে নির্মাণ করেন বাংলা কবিতাটিতে।

ভাষান্তরের ক্ষেত্রে এটা হয়তো একটা প্রাথমিক অসুবিধে। কিন্তু সব কবিতায়ই তো এই অসুবিধে অমন জাগ্রত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় না।

সেই 'সে'-কে? এই রহস্যকে ছুঁতে পারিনি বলেই বোধহয় অনুবাদটা এতদিন বাক্সবন্দি ছিল।

The room is still the same, just the picture is tilted
Unlike the lost monsoon's last hours
There were rain-drenched flowers in the garden
Morning glory showers.

To the same field no cowherd comes today
No magic flute weeps at the Banyan root
The lightning flashes in the cloud dark shy
In the old remembered way.

Didn't she know bad times in haste
The rooster's red comb twists
Didn't she know the heart's dull waste
Is the miser's clenched left fist.

That of all the grand capitals we know
The heart in reckoning fails
Didn't she know, whom I know so
Like the sea beneath my nails.

Today I'm here again, but the picture is tilted
Unlike the lost monsoon's last hours
There were rain drenched flowers in the garden
Morning glory showers.

২৩ মার্চ, ২০০৮

আমার মা'র ছোটবেলায় মামারবাড়িতে একজন গুরুদেব আসতেন। নৈহাটি থেকে। আমার দাদু-দিদিমা'র দীক্ষাগুরু।

এমনিতেই পুজো আচ্চা নিয়েই থাকার কথা তাঁর, কিন্তু গল্প শুনেছি বড় বিষয়ী এবং মামলাবাজ ধরনের মানুষ ছিলেন তিনি।

কোনও প্রতিবেশী একবার তাঁর কাঠাল গাছ কেটে নিয়েছিল বলে গুরুদেব নাকি প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে নালিশ করে চিঠি লিখেছিলেন।

আমার গল্‌ফ ক্লাব মামাবাড়িতে গুরুদেব এলেই বাচ্চাদের মধ্যে কিছুটা ত্রাস সঞ্চারিত হত। কারণ গুরুদেব ডেকে ডেকে ছোটদের বসিয়ে ধর্মকথা শোনাতেন—তারা মোটেই সেটা পছন্দ করত না। তারা ছলছুতো করে এদিক ওদিক কেটে পড়ত।

ফলে, কিছুক্ষণ পরেই মামারবাড়ির বিশাল হলঘরটা ফাঁকা। খালি গুরুদেব একা বসে আছেন মাটিতে।

এ দেখে মা'র শিশুমনে কোন আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল, জানি না। মা পাঁচ বছর বয়সে প্রথম কবিতা লিখেছিল,

সবাই চলে গেছে যে যাহার কাজে
গুরুদেব বসে আছেন কার্পেটের মাঝে!

পরে সারাজীবন আমরা মা'কে ক্ষেপিয়েছি
—তুমি হঠাৎ একটা 'যাহার' লিখতে গেলে কেন?
মা হাসত। কিছু বলত না।
আমার মামাবাড়িতে কবিতা পড়া বা লেখার তেমন চর্চা ছিল না।
বরং, বাবা অনেক বেশি কবিতা পড়তে ভালবাসত।

সিগনেট প্রেসে'র ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'বনলতা সেন' বইগুলো কেন অত যত্ন করে বইয়ের তাকে থাকত, জানি না। শিশুবেলায় সেগুলো পড়ে কিছু বুঝতামও না, আর না ছিল তাতে পাতায় পাতায় ছবি।

আর কেন যে বাবা মা ধরে নিয়েছিল যে, জীবনানন্দ পড়ে শোনালে শিশুর ভাল লাগবে না, তা-ও জানি না।

আমার বয়সি প্রত্যেক বাঙালি শিশুর মতোই, কবিতায় আমার হাতেকড়ি সুকুমার রায় দিয়ে।

কানে শুনে প্রায় সব কবিতাই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল আমার। তবু মা'কে মাঝেমাঝেই 'আবোল তাবোল' ধরিয়ে দিয়ে বলতাম।

—পড়ো।

কেন যে হঠাৎ, 'ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর'—লাইন দু'টো পড়ার সময় উচ্চকিত ছন্দাবৃত্তি মা'র গলায় অকারণে অজান্তেই ম্লান বিষণ্ণ হয়ে আসত, বুঝিনি তখন। এই কবিতাটা পড়ার পরেই আনমনে মা বইটা বন্ধ করে দিত।

আর আমি ভাবতাম, মা'র বুঝি আজ আর পড়তে ইচ্ছে করছে না।

বাড়িতে একটা দেব সাহিত্য কুটিরের বৈষ্ণব পদাবলীর বই ছিল। পূর্ণ চক্রবর্তীর আঁকা রঙিন ছবিতে কখনও পূর্বরাগ, কখনও অভিসার, কখনও রক্তবসনা বিরহিনী রাধা 'যোগিনী পাগলপারা' আবার কখনও 'দেহি পদপল্লবমুদারম'। কী যেন বুঝতাম ব্রজবুলি ভাষার, জানি না, ছন্দটা লেগে থাকত কানে।

এখন যখন সবাই জিগ্যেস করে, কেমন করে মৈথিলি ভাষায় গান লিখলাম 'রেনকোট'-এ, আমি ভেবেচিন্তে কোনও উত্তর দিতে পারি না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দেব সাহিত্য কুটিরের বৈষ্ণব পদাবলীর সেই খসখসে পাতার বইটা।

ছোটবেলায় আমার একজন মাত্র চেনা কবি ছিল আমার দিদাই।

দিদাই'র মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দবোধ ছিল। কবিতা লিখতে বড় ভালবাসত। গৃহবধূর শৌখিন কাব্যচর্চাকে বাড়ির কেউ-ই তেমন আমল দেয়নি। নইলে আজ দিদাইয়ের অনেক অবসরের রচনা হয়তো আমার সংগ্রহে থাকত।

শুনেছি, ভীষণ দুঃখ পেলে দিদাই নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকত, সবাই জানত সেটা গৃহিণীর মেয়েলি অভিমান। আসলে ওই প্রবল বেদনা থেকে দিদাইয়ের অপটু, অন্য হস্তাক্ষরে রচিত হত এক এক টুকরো কবিতা।

এবং ঠিক যে নিয়মে সময় এসে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তীব্রতম দুঃখকেও কোনও এক জাদুলেপ দিয়ে সহনীয় করে দেয়, ঠিক তেমনই সময় এসে কখন যে ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গিয়েছে নানা টুকরো কবিতা-চিরকুট, মামার বাড়িতে তার খবরও কেউ রাখেনি।

শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর দিদাই বেশ কিছুক্ষণ দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন। হয়তো বা ধোপার খাতার পিছনের পাতায় তৈরি হয়েছিল কোনও বিয়োগ গল্প। বাড়ির কেউ তার হদিশ পেয়েছিল কিনা, জানি না।

মা'র বিয়ের দিন, তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে, ঘরভর্তি আত্মীয় কুটুমকে অগ্রাহ্য করেও একবার এক ফাঁকে বন্ধ হয়েছিল দিদাইয়ের ঘরের দরজা।

তারপর, পরের দিন সকালে মা গাড়ি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময়, আলতা রাঙানো হাতে, লেস দেওয়া ছোট্ট রুমালের আড়ালে মা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল দিদাইয়ের দেওয়া একটা চিরকুট।

মা'র একটা চন্দন কাঠের বাক্স আছে, তার মধ্যে ভর্তি বাবার লেখা প্রেমপত্র। সেখানেই ঠাঁই নিয়েছিল সেই চিরকুটটা। অনেক সময় মা'কে দেখেছি বাক্স খুলে নিজের মনে ওই চিরকুটটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে পড়তে।

আর আমি ভাবতাম, মা নিজে নিজে যা-ই পড়তে পারে, সেটাই বুঝি কবিতা—আমার শ্রবণযোগ্য।

অনেক জেদ করার পর মা আমায় পড়ে শুনিয়েছিল।

কিছুমাত্র ক্ষণবাকি, তার পরে হায়!
সব আলো, সব হাসি, নিভিবে হেথায়,
হৃদয়ের পুতুলিকে সাজাইয়া নিজে
বিদায় জানানো ব্যথা দুঃসহ কি যে
মা ছাড়া বুঝিবে কেবা, নিকট কি দূর
বুঝিবে কেবল বুঝি সানাইয়ের সুর ...

এই অবধি পড়তে পড়তেই মা'র গলা ধরে আসত। মা অন্যমনস্কভাবে চিরকুটটা ভাঁজ করে, ছোট্ট কাগজটায় হামি দিত। তারপর তুলে রেখে দিত মা'র নিজস্ব চন্দনকক্ষে। বড় হয়ে যখন পড়েছি—

যেও না নবমীনিশি লয়ে তারাদলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।

—কোথাও যেন মনে হত মাইকেল মধুসূদন বুঝিবা দিদাইয়ের কবিতা পড়েছিলেন।

আরেকটু বড় হয়েছি। চিক্কু তখনও হয়নি, মনে নেই স্পষ্ট।
বিকেল থেকেই ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে হয়তো। থামার আর নাম নেই।
সন্ধে গড়িয়ে গেল। জানলার বাইরে কেবল ঝমঝমে বৃষ্টি, আর হাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজ।
মা কেমন যেন আনমনে বারবার জানলার খড়খড়ি তুলে দেখছে, বাবা অফিস থেকে ফিরছে কি না।

হয়তো বা, প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আলো নিভে গিয়েছে। লণ্ঠনের নরম আলোর দেওয়াল জুড়ে ছায়া। তার মধ্যে আমি ঘ্যানঘ্যান করছি, —মা, গল্প বলো।

মা'র মন অন্যদিকে পড়ে। বাবা অফিস থেকে বাড়ি না ফেরা অবধি অনিশ্চিত উদ্বেগযাপন। তারই মধ্যে হয়তো আমাকে ভোলাবার জন্য আমার বারবার শোনা কবিতাটাই বলে যাচ্ছে মা।

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটি মিটি আলো,
চারি দিকের দেয়াল জুড়ে ছায়া কালো কালো,
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝু-প, ঝু-প, ঝু-প—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে, একেবারে চুপ।
আর সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।।

কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারতাম মা'র মন আনচান করছে। কবিতাতে মন নেই। কী বলে ভোলাব মা'কে? কী প্রবোধ দেব? আমার শিশুমন তো জানে, ভোলাতে গেলে কবিতা বলতে হয়। তাই মা যেখানে ছেড়ে দিত, সেখান থেকে আমি ধরতাম।

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা—
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা।

আজও কবিতাটা নিজে পড়লে মা'র সেদিনের সেই অন্যমনস্ক উদ্বিগ্ন ছেড়ে ছেড়ে বলার ভঙ্গিটাই শুনতে পাই।

আর আজও যেন মনের কোন গভীরে আমার একটা গূঢ়-গোপন বিশ্বাস, যে কবিতাটা আসলে রবি ঠাকুর লেখেনি, আমার মা লিখেছে।

১৩ এপ্রিল, ২০০৮

'কোনো এক লোকোত্তর কৃষকের কথা কোনো এক কবিতায় আমরা পড়েছি। তার অর্থ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে, কিন্তু আজ দেখছি সে-কবিতা উলটো অর্থে সত্য হল। যার হাতে ফসল ফললো তাকে নিয়েই সোনারতরী দিগন্ত-পারে চ'লে গেল, পড়ে থাকলো রাশি-রাশি সোনার ধান; যতদূর দৃষ্টি যায় যেন শেষ নেই।' 'এখন আমাদের উপর ভার পড়েছে সেই ফসল ঘরে তোলার। বাছতে হবে, গোছাতে হবে, সাজাতে হবে গোলা ঘরে-ঘরে। ডেকে বলতে হবে সকলকে—এসো, এখানে এসো। এখানে তোমার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কল্যাণ। এখানে তোমার উত্তরপুরুষের আনন্দের সঞ্চয়।'

বুদ্ধদেব বসু

August, 1941 Calcutta. A man died
His mortal remains perished
But he left behind him a heritage. Which no funeral pyre could consume.

সত্যজিৎ-এর 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রটি শুরু হয়েছিল কবির প্রয়াণ দিয়ে। উপরের ইংরেজি লাইনগুলো (সঠিক না হতে পারে, স্মৃতি থেকে লিখেছি) ছিল তার ধারাভাষ্য।

'নালক' আমার বড় প্রিয় বিষয় ছিল। এই ফিল্ম জীবনে সেটা হয়তো কোনওদিন করা হবে না। বিশেষ করে বার্তোলুচি'র 'দি লিটল বুদ্ধ' এই কয়েক বছরে এত ধুমধাম করে তৈরি হয়ে গেছে।

তাই আমার সেই ইচ্ছেটা আমি 'খেলা'-র নায়ক-চিত্র পরিচালক রাজাকে দিয়ে দিলাম। আগেও আমার এমন অনেক ইচ্ছে আমি আমার ছবির ফিল্মমেকার চরিত্রদের দিয়ে দিয়েছি।

'বাড়িওয়ালি' মনে আছে? দীপঙ্কর মানে চিরঞ্জিৎ যে চরিত্রটা করেন? তিনি যে ছবিটার শুটিং করতে এসেছিলেন পুরনো বাড়িটায় সেটা 'চোখের বালি'। তখনও আমার কাছে 'চোখের বালি' নিয়ে ছবি করাটা নিছকই একটা স্বপ্ন ছিল।

আজীবন দক্ষিণ কলকাতার ইস্কুল-কলেজে পড়া। বাড়ির ছয় কিলোমিটার চৌহদ্দির মধ্যে প্রায় গোটা জীবনটা কাটানোর ফলে সময়ে সময়ে ভেতরে কোথাও যেন একটা গ্লানিবোধ হত—কে জানে যথার্থ বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠতে পারলাম কি না!

তারপর বাবার, ঠাকুমার, দিদাইয়ের দেওয়া পুরনো সব হলদেটে সিগনেট প্রেসের বইগুলো অনবধানে তাক থেকে পাড়ি—আর প্যাপিরাসের মতো দুর্মূল্য পাতাগুলোয় আঙুল বোলাতে বোলাতে ভাবি—অবন ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর এঁরা ছাড়া কে আমাদের কানের কাছে ফিসফিস করে বলত,

—বাপু হে, তোমার ভাষাটা নেহাৎ ফেলনা নয়।

চোখের সামনে খুলে যেত রাজপুরীর সিংহকপাট। রানি পুবে দাঁড়াতেন, বাতাস আগুন। রানি পশ্চিমে দাঁড়াতেন, বাতাস দ্বিগুণ।

আর অমনি ছবি এসে ধরল শব্দের হাত, শব্দ যেন আপনা থেকে হয়ে গেল ছবির চালচিত্র।

আর সেই সাতমহলা রাজপ্রাসাদের তলাটিতে, যেখানে কোনও নাম না জানা নদীর ঘাটে বিকেলের মেঘে ছাগলগুলিকে খুঁটি থেকে খুলে নিতে আসে দু'টি বেগুনি আর কমলা রঙের শাড়ি পরা মেয়ে, তারা দেখল ঘাটে বসে যে মানুষটা কাঁদছে তার পরনের পোশাক সাহেবের, গায়ের রঙ সাহেবের নয়।

আরও আশ্চর্য, সে কেঁদে কেঁদে কথা বলছে এক দুরূহ বাংলায়। যে বাংলা পাঠাশালায় উপর ক্লাসে বিদ্যাসাগরের বই পড়লে কিছুটা জানা যায়—

তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পরধন লোভেমত্ত করিনু ভ্রমণ, পরদেশে
ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি...

১৫ মার্চ, ২০০৯

রবীন্দ্রনাথকে

বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর—
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর—
তুমি যদি থাক মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর,
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর।।
তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখ'পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে দম্ভ করহ দূর,
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর।।

৯ মে, ২০১০

নীচে লেখা কবিতাটা আমি মাসখানেক আগে পড়ি। আর সেখান থেকেই এই সংখ্যাটার ভাবনা আমাদের মাথায় আসে।

'কানা'-কে কানা, 'খোঁড়া'-কে খোঁড়া, এবং 'তোতলা'-কে তোতলা বলতে নেই—এ কথা আমাদের সবার জানা।

ছোটবেলায় আমার নতুন পিসেমশাইকে দেখে আমি মা-কে চুপিচুপি বলেছিলাম,

মা, পিসেমশাই তোতলা!

মা ততোধিক চাপাস্বরে বলেছিল—ছিঃ! তোতলা বলতে নেই। ওঁর কথা আটকে যায়।

আজকাল যেমন অনেক Politically correct শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। 'বেঁটে'-কে Vertically Challenged এবং 'বামন'-কে Small people বলার পেছনে সহানুভূতি যতটা আছে, দর্শন ততটা আছে কি না বুঝতে পারি না।

নীচের এই কবিতাটি মালয়ালি কবি সচিদানন্দন-এর। মৌলিক কবিতাটির নাম 'ভিক্কা'। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কবি নিজেই।

আমার কলেজের বন্ধু পিকো, নবনীতাদি-র বড় মেয়ে অন্তরা দেবসেন, বহুদিন ধরে The Little

Magazine বলে একটা পত্রিকা চালায়। সেখান থেকেই কিছুদিন হল একটি কবিতার বই বেরিয়েছে 'India in verse'। সেই বই থেকেই কবিতাটি তুলে দিলাম। আপনাদের ভাল লাগবে।

Stammer
Stammer is no handicap.
It is a mode of speech.

Stammer is the silence that falls
between the word and its meaning,
just as lameness is the
silence that falls between
the word and the deed.

Did stammer precede language
or succeed it?
Is it only a dialect or
a language itself?
These questions make
the linguists stammer.

Each time we stammer
we are offering a sacrifice
to the God of meanings.

When a whole people stammer
stammer becomes their mother-tongue :
just as it is with us now.

God too must have stammered
when He created man.
That is why each of man's words
carries several meanings.
That is why everything he utters,
from his prayers to his commands,
stammers

like poetry.

১৬ অক্টোবর, ২০১১

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠান পূর্তি হল এই পঁচিশে বৈশাখে।
গোটা একটা বছর ধরে কবিকে ঘিরে কত কিছু। কত গান, কত পাঠ, কত অভিনয়, কত আলোচনা-সমীক্ষা ইত্যাদি।

রবীন্দ্ররচনা অনুসারী কত নতুন-নতুন কাজ হল। সব কাজই যে রসোত্তীর্ণ হবে তা কে বলেছে! অন্তত হল তো!

একটা বছরকে আঁকড়ে ধরে আবার যেন সবাই যে যার মতো করে কবিপ্রণাম করলেন। এই একক, অথচ সম্মিলিত স্মরণেরও তো একটা গভীর মূল্য আছে।

যার যেদিকে চোখ। আমি দেখলাম আখেরে লাভ যেটা হল, রবীন্দ্রনাথের অজস্র মনোরম প্রতিকৃতি আমরা আবার দেখতে পেলাম।

কবি শতবর্ষ স্মরণের সময় আমি জন্মাইনি, ফলে তখন কী হয়েছিল, জানি না।

তবে আমি নিশ্চিত যে, তখনও তো আমাদের জীবনে Scanner ঢোকেনি, enlarger-ও তখন পেশাদারি চিত্রগ্রাহক বা আলোকচিত্র স্টুডিওর সম্পত্তি।

এখন চতুর্দিকে কবিসংক্রান্ত সব কিছু উদ্‌যাপনের মধ্যমণিই যে তাঁর অতিকায় জ্যোতির্ময়, দেবোপম রূপ—সেটা আবার নতুন করে কী যেন একটা বুঝিয়ে দিল।

দাঁড়াই তো, এই এক বছরে শহরটা যেন রবীন্দ্র-প্রতিমার নির্মাণশালা—একটা বড় কুমোরটুলি হয়ে উঠেছিল।

দুই

বিগত বছরের যে কোনও অনুষ্ঠানেই সংগীতশিল্পী বা আবৃত্তিশিল্পীর পেক্ষাপটে আর নানা পদ্মফুলের মালা নেই। প্রায় প্রতিটি জায়গায় সদর্পে সশরীরে উপস্থিত কবি স্বয়ং। Scanner আর enlarger এর দৌলতে। কবি, তাঁর সামনে শিল্পী, আর দর্শকাসনে আমি। সহজ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে', তখন থেকে এই 'তুমি' টি যে কে, যাঁর চিরায়িত অবস্থান কবির গানের পর্দার নেপথ্যে, তা নিয়ে বিস্তর বাগবিতণ্ডা হয়ে এসেছে।

কোথা থেকে কবির গানে বারবার ফিরে এসেছে এই 'তুমি' সর্বনামের ডাক? কোনও গভীর ঈশ্বর ব্যাকুলতা থেকে? কোনও মহৎ অতিন্দ্রিয়ের আহ্বানে? না কেবলই কোনও অপেক্ষমাণ প্রণয়ী, প্রাণসখাকে ডাক দিয়েছেন?

এ বছরের এই এতগুলো অনুষ্ঠানে, মঞ্চের গানগুলোর পিছনে যখন দাঁড়িয়ে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, তখন অন্তত আমার মনে এই চিরকালীন 'তুমি'-র ধাঁধাটা যেন আপনিই পেয়ে যায় উত্তর।

জন্মের দেড়শো বছর পর তাঁর সব গানের 'তুমি' যেন তিনি নিজে। 'তুমি' সর্বনামটি এখানে পাশাপাশি হৃদয়ব্যাপী একটি বিশেষ সর্ব-নাম। যার সামনে পড়ে 'গীতবিতান'-এর পূজা আর প্রেম

পর্যায়ের ভেদাভেদ মুছে যায়, ঘুচে যায়, এলোমেলো হয়ে যায়—শুধু আমাদের সেই অন্তরালের 'তুমি'-কে নিজের মতো করে অমোঘভাবে চিনে নেওয়ায়।

জানি না। অভ্যাসমতো যখন এরপরও রবীন্দ্রনাথের গান রোজ সকালে রেডিওতে শুনব, প্রত্যেকটা 'তুমি'-কেই বুঝি নতুন করে দেখতে পাব জোব্বাধারী অনিন্দ্যমূর্তিতে।

বিশ্লেষণ করা যাঁদের কাজ, তাঁরা নিশ্চয়ই কর্তব্যপালন করবেন।

কিন্তু আমি যে পণ্ডিত নই, আমি ভক্ত। আমি তো আমার 'তুমি'-কে পেয়েই গেছি।

এবার তো নতুন করে সেই 'তুমি'-কে সঙ্গে করে এক নবীন রোমাঞ্চকর যাত্রা।

কবির 'তুমি' কে ছিল, কী করব জেনে? আমার 'তুমি' আর অন্ধকারের আড়ালে নেই।

সার্ধশতবর্ষান্তে সেই 'তুমি'কেই ভালবেসে বলি :

ওই আসনতলের মাটির 'পরে লুকিয়ে রব
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।।

একটু আগেই কুমোরটুলির কথা বলছিলাম, ঈশ্বর বোধকরি নানারকম ভাবেই নির্মিত হন।

১৩ মে, ২০১২

প্রজিডি

শিশু দিবস' উপলক্ষে এই সংখ্যাটার কথা যেই-না ভাবা হল, অমনি আমি শক্ত এক ফরমান জারি করলাম যে, শিশু-প্রতিভার তালিকা থেকে একজনই বাদ।

তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ কেমন শিশুবেলা থেকেই পিঁপড়ে-আমসত্ত্ব নিয়ে কবিতা লিখতেন, 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে' লিখে পাদপূরণ করতেন, তাঁর কল্পনার জগৎ নিয়ে ছোট্টবেলায় জোড়াসাঁকো-র সদর-অন্দরের ঠোকাঠুকির মধ্যেও নির্দ্বিধায় ভাবতে পারতেন 'ঐখানেতেই আছে রাজার বাড়ি'—এসব তো আমরা জানি। বহুবার পড়েছি, শুনেছি। আশ্চর্য হয়েছি, আবার ভুলেও গিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সত্যিই এমন এক শৈশবের বাসিন্দা, যিনি নামকরণের দিনেই যদি পুরো 'সঞ্চয়িতা'-টা গড়গড় করে রচনা করে ফেলতেন মনে-মনে, আর তার ঝটপট অনুলিখন করে ফেলতেন দিদি সৌদামিনী বা স্বর্ণকুমারী, কিংবা মেজবউঠান জ্ঞানদানন্দিনী—তা হলেও সে কিংবদন্তি হয়তো পুরোপুরি অবিশ্বাস্য ঠেকত না কোনও রবীন্দ্র-নাস্তিকের কাছেও। কিন্তু রবি ঠাকুর এমনই একজন আশ্চর্য জীবনযাত্রী যে—তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণেও আমরা কেবল তাঁর দক্ষতার বাইরেও অনায়াসে আবিষ্কার করে ফেলি কতগুলো বিরল ইন্দ্রজাল।

সম্প্রতি শিক্ষক-সখা শিবাজী-র (বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে আড্ডা হচ্ছিল। তাতে শিবাজীর এক অদ্ভুত গোয়েন্দাগিরি চোখের সামনে একটা রহস্য উদ্‌ঘাটন করল যেমন, তেমনই আবার তার অপর টাঙিয়ে দিল আরও আরও মুগ্ধ দিশেহারার স্তর।

রবি ঠাকুরের 'বাল্যস্মৃতি' পড়ে আমরা সবাই জানি যে, তাঁর শৈশবের পাঠ 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' টি তাঁর জীবনে 'আদি কবির প্রথম কবিতা'।

আমরা কখনও ভেবেও দেখি না, এটা কোনও তথ্য পরিবেশন নয়। এটাও আদ্যন্তে বালক রবির কল্পনা।

'বর্ণ পরিচয়'-এর পাতায় অনুরূপ যে সংলগ্ন বাক্য দুটি উনি পড়েছিলেন, তা কোনওমতেই 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' হতে পারে না। কারণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত এই প্রাথমিক পাঠে বাক্য দুটি সমার্থক হলেও, তার প্রকাশভঙ্গি অন্যতর—'জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে'।

বিদ্যাসাগরের পঙ্‌ক্তি দু'টি হয়তো এক প্রকৃতিপাঠের সংকেত নিয়ে এসেছে, কিন্তু মনে-মনে, কিংবা কোনও কল্পনার সত্য দিয়ে এই বাক্যবন্ধনটিকে এমনভাবে কবিতা করে ফেললেন শিশু-রবি, যে পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' লেখার সময়, ততদিনে বাক্য দুটি নির্ভুল নিঃসংশয়তায় কেবল 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'-র ছন্দ-অনুবাদ হয়েই বেঁচে আছে তাঁর মনে।

আর তাই বোধহয় সারাটা জীবন ধরে সমস্ত বাঙালি পাঠকের চৈতন্য জুড়ে 'জল পড়া' আর 'পাতা নড়া'-র দ্যোতনা সজীব রইল বছরের পর-পর-বছর।

শৈশবের স্মৃতি আমরা অনেকেই বহন করে নিয়ে চলি। কিন্তু শৈশবের কল্পনা? সে কি স্মৃতির অংশ, না বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সে রূপ বদলাতে শুরু করে?

সমস্ত জীবনপ্রবাহ ধরে কোনও এক শিশু-দিনের কল্পনাকে 'সত্য' করতে পারে আর ক'জন?

শিশু এবং 'শিশুদিবস'-ই যখন উপলক্ষ, তখন আরেকটা ঘটনার দিকে তাকাই।

তাঁর শেষ বয়সে, অসুস্থ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের প্রবল খাদ্যারুচি—কোনও কিছুই মুখে সুস্বাদু ঠেকাত না।

অমিতা ঠাকুর স্মৃতিচারণা-য় লিখছেন যে, অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে, দ্বিধা ভরে, সসংকোচে, [illegible] সাহস করে রবীন্দ্রনাথের জন্য মাছ রান্না করেছেন।

বড় তৃপ্তি করে খেলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর অমিতা ঠাকুরকে সস্নেহে বললেন,

ভাল হয়েছে। তোর হাত দিয়ে কখনও খারাপ রান্না বেরবে না, আমার হাত দিয়ে যেমন খারাপ লেখা বেরবে না কোনও দিন।

আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের কি সত্যিই বয়স হয়েছিল? না যে-ছবিগুলো আমরা দেখি, সেগুলো নকল, সাদা দাড়ি-গোঁফ পরা?

১৮ নভেম্বর, ২০১২

'কি লিখি তোমায়?'—লতা মঙ্গেশকরের গলা। পাড়ার পুজোর মাইকে রিনরিন করছে। 'তুমি ছাড়া আর কোনও কিছু ভাল লাগে না'।

এই তো বিষণ্ণ বিরহী, যার গুনগুনের সুরে উৎসবের মাইকে একলা থাকার আকুতি।

কবে থেকে যে বিরহীরা চিঠি লিখছেন তাঁদের প্রিয় বা প্রিয়াকে—তা কি সত্যিই ভেবে বলা যায়?

কালিদাসের গোটা 'মেঘদূত' কাব্যটাই তো সেই চিঠি পাতানোর কাহিনি, আর সত্যিই সে তো কোন যুগের কথা!

রবি ঠাকুরের 'নিমন্ত্রণ'-এর চিঠি যে কোন রহস্যময়ী নায়িকার উদ্দেশে, তা নিয়েও কি কম গোয়েন্দাগিরি হয়েছে?

আবার 'অপুর সংসার'-এর অপর্ণা যখন সবে প্রেমপত্র লেখার ভঙ্গিটি রপ্ত করতে শিখল, সেদিন থেকে অপু কান্ডারিরহিত।

আমাদের এবারের সংখ্যা চিঠির। নানা মানসীকে লেখা।

আমি যেহেতু কুঁড়ে, আমার দুই ছবির নায়িকার চিঠি তুলে দিলাম।

চিঠিগুলো সিনেমার জন্য লেখা বটে। কিন্তু আবার পড়ে দেখলাম—যে, চিঠি হিসেবেও লেখাটা তেমন মন্দ নয়।

প্রথম চিঠিটি 'চোখের বালি'-র। বিহারীকে লেখা বিনোদিনীর চিঠি।

দ্বিতীয়টি নৌকাডুবির। হেমনলিনী চিঠি লিখছে নলিনাক্ষকে।

প্রীতিভাজনেষু বিহারীবাবু—

বিধবার গায়ে গহনা দেখিয়া আপনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসাবাক্য আমাকে সাহস যুগাইয়াছিল। নিজের অজান্তে কখন যে সে সাহস দুঃসাহসে পরিণত হইয়াছে এবং আপনার কাছে এই হতাভাগিনীকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা সত্যিই আমার অগোচর। নিজের ভিতরে সেই সাহসের উৎসকে খুঁজিতে গিয়া বারংবার ভুল করিয়াছি। একবারের মতো অন্তত ঠিক করিবার জন্য আপনার কাছে পৌঁছাইয়াছিলাম। সে অভিজ্ঞতা আপনাকে আনন্দ দেয় নাই বলিয়া আমি সত্যিই লজ্জিত।

সমাজে আমার তিনটিই পরিচয়—বিধবা, মেমসাহেব এবং যুবতী। স্বতঃই এই তিন পরিচয়ের আড়ালে আমার আসল পরিচয়টি ঢাকা পড়িয়া থাকে। যুবতী, মেমসাহেব, বিধবা যে সাধারণ নারীও হইতে পারে সমাজ তাহা স্বীকার করে না।

আজ সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে, আমার এই চতুর্থ পরিচয়টি আমি কেবল আপনার সাহসের মধ্যে সন্ধান করিয়াছি। সংসার-অনভিজ্ঞা আশা, শুধুমাত্র সরলা এবং কাশীবাসিনী বলিয়াই আপনার অনুকম্পার অধিকারিণী। প্রথম দু'টি বৈশিষ্ট্য আর এই জন্মে ফিরিয়া পাইব না। অন্তত

দেবতার কল্যাণেও যদি আপনার প্রীতিভাজন হইরে পারি, দশাশ্বমেধ ঘাটে যুগ যুগ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেও দ্বিধা করিব না।

একটি অনুরোধ—এ অলঙ্কার সকল বালির। আমার নিকট গচ্ছিত ছিল। তাহার এই সম্পত্তি আগলাইয়া রাখিবে, আপনি ব্যতীত এমন নিরাপদ ব্যক্তি আমি অন্তত জানি না। তাই গহনার বাক্স আপনার কাছে রাখিয়া গেলাম। ইহার দায়দায়িত্ব এখন হইতে সম্পূর্ণ আপনার।

ক্ষমাপ্রার্থিনী
বিনোদিনী

প্রিয় নলিনাক্ষ বাবু,

আঘাত আর ক্ষতের মধ্যে বোধহয় একটা তফাত আছে। আমি নয় ডাক্তারি জানি না, গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আপনি আমায় শুধরে দেবেন তো? আঘাতের চিকিৎসা করতে আপনি বড় ব্যাকুল ছিলেন। আমিও হয়তো আরোগ্যের লোভে আপনার সেই ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু সেরে যখন গেলাম, বুঝলাম যেটা মিলিয়ে গিয়েছে, সেটা আদতে ক্ষত। আমার আঘাত ততদিনে তার নিজস্ব আঁধারে এতটাই গুছিয়ে সংসার করেছে যে, তাকে তাড়াতে গেলে আমার আঁধার, আমার অন্দর মহলা বড় নির্জন হয়ে পড়বে। আঘাতকে যে পুষে রাখতে চায়, ব্যথার শান্তি তার চিরদিনের। আপনাকে সেই ব্যথার সঙ্গে ছাড়ব না। কেবল এইটুকু অনুমতি চাইছি যে, সময়ে-অসময়ে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যদি চিকিৎসার ছুতোয় আপনার সখ্য দাবি করি, আপনি অপ্রসন্ন হবেন না। আমি সারাজীবন কোনও কাজের জন্য কারও কাছে ক্ষমা চাইনি, চাইতে হয়নি আমায়। এই প্রথম চাইছি। আপনার কাছে। আঘাত নিয়ে বেঁচে থাকার অনুভূতি আমার চেনা। ক্ষমা নিয়ে কী করে বেঁচে থাকা যায়, এবার সেই শেখার পালা। অপেক্ষাই জীবন। তারপর সত্যিই হয়তো কুসুমবনের অলি এসে লাগবে একদিন। সেই দিনের শুভেচ্ছায়—

আপনার অনুকম্পাপ্রার্থিনী
হেমনলিনী
৩ মার্চ, ২০১৩

মে মাসের ষোলো তারিখে কান ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল ওয়াং কর ওয়াই-এর ছবি দিয়ে।

আমরা তখনও, আমরা বলতে আমি আর বুম্বা (প্রসেনজিৎ), কলকাতায় বসে ইষ্টনাম জপছি—বুম্বার ভিসা হয় কি না হয়!

'দোসর' কানে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখানো হচ্ছে খবরটা যেদিন এল, সেদিন আমরা 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর শুটিং-এ ব্যস্ত, ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে। আর হবি তো হ, সেদিনই বুম্বার প্রথম কাজ এই ছবিতে।

প্ল্যানম্যান-এর শুভ (শুভশেখর ভট্টাচার্য) কোনও একটা মেক আপ ভ্যান-এর আড়ালে নিয়ে গিয়ে পরম গোপনে খবরটা দিল আমাকে। সবে নাকি অত্যন্ত গোপন সূত্রে খবরটা এসেছে—এখনও কাউকে বলা যাবে না। এপ্রিল মাসে অফিসিয়ালি খবরটা বেরোলে তখন প্রেস-এর সঙ্গে কথা বলাটাই সমীচীন। কিন্তু ছবিটা যখন কান-এ আছে, আমি এবং বুম্বা যে যাব—সে কথাটা তখনই হয়ে রইল। প্রায় শুভর আবদারেই।

খবরটা পেয়ে প্রথমেই যেটা মনে হল, যে হয়তো আমার যাওয়া হবে না। কারণ আমার মায়ের বাৎসরিক কাজটা হয়তো ওই সময়টাতেই পড়তে পারে।

মা মারা গেছেন, গত বছরের আঠেরোই মে। আমার মনে আছে, খবর পেয়ে ঐশ্বর্য ফোন করেছিল কান থেকে। চিরাচরিত নিয়মে কান ফেস্টিভ্যাল হয়ে আসছে মে মাসের ষোলো তারিখ থেকে ছাব্বিশ অবধি—অন্তত আমি যতদিন ছবি করছি, তাই তো দেখে আসছি। অতএব প্রায় স্থির ধারণা ছিল যে কান ফেস্টিভ্যাল তার নিজের সময়েই হবে; এবং যেহেতু ওই সময়েই মায়ের বাৎসরিক কাজ হওয়ার কথা, এবছরটা আমার কান-এ যাওয়া হল না।

খোঁজ নিয়ে অবশ্য দেখা গেল, যে তিথি অনুযায়ী কাজের দিনটা আগে। মে মাসের আট তারিখ। অতএব সেভাবে দেখতে গেলে ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার সময়টায় কোনও বাধা নেই।

শুটিং-এর ফাঁকে এই পুরো হিসেব নিকেশ করে বাড়ি ফিরে দেখলাম বাবা একা বসে টিভি দেখছেন। পাশে মায়ের চেয়ারটা যথারীতি খালি।

বাবাকে বললাম—বাবা, কান-এ দোসর দেখাবে। সাধারণত এই মুখটার উচ্ছ্বাসের রেখাগুলো আমি নিশ্চিতভাবে চিনি।

পাশের খালি চেয়ারের শূন্যতার ছায়া কয়েকটা চেনা ভঙ্গিকে আড়াল করল বোধহয়। বাবা টিভির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন—শুটিং ভাল হল?

বাবার টিভি দেখার জায়গা জুড়ে নরম নিওন আলোর নীলচে দ্যুতি। বাবার মুখে টেলিভিশনের আলোর নীলচে রেখা। সমস্ত আলোর রঙই যেন কেমন ঠান্ডা, বিষণ্ণ।

কেন যেন মনে পড়ে গেল মাতিস-এর কথা।

প্যারিস থেকে নিস-এ এসেছিলেন হেনরি মাতিস চিকিৎসার্থে। তারপর ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার প্রেমে পড়ে আজীবন দক্ষিণ ফ্রান্সবাসী হয়েই কাটালেন। 'সমুদ্রসৈকতের অপার্থিব দ্যুতিময় আলো, আনন্দরৌদ্র' সারা জীবন মাতিস-এর প্যালেটে উজ্জ্বল হয়ে থেকে গেল।

দুই

মে মাসের সতেরো তারিখ। বুম্বার ভিসার সমস্যার সমাধান হয়েছে। প্ল্যানম্যান অফিস থেকেই যেহেতু কান ফেস্টিভ্যালে সরাসরি যোগাযোগ করা হচ্ছিল, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় নিমন্ত্রণ চিঠি থেকে আরম্ভ করে কোনও কাগজপত্র, কিছুই নেই।

সতেরো সন্ধেবেলা দিল্লি পৌঁছবার কথা। রাতটুকু কোনওরকমে কাটিয়ে আঠেরো সকালে দিল্লি থেকে মিউনিখ হয়ে ফ্রান্সের নিস শহর।

সতেরো তারিখ সকালে গোছগাছ চলছে, বাবা আমার ঘরে এলেন। বিদেশে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে গেলেই, মায়ের একটা স্বতস্ফূর্ত উৎকণ্ঠা থাকত—'গরম জামা নিয়েছ তো?' সেই বাক্যটাই আবার ফিরে এল, এবার বাবার মুখে। বোঝাবার চেষ্টা করলাম কান-এ এখন ভীষণ গরম। পারলে সবাই টি শার্ট আর শর্টস পরে ঘোরে।

বাৎসরিকের কাজটা যেহেতু হয়ে গেছে, মার মৃত্যুস্মরণিকা আর কতটা অবশিষ্ট হয়ে পড়ে আছে বাবার মনে, জানি না। কিন্তু একথা তো জানি আগামিকাল সেই আঠেরোই মে। আমি পাশে থাকব না। ফলে বাবার যদি হঠাৎ মনে পড়ে তখন সে বড় করুণ অবস্থা হবে। তার থেকে আমার বোধহয় আগে থেকে জানিয়ে যাওয়া ভাল। অন্তত বাবার একটা মানসিক প্রস্তুতি থেকেই যাবে। কিন্তু বলি বলি করেও কথাটা বলা হল না।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে একটা লম্বা ফাঁকা রাস্তা। সামনে বাঁদিকে একটা বাঁক। আমার চটির ভেতর বালি ঢুকে গেছে। আমি চটি ঝাড়ছি আর মা একটু এগিয়ে গেছে আমায় ছেড়ে। মাকে তাই খুঁজে পাচ্ছি না। আর কোথা থেকে যেন একটা গান ভেসে আসছে।

মনে পড়ে, কত-না দিন রাতি

আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি।

ঘুম যখন ভাঙল, দু-গাল ভিজে জলের ধারা। এয়ারপোর্ট পৌঁছোনোর তাড়ায় শুষ্ক অশ্রু বাষ্প হতে সময় লাগল না।

তিন

লুফৎহনসায় ইকনমি ক্লাসে আমাদের দু'জনের টিকিট হয়েছে। কান ফেস্টিভ্যাল-এর সেদিকে ভীষণ কড়াকড়ি, তাঁরা মিনিমামটুকুই দেবেন— নিমন্ত্রিতরা বিজনেস ক্লাস ট্র্যাভেল করল কি না তাতে সত্যি তাঁদের কিছু এসে যায় না।

দিল্লি থেকে মিউনিখ ঘণ্টা আটেকের ফ্লাইট। সেখানে এক ঘণ্টার মতো বিশ্রাম, তারপর ফ্লাইট বদলে নিস। আট ঘণ্টার জন্য ইকনমি ক্লাসে ট্র্যাভেল করলে কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। সমস্যা হয় কিছুটা কেবল মালপত্রর বেলায়। জন পিছু কুড়ি কেজির বেশি মাল সঙ্গে নেওয়ার নিয়ম নেই। শুনে মনে হচ্ছে তো, কুড়ি কেজি আবার এমন কমটা কি হল? এদিকে শুভ একটা লম্বা ফিরিস্তি পাঠিয়েছে—'ঋতুদা, গিয়ে ইন্ডিয়ান ডেলিগেট্-দের একটা বিশেষ ডিনার আছে। তারপরদিন মাইকেল মুর-এর নতুন ছবির রেড কার্পেট আছে, তোমায় যেতে হবে। তারপর দোসর-এর স্ক্রিনিং এবং ভারতীয় পরিচালকদের একটা আলাদা সেমিনার। ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত চারটে আলাদা অনুষ্ঠান।'

আমি বললাম 'তা ছাড়া আমাদের দিন সাতেকের মতো থাকা। চারটে আলাদা অনুষ্ঠানের চারটে পোশাক—আমার কুড়ি কেজিতে হবে না।'

শুভ ফোনে হাসল—হি হি হি।

আমি বললাম—শোন্, যারা রেড কার্পেট-এ হাঁটে, তারা ইকনমি ক্লাসে ট্র্যাভেল করে না। অরিন্দমকে বল্ আমাদের বিজনেস ক্লাসে আপগ্রেড করাতে।'

শুভ ফোনে হাসল—হো হো হো।

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে লুফৎহনসার চেক ইন কাউন্টার-এ দাঁড়িয়ে আমি আর বুম্বা জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছি, আর আমাদের সুটকেস ওজন করা হচ্ছে। চেক ইন দাঁড়াল ব্যাগেজ বাহান্ন কেজি। মানে বারো কেজি বাড়তি ওজন, যার জন্য পয়সা দিতে হবে।

লুফৎহনসা কর্মী বললেন—বেশ। আমরা ছ'কেজি মতো ছাড় দিচ্ছি, আপনারা ছ'কেজির বাড়তি ভাড়াটা দিন।

বীরবিক্রমে জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ, কত বলুন?

হিসেব করে জানা গেল, কিলো পিছু তিরিশ ইউরো করে পড়বে। মানে কুল্লে একশো আশি ইউরো। শুনতে কত কম। ভারতীয় হিসেবে দাঁড়াল দশ হাজার টাকার একটু বেশি।

দুজনেরই মুখ কাঁচুমাচু হল।

—আসলে, দেখুন আমরা না কান ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছি ছবি নিয়ে। ছবি সংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র, পোস্টার, লিফলেট সঙ্গে আছে তো!....

চিরকাল আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাওয়ার সময়ে বা ফেরার পথের চালু অজুহাত।

আমার পাসপোর্টটা একটু খুঁটিয়ে দেখলেন লুফৎহনসা কর্মী। তারপর মুখটা অল্প প্রসন্ন হল। বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আপনিই ঋতুপর্ণ ঘোষ! আপনার নাম শুনেছি।'

মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস একটা হিন্দি ছবি করেছিলাম।

একশো আশি ইউরো, থুড়ি দশ হাজার টাকা মকুব হয়ে গেল। দুজনে মিলে বিগলিত হেসে, অনেক ধন্যবাদ দিতে দিতে ইমিগ্রেশনের দিকে পা বাড়ালাম।

চার

আগে বিদেশ যাওয়ার সময় সব থেকে বেশি অসুবিধে আমার যেটা হত সেটা ঘড়ির সময় বদলানো। মহাশূন্যের মাঝখানে, অনন্ত সময়সাগরে ভাসতে ভাসতে কেবলমাত্র প্লেন-এর ক্ষুদ্র মনিটরের একটা ক্ষুদ্রতর সাঙ্কেতিকায় Time at destinatio দেখে সময় বদলে নিতে আমার বরাবরের কেমন যেন একটা কুণ্ঠা হত, ভয় হত। মনে হত মণিবন্ধে বাঁধা সময়ের টুকরোটাই একবার মুছে গেলেই দেশের সঙ্গে সব সম্পর্ক নিমেষে ছিন্ন হয়ে যাবে।

সাধারণত বিদেশের মাটিতে পা রাখবার পরেও বহুক্ষণ দেশের সময়টা কব্জিতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। সেটাই যেন ছিল বাড়ির সঙ্গে আমার যোগাযোগ। দেশে এখন সন্ধে হল—বাবা মা টিভির সামনে বসে। এখন বাড়িতে রাত দশটা—এবার ওরা খেতে বসবে। ফোন করতে হলে এখনই করে নিই। মা তো ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোবে। এরপরে ফোন করলে যদি ঘুমটা ভেঙে যায়।

মা চলে যাওয়ার পর এই আমার প্রথম বিদেশে আসা। আমি জানি আমার স্যুটকেসের কোনও কোনায় লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ কোনও মাফলার গুঁজে দেয়নি।

আত্মা বলে সত্যি যদি কিছু থাকে, অগ্নি যাকে দগ্ধ করতে পারে না, শস্ত্র যাকে ছিন্ন করতে পারে না, সময় বা দূরত্ব যাকে মলিন করতে পারে না—সে কি তাহলে জানে পশ্চিম মানেই ঠান্ডা নয়? বা, সেই প্রিয় আত্মার অভাবে পৃথিবীর উষ্ণতম অঞ্চলও সারাবছর হিমশীতল।

এখন আমার ডবল ডায়াল ঘড়ি। দেশের আর প্রবাসের সময় সেখানে নিশ্চিন্ত সহাবস্থানে বাস করে পাশাপাশি। প্লেনে ওঠার আগেই একটা ঘড়ি বদলে ফ্রান্সের সময় করে নিলাম। ওখানে এখনও মাঝরাত। আর আমাদের মুখে বিমানবন্দরের কাচের দরজা দিয়ে সকাল ছ'টার আলো। ঘড়ি বদলাতে গিয়েই খেয়াল হল আজ আঠেরো তারিখ।

নাম লিখেছি একটি তৃণে, আমার মায়ের মৃত্যুদিনে—জয়ের এই কবিতাটা আমার কাছে বাংলা হাইকুর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে বাস করে এসেছে। সম্প্রতি ওই দুটো লাইনের অন্তর্লীন বিষণ্ণতা আমাকে এমনভাবে আক্রান্ত করে যে ওই সাতটা মাত্র শব্দ শেষ করার আগেই গলার কাছটায় দমবন্ধ বেদনার অনুভূতি হয়।

আমি জানি, গত আটই মে, মায়ের বাৎসরিক কাজটার সঙ্গেই মনে মনে মৃত্যুর বর্ষ উদযাপন পারিবারিকভাবে পালিত হয়ে যায়। তবু আবার করে মনে হল, আমি বাড়িতে নেই, বাবা একা। যদিও আজকাল সাংসারিকভাবে সময় তারিখ বার এগুলো সচেতনভাবে বাবার মনে রাখবার প্রয়োজন হয় না, তবু ভয় হ'ল যদি হঠাৎ কোনও কারণে মনে পড়ে যায় যে আজ সেই নিঃসঙ্গতার জন্মদিন। এবং সেই জন্মদিনে যদি আমন্ত্রিত বা রবাহুত হয়েই আসে আরও অনেক নিঃসঙ্গতা এবং বিষাদরা—তখন বাবাকে কে দেখবে? তার থেকে বোধহয় আগে থেকে প্রস্তুত করে দেওয়া ভাল।

—বাবা, আমি দিল্লিতে!

—ও! কখন ফ্লাইট তোমার?

—এই তো। ইমিগ্রেশন হয়ে গেছে। আর মিনিট কুড়ির মধ্যে বোর্ডিং।

—সাবধানে যেও। পৌঁছে একটা ফোন কোরো।

—বাবা। আজ আঠেরো তারিখ।

—হ্যাঁ। জানি তো, তোমার তো আজই রওনা দেওয়ার কথা।

—না। আজ আঠেরোই মে।

—হ্যাঁ, তো কী?

বুঝলাম বাবার মনে নেই। বা, অভিমানী স্মৃতি এই তারিখটাকে স্বীকার করে না।

—আজ এক বছর হল বাবা। মা...

ওপারে একটা নীরবতা। একটু থেমে বললাম।

—ভেবেছিলাম মনে করাব না তোমায়। তারপর ভাবলাম আমিও থাকব না। হঠাৎ যদি তোমার মনে পড়ে...

—না। আমার মনে ছিল না। তেইশ তারিখ তোমার মায়ের জন্মদিন, সেটা আমার মনে আছে।

—আমি তো তখনও ফিরব না বাবা। তুমি মন খারাপ কোরো না। একা একা বাড়িতে ভাল না লাগে, গাড়ি নিয়ে কোথাও একটা ঘুরে এসো।

—না, মন খারাপ আর কী! এ তো চলবেই। তুমি সাবধানে যেও।

সকালবেলার আলোয় ভেসে যাচ্ছে বিমানবন্দরের টারম্যাক। বোর্ডিং ঘোষণার প্রায় যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে যেতে যেতে স্বপ্নে দেখা গানটা আবার ফিরে এল।

মনে পড়ে কত-না দিন রাতি

আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি।

বিশাল ঝকঝকে একটা প্লেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। আর আমরা বাপ আর ছেলে একজন চিরন্তন 'খেলার সাথি'র স্মৃতির দুটো কোণ দুজনে আঁকড়ে ধরে সাগরপারে বসে থাকব একটা অদৃশ্য সুতোয় আটকে।

দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সকালবেলায় যেন প্লেনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। একটার পর একটা বড় বড় উড়োজাহাজ দাঁড়িয়ে আছে সারি বেঁধে, আর সকালের আলো ধুইয়ে দিচ্ছে তাদের উজ্জ্বল শরীর। ঠিক পেছনটাতেই অখণ্ড আকাশ। সকালের সোনা কেটে নীল হতে শুরু করেছে।

দেশের মাটি থেকে নিরলম্ব মহাশূন্যের বাহনে পা দিতে দিতে পুব আকাশের দিকে তাকাতেই আমার গলার কাছটা টিপে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

জানলা দিয়ে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে। মনে হয় মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে।

পাঁচ

রওনা দেওয়ার আগে রোববার অফিস থেকে অর্পিতা আর বর্ণিনী আমাকে কান, নিস, ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা ইত্যাদি নিশ্চিত গন্তব্যগুলো সম্পর্কে যাবতীয় সহজলভ্য তথ্য নেট থেকে ডাউনলোড করে দিয়েছিল। তাছাড়া লোনলি প্ল্যানেট-এর বইগুলো সাধারণত নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় সঙ্গে রাখি। প্লেনের লম্বা সফরে গল্পের বই, ঘুম আর টিভি দেখার ফাঁকে ফাঁকে এই নতুন জায়গার নতুন খবরগুলো আমাকে কিছুটা প্রস্তুতও করে দেয়। আবার অনেক নতুন অপ্রত্যাশিতের সামনে দাঁড় করায় অত্যন্ত সহজে।

অর্পিতা বেশ যত্ন করে প্রিন্টআউট নিয়ে দুটো ব্রোসিয়ার তৈরি করে দিয়েছিল আমার আর বুম্বার জন্য। প্লেনে উঠেই বুম্বারটা বুম্বাকে ধরিয়ে দিলাম।

আমাদের কেবিন ব্যাগেজও নেহাৎ ফেলনা নয়। বুম্বার একটা জবরদস্ত স্যামসোনাইট চাকাওয়ালা চামড়া ব্যাগ। আমি পাসপোর্ট টিকিট হারিয়ে ফেলতে পারি, এই আশঙ্কায় দুজনের সমস্ত কাগজপত্রই ওর কাছে। আমার নিজের হ্যান্ডল্যাগেজ ছাড়াও আমার সঙ্গে চলেছে 'স্টার আনন্দ'র একটা ল্যাপটপ।

যাওয়ার আগের দিন যুবরাজ এসে প্রায় জোর করে গুঁজে দিয়ে গেল —ঋতুদা, প্লিজ তুমি এটা একটু নিয়ে যাও। আমাদের ওখানে একটা ল্যাপটপ খারাপ হয়ে গেছে। ফিড পাঠাতে অসুবিধে হচ্ছে।

আমি আঁতকে উঠেছিলাম।

—সে আবার কী! আমার নিজের এত মালপত্র...

তুমি বা বুম্বাদা ল্যাপটপ নিচ্ছ কি?

না, তা নিচ্ছি না।

—তাহলে কোনও প্রবলেম নেই।

—না, প্রবলেম নেই কি আবার? আজকাল একটামাত্র হ্যান্ডব্যাগেজ নিতে দেয়।

—না ঋতুদা, ল্যাপটপটা ফাউ। মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগের মতো। ওটা নিতে দেবে। ওখানে ঋতব্রত আছে। ও কালেক্ট করে নেবে তোমার কাছ থেকে।

চট করে একটা মহাজনী বুদ্ধি মাথায় এল।

—বেশ! তাহলে ঋতব্রতকে বল আমাদের একটা স্যুটকেস ফেরত নিয়ে আসতে।

যুবরাজ যে এত সহজে রাজি হয়ে যাবে ভাবিনি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনও ব্যাপারই নয়।

বলেই মোবাইল বের করে পটাং পটাং করে ফ্রান্সে ঋতব্রতকে ফোন করে দিল।

লুফৎহনসা ইন ফ্লাইট প্রোগ্রামে 'ধুম টু' দেখাচ্ছে হৃতিক, ঐশ্বর্য, অভিষেক, বিপাশা—ততক্ষণে জানি, আগের দিনই অ্যাশ-এর সেক্রেটারি হরি সিং-এর সঙ্গে কথা হয়েছে, যে অ্যাশ আর অভিষেক সতেরো তারিখেই ফ্রান্স থেকে লন্ডন ফিরে যাবে। অতএব আমার সঙ্গে কান-এ ওদের দেখার হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

লোনলি প্ল্যানেট-এ একটা বড় ম্যাপ রয়েছে। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলভাগ করে তার মধ্যে কোত দ্যা'জুর (Coté-d-Azur) অঞ্চলটির সম্পর্কে অনেক লোভনীয় তথ্য।

ওই অঞ্চলের সুনীল সৈকত, স্বর্ণরৌদ্র কীভাবে লালন করেছে শিল্পীদের, হাতছানি দিয়েছে পর্যটকদের আর আতপ্ত সমুদ্রআবাস রচনা করেছে শীতল ইউরোপবাসীদের। সেই সবের মধ্যে চোখ বোলাতে বোলাতে ধীরে ধীরে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল।

দেশে এখন বেলা হয়েছে। বাড়িতে বাবা একা। বেশ বুঝতে পারছি উড়ন্ত তন্দ্রার মধ্যেও মায়ের লুকিয়ে স্যুটকেসে গুঁজে দেওয়া মাফলারের মতো একটা অস্বস্তি ধীরে ধীরে আমার গলার কাছটা ঘিরে ধরছে।

গত বছর মে মাসের শেষে মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানটুকু পার করেই 'সানগ্লাস'-এর লোকেশন দেখতে সবাই মিলে গিয়েছিলাম সিকিমে। সঙ্গে বাবাও ছিল। মা বড় পাহাড় ভালবাসত। মা আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেটা যেন আমার আর বাবার মার কাছে যাওয়া।

আমি সেই প্রথম সিকিম গেলাম। বাবা-মা আগেও এসেছে। সিকিমের পাহাড়ে পাহাড়ে ইউনিটের সবাই খুঁজছে ছবির লোকেশন, বাবা খুঁজছে স্মৃতি, আর আমার হাতের মুঠোর মধ্যে বাবার শীর্ণ হাতের তালু— আমি আপ্রাণ খুঁজছি সান্ত্বনার যারপরনাই কোনও দস্তানা। গাড়ির সিডিতে একটার পর একটা রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে। তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি মীড় আমাদের দুজনের চোখের জল হয়ে অঝোরে পড়ছে। এত জলস্রোত সারা সিকিমের সবকটা ঝরনার সম্মিলিত প্রস্রবণেও আছে কি না জানি না।

মিউনিখ পৌঁছলাম জার্মান সময় দুপুর দুটো। টার্মিনাল বদল করতে হল না ভাগ্যিস। তবু এক

টার্মিনাল-এও অনেক চলন্ত সিড়ি বা ছুটন্ত যন্ত্রপথ বেয়ে যতক্ষণে নির্দিষ্ট গেটে পৌঁছলাম, প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

'স্টার আনন্দ'র ল্যাপটপ-এ কাঁধের কোনও স্ট্র্যাপ নেই। ফলে সেটা এক বিষম ভারি বোঝা। অনেক কষ্টে আটচল্লিশ গেটের দূরত্ব আর ইওরোপের কফির গন্ধ সাঁতরে, ডিউটি ফ্রি দোকানগুলোর আলো ঝিলমিল পার হয়ে নিসগামী প্লেনে উঠলাম আধঘণ্টার মধ্যে।

সোয়া এক ঘণ্টার সফর। এই প্লেন-এ আমার আর বুম্বার জায়গা আর পাশাপাশি নয়—সামনে, পেছনে। প্লেন ছেড়েছে, আমি মিউনিখ এয়ারপোর্ট থেকে কেনা কয়েকটা খবরের কাগজে মগ্ন, হঠাৎ পেছন থেকে বুম্বা এসে টোকা মারল পিঠে।

—ডানদিকে দ্যাখ।

জানলার বাইরে দেখি চলন্ত মেঘশ্রেণী জমাট হয়ে আছে, জমে যাওয়া সমুদ্রের ফেনার মতো তরঙ্গায়িত হয়ে আর তার গায়ে প্রতিটি খাঁজেখোঁজে লুটোপুটি খাচ্ছে নিখাদ সোনালী রোদ আর গাঢ় বাদামি ছায়া।

প্লেন চলেছে, সেই আকাশ তোলপাড় করা মেঘরাশি চলেছে আমাদের সঙ্গে। কিছুক্ষণে চোখ সয়ে এল, বুঝলাম এটা মেঘ নয়—আল্পস পর্বতমালা।

প্লেনের সবকটা মুখ জানলার বাইরে, এই অসচরাচরে নিবিষ্ট। এমনকী এয়ার হোস্টেসরাও কফি পরিবেশন থামিয়ে থমকে তাকিয়ে আছেন বাইরে।

এখানকার সময় দুটো, দেশের ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা হবে। ঠিক এক বছর আগে এই দিনে মা চলে গিয়েছিল বিকেল পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিটে। আমি সেদিনও প্লেনে ছিলাম—কলকাতা ফিরছিলাম বম্বে থেকে। আজ প্রায় সূর্যাবর্তের পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর আবার বুঝি মার সঙ্গে দেখা হল এই অনন্তের মাঝে। আল্পস তুষারশৃঙ্গকে সাক্ষী রেখে।

অসুস্থ হওয়ার পর থেকে মার যখন চলাফেরা করার ক্ষমতা কমে এল, আমার নতুন কোনও জায়গায় যাওয়ার কথা হলে একটাই কথা বলত মা।

সেই তরঙ্গায়িত জলদপ্রতিম রৌদ্রালোকিত নিঃসীম পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে মার গলার স্বরটা যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম—

যা দেখতে পাবি দুচোখ ভরে দেখে নিবি। একদম ভাববি না বোকা, মা বিছানায় পড়ে আছে। মনে করবি তোর চোখ দিয়েই আমি দেখছি।

১০ জুন, ২০০৭

এয়ারপোর্ট-এ এসে নামলাম ঠিক সময়ে। মিউনিখ থেকে নিস-এর যাত্রীসংখ্যা খুব বেশি নয়। ফলে লাগেজ এসে পৌঁছোতে সময় লাগল না। বারবার ইউরোপ গেলে একটা জিনিস কেন ভুলে যাই, আর এয়ারপোর্টে নামা মাত্র মোক্ষমভাবে মনে পড়ে, জানি না—যে সঙ্গে খুচরো ইউরো রাখতে হবে। সারবাঁধা ট্রলিগুলো থেকে একটা ট্রলি টেনে বার করতে গেলে খুচরো এক ইউরো কয়েন ফেলতে হয়, তবে ট্রলি-র তালা খোলে।

ব্যাগ হাতড়াচ্ছি, কোনও পুরনো ভ্রমণের কোনও স্মরণমুদ্রা পড়ে আছে কি না। এমন সময়ে হালকা বাদামী রঙা স্যুট পরা এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন একটা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে—আমার আর বুম্বার নাম লেখা। বোঝা গেল, উনি কান ফেস্টিভ্যাল-এর সরাসরি প্রতিনিধি—আমাদের নিতে এসেছেন। বাইরে দাঁড়িয়েছিল একটি বিশাল গাড়ি। এক এক করে গাড়ির চালক আর অভ্যর্থনাকারিণী তাতে মালপত্র তুলে দিলেন—আমাদের হাত লাগাতেও হল না।

গাড়িতে উঠেই বুম্বা ছটফট করতে লাগল—সিগারেট খাবে। সত্যি, এতক্ষণ টানা জার্নি করে এসেছে, একটা সিগারেট ও খায়নি বুম্বা—আমার কাছেও আশ্চর্য লাগছিল।

গাড়ির চালক ইংরেজি বোঝেন। এয়ারপোর্ট পার করে নিস শহরে পড়লাম। আর পড়ামাত্র বুঝতে পারলাম মাতিস-এর সেই বিপুল আলোকিত আকর্ষণের মূল কারণ। সোনালি রোদে ঝলমল করছে চারদিক।

বিকেল চারটের কাছাকাছি। দুপুরের কড়া তেজ বা বিকেলের ম্লান আলো কোনওটাই নয়। যেন সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো প্রকৃতি। শহরের পথ নির্দেশিকা চিহ্নগুলোতে 'নিস' শব্দের বানান—Nyssa। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। জানা গেল এটা দক্ষিণ ফ্রান্সের নিজস্ব বাগধারার বানান। এখনও বেঁচে আছে কিছু প্রাচীন মানুষের মধ্যে।

যার যেদিকে উৎসাহ। বুম্বা জিজ্ঞেস করল গাড়িটার কী নাম। কী যেন একটা বললেন ভদ্রলোক। আমি বিশেষ বুঝলাম না, বোঝা গেল বুম্বা যারপরনাই অভিভূত।

নিস থেকে কান পৌঁছতে সময় লাগল ঘণ্টা খানেকেরও কম।

ইউরোপের যে কোনও ছোট শহরের রাস্তাঘাট চেহারাচরিত্র, আলোছায়ার ধরন অনেকটা একরকম।

পুরনো পাথর বাঁধানো রাস্তা, উঁচুনিচু পথ, দু'পাশে ফুটপাথ জুড়ে ছায়ামেলা সীমারেখা—সেখানে সামান্য কয়েকটা চেয়ারটেবিল জড়ো করে পথের ধারের কাফে।

কানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে লা বোকা অঞ্চলের বিচ রেসর্ট হোটেলে। হোটেল না বলে সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টও বলা যেতে পারে। ফ্রান্সে এমনটা অনেক আছে।

হোটেলের রিসেপশনে প্রবল উত্তেজনা। একে একে নানা অভ্যাগত এসে পৌঁছেছেন। সবাই দূরদূরান্তর থেকে, দীর্ঘ সফরক্লান্ত। এদিকে রিসেপশনের কর্মীরা ফরাসি ছাড়া কোনও ভাষায় কথা

বলবেন না। ইংরেজি বলতে গেলেই হাঁ হাঁ করে দু'হাত তুলে দিচ্ছেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

চিঠিপত্র, পাসপোর্ট দেখিয়ে বোঝানো গেল আমরা উৎসবের অতিথি। আমাদের হাতে চাবিটা ধরিয়ে দিয়ে অন্য অতিথির সঙ্গে ইশারা-কথোপকথনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রিসেপশন কর্মী।

আমাদের ঢাউস দুটো সুটকেস। দিল্লির লুফৎহনসা কর্মী সদয় হয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন বটে। কিন্তু বাড়তি ওজন মকুব করিয়ে খুব যে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি, তা নয়। সেটা হাড়ে হাড়ে এখানে এসে বুঝলাম। এই হোটেল-এ কোনও পোর্টার সার্ভিস নেই। অতএব নিজের মালপত্র ঘাড়ে করে নিজে নিজে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। একে পথক্লান্তির অবসাদ, তার ওপর বাইরের চড়া রোদ্দুরে মাথা ধরে আছে। বুম্বা ততক্ষণে এয়ারপোর্ট-এ আনতে যাওয়া গাড়িটাকে সইসাবুদ করে বিদায় করছে। আর আমি তিতিবিরক্ত মুখে বিচ রেসর্ট-এর রিসেপশনে সানগ্লাস পরে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ কোত্থেকে একটা গলা ভেসে এল 'কী রে ঋতু? কখন এলি?'

প্রথমে ভাবলাম নির্ঘাৎ দুঃস্বপ্ন দেখছি। বা ফরাসি ভাষার আতঙ্কে মনে মনে বাংলা বাক্য শুনছি। তবু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি ওপরের বারান্দা থেকে আমার দিকে প্রবল উৎসাহে হাত নাড়ছে এক মেরুন পাঞ্জাবি পরা টাকমাথা। সানগ্লাস খুলে দেখি দেবু—আমাদের বন্ধু সঙ্গীতকার দেবজ্যোতি মিশ্র।

'দহন' থেকে শুরু করে 'অন্তরমহল' অবধি টানা আমরা এতগুলো ছবিতে কাজ করেছি—'রেনকোট' সে অর্থে আমার ছবিতে প্রথম গানের সুর দেবুর, চোখের বালির রাজকীয় আবহ দেবুর, বাড়িওয়ালির বিয়ের গানের করুণ বিলাপ দেবুর। সম্প্রতি বহুদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি, কয়েকটা প্রয়োজনীয় এসএমএস বিনিময় ছাড়া। আমি জানতামও না যে ওরও কান ফেস্টিভ্যালে আসার কথা আছে। দেবুকে দেখামাত্র সুদূর প্রবাসে আত্মীয়দর্শনের যে পবিত্র আনন্দটুকু পাওয়া যায়, প্রথমেই সেটা হল। তারপরেই হল দারুণ অভিমান—সেটা নিজের ওপর, আমাদের সাম্প্রতিক অযোগাযোগের ওপর, না ফরাসি আতিথেয়তার ওপর, নাকি ভীষণ রাগের পর থেকে যে কোনও আপনজনকে কাছে পেলে যেভাবে ফুঁসে ওঠে মন—কিচ্ছু জানি না। প্রথম কথাটা বললাম দেবুকে,

—কদিন আছিস রে তুই?

—একুশে চলে যাব।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ। প্যারিস হয়ে কলকাতায়।

—ও! আমার একটা সুটকেস নিয়ে যাবি? তোর নিশ্চয়ই খুব লাগেজ নেই?

দেবু ততক্ষণে হাসছে।

—হ্যাঁ নিয়ে যাব। মাদ্রাজ থেকে তো অনেকবার নিয়ে এসেছি। তুই ক'দিন?

ততক্ষণে বুম্বা রিসেপশনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তিন বাঙালির বহুদিন পর দেখা হলে পৃথিবীর

যে কোনও জায়গাই যে মুহূর্তের জন্য বঙ্গখণ্ডে পরিণত হবে, তা তো আমরা সবাই জানি। মনে হ'ল সাদা চামড়া রিসেপশনের ষণ্ডা লোকগুলোর একটাকে ডেকে বাংলাতেই বলি, 'বাছা, মালপত্তরগুলো একটু ঘরে দিয়ে এস তো।'

দুই

লা বোকা বিচ রেসর্ট-এ আমার ঘরটা পশ্চিমমুখো।

এখানে সূর্য ডোবে রাত আটটার পর। ততক্ষণ অবধি ঘরের দেওয়াল তেতে আগুন।

ইউরোপ-এর এটা একটা অদ্ভুত মজা।

বিকেলের পর থেকেই রোদে দাঁড়ালে যতটাই গরম, একটু ছায়ার টুকরো খুঁজে পেলে ততটাই নিরবচ্ছিন্ন ঠান্ডা। বিকেল পাঁচটা বাজতে চলল। তাপমাত্রা প্রায় চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গরমকালে ইউরোপ ভ্রমণ যে এখন কি দুঃসহ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে তা প্রথম বুঝেছিলাম বছর তিনেক আগে লোকার্নো ফেস্টিভ্যালে চোখের বালি নিয়ে গিয়ে।

লোকার্নো সুইজারল্যান্ডে। আমার মতো ভেতো বাঙালির কাছে শীতলতার চিররাজ্যে।

পৌঁছে দেখি, একী! এ তো আফ্রিকা। এত গরম।

তার ওপর আমাকে থাকতে দিয়েছিল পুরনো একটা হেরিটেজ হোটেল-এ।

প্রায় পাঁচশো বছর আগের একটা পুরনো দুর্গপ্রমাণ পাথুরে বাড়িকে হোটেল করে নেওয়া হয়েছে।

সেখানে সারাদিন পাথুরে দেওয়ালে জুলাই মাসের চড়া রৌদ্রে তপ্ত আগুন হয়ে থাকে। হোটেল-এ কোনও এয়ার কন্ডিশন নেই, ফ্যান নেই। আমাদের কলকাতায় বেয়াড়া গরমে লোডশেডিং হলে যেরকম হয়, তেমনই একটি অনন্ত অবস্থা।

অনেক বলে কয়ে কাকুতিমিনতি করে একটা ফ্যান আনানো হল ঘরে। সারাদিনের জমে থাকা গরম হাওয়া কি তাতে কাটে? তার ওপর ফ্যানটা আবার ছোট্ট, আমাদের এখানে গাড়িতে অনেকে যেরকম ফ্যান লাগান তেমনই অনেকটা। বালিশের ওপর বালিশ চাপিয়ে ঘুমোলে কোনওরকমে মুখটুকুতে একটু হাওয়া লাগে।

তখন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ। সবে বছরের দীর্ঘতম দিন গেছে। সূর্য ডোবার সময় রাত ন'টা।

রাত দশটার সময় যখন ঘুমোতে যেতাম, আমার ঘড়িতে তাপমাত্রা দেখাত উনত্রিশ ডিগ্রি, আর পর্দার বাইরে তখনও চড়া আলো।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সঙ্গে ইউরোপ তখন সচেতনভাবে সবে যুঝতে আরম্ভ করেছে। ফলে, ছোট কোনও শহরে গরমকালে হঠাৎ অনেক পর্যটক এসে পড়লে গরমের মোকাবিলা কেমন করে

করবে, সেটা তখনও তাদের নাগালের বাইরে।

ফ্রান্সে এসে দেখলাম কান-এর মতো পাড়াগাঁয়ের অত্যন্ত অপাংক্তেয় হোটেল-এ এখন সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা। গরমের অত্যাচার যাতে পর্যটককে পর্যুদস্ত না করে।

আমার ঘরটার লাগোয়া একটা বারান্দা। তার অ্যাক্রিলিকের ছাউনির ওপর ঘন ডুমুরলতার ছাদ। পাশেই হোটেলের সাঁতারপুকুর। ভিজে হাওয়া, আর ঠান্ডা ছায়া মিলিয়ে ওই ছোট্ট বারান্দাটা বড় মনোরম।

বুম্বার ঘরটা অল্প দূরে। করিডোরের ওপাশে। আমার ঘরে মালপত্র পৌঁছে দেওয়ার তদারকি সেরে নিজের ঘরটা গোছাতে গেছে বুম্বা। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল।

—ক্যামেরাটা বের কর তো। একটা ছবি তুলি। আমি যে কোনও যন্ত্রপাতিতে সমান আনাড়ি। সেটা ডিভিডি প্লেয়ার চালানো থেকে বিদ্যুৎ কেটলি অবধি। ভাবতে সত্যি লজ্জা করে, আমার চোদ্দটা ছবি বানানো হয়ে গেল। আমি এখনও স্টিল ক্যামেরা দিয়ে ভাল করে একটা ছবিও তুলতে পারি না।

আমার ইউনিট সহকর্মী সঞ্জয় কলকাতা থেকে রওনা দেওয়ার আগে আমাকে পইপই করে কী করে ডিজিট্যাল ক্যামেরা চালাতে হয়, মানে কোন বোতাম টিপলে কী হয়, সেটা প্রায় জলের মতো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, এ আর বেশি কী? এ তো সোজা!

ক্যামেরাটা বের করে বুম্বাকে বোঝাতে গিয়ে দেখি, সব গুলিয়ে গেছে। বুম্বা আমাকে বহুদিন চেনে, অত্যন্ত অবিচলিত শান্ত স্বরে বলল—ছাড়, আমি দেখে নিচ্ছি।

নিজের মনে ক্যামেরাটা নিয়ে খুটখাট করতে লাগল বুম্বা। আর আমি চোখের সামনে 'স্টার আনন্দ'-র ল্যাপটপটা নিয়ে বসে অকূল পাথার ভাবছি—ঋতব্রতকে কোথায় খুঁজে পাব? এসে অবধি ওর নম্বরে তিনটে এসএমএস করেছি। কোনও উত্তর আসেনি।

হঠাৎ একটা ক্লিক করে শব্দ হল। মুখ ফিরিয়ে দেখি বুম্বা চোখ থেকে ক্যামেরা নামাল। আমার দিকে এলসিডিটা এগিয়ে দিতে দেখলাম আমার ন্যাড়ামাথা অন্ধকার মুখ। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের নন্দনকানন কান শহরে আমার প্রথম ছবি।

তিন

হোটেলের মাঝখানের চত্বরটা জুড়ে বিশাল একটা সুইমিং পুল। তার ধারে চেয়ার টেবিল পেতে পানভোজনের ব্যবস্থা। হোটেলে কোনও রুম সার্ভিস নেই, একটা রেস্তোরাঁ আছে, সেখান থেকে টেক অ্যাওয়ে প্যাকেট ঘরে নিয়ে আসা যায়। ঘরের মধ্যে একটা জায়গায় ছোট একটা প্যান্ট্রি মতো। বাসনকোসন, কাপপ্লেট, কাঁটা চামচ, ছুরি, গ্রেটার, ইলেকট্রিক কেটল, মাইক্রোওয়েভ এমন কি বার্নার ওভেন অবধি আছে। খাবার বাইরে থেকে কিনে এনে ঘরে ফিরে গরম করে নেওয়া।

ফ্রান্সের এই ছোট শহরগুলোর খাবার বেশ সস্তা। একেবারে পাঁচতারা হোটেল বা দামি রেস্তোরাঁ বাদ দিলে বড় দোকান, আর ছোট হোটেল-এ দামের তফাত বিশেষ নেই।

ঘরে ঢুকেই বোঝা গেল জল নেই। এখানে কলের জল লোকে দিব্যি খায়। তবে আমাদের চিরাচরিত পিটপিটানি থেকে বোতল থেকে জল না ঢেলে খেলে আত্মা কেমন যেন অতৃপ্ত থেকে যান। আর চেনা চেনা ডাক্তারদের মুখ ঘনঘন মনে পড়ে যায়। ডাক্তারবন্ধুদের নিশ্চয়ই ভালবাসি, তবে প্রতি ঢোঁক জল খাবার সময়েই নয়।

অতএব জলটা কিনে আনতে হবে। আজকাল তো দুনিয়াশুদ্ধ হোটেলে প্লাস্টিক কার্ড হয়ে গেছে, এখানে সেই সনাতন চাবি—তায় বিশালকায়।

সুইমিং পুলের ধারে এসে বসলাম। বুম্বা পাশের রেস্তোরাঁতে খাবারের খোঁজ করতে গেছে। আপাতত কফি খেতে চাই, তাছাড়া রাতের খাবার কী পাব না পাব?

সুইমিং পুলের ধারটা প্রায় খালি। একটু আগে ঘরে বসেও সাঁতারুদের সমস্বর কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন তাঁরা আর কেউ নেই। বাইরে রোদের তাপ মরে এসেছে। আজ পুকুরের জল থেকে উঠে আসছে এক অদ্ভুত বিষণ্ণ শীতলতা। ঘড়ির দিকে তাকালাম, প্রায় আটটা বাজে। মানে দেশে এখন সাড়ে এগারোটা। বাবা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। নইলে একটা ফোন করতাম।

ঘড়ি থেকে চোখ সরাবার আগেই তারিখটায় নজর আটকাল। আরেকটা আঠেরোই মে বিদায় নিচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে। ফ্রান্সে তার আয়ু আরও কয়েক ঘণ্টা।

ঠিক একবছর আগে এইসময় মায়ের মৃতদেহ নিয়ে আমরা শ্মশানে। ইলেকট্রিক চুল্লির লাইনে। একমাথা সিঁদুর পরে মা শুয়ে আছে মাটিতে। আস্তে আস্তে ফুলে ওঠা মুখ আবার কেমন সুন্দর হয়ে উঠছে। ভাঁজ গাল, বসা চোখ, রোগার্ত শরীর নিটোল পেলব হয়ে যাচ্ছে কোন চিরশান্ত অমরস্পর্শে।

আর পঞ্চাশ বছরের সাথিকে কেমন করে বিদায় জানাতে হয়, না জানা আমার বাবার মুখের পেশীগুলো বদলাচ্ছে এক অশান্ত তোলপাড়ে।

সুইমিং পুলের ঠাণ্ডা হাওয়াটা কেমন যেন গরম বোধ হতে লাগল। প্রায় যেন আগুনের হলকা। আপনা থেকে চোখ বন্ধ হয়ে এল।

মনে পড়ে কত-না দিনরাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি

না! এ যাত্রা গানটা আমার আর পিছু ছাড়বে না। (চলবে)

১৭ জুন, ২০০৭

দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রসৈকত কান শহরের প্রধান আকর্ষণই হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রীষ্মকালীন দুটো চলচ্চিত্র উৎসব। কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের উৎসব।

উৎসবের ঝাপটায় সারা শহরের চেহারাই অন্যরকম। একেবারে আঞ্চলিক মানুষ, যাঁরা দোকান চালাচ্ছেন, রেস্তোরাঁয় ব্যস্ত, গাড়ি বা বাসের চালক—তাঁদের বাদ দিলে প্রায় সারা শহরটার গলায়ই ঝুলছে কান ফেস্টিভ্যাল-এর স্মারকফলক—বিভিন্ন বিভাগের ডেলিগেট কার্ড।

লা বোকা-য় এই বিচ রেসর্ট হোটেলটিতে প্রধানত থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে এশীয় আমন্ত্রিতদের।

সকালবেলার বুফে ব্রেকফাস্ট-এ গিয়ে অন্তত সেরকমই তো মনে হল মধ্যপ্রাচ্য, সুদূর প্রাচ্য, এবং বিশেষ করে ভারতীয় অভ্যাগতদের একত্র সহাবস্থান।

প্রথমদিন সন্ধেবেলাই বেশ আলাপ জমে গেল মণিরত্নমের সঙ্গে। সুইমিং পুলের ধারে বসে আছি আমরা। বুম্বা সবে কফি নিয়ে এসে পৌঁছেছে—হঠাৎ দেখি নাতিদীর্ঘ একটি চেনা শরীর এগিয়ে আসছে। আমি যেন শুনেছিলাম 'গুরু' দেখানো হবে, কিন্তু সেটা খুব সচেতনভাবে স্মরণেও ছিল না। কিন্তু মণিকে সামনে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

মণিরত্নম মানুষটা বরাবরই খুব শান্ত, মিতবাক। প্রায় মুখচোরাই মনে হয় অনেক সময়ে, এমনভাবে মণি গুটিয়ে রাখেন নিজেকে। আবার প্রয়োজনে পছন্দমতো সঙ্গী পেলে অনর্গল কথা বলে যেতেও দেখেছি। মণির স্বভাবের একটা বড় শান্ত প্রসন্নতা আছে, আর আছে একটা সুচারু পরিশীলিত বুদ্ধিমত্তা ও কৌতুকবোধ। সিনেমাজগতের বেশিরভাগ মানুষকেই দেখেছি আড্ডা মারতে শুরু করলে ব্যাপারটা কিছুক্ষণের মধ্যেই কেমন যেন একটা তীব্র, ক্রুদ্ধ, পরনিন্দায় পর্যবসিত হয়। মণির সমস্তটাই হয় আলোচনা বা প্রয়োজনে সঙ্গত সমালোচনা—কোনওদিনই সেটা পরনিন্দার পর্যায়ে পৌঁছতে দেখিনি।

মণির সঙ্গে আমার কয়েকটি পরোক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে। ঐশ্বর্যর প্রথম ছবি মণির সঙ্গে। 'চোখের বালি'র সময় নানা গল্পের মধ্যে ঐশ্বর্য আমাকে বলেছিল ও প্রথমবার সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল মণিরত্নমের মাধ্যমে। 'ইরুবার'-এর শুটিং-এর কারণে ট্রেনে চেপে কোথাও একটা যাচ্ছিল ওরা। রাত হয়ে এসেছে, ট্রেনের জানলার বাইরে অন্ধকার প্রকৃতির বুকে অনন্ত জোনাকি স্ফুলিঙ্গ। সেই সূত্র ধরেই মণি ওকে 'অপরাজিত'র জোনাকির অনন্য সিনেমা প্রয়োগের গল্প বলেছিলেন।

তারপর অভিষেক আর অজয় দেবগণ 'যুবা'তে অভিনয় করবার পরপরই আমাদের সঙ্গে 'রেনকোট' আর 'অন্তরমহল' করেছে। মণির প্রিয় মুম্বাই নায়িকা মনীষা 'খেলা' ছবিতে অভিনয় করতে এসে কত অজস্রবার মণিপ্রসঙ্গে মুখর হয়েছে। সানগ্লাস-এর শুটিং-এর সময়ে মাধবন আর

অতি সম্প্রতি 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর সময় প্রীতি জিন্টা—ভাবা যায়! এতগুলো শিল্পী আমাদের দুজনের ছবিতেই কমন!

ফলে এহেন মণিরত্নমের সঙ্গে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ তেমন বেশি না হলেও মনে হল, অনেক অভিনেতৃদূতীর মাধ্যমে আমরা পরস্পর সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। একই মানুষ দুটো ইউনিট-এ কাজ করলে কিছু এই ইউনিট-এর গল্প ও ইউনিট-এ আবার কিছু ও ইউনিট এর গল্প এই ইউনিট-এ ভ্রমণ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেল কেবল গল্প শোনার বাইরেও আমরা পরস্পরকে বেশ নিবিড়ভাবে চিনি। হতে পারে দু'জনের ছবিই দু'জনকে ধীরে পরিচিত, ক্রমে আপন করেছে।

মণির সম্পর্কে এতখানি বলার একটা কারণ আছে। প্রথমত, দুহাজার সাত সালের কান ফেস্টিভ্যালে মণিরত্নমকে প্রায় হঠাৎ বন্ধু করে পাওয়া বা ফেস্টিভ্যাল-এর দিনগুলোতে মণির নির্বাক সহাস্য সান্নিধ্য ধীরে ধীরে কেমন করে আমাকে বহু অপ্রীতিকর অবস্থায় নীরব ধৈর্য দিয়েছে, সেটা বুঝে ওঠাও বড় প্রয়োজন।

ভারতীয় সিনেমাগুচ্ছর প্রদর্শনী শুরু হল ১৯ মে। উৎসব চত্বরে একটি বিশেষ বেষ্টনী—সেখানে এই সাতটি ছবি দেখানো হবে।

উনিশ তারিখ তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে কান ফেস্টিভ্যাল, সারা শহরজুড়ে ছড়িয়ে ফেস্টিভ্যাল-এর নানা মানুষ। অতএব শুভরা যে কোথায়, এখনও ভাল করে জানা যায়নি। খবর পেলাম পরিচিত অনেকে এসেছেন, কিন্তু সেভাবে কারওর সঙ্গে দেখা বা কথা হয়নি।

আগেই বললাম লা বোকার এই হোটেলটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রিত ভারতীয় অভ্যাগতদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতীয় সাতখানি ছবি বাবদ জনা পনেরো অভ্যাগত কান ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত। কোনও কোনও ছবির ইউনিট সঙ্গে করে আরও কাউকে কাউকে এনেছেন। যেমন ভাবনা তলোয়ারের ধরম ছবিটার জন্য ভাবনা নিজে, তাঁর স্বামী ছবির প্রযোজক সুশীল তলোয়ার, সঙ্গে দেবজ্যোতি, মানে দেবু, ছবির সঙ্গীত পরিচালক।

এইভাবে প্রতিটি ছবিতেই কমবেশি দু'তিনজন করে আমাদের গোটা দলের সদস্য সংখ্যা সাকুল্যে সতেরো।

হোটেলের রিসেপশনের উল্টোদিকে ফেস্টিভ্যাল-এর একটা কাউন্টার বসেছে সাময়িকভাবে। সেখানে দেয়ালের গায়ে বড় করে কান ফেস্টিভ্যাল-এর ৬০ বছরের একটা পোস্টার টাঙানো। আর দুজন অত্যন্ত মাঝবয়সী মহিলা এই হোটেল-এর নিমন্ত্রিত সদস্যদের যাতায়াতের তদারকি করেন। আমাদের জন্য তিনটে বিশাল গাড়ি রয়েছে লা বোকা থেকে ফেস্টিভ্যাল চত্বর অবধি নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যখনই গিয়ে সেই মহিলাদের জিজ্ঞেস করি—কখন গাড়ি যাবে? তাঁদের

একটাই উত্তর 'সতেরো জন না হলে গাড়ি যাবে না' বোঝা গেল, তাঁদের কাছে সতেরো জন্য অভ্যাগতর একটা তালিকা আছে—তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অতগুলো ভারতীয় নাম, এবং কে কোন ছবির সেটা মনে রাখতে পারেন না। কোনওমতে সতেরো সংখ্যাটা তাঁদের মনে গেঁথে গেছে। অতএব ভারতীয় অভ্যাগত বললেই তাঁরা কেবল একটা সংখ্যা বোঝেন। যেটার নাম সতেরো। তাঁদের মধ্যে সকলেই যে একসঙ্গে ফেস্টিভ্যালে ছবি দেখতে যাবেন না, বা যেতে চান না, ভারতীয়রা যে সবসময়ে কন্ডাক্টেড ট্যুর সদস্যর মতো জোট বেঁধে চলাফেরা করতে না চাইতেও পারেন, সেটা তাঁদের কে বোঝাবে?

একান্ত বেগতিক অবস্থা থেকে আমরা নিজেরাই গাড়ির চালকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়ে আমরা কয়েকজন নিজেদের মতো সকাল সকাল ফেস্টিভ্যালে পৌঁছে যেতাম।

লা বোক অঞ্চলটা পার করে একটা বিশাল ফ্লাইওভার, সেটা পার হতে হতে দ্বিতীয় দিন থেকেই চিনে গেলাম, উৎসবের প্রধান চত্বরে পৌঁছতে আর মিনিট সাতেক দেরি।

দুই

ফেস্টিভ্যাল-এর প্রধান চত্বরটায় একটা বিশাল সিনেমাহল জ্বলজ্বল করছে। নাম প্যালে (Palais)। ইংরিজি অর্থ করলে বোধহয় দাঁড়ায় Palace, বা রাজদুর্গ।

কান ফেস্টিভ্যাল-এর প্রতিযোগিতা বিভাগের ছবিগুলো সাধারণত এখানেই দেখানো হয়। আর দেখানো হয় প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ ছবির প্রথম প্রদর্শনী, কান ফেস্টিফ্যাল-এর ভাষায় রেড কার্পেট প্রিমিয়ার।

প্যালে সিনেমা হলটা ঘিরে কান ফেস্টিভ্যাল-এর বিশাল প্রদর্শনী ব্যবস্থা। গত বেশ কয়েক বছর ধরে কান ফেস্টিভ্যাল মূল হলিউডি ছবির বাইরের ছবির একটা বিশাল বাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিল্ম বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের এক সংযোগস্থল। রাস্তার ফুটপাথ জুড়ে লম্বা প্যাভিলিয়ন-এর সারি। প্রতিটি প্যাভিলিয়ন-এর নম্বর আছে। কান ফেস্টিভ্যাল সদস্য মাত্রই একটা করে কান ফেস্টিভ্যাল ব্যাগ পান। সেই ব্যাগটায় নানা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির সঙ্গে এই প্যাভিলিয়নগুলোর বিস্তারিত সূচিপত্র সম্বলিত পুস্তিকা দেওয়া আছে। সেখান থেকে সহজেই কোন প্যাভিলিয়ন কোন দেশের, তার একটা সহজ নির্দেশপন্থা তৈরি হতে পারে।

'সিনেমা অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'— যেখানে ভারতীয়, লেবানন এবং আফ্রিকার একটি বিশেষ সিনেমাগুচ্ছ দেখানো হচ্ছে সেটিই আমাদের ভারতীয় দলটির অভীষ্ট প্রদর্শনীকক্ষ। কাছে গিয়ে যেন সার্কাসের তাঁবু—একটা অস্থায়ী সিনেমামহল। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তৃতীয় বিশ্ব বলে কি এতটাই ফেলনা! মেলায় তাঁবু খাটিয়ে সিনেমা দেখার ব্যবস্থার মতো। তার ওপর একপাশে রাস্তা, অন্য পাশে সমুদ্রবন্দর। জলযান, স্থলযান যে যার নিজের সশব্দ গতিতে ধাবমান।

এর মধ্যে সংলাপ, আবহ কীই বা শোনা যাবে?

ফেস্টিভ্যাল অফিসে প্রথমদিন সকালবেলা প্রাতরাশ সহযোগে ভারতের সব পরিচালকদের একত্রিত করা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য। একে একে সবাই ঢুকে পড়েছেন কেবল আমি আর বুম্বা তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে, 'স্টার আনন্দ'র ল্যাপটপ হাতে। কখন ঋতব্রত আসবে! অবশেষে দূরে ঋতব্রতকে দেখা গেল। আমি ফোঁসফোঁসে রাগে এবং বুম্বা মিষ্টি কথায় তার হাতে ল্যাপটপ সঁপে দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

সকালবেলার প্রথম ছবি মালায়লাম ভাষায়। ডঃ বিজুর 'সায়রা', ছবি দেখতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখি, আরে বাব্বা! এত রীতিমতো পাঁচতারা সিনেমা হল। কোথায় লাগে যেকোনও মাল্টিপ্লেক্স। যেমন বসবার ব্যবস্থা, তেমন আনুপাতিক দূরত্ব, অসাধারণ প্রোজেকশন অনবদ্য শব্দ প্রক্ষেপণ। আর বাইরের রাস্তার ভিড়ের আওয়াজ—তার কোনও লেশমাত্র নেই। প্রেক্ষাগৃহর আকারটা অতিকায়, প্রায় গোটা চারেক মাল্টিপ্লেক্স স্ক্রিন তার মধ্যে সহজেই ঢুকে যাবে।

ছোট্ট একটা বক্তৃতার পর ছবি শুরু হয়ে গেল। ইংরিজি সাবটাইটেল-এর তলায় ছোট্ট একফালি কালো ব্রান্ডের গায়ে ইলেকট্রনিক ফরাসি সাবটাইটেল ফুটে উঠছে। আমি বুম্বা দুই বাঙালি। মণিরত্নম একজন তামিলভাষী। ভাবনা উত্তর ভারতের মেয়ে। একটা মালয়ালম ছবি দেখতে দেখতে সবাই উপলব্ধি করলাম সেই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে দুটো মাত্র ভাষা—ইংরিজি আর ফরাসি। যে যেটা বোঝেন।

তিন

দুপুর একটা থেকে আড়াইটে অবধি সাধারণত ছবি দেখার বিরতি। ওই সময়টায় চারপাশের ফুটপাথ কাফেতে উপচে পড়া ভিড়। সবাই কোনওরকমে কয়েক গ্রাস খেয়েই ঢুকবেন ছবি দেখতে।

চারদিকের ইউরোপীয় দোকান, ফলে অচেনা খাবার কেমন হবে বুম্বা বোধহয় সঠিকভাবে ঠাহর করতে পারছিল না। সামনে একটা ম্যাকডোনাল্ডস দেখে সেখানেই ঢুকে পড়া গেল।

দোকানের ভেতর তিলধারণের জায়গা নেই—বসে খাওয়া তো দূরের কথা। ভাল করে দাঁড়াবার অবধি জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে বাইরে ফুটপাথের ধারে বাঁধানো ঘাসের টুকরোর ধারে সিঁড়িতে বসে দু'জনে মিলে দুটো ট্রে নিয়ে কম্বো মিল খাচ্ছি। আর সেনেগাল থেকে আসা দুজন মানুষ আমাদের পরম বন্ধু ভেবে ঝাঁকায় ঝোলানো সানগ্লাস গছাবার চেষ্টা করছেন 'ইউ ইন্ডিয়া উই সেনেগাল, ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড' বলে।

ফ্রান্সের ফেরিওয়ালার সঙ্গেও যে গড়িয়াহাটের ফুটপাথের মতো দরদাম করা যায়, বুম্বা সেটা ভাবেনি। আর তাছাড়া ও বেচারা নিজেও রাস্তা থেকে কেনাকাটা বিশেষ করে না, ফলে দরদাম

করার ব্যাপারটায় তেমন সড়গড় নয়।

এদিকে সানগ্লাস আর জুতো, এই দুটো জিনিস দেখলে নিজেকে সামলানোও বুম্বার জন্য খুব সহজ নয়। পঞ্চাশ ইউরো দিয়ে শুরু করে শেষমেশ কুড়ি ইউরোতে তিনটে পছন্দসই সানগ্লাস ব্যাগে ভরে বুম্বা একটা পরম তৃপ্তির হাসি হাসল।

কান শহরটা ফেস্টিভ্যালের সময়টুকু বাদ দিলে কেবল সৈকতভ্রমণবিলাসীদের জায়গা। তাই ফুটপাথের ধারের বেশিরভাগ দোকানেই সৈকতসামগ্রী। সাঁতারের পোশাক (পুরুষ এবং মহিলার), বিচ তোয়ালে, ট্যানিং অয়েল, নানারকম সাবান, বডি লোশন, হেয়ারব্যান্ড, সানগ্লাস ইত্যাদি সাজানো রয়েছে থরে থরে। সঙ্গে রয়েছে আঞ্চলিক পারফিউম, এবং ওয়াইন। কোনওটিরই দাম বিশেষ নয় কিন্তু গন্ধ বা স্বাদের একটা প্রবল নিজস্বতা আছে।

আর রয়েছে, সম্প্রতি গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি ফেস্টিভ্যাল স্যুভেনির-এর দোকান। সেখানে কান ফেস্টিভ্যাল সংক্রান্ত নানা ব্যবহারিক পণ্য। বিভিন্ন বছরের লোগো দিয়ে বানানো টি শার্ট, ব্যাগ, পোস্টার, কলম—নানা কিছু।

ফুটপাথের ধারে ঘুরতে ঘুরতে বেলা হল। একবার মনে হল ইন্ডিয়ান প্যাভিলিয়নটার দিক থেকে ঘুরে আসি। গুটিগুটি সেদিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখা হল শুভ আর বিরাজের সঙ্গে। শুভশেখর ভট্টাচার্য এবং বিরাজ কালরা দু'জনেই প্লানম্যান-এর তরফ থেকে ছবি বিকিকিনির ব্যাপারে কাজ করতে এসেছে ফেস্টিভ্যাল-এ। দেখা হতেই রাস্তা পার হয়ে দৌড়ে এল শুভ।

—ঋতুদা, বুম্বাদা তোমরা খেয়েছ?

—হ্যাঁ, এই তো এক্ষুণি খেলাম, কেন রে?

—না, একটা পিৎজা খাবে, চল না।

—আরে বাবা এক্ষুণি খেয়েছি, পেটে জায়গা নেই।

—হাফ খাবে, চল প্লিজ, বিয়ার খাবে বুম্বাদা?

বিয়ার খাওয়াবে বলে শুভ তো সচরাচর এতটা পীড়াপীড়ি করে না, ব্যাপারটা কী?

ব্যাপারটা বোঝা গেল একটু পরেই। পিৎজার দোকানে পৌঁছে। দোকানটা সাময়িক, বোঝাই যাচ্ছে, যে ফেস্টিভ্যাল-এর জন্যই তৈরি হয়েছে। আমাদের পাইস হোটেলের মতোই ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর চক দিয়ে লেখা খাদ্য তালিকা আর দাম।

নানারকম নয়নলোভন খাবারের দোকানের সামনে এলে, যতই পেট ভরা থাকুক না কেন, কেমন যেন খিদে খিদে পেতে থাকে। আমিও ব্ল্যাকবোর্ড থেকে খাবারের সারিতে আটকে গিয়ে মন দিয়ে খাবার দেখছি, হঠাৎ চোখ পড়ল দোকানের ভেতর।

চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দোকানের একজন পরিবেশনকারিণী। এমন অনির্বচনীয় রূপ আমি বড় একটা দেখিনি। গাঢ় খয়েরি কোঁচকানো চুল টেনে বাঁধা। কাঁচা সোনার

মতো গায়ের রং, অপূর্ব নিঁখুত মুখশ্রী। ভরাট বুক, সরু কোমর, চাঁপার কলির মতো আঙুল। কোথায় লাগে বলিউডের তাবৎ নাম্বার ওয়ানরা!

অপলকে আমি তাকিয়ে আছি মেয়েটির দিকে, শুভ পাশ থেকে মুচকি হেসে বলল

—এবার বুঝলে, কেন আমার দিনে এতবার পিৎজা খিদে পায়?

আমি সত্যি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

—তুমি অভিনয় করবে?

বলেই মনে হল বাতুলতা। কান ফেস্টিভ্যাল-এ, যেখানে তাবৎ ছবি করিয়েদের আনাগোনা—তাঁদের অনেকেই নিশ্চয়ই মেয়েটিকে দেখেছেন এবং অনেকেই এই প্রস্তাব দিয়েছেন।

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না। কাজ থামিয়ে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল সঙ্গে একজন ষণ্ডা যুবককে নিয়ে

—কী ব্যাপার, কী চাই?

আমরা বললাম,

—পিৎজা এবং বিয়ার।

বিরাজ আত্মসান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল

—নিশ্চয়ই ম্যারেড। লোকটা ওর স্বামী।

২৪ জুন, ২০০৭

কলকাতা শহরে, বা পশ্চিমবঙ্গে, আমার মতো অনেকেই যাঁরা ষাট সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে স্কুল যেতে শুরু করেছেন, তাঁদের অনেকেরই প্রথম বিদেশভ্রমণ সিনেমার পর্দায়—হয় 'আফ্রিকান সাফারির' তিনঘণ্টার মাসাইমারা সফর বা 'সাউন্ড অফ মিউজিক'-এর পাহাড়ঝরনা ঢালুজমি বেষ্টিত অস্ট্রিয়ার প্রান্তর। জায়গাগুলোকে হয়তো মানচিত্রে তাদের যথাযোগ্য পরিচয় হিসাবে চিনি না। তবু যে এটা বিদেশ, আমার নিজের দেশ নয়—সে কথা সহজেই বুঝতে পারি।

আরেকটু বড় হয়ে যখন হিন্দি সিনেমা দেখতে শুরু করলাম, আর গানের দৃশ্যগুলো বারবার করে সুরেলা পর্যটনে নিয়ে যেত নিসর্গপিপাসু মনকে, ততদিনে কেমন যেন কী একটা রহস্যময়ভাবে জেনে গিয়েছি যে হিন্দি ছবির অধিকাংশ শুটিং-ই সুইৎজারল্যান্ড-এ হয়। ঠিক যেমন কী একটা ভাবে জানতে শুরু করেছি, যে ক্লাসের অমুক ছেলেটা তমুক মেয়েটার বন্ধু নয়, বয়ফ্রেন্ড।

সুইৎজারল্যান্ড প্রথম যখন যাই, সে বছর চারেক পূর্বে, ততদিনে আমি ছবি করিয়ে। অপটু

কারিগর, আইফেল টাওয়ারের সামনে গিয়ে ঠিক কোথায় কোথায় নাটবল্টু লেগে থাকতে পারে, তার সন্ধান করে। আমিও অপরিণত চলচ্চিত্র কর্মী, সুইৎজারল্যান্ডে পদার্পণ করেই প্রথম আবিষ্কার করলাম যে সেখানে সন্ধে হয়। মানে সূর্যাস্ত পরবর্তী অন্ধকার নামে রাত্রি ন'টার আশপাশে—আমি গ্রীষ্মকালের কথা বলছি। একে অপরিণত, তায় কম বাজেটের ফিল্ম করিয়ে। একটা হিসাব পরিষ্কার মনের মধ্যে খেলে গেল যে, এখানে সারাদিনের আউটডোর শুটিং-এর অবকাশ অনেক বেশি—কারণ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের ব্যবধান প্রায় তেরো চোদ্দো ঘণ্টা—ইন্ডাস্ট্রির হিসাবে টানা দেড় শিফ্‌ট।

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ফ্রান্সও তার ব্যতিক্রম নয়। চোখে কালো পট্টি বেঁধে মাঝরাস্তায় নিয়ে গিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দিলে যে কোনও হতচকিত কলকাতাবাসীই বলবেন—এখন খুব জোর হলে বেলা তিনটে। রোদের তেজ এবং দীপ্তি সমান বিভ্রান্তিকর। টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করার পর ফুটপাথ ঘেঁষে হাঁটছি। সরু রাস্তা। আমাদের উত্তর কলকাতার অনেক এলেবেলে গলিও এর থেকে চওড়া। ফুটপাথ নামক পদার্থটি সত্যিকারের কোনও প্রশস্ত বুলেভার্ড নয়। সরু, ইঁট বাঁধানো। দোকান এবং পথের ধারের হকারের ঘিঞ্জি পশরা বিপণনে ক্রমশ সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত। ফ্রান্সের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই, নগরোন্নয়ন সম্পর্কে তো নেই-ই। এদেশেও কোনও সুভাষ চক্রবর্তী, 'হকার খেদাও' বলে কখনও এঁদের তুলে দিয়েছেন কিনা এবং তাঁরা ফিরে এসেছেন কি না, জানি না, যেভাবে যে কোনও কালস্রোত কিনারা ভূমিতে এসে ফেলে রেখে যায় চিকচিকে পলিমাটির সঞ্চয়।

কলকাতা শহরে আমার ডাক্তাররা, যাঁরা অনেক বলে কয়ে, কাকুতি, মিনতি, অনুরোধ, উপরোধ করেও আমাকে দিয়ে হাঁটাতে পারেননি কোনওদিন টানা কুড়ি মিনিটের বেশি, তাঁদের প্রীত্যর্থে বলি, কান শহরে আমার আর বুম্বার নিয়মিত হাঁটার সময়সীমা কম করেও প্রাত্যহিকভাবে ছিল ঘণ্টা তিনেক। বুম্বা হাঁটছে অন্য আনন্দে। পথে কেউ ঘিরে ধরার নেই, ছেঁকে ধরার নেই—অটোগ্রাফ চাইবার নেই, ছবি তুলতে চাইবার নেই—হ্যান্ডিক্যামটায় সড়গড় হলে কত সহজেই 'সুপারস্টারের স্বাধীনতা' বলে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য নামিয়ে দেওয়া যেত। আর আমি হাঁটছি যেন নিশিডাকে। পথের ধারের দোকানের সারি কেমন যেন সরে সরে আমাকে মরীচিকা ভোলাচ্ছে।

সত্যি! কিছুক্ষণ পর একই দোকানের পুনরাবৃত্তি মনে হয়। কিন্তু একঘেয়ে লাগে না সবসময়ে কারণ এই রোদচশমা জোড়াই এখানে হয়তো দু ইউরো সস্তা। ফলে ইউরোহিসেবিদের কোনও দোকানে থিতু হয়ে শপিং করতে শুরু করার আগে মধ্যবিত্ত বিবেক নড়া ধরে পুরো চত্বারটা ঘুরিয়ে দেয়।

কিনতে গেলে একটা ছুতো লাগে তো। সঙ্গীর কাছে তো বটেই, নিজের কাছেও।

এই দোকানটা আজকেই সেরে নিই বুম্বা, বুঝলি! তাহলে কাল আবার এদিকটাতে আসতে হবে না। আমরা অন্য কোথাও যাব। ঠিক যেন, এই দোকানটা সেরে নেওয়ার জন্য কেউ একটা

মাথার দিব্যি দিয়েছিল। 'বাবা, তোমার জন্য কী আনব?' বিকেল চারটের আলোয় দাঁড়িয়ে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাদের মৃদু আলো জ্বলা খাবারঘরে বাবা একা বসে রাত্তিরের খাবার খাচ্ছে।

'কী আবার আনবে? তুমি কেমন আছ?'

'ভাল আছি বাবা। তোমার শরীর ভাল?'

'তোমাদের ছবি কেমন হল? লোকের ভাল লেগেছে?'

'মনে তো হল। কয়েকটা ফেস্টিভ্যাল ডেকেছে,—রোম, ব্রাসেলস...'

'কবে?'

নিঃসঙ্গ খাবার টেবিলের বিষণ্ণতা কী জানতে চাইল তাহলে?

কত শীঘ্র আবার নতুন বিদেশবিজয়?

না কি, আবার কবে চলে যাবে তুমি?

'অক্টোবর, নভেম্বর নাগাদ। দেখি!'

আমি জানি মা হলেই বলত 'আমায় নিয়ে যাবি তো?'

'তোমায় কী করে নিয়ে যাব!'

'কেন, আমি ঠিক প্লেনে উঠে বসে পড়ব। টিকিট চাইলে তোকে দেখিয়ে দেব।'

'আহা! প্লেনটা যেন তোমার ছ'নম্বর বাস!'

'লোকে মাকে নিয়ে হজ-এ যায়। তীর্থ করাতে নিয়ে যায়। তাতে কত পুণ্যি হয় জানিস।

'আমার পুণ্যির দরকার নেই।'

যে মানুষটার বিছানা ছেড়ে বাথরুমে যেতে গেলে নার্স এবং আয়া লাগে, তার সঙ্গে এই প্রায় অলীক ঝগড়াটা বহুক্ষণ চলত। প্রায় যেন স্বপ্নচারণের মতো। দু'জনেই জানতাম আমরা—এটা সত্যি আবদার নয়। কিন্তু সত্যিটাকে মেনে নেওয়া এক, আর হজম করে নেওয়া এক—তাহলে তো জীবনটা কনফেশন বক্স ছাড়া আর কিছু হবে না। কল্পনার ঝগড়া কি কম দামি?

দু একটা দোকানে কেনাকাটা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দু'জনের দুটো ব্যাগ ছাড়া, হাতে বেশ দু-একটা শপিং ব্যাগ যুক্ত হয়েছে। এবং সেগুলো নিতান্ত কম ভারি নয়। বুম্বা বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। আমাকে অনেকগুলো ব্যাগ জলের বোতল, দোপাট্টা সব কিছু নিয়ে ঈষৎ নাজেহাল দেখে গম্ভীরভাবে হাত বাড়াল—

—ব্যাগ দুটো দে।

ভাগ্যিস কলকাতা নয়। প্রসেনজিৎকে দিয়ে ব্যাগ বওয়াচ্ছি দেখলে ফ্যান ক্লাব আমাকে আস্ত রাখত!

এবার একটা কিছু খেতে হবে। ম্যাকডোনাল্ডস বহুক্ষণ হজম হয়ে গেছে। বুম্বাকে বলামাত্র হাঁ হাঁ করে উঠল,

–এই তো খেলি।

–এই তো নারে। অনেকক্ষণ খেয়েছি। ঘড়ি দ্যাখ।

ঘড়ি দেখেই আঁতকে উঠল বুম্বা।

–সাড়ে ছ'টা বাজে। কী বোকা! দেশ মাইরি। কিছু বোঝবার উপায় নেই।

রাস্তার ধারের ক্যাফেগুলোতে বেশ ভিড়। প্রবল ক্ষিপ্রতায় ওয়েটার এসে একটা মেনু কার্ড দিয়ে গেল।

ইউরোপের মেনু কার্ড পড়ার দুর্গতি আমার আগে কয়েকবার হয়েছে। অনেকগুলো লম্বা লম্বা বাক্যাংশ, দান্তের কোটেশন বললেও আমি আশ্চর্য হতাম না।

কিন্তু খেতে বসে কী খাচ্ছি, বা কী অর্ডার করব, বুঝতে না পারলে তো মহা সমস্যা। একবার ইতালিতে গিয়ে মনে আছে উঠে গিয়ে আশপাশের টেবিলে কে কী খাচ্ছেন, দেখে নিয়ে তারপর ওয়েটারকে বলতাম 'এটা দিন, সেটা দিন।' বুম্বা দেখতাম সে সবের মধ্যেই গেল না।

আঙুল তুলে দুই চিহ্ন দেখিয়ে বাংলায় বলল,

–দুটো কফি।

লোনলি প্ল্যানেট-এর শেষের পাতায় কতগুলো অধিক ব্যবহৃত ব্যবহারিক সংলাপাংশ এবং তার ফরাসি অনুবাদ দেওয়া আছে। প্লেনে আসতে আসতে বুম্বাকে বলেছিলাম—এগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নে। ওরা একদম ইংরিজি বলে না। বুম্বা গম্ভীরভাবে বলল,

–পরে দেখব।

মানেটা বুঝলাম—তুই দ্যাখ। আমার দরকার নেই।

ওর সত্যিই দরকার নেই। এখানে এসে পৌঁছনো অবধি দিব্যি বাংলায় কথা বলে চালিয়ে যাচ্ছে। আমি আবার ঢং করে কারও সঙ্গে দেখা হলে এক আধবার বঁ জ্যুর (Bon Jour) বলে যে কী ফ্যাসাদে পড়েছি! অমনি তারা গড়গড় করে ফরাসিতে কথা বলে চলে। আমি কী না এটুকু শিখে ফেলেছিলাম যে 'Do you speak English' বলতে গেলে 'পার্লে ভু আঙ্গলে' বলতে হয়। তাই অনর্গল ফরাসি শুনলে সেটা বলি, আর তারা আরও গড়গড়িয়ে ফরাসি বলে চলে। ফরাসি মানে আমি যেটুকু বুঝলাম বিবিধভাবে 'শ', 'স', আর 'ষ' বলতে শেখা।

দুটো কফি এল। ছোট্ট দুটো কফি কাপে।

বুম্বা পাতি বাংলায় ওয়েটারকে বলল—

–আর ছোট কাপ নেই?

সে কোনও উত্তর দিল না। প্রবল সবিস্ময় বিরক্তিতে শ্রাগ করে চলে গেল।

বুম্বা রেগে আমায় বলল,

–এক পয়সা টিপস দিবি না।

দুই

অনেকগুলো ঝোলাঝুলি কাঁখে, কাঁধে হাতে নিয়ে আমি আর বুম্বা ট্যাক্সির লাইনে।

প্রথমত ট্যাক্সির লাইন কোন দিক থেকে শুরু সেটা বুঝতেই কিছুক্ষণ সময় লাগল। স্বাভাবিক। ফুটপাথে জনা আটেক লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে মুখ করে। সারির ডানদিকের লোকটি প্রথম না বাঁদিকের মহিলাটি প্রথম, ঠাহর করতে না পেরে আমরা ভয়ে ভয়ে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একে অপরিচিত, তায় এশিয়ান—মহিলার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র যদি ফরাসি ভাষায় অপমান করে, আমাদের দাঁত বের করে হাসা ছাড়া কোনও কিছু করার নেই।

দেখলাম, একটা ট্যাক্সি এসে থামল। আমাদের পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক রেলায় উঠে গিয়ে বসে পড়লেন। বুঝলাম ইনিই লাইনে প্রথম। অগত্যা গুটি গুটি লাইনের অন্য প্রান্তে যাত্রা। সেখানে এসে সেই আগের মহিলার পাশে ভয়ে চার পাঁচ লোক দাঁড়িয়ে। মানে, আমাদের ক্যাবলামোর জন্য শুধু শুধু লাইনে পিছিয়ে গেলাম। বুম্বা আমায় বাংলা ভাষায় কাঁচা খিস্তি করতে লাগল। দোষটা নাকি পুরোপুরি আমার। কী দোষ? না, আমি এর আগে কয়েকবার ইউরোপে এসেছি—অতএব সমস্ত মহাদেশটার জীবনযাপন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রকরণবিধি নাকি আমার নখদর্পণে থাকবার কথা ছিল।

মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করবার পর শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি এল। ট্যাক্সিতে তো চড়লাম—কোথায় যাব বলবটা কী? 'লা বোকা বিচ রিসর্ট'—প্রায় বানান করে বলার মতো করে বললাম। ট্যাক্সিচালক বোধহয় কিছুটা ইংরিজি জানেন—বুঝতে পারলেন। মিনিট দশেক লাগল হোটেলে পৌঁছতে।

আমাদের একটা যুগ্ম তহবিল ছিল রোজকার টুকিটাকি খরচার। সেটা বুম্বার কাছেই থাকত। ট্যাক্সি ভাড়া মেটানোর সময় কানে এল বুম্বা জিজ্ঞেস করছে

—How Much?

——Eighteen.

——OK. Eighteen rupees.

কী অবলীলায় একটা মানুষ পৃথিবীর অত বিশিষ্ট মহার্ঘ একটা কারেন্সিকে 'রুপি' করে নিয়েছে শুনে হাসিও পেল, ভালও লাগল। সত্যিই তো, বিদেশ বেড়াতে গেলে সারাক্ষণ যদি আমার মধ্যে একটা Conversion Calculator ভরা থাকে, তাতে তো বেড়ানোর মজাটাই মাটি।

ইউরোপ বেড়াতে গেলে এটাই বোধহয় আনন্দের মুলমন্ত্র।

ইউরোকে মনে মনে ভারতীয় রুপি ভাবা।

১ জুলাই, ২০০৭

তিপ্পান্ন তলার উচ্চতায় কোনওদিন থাকিনি আমি।

আমেরিকার ডেট্রয়েট-এর রেনেশাঁস ম্যারিয়টে আপাতত এটাই আমার এই ক'দিনের আস্তানা। আঠাশ জুন থেকে তেসরা জুলাই অবধি। ৫৩১৭ নম্বর কামরা।

জানলার বাইরেই জেনারেল মোটর্স-এর হেড কোয়ার্টার—নীচে ডেট্রয়েট ডাউনটাউনের রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া।

আর একটু দূরে সুর্যদীঘল বাড়িশোভিত ডেট্রয়েট-এর পাড়াগাঁ—সকালের রোদ আর কুয়াশায় ঝাপসা আলোর চাঁদোয়া।

আমি এর আগে চব্বিশ পঁচিশ তলার উচ্চতা অবধি বাস করেছি—তিপ্পান্ন তলায় কোনওদিন থাকিনি। আমার ধারণা ছিল, এতটা ওপর থেকে পৃথিবীটা সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগবে। ঠিক চব্বিশ পঁচিশ তলা থেকে যেমনটা দেখেছি, তেমনটা বোধহয় না। আবার প্লেন থেকে যেমন দেখা যায় তেমন নয়, নীচের সরু ফিতে রাস্তা, গুবরে পোকার মতো গাড়িঘোড়াও নয়। কে জানে, আমার সেই চব্বিশ তলা থেকে দেখা দৃশ্যটাই বারবার করে মনে এল এই তিপ্পান্ন তলায় বসে।

তাহলে কি একটা দূরত্বের পর সবকিছুই সমান দেখায়, একবল্গা, সমতল, উচ্চাবচহীন!

আমেরিকায় মিশিগান অঞ্চলের ডেট্রয়েট শহরে অনাবাসী বাঙালিদের বঙ্গ সম্মেলন।

প্রথমে কথা হয়েছিল, 'দোসর' ছবিটার একটা বিশেষ প্রদর্শনী হবে এখানে এবং সেই সঙ্গে দোসর-এর ডিভিডি রিলিজ করা হবে।

শেষ পর্যন্ত আমার প্রযোজকরা কোনও একটা কারণে অনাগ্রহী হয়ে পড়লেন। তাতে ছবিটা আর দেখানো হল না। কিন্তু আমার নিমন্ত্রণটা বহাল রয়ে গেল।

আমার মনের মধ্যে একটা চাপা অহংকার ছিল যে চোদ্দটা ছবি করে ফেলার পর কোনও অব্যবস্থাই আমাকে নতুন করে ভয় দেখাতে পারবে না। কিন্তু ডেট্রয়েট-এর সম্মেলনের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝলাম সেই অহংকার কত যে ভঙ্গুর।

উত্তর আমেরিকার এই বার্ষিক গ্রীষ্মকালীন বঙ্গ সম্মেলন আমার কাছে নতুন নয়। এর আগেও কয়েকবার এখানে এসে এর আদত চেহারাটা আমি অনেকটা চিনে ফেলেছি বলেই মনে করি।

ধরুন, যেমন ম্যাডক্স স্কোয়্যারের দুর্গাপুজো। তার একটা ঝলমলে বারোয়ারি ভাবও আছে। আবার একটা আবার একটা পাড়ার পুজোর অপেশাদারি অন্তরঙ্গ হুল্লোড়ও আছে। উত্তর আমেরিকার এই বার্ষিক সম্মেলনগুলি আমার কাছে অনেকটা এরকমই লাগে—এবং সেটা যে খুব একটা মন্দ লাগে, তাও বলছিল। তাতে নিজেরা আনন্দ করা যায় হয়তো, কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে অন্য কারওর প্রবেশ করা কঠিন।

এবছরটা কেমন যেন মনে হল অপেশাদারিত্বর চূড়ান্ত। আমাকে বলা হয়েছিল বাঙালির আড্ডা নামে একটা অনুষ্ঠানকে মঞ্চে সঞ্চালনা করতে। তাতে বিবিধ কৃতী বাঙালিরা থাকবেন। তালিকাটা শুরু হয়েছিল অমর্ত্য সেন, রবিশংকরকে নিয়ে। কলকাতা ছাড়ার আগে অবধি শুনে গেলাম যে

সুনীলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), নবনীতাদি থাকবেন অন্তত। যাক বাঁচোয়া।

অনুষ্ঠানের দিন মঞ্চে পৌঁছে শুনি ওঁরা কেউ নেই। নেই কেন! আশেপাশেই আছেন, কোথায় আছেন কেউ জানেন না। একা একা আড্ডা মারতে হবে। ভাবুন! সুদেষ্ণা (রায়) ছিল, আর গৌতম (ভট্টাচার্য) ছিল স্টেজে। তাদের প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে স্টেজে উঠে পড়তে হল। পনেরো মিনিট অর্থহীন বকার পর প্রেক্ষাগৃহের ভিতর থেকে একটা গলা এল 'নবনীতাদি এসেছেন।' মাইকে, ডাকলাম 'নবনীতাদি, স্টেজে আসবে একটু?' নবনীতাদির গলা পেলাম, 'আমাকে তো গল্প পড়তে যেতে হবে রে।' বুঝুন!

অনুষ্ঠানসূচি তৈরি হয়েছে যখন, এটা নিয়ে আর কেউ ভাবেননি যে একটা মানুষ একই দেহে দুটো জায়গায় একসঙ্গে উপস্থিত থাকবেন কী করে? বা হয়তো প্রযোজকদের কেউ ভেবেছিলেন বা সীতা অউর গীতার মতো নবনীতার আসলে দু'জন। আমি এটা নিয়ে নালিশ করলে হয়তো বলতেন— নবদি না হয় গল্প পড়ুন, আর আপনি বরং নীতাদিকে নিয়ে আড্ডাটা মারুন।

কোনওক্রমে আড্ডা শেষ করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে আনন্দ পাবলিশার্স এর স্টল। সেখানে জমিয়ে বসে আড্ডা মারছেন সুনীলদা। আমি বললাম, 'এলে না কেন, আড্ডায়?'

সুনীলদা অত্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা—

কোন আড্ডায়?'

এই যে, বাঙালির আড্ডা ছিল। তোমার থাকার কথা ছিল শুনলাম।'

—'কই, আমায় বলেনি তো কেউ।'

চমৎকার!

ডেট্রয়েট শহরটায় যেখানে আমরা ছিলাম সেটা আসলে ডেট্রয়েটের বিবাদী বাগ। সন্ধে হলেই বড় বড় বাড়িগুলোও নিঝুম। দোকানপাট বন্ধ। এমনকি এ অঞ্চলের রেস্তোঁরাগুলোও দশটা-এগারোটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকায় কোথাওই প্রায় এমনটা দেখিনি।

জানা গেল, ডেট্রয়েটে ক্রাইম রেট খুব বেশি। এবং তার সরাসরি কারণ হচ্ছে বিত্তহীন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মাদকাসক্তি এবং তজ্জনিত ছিনতাই, মারামারি—ইত্যাদি। স্থানীয় মানুষেরা বললেন, মহিলারা সঙ্গে থাকলে বেশি রাত্রে রাস্তাঘাটে চলাফেরা না করাই শ্রেয়।

আমরা সবাই জানি ডেট্রয়েট আমেরিকার গাড়ির আদি শহর। এখানে হেনরি ফোর্ড মিউজিয়াম আছে। ফোর্ড, ক্রাইসলার ইত্যাদি বিশালকায় গাড়ি তৈরির পীঠস্থান হিসেবেই ডেট্রয়েট বিখ্যাত।

একসময়ে মিশিগান অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈভব, খনিজ ঐশ্বর্যর কথা ভেবে এখানে গাড়ির কারখানা খোলেন হেনরি ফোর্ড। তৈরি হল জগদ্বিখ্যাত ফোর্ড গাড়ি।

এখন ধীরে ধীরে জাপানি গাড়ির প্রতিযোগিতার সামনে পিছিয়ে পড়ছে আমেরিকা। সহজলভ্য দামে নিত্য নতুন মডেল যোগান দেওয়া মানে এশিয়া থেকে শ্রমিক, বা স্পেয়ার পার্টস আনানো। সেগুলি আমেরিকায় তৈরি হলে পড়তায় পোষাবে না—ভারতের বেঙ্গালুরু থেকে ডেট্রয়েট-এ

ফোর্ড-এর স্পেয়ার পার্টস যায়, এও শুনলাম।

এক সময়ে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রায় ক্রীতদাস করে আনা হয়েছিল। মহাদেশের এই উত্তরপূর্ব ভাগে—গাড়ির কারখানা শুরু হওয়ার গোড়ার দিকে। খেয়াল ছিল না হয়তো, যে সংখ্যা গুনে শ্রমিক আনা যায়, মানুষ আনা যায় না। কারণ মানুষ তার নিজের নিয়মে জীবনযাপন করে, সংসার করে, সন্তান করে, সন্তান জন্ম দেয়। আজ এত বছর পর এই কৃষ্ণাঙ্গ এখন ডেট্রয়েট-এর বিভীষিকা।

আজকের এতগুলো প্রজন্ম পার হয়ে এসে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা অকুলান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের কথা ভেবে তো সেদিন গাড়ির কারখানা শ্রমিক ভর্তি করেনি! ফলে আজ বেকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষরা উপার্জনহীন, সঙ্গতিশূন্য, অবসাদগ্রস্ত, মাদকাসক্ত এবং অপরাধলিপ্ত।

গাড়ির কারখানা বললেই বড় পরিচিত একটা নাম সম্প্রতি আমাদের সকলের মনেই ভেসে ওঠে। ড্রেটয়েট শহরের সাততারা হোটেল-এর বিলাসবহুল ঘরে বসে সেই শিরদাঁড়া হিম করা শিহরনটা এল প্রায় অবধারিত ভাবেই।

আলিমুদ্দিনের অগ্রজরা সেখানে ছিলেন, শুনলাম। আমরা কি আশা করব যে কোনও নবলব্ধ উপলব্ধি নিয়ে তাঁরা ফিরবেন?

নাকি, ইতিহাসও ঐ তিপ্পান্ন তলা হোটেলটার মত?

একটা দূরত্বের পর থেকে বাকি সবকিছুই কেমন যেন সমান ঝাপসা দেখায়। সমতল, বাঁকচুরহীন...

পুঃ : ভাল কথা, বং কানেকশন দেখেছেন?

না দেখে থাকলে আজকেই দেখুন, প্লিজ!

২২ জুলাই, ২০০৭

এক

একটাই আক্ষেপ ছিল মা'র।

—আমায় কোথাও একটা বেড়াতে নিয়ে যাবি।

মা তখন সবে হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। দু'টো নার্স, আয়া। বাথরুম অবধি যেতে পারে না। বেডপ্যান এর ব্যবস্থা।

বাবা শুনলেই হাঁ হাঁ করে উঠত,

—কী? বেড়াতে যাবে? একটা চায়ের কাপ ধরতে পারো না ঠিক করে, বেড়াতে যাবে?

মা'র একটা শান্ত উত্তর ছিল,

—আমরা মা-ছেলেতে কথা বলছি। তুমি এর মধ্যে ঢুকছ কেন?

স্বাভাবিক! এর কোনও উত্তর হয় না। বাবা চুপ করে যেত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নার্স মেয়েটি হয়তো মুখ টিপে হেসে পাশের ঘরে চলে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর মা'র শিরা ওঠা হাত দু'টো আবার চুপিচুপি উঠে আসত আমার হাতের ওপর।

—যাবি নিয়ে?

—কোথায় যাবে বলো?

—তুই তো কত জায়গায় যাস। কোন জায়গাটা ভাল রে?

—বিদেশে? বিদেশে তোমায় নিয়ে তো অত ঘুরতে পারব না, মা। আর না ঘুরে দেখলে সব জায়গাই একরকম। হোটেল আর গাড়ি।

মা আর কোনও কথা বলত না। চুপ করে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করত এই আশায়, যদি চট করে আমায় মাথায় কোনও একটা জায়গার নাম এসে যায়।

মা'কে নিয়ে আমার আর পৃথিবী ঘোরা হল না।

মে মাসের আঠারো তারিখ মা চলে গেল। তারপর জুন মাসের গোড়ায়, আমার তখন সানগ্লাস-এর জন্য লোকেশন দেখতে যাওয়ার কথা সিকিমে-সদ্য বিপত্নীক বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

একটা গাড়িতে সাধারণত বাবা আর আমি। ইউনিটের বাকিরা অন্য গাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ক'টা কথা বাবা আর আমি বলেছি সেই পুরো সাতদিনে, আমার মনে নেই।

সাধারণত আমরা দু'জন চুপ করে বসে থাকতাম। খুব বেশি হলে বাবার হাতটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে।

আর আমাদের সঙ্গে সমানে কথা বলে যেত মা। কত না-বলা কথা। কত বারবার বলা কথা। মা'র হয়ে কথা বলত জানলার বাইরের অরণ্য, পর্বত, খাদ, ঝরনা।

কথা বলতেন রবি ঠাকুর। চলন্ত গাড়ির স্টিরিও বাক্সে।

ঠিক সেই সেই কথাগুলো, যা আমি বা বাবা, কিংবা আমরা দু'জনেই, বলতে চাইছি সেই মুহূর্তে। কিছুতেই পেরে উঠছি না।

গত বছর জুন মাসের শেষে বম্বের বিখ্যাত বিজ্ঞাপনকর্মী প্রহ্লাদ কক্করের স্ত্রী মিতালী ফোন করল হঠাৎ। মিতালি আমার বহুদিনের পরিচিত।

—ইজরায়েলে তোমার একটা রেট্রোস্পেকটিভ করতে চায় ইন্ডিয়ান এমব্যাসি। সবক'টা ছবি

হয়তো পারবে না। ছ'-সাতটা বাছাই করা ছবি দেখাবে। ওরা আমার খুব চেনা। আমায় ধরেছে তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য। It's a touring festival, সারা ইজরায়েল ঘুরে হবে। ওরা খুব করে চাইছে—তুমি যদি অন্তত তিনদিনের জন্য যেতে পারো।

প্রথমটায় না-ই বলে দিয়েছিলাম। তখন আমি দ্য লাস্ট লিয়ার শেষ করা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। কী করেই বা যাব? আর ইজরায়েল যদি যেতেই হয়, দেখতেই হয় ভাল করে, তিনদিনে কী-ই বা দেখব?

মিতালি খুব জোর করল,

—যাও না! সে তুমি বেশি থাকতে চাইলে ওদের কোনও আপত্তি নেই। ওরা তো খুশিই হবে বরং।

—আমি চেষ্টা করছি মিতালি। পারব কি না, বুঝতে পারছি না। ছবিটা শেষ করতে হবে। সামনে টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। কবে যেন বলছ ওদের রেট্রোস্পেকটিভটা?

—অগাস্টে। ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু। ওই আমাদের ষাট বছরের স্বাধীনতা পূর্তি। আর ইজরায়েল-এর সঙ্গে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্কের পনেরো বছর পূর্তি। এই দুটো মিলিয়ে ওরা একটা...

—ধরো, যদি যেতে পারলাম, ওরা কি আমাকে ইজরায়েল ঘুরিয়ে দেখাবে?

—নিশ্চয়ই। তুমি কোথায় কোথায় যেতে চাও, বলো? তুমি কি আগে গিয়েছ কখনও ইজরায়েল?

—না গো! সেই জন্যই...

মিতালির কণ্ঠস্বরে আর কোনও বিনীত আকুতি নেই।

সরাসরি জোর। বন্ধু যেমন বন্ধুর ওপরে করে।

—যাও ঋতু। তাহলে ঘুরে এসো। তোমার খু-উ-ব ভাল লাগবে। দু'দিনের জন্য হলেও ঘুরে এসো।

অদ্ভুত একটা দোনামনা নিয়ে ফোন রাখলাম।

—দেখি, যদি ম্যানেজ করতে পারি, জানাব তোমায়। ছবিগুলো ওঁরা দেখাতে চান, দেখান। আমার যাওয়াটা নিয়ে যদি মন ঠিক করি, তোমায় ফোন করব।

মিতালির ফোন রাখতে রাখতেই প্ল্যানম্যান-এর শুভর ফোন।

—ঋতুদা, ভাল খবর! মনে হচ্ছে গালা প্রিমিয়ার সেকশনে ছবিটা দেখাবে টরোন্টোতে। ওরা ফোন করেছিল। ওরা প্রিন্ট হাতে না পেয়ে প্রোগ্রাম ছাপতে চাইছে না। বলে দিই, অগাস্টের শেষে প্রিন্ট হয়ে যাবে?

বলে তো দিতেই হবে। প্রোডিউসার-এর জন্য সত্যিই তো এটা দারুণ সুযোগ। বুঝলাম, ইজরায়েল আমার কপালে নেই।

দুই

আমাকে আর ফোন করে মিতালিকে জানাতে হল না।

মিতালির পরিচিত যাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন ইজরায়েল থেকে, তাঁরাই আমাকে ফোন করতে লাগলেন প্রায় নিয়মিত।

প্রধান ভদ্রলোকের নাম অলোক রাজ (ইনি সেই সি বি আই-এর অলোক রাজ নন)— উনি ইন্ডিয়ান এমব্যাসির তরফ থেকে আমাকে যোগযোগ করছিলেন।

ওঁদের প্রায় দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। শুরু হচ্ছে ১৫ আগস্ট থেকে।

আমার ছবি দেখানোর ভ্রাম্যমাণ ক্যালেন্ডার ১৮ আগস্ট থেকে শুরু।

যতই ভদ্রলোককে বোঝাই যে এই মুহূর্তে আমার পক্ষে কিছু সঠিকভাবে জানানো সম্ভব নয়, কারণ সেই সময়টা আসলে আমার ছবি শেষ করার সময়।

আর, একটা ছবি যখন শেষ হয়, তখন নানা ধরনের লাস্ট মোমেন্ট ক্রাইসিস তৈরি হয়, যেটার সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত বেশির ভাগ সময় খোদ পরিচালককেই নিতে হয়।

অলোক রাজ আমার সবকথা শুনলেন, তারপর বললেন,

—আচ্ছা! তবে কবে ফোন করব বলুন।

আমি অধৈর্য হয়ে একটু কড়া কথা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ রোগ শিরা বার করা একটা হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল।

কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল সেই গলা।

—চল না! এত করে বলছে। আমরা মা ব্যাটা বেড়িয়ে আসি।

ইউনিটের সঙ্গে কথা বলতেই একটা বিরাট রে রে রব পড়ে গেল। সবাই মিলে প্রচণ্ড চেঁচামেচি করতে লাগল।

—ইল্লি আর কী! তুমি ইজরায়েল বেড়াবে আর আমরা বসে বসে কাজ করব! কেন? আমাদেরও নিয়ে চলো।

এমনকী, কে আমার কোন স্যুটকেস-এর মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে চলে যেতে পারবে, সে-ই আলোচনাও হয়ে গেল।

আমি অলোক রাজকে আমার টিকিট করতে বলে দিলাম।

আলোক বেজায় খুশি। তবু টিকিট করা নামে আমতা আমতা করে বলল

—তুমি কি Paper Visa নিয়ে আসবে, না...?

প্রথমটায় বুঝিনি। তার মানে, আমার পাসপোর্টে ইজরায়েল ভিসা স্ট্যাম্প করা হবে না, আমাকে আলাদা করে একটা কাগজে সেই ভিসাটা দিয়ে দেওয়া হবে—আমায় সেটা সঙ্গে করে ঘুরতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—কেন?

—না, অনেকে তাই করেন। পাসপোর্টে স্টাম্প করান না।

আমি তো অবাক।

—কেন বলুন তো?

টেলিফোনের ওপাশে অলোক নিরুত্তর।

আমি বললাম,

—না, আমি যদি যাই, ঠিকঠাক ভিসা, আমার পার্সপোর্টে স্ট্যাম্প করিয়েই যাব। আমি একটা দেশে বেড়াতে যাচ্ছি, সেটা লুকিয়ে যাবে কেন?

অলোকের সঙ্গে ফোনে কথা হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মিতালির ফোন।

—তুমি নাকি পেপার ভিসা নেবে না বলেছ?

—হ্যাঁ, কেন নেব?

— একী, তুমি পাগল নাকি? তোমার পাসপোর্টে ইজরায়েল-এর ভিসা থাকলে পরে কোনও মুসলিম দেশে যেতে চাইলে তোমার অসুবিধে হবে।

—যেমন?

—যেমন দুবাই। বা, ধরো ইরান...

—সেটা তাদের সমস্যা।

মিতালিও চুপ। হঠাৎ আমার মাথায় কী যেন একটা এল।

—ধরো, আমার পাসপোর্টে যদি ইরানের ভিসা স্ট্যাম্প করা থাকত, তাহলে ইজরায়েলও কি আমাকে ভিসা দিতে আপত্তি করত?

মিতালি হেসে ফেলল।

—করতেই পারত। তুমি তো বেড়াতে যাচ্ছ, যাও। ওসব পলিটিক্স-এর মধ্যে ঢোকার দরকার কী?

মা'কে জিগ্যেস করলাম,

—কী করব মা?

কোনও উত্তর নেই। জ্বলজ্বল চোখদু'টো আকুতিভরা।

পরে যদি ইরান যাওয়ার সুযোগ হয়, তোমার কি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে?

যথারীতি কোনও উত্তর নেই। জুলজুলে চোখদু'টো জ্বলজ্বলে হল।

আমি অলোককে ফোন করে বললাম,

—আমার পেপার ভিসাই করিয়ে দাও। মনে হচ্ছে তখন আমি বম্বেতে থাকব। আমি টিকিট ওখান থেকেই কোরো।

তিন

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। দ্য লাস্ট লিয়র-এর কাজ তখন পুরোদমে চলছে। কেবল অমিতদা-র ডাবিংটুকু আটকে আছে কিছুটা। মানে, শেষ দু'টো রিল। বেশ কয়েকদিন হল কৃষিজমি কেলেঙ্কারিতে নাজেহাল হচ্ছেন ভদ্রলোক।

ফলে, রামগোপাল ভর্মার সরকার রাজ-এর শুটিংও মাঝপথে ছেদ পড়েছে। আমি না থাকলে অমিতদা-র পেছনে লেগে পড়ে থেকে ঘ্যান ঘ্যান করে ডাবিং করিয়ে নেওয়ার কেউ নেই। ফলে, শুভ একটু নার্ভাস হচ্ছিল।

—ঋতুদা, তুমি কি একবার অন্তত বলে দিয়ে যাবে? যদি সময় পান...

রোজি, অমিতদা'র এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট জানাল চব্বিশ-পঁচিশ অগাস্ট-এর আগে কোনও সম্ভাবনা নেই। ততদিনে আমার ফিরে আসার সময় হয়ে যাবে।

আঠেরোই আগস্ট ভোরবেলা রয়াল জর্ডানিয়ান-এর প্লেনটা ছাড়ার কথা ছিল ভোর ৫.৫৫। তাই ইচ্ছে করে বেশি রাতে Pixion-এ এডিট রেখেছিলাম, যাতে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে পড়িমরি করে এয়ারপোর্ট দৌড়তে না হয়। বরং রাতটা কাজ করে জেগে কাটিয়ে দিলে, তিনটের মধ্যে এয়ারপোর্ট ঢুকে পড়া। তারপর চেক-ইন ইমিগ্রেশনের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুটা ব্যস্ত থাকা—শেষমেশ কোনওমতে দুগ্গা বলে প্লেনে উঠে পড়া।

মধ্যপ্রাচ্যের দিকে এই আমার প্রথম আসা। এর আগে যেটুকু ছুঁয়ে গিয়েছি, তা transit-এ।

মুম্বই এয়ারপোর্ট থেকে যে ধরনের মানুষ এই সেক্টর-এর যাতায়াত করেন, তাঁদের সম্পর্কে আমার কোনও সম্যক ধারণা ছিল না।

আমার কাছাকাছি সময়েই দুবাইয়ের কয়েকটা ফ্লাইট যাত্রী, ইথিয়োপিয়ার বেশিরভাগই ঝলমলে রঙিন জামাকাপড় পরা, মাথায় নানারঙের পাগড়ির মতো ঝলমলে বস্ত্র-শিরস্ত্রাণ পরা কৃষ্ণাঙ্গী মহিলারা, ট্রলিতে প্রচুর প্ল্যাস্টিকের বস্তায় ভরা জিনিসপত্র নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে।

মনে হল ইংরেজি ভাষাটায় এঁরা তেমন স্বচ্ছন্দ নন, নইলে অমন চমৎকার সব পাগড়ি কোত্থেকে কিনেছেন, নিশ্চয়ই জিগ্যেস করতাম।

রয়াল জর্ডানিয়ান-এর আম্মানগামী বিমানের বিজনেস ক্লাসে তেমন ভিড় নেই। কাউন্টারের ভদ্রলোক খুব যত্ন করে আমাকে চেক-ইন পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন। 'সেলিব্রেশন' লাউঞ্জ বলে এয়ার ইন্ডিয়ার একটা বিলাসবহুল অতিথিখানা আছে—আপাতত সেখানেই অপেক্ষা করার কথা।

খুঁজে পেতে সেখানে গিয়ে বুঝলাম যে, সত্যিই এই সেক্টর-এর যাত্রীদের প্রতি কোথাও যেন

একটা প্রচ্ছন্ন অবহেলা আছে। সেটা নিছক আমাদের ভারতীয় গড়িমসি নয়।

পূর্বে আমার যা বিদেশ ভ্রমণ, বাংলাদেশ বাদ দিলে, প্রায়শই ইউরোপ বা আমেরিকা।

পৃথিবীর এই বিশেষ ভূমগুলে যাঁরা নিত্যযাত্রী বা ভ্রমণার্থী—তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাঁদের প্রতি বিমানকর্মীদের ব্যবহার—পুরোটাই কোথাও যেন একটু অন্যরকম। বৈষম্যর মতো কড়া কথা ব্যবহার না করে 'আলাদা' কথাটাই বলি বরং।

লাউঞ্জের অভ্যর্থনাকারিণী মেয়ে দু'টি—প্রায় ইংরেজি বলতে পারে না বললেই চলে। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা—কেবল বিজনেস স্যুট গায়ে চাপিয়ে অনেকটাই যেন ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক। সেই পেখমের ভার তাদের যথেষ্ট কুণ্ঠিত এবং বিড়ম্বিত করেছে।

লাউঞ্জের যাত্রীরা কয়েকজন দেখলাম তাঁদের ফ্লাইটের সময় সম্পর্কে জিগ্যেস করে তেমন কোনও সদুত্তর পেলেন না। মেয়েগুলো একটু কুণ্ঠিত, অপ্রস্তুতভাবে মিনমিন করল, তারপর অধৈর্য যাত্রী একটু সরে যেতেই নিজেদের মধ্যে ফিকফিক করে হাসতে লাগল। যেন লজ্জাটা ঢাকা দিতেই।

কিছুক্ষণ পরে দেখি ওদেরই একজন দাদা গোছের, মানে একটু বয়স্ক এয়ারলাইন্স কর্মচারী, তাঁদের সঙ্গে এসে কথা বলতে লাগলেন। মনে হল, কোনও যাত্রী হয়তো বা গিয়ে নালিশ করে থাকবেন।

ভদ্রলোক ওদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। বেশিরভাগ কথোপকথনটুকুই, যেটুকু আমার কানে আসছিল, হচ্ছিল মারাঠি ভাষায়। তারই মধ্যে একটা মুম্বাইয়া হিন্দি বাক্য কানে এল।

—কাস্টমারকে সাথ ক্যায়সা বাত করনে কা?

মেয়েগুলোর তরফ থেকে কিছুক্ষণের নৈশব্দ্য।

তারপর দাদা নিজেই পাদপূরণ করলেন,

—প্যার সে।

চার

রয়াল জর্ডানিয়ান বিজনেস ক্লাসের চেহারাটা তেমন প্রশস্ত নয়। বোঝা গেল খুব বেশি সংখ্যক যাত্রী এতে যাতায়াত করেন না। গুনে দেখলাম কুল্লে আমরা তিনজন।

সিটগুলো তেমন চওড়া নয়। লেগ স্পেস মোটামুটি, হেলান দেওয়ার মতো। সামনের লেগরেস্ট বা ফুটরেস্ট যাত্রীর ইচ্ছেমতো এগোয় পিছোয় না সবসময়ে। বেশিরভাগটাই ঘটে নিজেদের মর্জিমতো।

এয়ার হস্টেসরা লাল আর কালো ইউনিফর্ম পরেন। কিন্তু তার মধ্যে একজনকে দেখে একটু অন্যরকম লাগল। মহিলা শ্বেতাঙ্গিনী, সোনালি চুল উঁচু করে বাঁধা। পরেছেন এমব্রয়ডারি নক্সা করা

একটা তুঁতে রঙের কাফতান। মুখে প্রচুর মেকআপ—চোখ, ভুরু, ঘন নীল আই শ্যাডো। যেন স্টেজে নামবেন, কেবল পোশাক বদলানোটাই বাকি।

অন্যদের থেকে তাঁকে একটা আলাদা দেখাচ্ছে যে, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি সাধারণ কোনও যাত্রিণী হবেন। পরে বুঝলাম যে তিনিও বিমানসেবিকা—এই এয়ারলাইন্স যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, তারই চিহ্ন তাঁর পোশাকে আসাকে।

প্লেন ছাড়তে মিনিট পনেরো দেরি। আমার চিন্তার তেমন কিছু ছিল না। কারণ জর্ডন-এর আম্মান-এ আমার বিমানবদল।

সেখানে ঘণ্টা তিনেকের বিশ্রাম। সেখানে থেকে টেল আভিভ আধঘণ্টার ফ্লাইট।

তখন প্রায় ভোর ছ'টা বাজে। সারারাত ঘুমোইনি। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে। গরম তোয়ালে, ঠাণ্ডা তোয়ালে, কোল্ড ড্রিংক্স, হেডফোন—ইত্যাদি দিয়ে যাওয়ার পর একটু ভয়ে ভয়ে সিটের পাদানিটা বোতাম টিপে সামনের দিকে ছড়িয়ে নিয়েছি। নীল কাপতানকে একটু ভয়ে কাছে ডেকে জিগ্যেস করলাম, টেক-অফ এর কত পরে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হবে, সেই হিসেবে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর তোড়জোড় করব, কি না?

নীল কাফতান তড়িঘড়ি ভেতরে চলে গেলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রে সাজিয়ে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসে হাজির আমার জন্য।

আমি যেমনই হতবাক, তেমনই অপ্রস্তুত। প্লেন ছাড়েনি, যে কোনও মুহূর্তে ছাড়বে। টেক-অফ অ্যান্যাউন্সমেন্ট হল না, কিচ্ছু না—হঠাৎ করে খেতে দিয়ে দিল, এমনটা তো আগে কখনও কোথাও দেখিনি। বেশ অবাক লাগছিল আমার। অথচ অন্তর থেকে প্রবল ইচ্ছে করছে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে চট করে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সারারাত চোখের পাতা এক করিনি।

ন্যাপকিন নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, কাটলারি থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতেই মধ্যপ্রাচ্যের ছাপ স্পষ্ট। ভাবছি থেকে শুরু করব, আর তক্ষুনি যদি টেক অফ অ্যানাউন্স করে। আর কেউ যদি আমার হাত থেকে খাবারটা নিয়ে চলে যায়, এমন সময় দেখি নীল কাফতান আমার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করছে,

—কফি?

আমি ঈষৎ হেসে হ্যাঁ বলে দিলাম।

তারপর 'জয় মা' বলে খেতেও শুরু করে দিলাম।

ঠিকই জানত নীল কাফতান। আমার খাওয়া হয়ে গেল, কফি খাওয়া হয়ে গেল। কোনও তাড়াহুড়ো, হেঁচকি-বিষম কিচ্ছু না খেয়ে।

প্লেন-এর তখনও ছাড়ার নাম নেই।

খাওয়া শেষ হতেই উশখুশ করছি, এবার ঘুম পাচ্ছে—ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

নীল কাফতান প্রায় অন্তর্যামিনী, অমনি এসে ট্রে পরিষ্কার করে টরে নিয়ে গেল। আমি খুব কিন্তু কিন্তু করে বললাম,

—আসলে আমি সারারাত ঘুমোইনি...

একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হত।

—নিশ্চয়ই। ঘুমোও।

—সিটটা তো একটু হেলাতে হবে। নীল কাফতান বোতাম ঘুরিয়ে সিটটা হেলিয়ে দিল।

পাশের জানলা দিয়ে প্রভাত সূর্যের আলো।

নীল কাফতান জানলা বন্ধ করে আমার গায়ে কম্বল টেনে দিয়ে বলল,

—গুড নাইট।

দেশে বিদেশে মিলিয়ে এই আমি প্রথম কোনও এয়ারলাইন্স-এ ট্রাভেল করলাম, যারা টেক-অফ-এর আগে সিট রিক্লাইন করতে দেয়। এবং জানলা বন্ধ করতেও দেয়।

কখন প্লেন ছাড়ল, জানি না। আমি তখন গভীর ঘুমের দেশে।

কেবল ঘুমের মধ্যে টের পেলাম, কে যেন সরে যাওয়া কম্বলটা গায়ে সযত্নে টেনে দিচ্ছে।

কষ্ট করে চোখ খুলে নীল কাফতানকে ধন্যবাদ দিতে যাব—দেখি মা।

শুকনো রোগা দু'টো হাত দিয়ে আমার কম্বলটা টেনে দিতে দিতে প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল,

—ঘুমিয়ে পড়।

পাঁচ

জর্ডনের আম্মানে আমরা পৌঁছলাম লোকাল টাইল সাড়ে ন'টা নাগাদ।

আম্মানে তিনঘণ্টার একটা স্টপওভার ছিল। নামেই তিনঘণ্টা। এয়ার ক্রাফ্‌ট বদল, ট্রান্সিট, সব মিলিয়ে হাতে সময় পাওয়া গেল ঘণ্টা দুয়েকের কাছাকাছি।

মধ্যপ্রাচ্যের কিছু লোকসঙ্গীত আমার কেনবার ইচ্ছে ছিল বহুদিন—আমার ছবির অন্যতম সঙ্গীত পরিচালক সঞ্জয়ও বলে দিয়েছিল বহুবার করে। বিশেষ করে উদ-এর কোনও বাজনা পাওয়া গেলে আনতে বলেছিল বার বার করে। অনেক খুঁজলাম এয়ারপোর্ট-এর মিউজিক স্টোরগুলিতে, তেমন কিছু পেলাম না। বেশিরভাগই কেবল বম্বের হিন্দি ছবির গান।

সাধারণত বইয়ের দোকানে বা গানবাজনার দোকানে গেলে আমার সাম্প্রতিক এবং আঞ্চলিক বই বা গানবাজনার খোঁজ করতে ইচ্ছে করে। আঞ্চলিক সাহিত্যের অনুবাদ, আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা, বা খবরের কাগজ সংগ্রহ করাটা আমার এখন একটা বাতিকের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমন কিছু সত্যিই পাওয়া গেল না আম্মানে। যা পাওয়া গেল, তাও বেশিরভাগই হিব্রুতে। ইংরেজিতে অনুবাদ তেমন কিছু পেলাম না।

টেল আভিভ যাওয়ার ঘোষণা ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্লেনে উঠে আমার সিট পকেটে গোঁজা। যে খবরের কাগজটা পেলাম, তাতে তারিখ দেখতে গিয়ে দেখি মাসের নাম shravan।

প্লেনের মধ্যে হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হাওয়া দিল। আর টেল আভিভ থেকে জেরুজালেম যেতে পথে পুরনো একটা বাড়ি।

সত্যিকারের গা শিরশিরটা করল, যখন হিসেব করে দেখলাম কলকাতায় আজ শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখ।

চিরকাল যে শ্রাবণ কালিদাসের শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণ, আমার ঠাকুমার মনসাপূজার শ্রাবণ—সে কেমন করে পৌঁছে গেল জর্ডন নদীর পারের এই মরুভূমির দেশে, এই ভেবে সত্যি কোনও কূলকিনারাও পাচ্ছি না। মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ফলে এবারও প্লেনটা কখন যে টেক-অফ করল, যেন বুঝতেও পারলাম না।

ছয়

টেল আভিভ-এ নামলাম যখন, ইজরায়েলি সময় তখন বিকেল তিনটে।

বেন গুরিয়ন এয়ারপোর্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ইব্রাহিম য়েহুদা। ইন্ডিয়ান এমব্যাসি থেকে এসেছেন। আপাতত তাঁরই দায়িত্ব আমার আতিথ্যের। আমার আগামী দু'দিনের বাস একটা হোটেলে। তৃতীয় দিন থেকে আমি যাযাবর।

আমার এখনকার হোটেলটা টেল আভিভ আর জেরুজালেম-এর মাঝামাঝি। বরং দূরত্বের হিসেবে জেরুজালেম-এর কাছেই। টেল আভিভ থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টার যাত্রাপথ।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, তপ্ত শ্রাবণমধ্যাহ্ন। তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে জেরুজালেম-এর দিকে।

এখানকার বেশিরভাগ জিনিসই মার্কিন ধরনের। গাড়িগুলো লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। আলো পাখা জ্বালানোর সুইচগুলো উল্টো দিকে জ্বলে। কেবল মোবাইল সেটগুলো একেবারে আলাদা।

হিব্রু বাক্য যেহেতু ডানদিক থেকে বাঁদিকে যায়, এখানকার মোবাইল এর Keyboard গুলো বোধহয় অন্যভাবে বানানো। সেরকমই তো শুনলাম।

আমাকে ওঁরা King David হোটেলে রাখতে চেয়েছিলেন। ই-মেল করে ঘরের মাপ, অন্দরসজ্জা, সুযোগ সুবিধের তালিকা সব পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। দেখলাম কেবল একটা বিশাল, আধুনিক, বিলাসবহুল হোটেল। একবার ভেতরে ঢুকে গেলে আমেরিকায় আছি, না ইওরোপে—বোঝবার উপায় নেই। আমি তাই ফিরে ওঁদের কাছে পাল্টা অনুরোধ করেছিলাম যে, আমাকে একটা সাধারণ, ছিমছাম, খোলামেলা গেস্ট হাউস বা ছোট হোটেলে রাখলে আমার ভাল লাগবে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। গরম তেমন আর রুদ্ধশ্বাস নয়। বিকেলের আলো পড়ে আসছে।

অত্যন্ত বিনীতভাবে আমার সম্মতি-টম্পতি নিয়ে ইব্রাহিম গাড়ির এসি বন্ধ করে জানলার কাচটা খুলে দিল।

জেরুজালেম জায়গাটার উচ্চতা সমুদ্রতট থেকে অনেক ওপরে। ফলে তাপমাত্রা এখানে অনেক কম। আস্তে আস্তে চারপাশটা ঠান্ডা হয়ে আসছে।

চওড়া কংক্রিট রাস্তা ছেড়ে আমাদের গাড়ি এবার আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরেছে। দু'পাশে নানারকম গাছের পাতার ভেতর দিয়ে পশ্চিমের রোদ—তাতে নরম আলো, তাপের কোনও তীব্রতা নেই।

ইব্রাহিমকে জিগ্যেস করলাম,

— কোথায় আমরা?

হেসে উত্তর দিল ইব্রাহিম,

—জেরুজালেম পৌঁছে গিয়েছি।

আমি জানালার বাইরে তাকালাম তড়িঘড়ি।

পাঁচ হাজার বছর আগেও এই শহরের ঠিক এই জায়গাটায় কি এমনভাবে সূর্য ডুবত? একই সময়?

কে বলে দেবে?

বলে দিল মা। ফিসফিস গলা পাশ থেকে বলল,

— সেই যে কত গল্প বলেছি। মনে নেই তোর? সে গল্পে তো এই গাছগুলোও ছিল রে, বোকা। এই আকাশটা ছিল। এই পাহাড়ি রাস্তাটা ছিল, এই রুজুরুজু হাওয়া... তুই কি খালি যিশুখ্রিস্টের গল্পটা মনে রেখেছিস?

গাড়ি এসে থামল একটা ছড়ানো বাংলোর সামনে।

ওরা আমার কথা রেখে। Dan Chain-এর King David হোটেল বদলে ওরা আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে একটা নিরিবিলি রিসর্ট-এ। নাম Mishkenot Sha'ananim।

পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি বাগান নিয়ে উঁচু নিচু করে তৈরি করা একটা সুশ্রী, রুচিবান বাংলো।

গাড়ি থেকে নামার আগেই দেখি ইব্রাহিম আমার লাগেজ নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমি আমার কোলের, কাঁখের, পিঠের নানাবিধ ঝোলা, ব্যাগ, জলের বোতল সামলাতে গাড়ি থেকে নামলাম।

তারপর হাত বাড়িয়ে দিলাম গাড়ির ভেতর।

—এসো।

পাথুরে পাহাড়ি রাস্তা তো! মা যদি হোঁচট খায়!

সাত

খুব তো তেজ দেখিয়ে পাঁচতারা হোটেলকে না বলে দিলাম। কে জানত, যে শেষ অবধি এমন বিপত্তি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য।

আজ আঠেরোই অগাস্ট, ২০০৭। শনিবার। ইহুদিদের দেশ ইজরায়েল জুড়ে আজ সাবাথ। শুরু হয়েছে গতকাল শুক্রবার থেকে, চলবে আজ মানে শনিবার, সূর্যাস্ত অবধি। সপ্তাহান্তের এই দুটি দিন ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের সংযম দিবস। সাধারণত এই দিন দু'টোয় পার্কে বা সিনেমাহলে ভিড় হয় না, সিনেগোগ ছাড়া আর কোথাও যান না এখানকার নিষ্ঠাবান ইহুদিরা। সিনেগোগ-এ গেলেও হেঁটে যান। সূর্যাস্তের আগে অবধি বিলাসী খাওয়াদাওয়াও বন্ধ।

আমি যে রিসর্ট-এ এসে উঠেছি, তাদের কসরুত সার্টিফিকেট আছে। সেটা একধরনের ইহুদি ধর্মজাত খাদ্যবিধি। দুধ, বা নিরামিষ খাবারের সঙ্গে আমিষ জাতীয় খাবার মিশিয়ে না ফেলা।

মানে এই রিসর্ট-এ এসে উঠলে যে কোনও নিষ্ঠাবান গোঁড়া ইহুদিও পরম নিশ্চিন্তে সাবাথ পালন করতে পারেন। পাঁচটা বাণিজ্যিক হোটেলের মতো এরা আমিষ নিরামিষ ঠেকাঠেকি করে তাঁকে ধর্মভ্রষ্ট করবে না।

ভাল কথা! কিন্তু আমি ন্যাড়া বলে তো আর ইহুদি নই। আমার আজ সাবাথ-ও নয়। এখন প্রায় বেলা সাড়ে চারটে বাজে। খিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে। অথচ সূর্য না ডুবলে এই হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে না।

ন্যাড়া হওয়ার পর থেকেই আমার ভ্রু কুঞ্চিত অপ্রসন্ন মুখটা একটু বেশি নিষ্ঠুর দেখায় বোধহয়। নইলে আমি আসলে ভেতরে ভেতরে যতটা অধৈর্য এবং ক্ষুধার্ত ছিলাম, তার থেকে আমাকে নিশ্চয়ই অনেকটা বেশি বিরক্ত দেখাল। ইব্রাহিম এতক্ষণ হাসিমুখে আমার সঙ্গে গল্প করতে আসছিল। হঠাৎ দেখলাম সে তাড়াতাড়ি ঘরের সব আলো, পাখা, এসি, টিভি, গিজার, কল একসঙ্গে চালিয়ে দিয়ে সুট করে কেটে পড়ল, এক্ষুনি আসছি বলে।

রিসেপশনে ফোন করি, কেউ ফোন তোলে না। হাউস কিপিং নিরুত্তর। রুম সার্ভিস বেজে যাচ্ছে।

এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। মিনিবার খুলে দেখি—ফাঁকা।

একটা চিনেবাদামের প্যাকেটও নেই।

ঘণ্টাখানেকও হয়নি এসে পৌঁছেছি। এর মধ্যেই যদি 'কেন কেউ খেতে দিচ্ছে না?' বলে অলোক রাজকে পাগল করে মারি; পরে হয়তো সেই নিয়ে বেচারা মিতালিকে অনেক কথা শুনতে হবে। এই ভেবে কিছু না বলে ফোঁস ফোঁস করছি কেবল, বাড়িতে ফোন করে যে বাবাকে পৌঁছনোর সংবাদ দেব, সেটাও ইচ্ছে করছে না, এমন সময় ডোরবেল বাজল।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি ইব্রাহিম। বেচারা ঘর্মাক্ত মুখে হাঁফাচ্ছে। হাতে ধরা একটা

লেটুস-এর বাগান অন্য হাতে একটা ডায়েট কোক। ওর গোলগাল ফরসা নধরকান্ত দেহ ঘামে চুপসে গিয়েছে, মুখটা টকটকে লাল।

পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নিশ্চয়ই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে আমার জন্য খাবার কিনে এনেছে। অপ্রস্তুত মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বলল

—আর সব কিছু বন্ধ। কেবল একটা দোকান খোলা ছিল। চিকেন স্যান্ডউইচ তুমি খাও তো?

বোঝা গেল, ব্রাউন পেপার ঠোঙার ভেতর উঁকি মারা লেটুসের বাগানের ভেতর পাউরুটি, চিকেন এবং আরও কিছু সুখাদ্য লুকিয়ে আছে।

আমি বললাম,

—ভেতরে এসো।

কোনওরকমে খাবারটা আমার হাতে চালান করে দিয়ে বলল,

—না, না, ঠিক আছে। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। তুমি কি সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে পারবে? আজ টেল আভিভ-এ শো তো। তার ওপর উইক-এন্ড ট্র্যাফিক থাকবে। আমাদের অন্তত দেড় ঘণ্টা হাতে নিয়ে বেরনো উচিত। সাড়ে আটটায় তোমার প্রেজেন্টেশন। ন'টার সময় শো।

বাবা মা নিশ্চয়ই কখন লুকিয়ে আমার নাম 'ভবি' রেখেছিল। ওই সকাতর মিনতি এবং প্রবল খিদের মুখে দাঁড়িয়েও তক্ষুনি বললাম,

—উইকেন্ড ট্র্যাফিক মানে? এই তো বললে সাবাথ-এ লোকে বেরোয় না! গাড়ি কম চলে!

ইব্রাহিম বুঝতে পারল না, আমি ঠাট্টা করছি, না সিরিয়াসলি বলছি। ও কিন্তু নিজে উত্তরটা সিরিয়াসলিই দিল,

—না, না। শনিবার সূর্যাস্তের পর তো আবার সব নরম্যাল।

আট

টেল আভিভ এর স্ক্রিনিং দিয়ে আমার সিনেমাগুচ্ছ শুরু। কয়েকটা ছবি বাছাই করে এনেছেন ভারতীয় এমব্যাসি। কীসের নিরিখে ছবি বাছাই হয়েছে, জানি না।

কেবল এটুকু জানতে পেরেছি যে, প্রতি সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে 'দোসর' দিয়ে। কারণ তখন অবধি সেটাই আমার সাম্প্রতিকতম ছবি। 'দোসর'-এর প্রিন্ট আগে থেকেই পৌঁছে গিয়েছিল ইজরায়েল। ইংরেজি সাবটাইটেল ছাড়াও ইলেকট্রনিক হিব্রু সাবটাইটেল-এর জন্য।

ইব্রাহিম যে স্যান্ডউইচটা এনেছিল, সেটা সহজেই চারজনে মিলে খাওয়া যায়। খিদের মুখে ভেবেছিলাম পারব খেতে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকেই হাঁসফাঁস করি আর ডায়েট কোক-এ চুমুক দিই।

দরজাটা খুলে ইব্রাহিকে খুঁজলাম একবার। কাছে পিঠে কোথাও আছে কি না। দেখতে পেলাম না।

ও বেচারিরও ভীষণ খিদে পেয়েছে। থুড়ি, পেয়েছিল। আমার মুখখিঁচুনির ঠেলায় এতক্ষণে পেট ভরে যাওয়ার কথা।

ভরা পেটে বাড়িতে ফোন করলাম। তারপর ধীরে ধীরে স্যুটকেস আনপ্যাক করে তৈরি হলাম।

সাতটা বাজে, বাইরে এখনও অন্ধকার হওয়ার কোনও লেশমাত্র নেই।

হঠাৎ শরীর জুড়ে একটা অপরিসীম ক্লান্তি এল। দেড়ঘণ্টা গাড়ি চেপে এখন যেতে হবে, তারপর লোকজনের সঙ্গে অকারণে অমায়িক ব্যবহার করতে হবে। স্টেজে উঠে ভারতীয় সিনেমা নিয়ে বলতে হবে ... উরে বাব্বা! তার থেকে জামাকাপড় ছেড়ে, দিব্যি একটা লম্বা স্নান করে বীরের মতো শুয়ে পড়াই ভাল।

কিন্তু এখন যদি ইব্রাহিমকে বলি, যে আমি সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানে যাব না, তাতে ওর মুখের চেহারা কতরকমের হতে পারে, সেটা ভেবে ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম।

ঠিক সাতটার সময় বেল বাজল। দরজার বাইরে ইব্রাহিম এখন একটু ধাতস্থ।

—বিশ্রাম হল?

—তুমি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ।

—কাছেই। একটা সাইবার কাফেতে মেল চেক করছিলাম।

রাত্রের ইজরায়েল আর পাঁচটা দেশের মতোই।

যখন ফ্রি-ওয়ে দিয়ে জেরুজালেম থেকে টেল অভিভ আসছি সন্ধেবেলা স্ক্রিনিং-এর জন্য, ততক্ষণে ঘন অন্ধকার নেমে গিয়েছে। যেন আমেরিকার চওড়া রাস্তাগুলোর মতো একটা রাস্তা ধরে চলেছি আমরা। রাস্তাটা স্পষ্টত দু'টো লেন-এ ভাগ করা। একটা লেন, যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেটা লাল জোনাকির লেন—আমাদের সামনে যাচ্ছে রাশি রাশি টেল লাইট। আর অন্য লেনটা হলুদ আলোর লেন—যে রাস্তায় গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে আসছে এদিকে।

টেল আভিভ-এর সিনেমাথেক হলটা বেশ পুরনো। বেশ একটা সত্তর দশকের বুটিক সিনেমার মতো দেখতে।

আয়তনে মাঝারি। আমাদের নন্দনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সিঁড়ি বেয়ে একটা ধাপ উঠলে একটা কাফে। সেখানে রাত ন'টাতেও বেশ ভিড়। এবং চিরাচরিতভাবে আর্ট সিনেমা সংলগ্ন যে কোনও কাফের মতোই প্রতিটি টেবিলেই ধূম্রায়মান অ্যাশ ট্রে।

ইব্রাহিমকে কাছাকাছি খুঁজে পেলাম না। পেলে দেখিয়ে দিতাম যে, সিনেমা কোনও সাবাথ মানে না। কখনওই, কোথাও।

দর্শকরা বেশিরভাগই অভ্যাগত। তার মধ্যে, অনেক স্থানীয় মানুষই আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার সঙ্গে এসে ছবিটবি তুললেন। আমি তো একেবারে তাজ্জব। টেল আভিভের সিনেমা দর্শক, হ'লই বা সে আর্ট ফিল্ম, আমাকে চেনে? সেটাতে প্রথমে আশ্চর্য হয়ে, তারপর

মেনে নিয়ে এবং শেষমেশ বিশ্বাস করতে করতে যখন বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে আরম্ভ করেছি, তখনই অপ্রীতিকর সত্যটা বেরিয়ে পড়ল। জনৈক ইজরায়েলি যুবক আমার সঙ্গে ছবি তো তুললই, আমাকে আবার গিফট র‍্যাপ করা একট কলমের বাক্সও উপহার দিল। আমি যখন প্রায় এতসব দেখে নিজেকে স্টিভেন স্পিলবার্গের মতো জনপ্রিয় ভাবছি, ছেলেটি দ্বিতীয় একটি গিফট র‍্যাপ করা কলমের বাক্স আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

—প্লিজ আমার হয়ে এটা মিঃ বচ্চনকে দিয়ে দেবেন?

ও হরি! এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে, আমি যে দ্য লাস্ট লিয়র বলে একটা ছবি করছি, সে খবরটা ইন্টারনেট-এর কল্যাণে এখানে বহুলপ্রচারিত এবং আমার সঙ্গে দল বেঁধে ছবি তোলার কারণ হচ্ছে যে, আমি অমিতাভ বচ্চনকে চিনি।

শো-এর সময় এগিয়ে আসতে ধীরে ধীরে ফয়ার ফাঁকা হতে চলেছে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এক দম্পতি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক ফর্মাল ডিনার জ্যাকেট পরা, এবং ভদ্রমহিলার কচি কলাপাতা সবুজ শিফন শাড়িতে নীল চুমকি দিয়ে জাপানি পাখার নক্সা।

কাছে এসে নমস্কার করে পরিচয় দিলেন দু'জন।

এতদিন কলকাতা বা বম্বে থেকে এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই কথা বলেছি আমি।

ইনিই অলোক রাজ। এবং মহিলা ওঁর স্ত্রী। এখন নামটা মনে পড়ছে না।

টেলিফোনে গলা শুনে আমি অলোককে আরেকটু বেশি বয়সি ভেবেছিলাম। দেখলাম, আসলে বেশ অল্পবয়সি, স্মার্ট, চালাকচতুর একজন লোক। লোক না বলে ছেলে বললেও ক্ষতি হয় না।

ভারতীয় এমব্যাসির আমলারা অনেকেই ছিলেন। এবং ও দেশের মন্ত্রীরাও দু'একজন।

প্রত্যেকে মিনিট দু'এক বলতে বলতেই অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। এবার ছবি শুরু।

আমি বলেই দিয়েছিলাম ছবি দেখব না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরেই চলে আসব।

স্টেজ থেকে সবাই নামতে নামতেই হলের আলো নিভে গেল। ছবি শুরু হয়ে গিয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে আমাকে ধরে ধরে হলের বাইরে বার করে আনছিল অলোক। তার মধ্যেই একঝলক ছবি দেখতে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

নদীর বুকে খালি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে গান চাইছে চান্দ্রেয়ী!

—আজ যেমন করে গাইছে আকাশ...

তলায় তাৎক্ষণিক ইলেকট্রনিক সাবটাইটেল ভাসছে হিব্রুতে।

এমন কাউকে পেলাম না, যে রবি ঠাকুরের এই গানের হিব্রু অনুবাদটা আমাকে পড়ে শোনায়।

নয়

সিনেমাথেক-এর কাফেটা এখন সত্যিই বেশ ছোট, ছিমছাম এবং ঘরোয়া লাগছে। দু-একটা টেবিল ছাড়া বাকি টেবিল বেশিরভাগই খালি।

অলোক, ইব্রাহিম আর আমি এসে বসলাম একটা টেবিলে।

আমি চলে যেতেই চেয়েছিলাম। অলোক ভীষণ পীড়াপিড়ি করল এক কাপ কপি খেয়ে যাওয়ার জন্য। ইব্রাহিমের দায়িত্ব আমাকে আবার জেরুজালেম-এ গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেওয়ার। ও বেচারা তাই এখনও অপেক্ষা করছে।

কফিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এমন সময় একজন বয়স্ক মানুষ এসে বিরাট বিরাট মোটা খাতা খুলে ধরলেন।

দেখলাম, ভদ্রলোককে অলোক এবং ইব্রাহিম দু'জনেই বেশ খাতির করছে। তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বসতে বলল ভদ্রলোককে। শুনলাম, ভদ্রলোক এই সিনেমাথেকের কিউরেটর। বহুদিন হল সিনেমাথেকের দেখাশোনার ভার ওঁর ওপর। ওঁকে এই টেল আভিভ শহরে আর্ট সিনেমার অভিভাবক মনে করে সবাই। মোটা বাঁধানো খাতাটা খুলে আমার সামনে মেলে ধরলেন ভদ্রলোক। তারপর একটা খালি পাতা বের করে কলম বাড়িয়ে দিয়ে বললেন কিছু লিখে দিতে।

আজ অবধি যাঁরাই এই সিনেমাথেকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, পৃথিবীর এমন সব চলচ্চিত্রকর্মী কিছু না কিছু লিখে দিয়েছেন এই খাতায়। প্রায় গত ত্রিশ বছর ধরে।

ইজরায়েলি সিনেমা সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব সীমিত। একে তাই নিয়ে বেশ কুণ্ঠায় ছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি লিখে না দিয়ে জিগ্যেস করলাম,

—আমি কি খাতাটা একটু দেখতে পারি?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না। পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলেন আমার সামনে। নানারকম কালিতে, নানা কলমে লেখা, নানা মানুষের সেই সঙ্গে দু-এক টুকরো কথা—সইগুলোর তলায় ভদ্রলোক গোটা গোটা অক্ষরে প্রত্যেকের নাম লিখে রেখেছেন। ভদ্রতাবশত প্রায় যান্ত্রিকভাবেই পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম। একটা পাতায় এসে হোঁচট খেলাম। মনে হল যেন সইয়ের তলায় গোটা অক্ষরে যে নামটা লেখা, তার বানানটা যেন চেনা—JEAN LUC GODDARD।

স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময়ে মুখ তুলেই দেখি টেল আভিভের সিনেমার ভীষ্ম আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন। তারপর চট করে পাতা উল্টে বার করলেন ফ্রাঁসোয়া ত্রুফে।

আবার চোখ চাওয়াচাওয়ি, আবার মুচকি হাসি। পরের পাতাতেই পোলানস্কি, তার দু'টো পাতা পরেই উইম ওয়েন্ডার্স। তার আগে বা পরে, মনে নেই, মাইকেলেঞ্জেলো, আন্তিনিয়নি।

এবার যেন আমার মাথায় কী একটা চাপল। বললাম

—বার্গম্যান!

পাতা উল্টে গেল। সেই অভ্রান্ত জাদুলণ্ঠন হস্তাক্ষর।

ততক্ষণে আমায় খেলায় পেয়ে বসেছে। আমি এক একটা নাম বলছি রোল কলের মতো, আর

সেই মানুষগুলোর হস্তাক্ষর জাবদা খাতায় কোন অভ্যন্তর থেকে 'প্রেজেন্ট প্লিজ' বলে চলে যাচ্ছে।

ডিভিডি স্টোরে গিয়ে যেমন আমরা পরিচালকের নাম বলে ছবি খুঁজি, এখানে প্রায় তেমন করে সই আবিষ্কার করা।

মার্লন ব্র্যান্ডো, জ্যাক নিকলসন, রবার্ট ডি নিরো—এ যেন হলিউডের হল অফ ফেম-এর রাস্তা।

হঠাৎ একটা পাতায় এসে চোখজোড়া আটকাল। পাতার ঠিক মাঝখানটাতে একজোড়া গাঢ় গোলাপি লিপস্টিকের দাগ। আর তার তলায় lipstick দিয়েই লেখা—

—I first kissed this book। তলায় সই ভ্যানেসা রেড গ্রেভ।

ইব্রাহিম আমার জন্য ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। কারণ, যে গাড়িটা আমার ডিউটি করছিল, তাকে জরুরি অন্য কোনও কাজে পাঠানো হয়েছে।

ফেরবার পথে আবার সেই লাল হলুদ আলো দিয়ে ভাগ করা রাস্তা।

আমি আর ইব্রাহিম সপ্তাহান্তের ট্র্যাফিক সাঁতরে জেরুজালেম ফিরছি।

দু'জনেই ক্লান্ত, দু'জনেই নির্বাক। আমি কেবল জিগ্যেস করলাম,

—কালকে কি কোনও গাড়ি থাকবে, না আমরা ট্যাক্সি করে বেরোব?

ইব্রাহিম প্রবল লজ্জার সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,

—না, না, গাড়ি থাকবেই। তবে আমি হয়তো আসব না।

—তবে?

—ভয় নেই। তোমার সঙ্গে একজন থাকবেন। স্থানীয় মানুষ, তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

১ জুন, ২০০৮

উনিশে আগস্ট রোববার সকালবেলা বুঝতেও পারিনি যে আজকের পুরো রাস্তাটাই হাঁটাপথ। সিল্কের জামাকাপড় পরে লবিতে বেরিয়েছি— দেখলাম দু এক ইংরিজিভাষী শ্বেতাঙ্গর সঙ্গে কথা বলছে একজন ন্যাড়ামাথা সবুজ টি-শার্ট পরা মধ্যবয়স্ক বুড়োটে লোক।

রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই ওরা বলল—ও-ই তোমার ট্যুর গাইড।

মোটি রস। সিনেমাথেক থেকে আমাকে পুরোনো জেরুজালেম ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য মোটিকে পাঠিয়েছে।

গতকাল টেল আভিভ-এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে নাকি এব্রাহাম মোটির সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিল।

দুটো জিনিস জানবার ছিল আমার। গাইড হয়ে যিনি আসবেন তিনি ইংরিজি বলেন কিনা, বা কতটা ভাল বলেন।

আর দ্বিতীয়, তাঁর বয়স কত। আজকের প্রজন্ম এই জীবন্ত ইতিহাসটাকে কীভাবে দেখছে— সেটা জানতে ইচ্ছে করছিল। আর তা ছাড়া, নতুন একটা দেশে এসে বুড়ো হাবড়াদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কারই বা ভাল লাগে!

মোটিকে দেখে প্রথমে একটু দমে যাইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। তারপর নিজেকেই বোঝালাম — গাইড মানে গাইড। সে জায়গাটা জানে কি না সেটা নিয়ে কথা। সে বুড়ো না ছোঁড়া, শুঁটকো না ভোঁদা — অত দেখতে গেলে চলে। 'গাইড' সিনেমাটা কীভাবে যে আমাদের মাথা চিবিয়ে খেয়েছে, এখন বুঝতে পারি। কেবল অজানা দেশ দেখার আনন্দ নয়, সেই নতুন আনন্দের পরমাশ্চর্যকে যে এনে পৌঁছে দেবে আমাদের কাছে তাকে যেন নিজেকেও হতে হবে এক রোমাঞ্চকর মানুষ।

মোটিকে দেখে অনেক বছর আগে দেখা এক শ্বেতাঙ্গ বন্ধুকে মনে পড়ে গেল। ইসকনের মথুরা দাস। পরিবারদত্ত নাম অবশ্য একটা ছিল, আমি জানতামও—এখন মনে পড়ছে না।

খাড়া নাক, গমের মতো রঙ, ছোট উজ্জ্বল চোখ, মাঝারি হাইট, ছিপছিপে একহারা চেহারা — মথুরা অবশ্য অনেক স্বাস্থ্যবান। আর মাথায় লম্বা ঘন বাদামি চুল। টেনে পনিটেল করে বেঁধে রাখত পেছনে।

মোটি আর আমি রিসেপশনে বসলাম। একেবারে রাস্তায় গিয়ে গোড়ার কথা শুরু করার থেকে পুরনো জেরুজালেম সম্পর্কে অন্তত কিছুটা জেনে নেওয়া যাক। আগের সন্ধেয় এব্রাহামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম — এখানকার মানুষদের যীশু সম্পর্কে মনোভাবটা কী?

বলেছিল, একটু ধর্মীয় ইহুদিদের মনোভাব তেমন প্রসন্ন নয়।

এটা শোনার পর থেকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যীশু সম্পর্কে কথা বলছি সবার সঙ্গে।

জেরুজালেম শহরটা যে একটিমাত্র মানুষের জন্য আমার কাছে এত গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সেই মানুষটাকে এড়িয়ে কেমন করে শহরটাকে চিনব, সেটা বুঝতে পারছি না। জেরুজালেম সম্পর্কে যা যা বলছিল সেটি লিখে রাখছিলাম আমার নোটখাতায়। একটা সময় বললাম,

— চলো না, গাড়িতে যেতে যেতে কথা বলি।

মোটি কথাই বলে মুখ চোখ ঘুরিয়ে, একটু রহস্যময় হেসে, ফলে কোন জিনিসটা যে আসল রহস্যের, আর কোনটা ওর নিজস্ব নাট্যভঙ্গি; সে বুঝতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

এই প্রথম সেই রহস্য হাসি দেখলাম। মোটি বলল,

— গাড়ি তো নেই। আনিনি সঙ্গে।

সক্কালবেলা আমার মেজাজটা গেল খচে। এই গত রাত্তিরে বারবার করে জিজ্ঞেস করলাম ইব্রাহিমকে, কাল গাড়ি আসবে কি না, ও বলল — ও নিজে আসবে না কিন্তু গাড়ি ঠিক পৌঁছে যাবে... এখন বলছে গাড়ি নেই। আসেনি! মানে?

মোটি নাক মুখ ঘুরিয়ে একটা বিস্তৃত কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করছিল। আমার এক ধমকে সোজা হয়ে গেল।

— না, মানে ওল্ড জেরুজালেম সিটিতে তো গাড়ি ঢুকবে না। ওটা হেঁটে দেখতে হবে।

— বেশ। আর সেখানে অবধি পৌঁছতে গেলে কতটা হাঁটতে হবে?

— সেটা নির্ভর করছে আমরা কোন গেটটা দিয়ে ঢুকব? সাতটা গেট আছে... জাফা, ডামাসকাস, হেরড, লায়ন, ডাঙ্গ, জায়ন...

— চোপ! কোনটা কাছে, সেটা বলো!

ধমক খেয়ে মোটি কেমন তোতলাতে লাগল। আর আমার মনে হ'ল এবার যদি আবার প্রশ্ন করি ও নির্ঘাৎ বলবে,

— না, না। আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।

ও ধীরে ধীরে বলল,

— জাফা গেটটা কাছে পড়বে। আমরা সেই অবধি ট্যাক্সি করে যেতে পারি। তারপর এমনিতেই আমাদের হাঁটতে হবে।

আমার মুখে এসে গিয়েছিল,

— ট্যাক্সি কেন? আমাকে যে বলা হয়েছিল আমার জন্য গাড়ি পাঠাতে হবে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর সেই শিরা বার করা হাতটা, আর কানের কাছে ফিসফিস,

— বেশি অসভ্য হয়েছ, না! অনেক দিন কানমলা খাওনি। ওটুকু হাঁটলে কি তোমার ননীর অঙ্গ গলে যাবে!

মা'র চিরকাল এরকম বদভ্যেস। পারলে যেখানে সেখানে, যার তার সামনে কান মুলে দেয়। রোগে ভুগে ছোট্ট হয়ে যাওয়ার পর আর কানে হাত পেত না। তাহলেও, আমি যে একটা কেউকেটা, আমাকে যে একটু রেয়াত করে চলবে, সে বালাই নেই।

মোটিকে বললাম,

— এক মিনিট বোসো, প্লিজ, আমি আসছি একটু ঘর থেকে।

এই রিসর্টে এখনও পেতলের ট্যাগ লাগানো চাবি। প্লাস্টিক কার্ড হয়নি। রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে এক দৌড়ে ঘরে গেলাম।

সিল্কের জামাকাপড় ছেড়ে সোজা পাতলা সুতির টি শার্ট আর প্যান্ট। পায়ে স্নিকার্স। ব্যাস এবার আমায় কত হাঁটতে হবে বলো।

রিসেপশনে ফিরে এসে দেখি মোটি উত্তেজিত ভাবে ফোন করছে সেলফোন থেকে কাউকে একটা। মুখে বেশ একটা উদ্বেগের ছাপ।

আমি ওর কথার মধ্যে না ঢুকে একটা চিরকুটে লিখে বাড়িয়ে দিলাম

— গাড়ির জন্য ভেবো না। আমরা ট্যাক্সিতেই যেতে পারি।

মোটি একনজরে লেখাটা পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখের দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গিয়ে একটা আশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি ফোনালাপ শেষ করে 'তোদা' 'তোদা' বলে ফোন রেখে দিল।

'তোদা' হল হিব্রু ভাষায় 'ধন্যবাদ'। আরবি ভাষায় সেটা হচ্ছে 'শুক্রম'। যেখান থেকে উর্দু 'শুক্রিয়া'। ট্যাক্সিতে জাফা গেট পৌঁছোতে দশ মিনিট মতো সময় লাগল।

গতকাল রাত্রে সিনেমাথেকের কাফেতে বসেই অলোক বলছিল যে, গোটা ইজরায়েল দেশটা নাকি আয়তনে অনেকটা আমাদের মিজোরামের কাছাকাছি। গোটা ভারতবর্ষ নাকি সেই হিসেবে ইজরায়েল-এর থেকে একশো বিয়াল্লিশ গুণ বড়।

আজকের জেরুজালেম-এর পশ্চিম দিকটাই প্রধানত ইহুদিদের আধিপত্য। পূর্ব জেরুজালেম-এ বাস করেন প্রধানত আরবি এবং প্যালেস্টিনিয়ান মুসলমানরা।

এই পূর্ব এবং পশ্চিম জেরুজালেম-এর মাঝামাঝিই হচ্ছে আদি জেরুজালেম শহর। আমাদের এই মুহূর্তের গন্তব্য। আমরা শহরে ঢুকব জাফা গেট দিয়ে। 1516 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1917 ডিসেম্বর অবধি ইজরায়েল অটোমান বা তুর্কিদের শাসনকাল ছিল। 1917 খ্রীস্টাব্দে থেকে বৃটিশদের শাসনাধীন হয় ইজরায়েল। ইজরায়েল-এর স্বাধীনতা আমাদের থেকে খুব দূরে নয়। আমরা সাতচল্লিশের অগাস্ট। ওরা আটচল্লিশের এপ্রিল।

তুর্কিদের রাজত্বকালে সুলতান সুলেমান নাকি হজরত মহম্মদের কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে জেরুজালেমের সুরক্ষা প্রয়োজন। তাই 1536 খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম-এর চারপাশ ঘিরে অত্যন্ত মজবুত এক নগরপ্রাকার গড়ানোর কাজ শুরু করেন সুলেমান। দু মাইল লম্বা আর চল্লিশ ফুট চওড়া এই দেওয়াল বানানোর কাজ চলেছিল পাঁচ বছর ধরে।

জাফা গেটের কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, দেখি দেওয়ালে মাঝখানটা একটা বড় ফাঁক। ফাঁক মানে তার মধ্যে দিয়ে গোটা একটা রাস্তা দিব্যি ঢুকে গিয়েছে।

আমাদের ট্যাক্সি সেই অতিকায় দেওয়াল ফোকরের মধ্যে দিয়ে এসে দাঁড়াল জাফা গেটের সামনে এখান থেকে পদব্রজে আদি জেরুজালেম ভ্রমণ।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি ভাঙা দেওয়ালের দিকে, মোটি আমার মনের ভেতরের প্রশ্নটা যেন পড়ে নিয়েই বলল,

— 1898 সালে একজন জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম জেরুজালেম পরিদর্শনে আসেন

তখনকার অটোমান শাসক দ্বিতীয় হামিদের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে। কাইজারকে সম্মান জানাতে গিয়েই এই দেয়ালটাকে মধ্যিখান থেকে চিরে দু'ভাগ করে তবে কাইজার-কে তার মধ্যে আনা হয়েছিল।

নিজের দেশ সম্পর্কে এতবার শুনেছি, এতবার পড়েছি, শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন। চিরকাল, সেই ছোটবেলা ইতিহাস ক্লাসে Unity in Diversity পড়তে শুরু করবার সময় থেকেই প্রায়। ভাবতাম এ বুঝি কেবল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য—যে কতশত সাম্রাজ্য, শাসকবংশ, কত ধর্ম, কত জাতির প্রভাবের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে আমার দেশ। ইজরায়েল-এ এসে যেন সম্যকভাবে বুঝলাম, যে সত্যিই, প্রায় যেন প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো, ছিন্ন বিভিন্ন হতে হতেও বেলে পাথরের পিঠকে প্রায় যেন অভেদ্য করে আজও দাঁড়িয়ে আছে একটা দেশ।

চাইলেও যারা 'বহিরাগত'-কে না বলতে পারে না। পারেনি।

জাফা গেট থেকে এবার হাঁটাপথ। ডেভিড স্ট্রিট ধরে।

শুরু হবে আদি জেরুজালেম। এ সেই দেশ যে একদিন পুরাণকে ইতিহাস করে দিয়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে পুরাণকে।

সেই জাফা গেট-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম দু'জন। যাদের মধ্যে একসময় একটা ইতিহাস ছিল। এখন শুধুই পুরাণ।

মা আর আমি।

যে কোনও ভারতীয়কে ডেভিড স্ট্রিট চিনিয়ে দেওয়ার একটা সহজ উপমা আছে। বেনারসের বিশ্বনাথের গলি। অমনই সরু একফালি পথের দু'ধারে দোকান। এঁকেবেঁকে চলে গেছে। কেবল আদি জেরুজালেম-এর এই গলিটা পাথুরে, থেকে থেকে রুক্ষ সিঁড়ির ধাপ। আর পুরো রাস্তাটাই পাহাড়ি। ফলে পদে পদে উঁচুনিচু।

মোটি, আমার গাইড আমাকে বোঝাচ্ছিল যে জেরুজালেম-এর জনসংখ্যা হল সাত লক্ষ তিরিশ হাজার। তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, 65 শতাংশ হলেন ইহুদি ধর্মাবলম্বী।

মোটির কথা শেষ হয়নি। পথের ধারের একজন বিক্রেতা, যে তাঁর দোকানেরই সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন, বুঝতে পারিনি। পারলাম তাঁর প্রবল প্রতিবাদে

—মোটেই 65 শতাংশ নয়। বললেই হবে, মেরেকেটে চল্লিশ বা পয়তাল্লিশ শতাংশ।

কিছুক্ষণ ইংরিজি ভাষাতেই তর্ক বিতর্ক হল, তারপর মধ্যপ্রাচ্যের কোনও ভাষায় বাকি আলোচনা করল মোটি তার সঙ্গে। সেটাও বুঝতে পারলাম না। কী বলল দু'জনে তা তো পারলাম না-ই।

কিছুক্ষণ পর মোটি আমায় বলল,

—চলো।

বলে হনহন করে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

—ও আপত্তি করছিল কেন?

—ওদের স্বভাবই ওই।

—ওদের মানে?

—ওরা, মানে প্যালেস্টিনিয় মুসলমানগুলো। আর কোনও কাজ পায় না, খালি...

রাস্তার দুপাশে নানারকমের দোকান। লম্বা জোব্বা জাতীয় পোশাক, কার্পেট, বাদ্যযন্ত্র নানা ধরনের কিউরিও বিক্রি হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,

—এটাই কি যীশুর শেষ যাত্রার পথ?

মোটি বলল,

—আর একটু এগিয়ে নিয়ে। ধরো, মিনিট পাঁচেক।

আমি এবার সত্যিই অবাক। সারা পৃথিবী জুড়ে এত বিশিষ্ট একটা ধর্মস্থান অথচ পথের দু'ধারের একটা দোকানেও যীশুর ছবি নেই। ক্রুশ নেই। খ্রিস্টানধর্মের নাম গন্ধ নেই। কে বলবে এটা পৃথিবীর একটা অন্যতম বড় তীর্থস্থান। দোকানে ধূপ আছে, তামাক আছে, আসন আছে, কার্পেট আছে। বেশিরভাগই শৌখিন স্থানীয় শিল্প বলে না দিলে বোঝাই যায় না। পৃথিবীজোড়া এমন এক বিশালকায় ধর্মের প্রথম প্রবর্তক আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে এই রাস্তা দিয়েই শেষ যাত্রা করেছিলেন।

আজ অবধি এত জায়গায় বেড়িয়েছি, দেশে-বিদেশে কত নতুন জায়গায় গেছি, কোনও দিন মনে হয়নি ছবি তুলে আনি। ফলে আমার যাবতীয় বিদেশ ভ্রমণের ছবি আমার সঙ্গী বন্ধুবান্ধবদের তোলা, তারা যখন আদর করে কপি দিয়েছে, রেখে দিয়েছি। নইলে সেটা সংগ্রহ করার কোনও বিশেষ ইচ্ছেও হয়নি কখনও।

জেরুজালেমের এই পাথুরে গলিতে দাঁড়িয়ে এই প্রথম মনে হল,

—ইস্! একটাও ছবি থাকবে না আমার এখানে!

তার থেকেও বেশি মনে হল, যদি এই গলিটার ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারতাম। কত হাজার হাজার বছরের কত গল্পকথার কিছু কিছুও তো ধরা পড়ত কোথাও।

এখন আর আফশোস করে কী হবে! প্রথমত আমি ছবি তুলতে পারি না, অনেকবার শেখার চেষ্টা করেছি— ধৈর্যে কুলোয়নি। আমার নানা সাইজের ডিজিটাল ক্যামেরা আছে, তাতে ছবিও ওঠে কোনও কসরৎ না করে। কিন্তু আমার তাতে মন ভরে না মোটে। ছবিগুলো যদি বারবার দেখবার মতো না হয়, তাহলে সে ছবি তুলে লাভ কী! ফলে তিনটে ক্যামেরাই কলকাতায়

নিজেদের বাক্সের মধ্যে ঘুমোচ্ছে, আর আমি এখানে জেরুজালেম-এর ছবি কেবল স্মৃতি ছাড়া আর কী বয়ে নিয়ে যাব ভাবছি, এমন সময় মা'ই যেন বুদ্ধিটা দিল।

—ব্যাগে কাগজ আছে?

—আছে।

—কলম?

—তাও আছে।

—এঁকে নে।

বাঃ! এটা মাথায় আসেনি তো। বালিপাথরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। পাশেই একটা লোহার গেটওয়ালা বাড়ি। ফাঁক দিয়ে উঠোন দেখা যাচ্ছে। ওপরে সাইনবোর্ডটা পড়বার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

মোটি বলল,

—ওটা গ্রিক প্যাটরিয়ার্কি চার্চ। অটোমান রাজত্বের সময়ে খ্রিশ্চানদের ওপর প্রবল অত্যাচার চলছে। তখন এই ছোট ছোট খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে বড় বড় নাটবল্টু দেওয়া লোহার দরজা তৈরি করে নিচ্ছিল। যাতে অটোমান অত্যাচারীরা যখন তখন ঘোড়া চালিয়ে ভেতরে না ঢুকে পড়তে পারে।

খসখস করে ছবি এঁকে নিলাম। আমি যেমন পারি। নাকি আদি জেরুজালেম-এর ডেভিড স্ট্রিট-এর সেই পাথুরে সিঁড়িতে আমার পাশে মা-ও এসে বসল। তারপর ছোটবেলায় যেমন ছবি আঁকা শেখাত তেমন করে ধীরে ধীরে আমার নীলরঙের নোটখাতার পাতায় আঁকিয়ে নিল পথের ধারের বিপন্ন খ্রিস্টানদের সেই এক সময়কার শরণদুর্গ।

মোটি হয়তো ঠিক বুঝতে পারছিল না যে, রাস্তায় বসে থেবড়ি খেয়ে ছবি আঁকছে একজন ভারতীয় ফিল্মমেকার, এটা হয়তো তার কাজও বটে—ফলে, অনেকক্ষণ ধরে মোটি আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল, আমাকে বিরক্তও করছিল না আবার সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে, সেটাও বুঝিয়ে দিচ্ছিল কিঞ্চিৎ অধৈর্য পদচারণায়।

আমিও গভীর মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করছি পার্সপেক্টিভ মিলিয়ে ছবিটা ঠিকঠাক করে আঁকতে। নইলে বাবাকে এসে দেখালে বাবা বেজায় বকতে পারে।

হঠাৎ-ই যেন মা আমার মুখটা ঘুরিয়ে দিল খাতার পাতা থেকে রাস্তার দিকে।

একদল আর্মেনিয়ান পাদ্রী কালো পোশাক, হাতে রৌপ্যদণ্ড, মাথায় অদ্ভুত কালো জমাট শিরস্ত্রাণ পরে, দল বেঁধে হেঁটে গেলেন রাস্তাজুড়ে।

যে শোভাযাত্রার এমনই রাজকীয়তা, এমনই সদম্ভ পদক্ষেপ, যে আমি, জন্মসূত্রে একজন হিন্দু মোটি, জন্মসূত্রে একজন ইহুদি, আর চারপাশের দোকানের প্যালেস্টিনিয়ান মুসলিম মানুষগুলো

কেমন যেন শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, ফ্যালফ্যাল করে দেখতে থাকল ধর্মযাজকদের সেই রাজকীয় কুচকাওয়াজ।

আর ওরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই কালো স্যুট পরা একদল তরুণ বুকের কাছে জড়ো করা হাত দুটিতে একটা বাইবেল আঁকড়ে ধরে নিশ্চুপে দল বেঁধে সেই পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। ওরা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর অবধি ওদের জুতোর ঠকঠক আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল পাথুরে রাস্তা বেয়ে। মোটি বলল, ওরা ধর্মতত্ত্বের ছাত্র, কোনও একটা সেমিনারে এসেছে।

সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা, ধর্মের ছাত্রদের সমবেত পদচারণা— পরনের পোশাকটাই কেবল কোরা বা গেরুয়া নয়। পথের ধারে মা-বেটা, দুজনে মিলেই ভাবতে লাগলাম আমাদের দুজনের বড় প্রিয় সেই বেনারসের কথা।

শৈশবের নানা স্তরে পুজোর ছুটিতে উত্তর ভারতের পাহাড়ে যখন বেড়াতে যেতাম আমরা চারজন— বাবা, মা, চিক্কু আর আমি, আমাদের ব্রেক জার্নি করার একটা নিশ্চিত জায়গা ছিল বেনারস। শেষ বেনারস গিয়েছি 'চোখের বালি'র শুটিং করতে। ট্রেনটা যখন বারাণসী স্টেশনে দাঁড়াল ভোরবেলা, আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম বাবার গলা,— বরুণা আর অসি, দুই নদী মিলে নাম হল বারাণসী।

বিশ্বনাথের গলিতে গেলেই মা শাড়ির দোকানে ঢুকবে, এই ভয়ে ছোট্ট চিক্কু বেড়াতে যেতে চাইত না কেবল টাঙ্গা করে যখন বেরোতাম আমরা—চুণার বা সারনাথ দেখতে, সেটাই ছিল চিক্কুর আমোদভ্রমণ। একবার টাঙ্গার সামনের সিটে বসে চিক্কু হয়তো লক্ষ করে দেখছে যে, ঘোড়াটি ছুটতে ছুটতেও ঘন ঘন মলত্যাগ করছে। ছোট্ট কাতর গলায় বাবাকে মিনতির স্বরে বলেছিল

—বাবা! ওর পেট খারাপ হয়েছে। ও খালি পটি করছে। ও আর ছুটতে পারছে না। আমরা অন্য টাঙ্গা নিই।

হু হু করে এতগুলো ছবি স্লাইড শো'র মতো ভেসে গেল চোখের সামনে। পাশে তাকিয়ে দেখি, মা আর নেই। নিশ্চয়ই ঢুকে গেছে কোনও একটা দোকানে! জানি না, এখানকার প্যালেস্টিনিয় মুসলমান দোকানিরা মাকে বেনারসি শাড়ি দেখাতে পারবে কিনা!

মোটি বা, ডেভিড স্ট্রিটের পথচারীরা কী ভাবল জানি না। কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তারা কেবল দেখল, মাঝরাস্তায় খাতাকলম হাতে বসে টি শার্ট পরা ন্যাড়ামাথা একটা লোক হাপুস নয়নে কাঁদছে। (চলবে)

৮ জুন, ২০০৮

নানা রকমের গন্ধে ভেসে যাচ্ছে ভিয়া ডোলো রোসা। হিং, কর্পূর, জোয়ান রসুন, নানারকমের মশলা। কতকটা জাফরান, কিছুটা যেন লবঙ্গ — সব মেশানো একটা অদ্ভুত গন্ধ। এত সুপাচ্য, সুস্বাদু গন্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রায় যেন ভুলেই যেতে হয়, যে এইখানে এই রাস্তা ধরেই আজ থেকে প্রায় একুশশো বছর আগেই ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যিশুখ্রিস্ট পার হয়েছিলেন তাঁর শেষ যাত্রার চড়াই-উতরাই।

সম্প্রতি মেল গিবসন-এর 'দ্য প্যাশন অফ খ্রাইস্ট' ছবিটিতে এই রক্তাকীর্ণ যাত্রা আমরা বিবিধ বিশদতায় দেখেছি। ছোটবেলার বই পড়া বা প্রতিটি গুড ফ্রাইডে-তে নিয়ম করে এই গল্পটা আবার আবার করে শুনে জেরুজালেম শহরটা সম্পর্কে মনে মনে একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল।

ভিয়া ডোলো রোসা-তে (The Path of pain) পা রাখবার আগে আমি জানতামও না যে, আমার মনের ভেতর একটা জেরুজালেম শহর আছে, যার স্থপতি আমার শৈশব। আর আমি প্রায়ই হারুন-অল-রশিদের মতো সমস্ত কাজের ফাঁকে নিভৃতির ছদ্মবেশে তার পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

সত্যিকারের জেরুজালেম শহরে এসে বুঝলাম যে, জেরুজালেম বলে এই পৃথিবীতে আরও একটা জায়গা আছে। যেটা ঠিক আমার জেরুজালেম এর মতো নয়। তবু এর এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, বৈভব আছে।

আজ রোববার। পর্যটক এবং খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের ভিড় কম। এবং ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে, যে বিশ্বব্যাপী ধর্মের জোরে ইহুদিদের ওপর অমন অত্যাচার করেন হিটলার, বা যে ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে আমেরিকাকে বারবার করে চাগিয়ে তুলতে প্রেসিডেন্ট বুশ 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটা প্রায় সমার্থক করে দেন 'ইসলাম'-এর সঙ্গে—যিশুখ্রিস্টের শেষ যাত্রাপথে সেই ধর্মের আস্ফালন সংকুচিত হয়ে কুঁকড়ে সরে দাঁড়িয়েছে একদিকে।

জেরুজালেম-এর এই অংশটা প্রধানত প্যালেস্টিনিয় মুসলমান অধ্যুষিত। বাকি যাঁরা এখানে নিত্য যাতায়াত করেন, তাঁরা ইহুদি। ফলে খ্রিস্টানদের তীর্থদর্শন এই দুই ধর্মের চাপের মাঝখানে কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত, দিশাহারা। পন্টিয়াস স্পিলেট যেখানে যিশুকে দণ্ড দেন, সেখান থেকে ক্রুশ কাঁধে গলগথা পাহাড়ে পৌঁছনোর পথটা দীর্ঘ না হলেও বেশ চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে।

কয়েকটা জায়গা তো এমন, সিঁড়ি ভাঙতে হয়। যে সত্যিই যদি ক্ষণেকের তরে দাঁড়িয়ে মনে করতে হয় যে, এই পথ দিয়ে নিজের মৃত্যুস্তম্ভ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে উঠতে হয়েছিল অনাহারী, অত্যাচারক্লিষ্ট একজন মানুষকে, তখন সত্যিই মনটা কেমন যেন উদ্বেলিত হয়। তারপর যখন মোটির মুখে শুনি এবং মনে মনে মেলাই যে, সেই মানুষটা রাগে, ক্ষোভে, আক্রোশে অভিশাপ দিচ্ছেন যে 'ছারখার হয়ে যাবে জেরুজালেম'— তখন করুণার অবতারের, ক্ষমার দেবতার এই ক্রোধকে কী অসহায় ভাবে মানবিক মনে হয়, জ্যান্ত মনে হয়। আর যেন মনে হয়, সেই বিখ্যাত অন্তিম খেদোক্তি —'প্রভু, এদের ক্ষমা কোরো, এরা জানে না এরা কী করছে।' কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত

কিংবদন্তির মতো লাগে। এবং ঈশ্বর গড়ার বাঁশের একচালা, খড়মাটি রং চোখের সামনে কেমন যেন প্রকট হয়ে যায়। যিশুর শেষ যাত্রাশুরু থেকে যাত্রাশেষ, মানে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং তাঁর রাজকীয় সমাধি চোদ্দটি বিশিষ্ট স্থল বা 'স্টেশন'-এ ভাগ করা। কেবল মাত্র খ্রিস্টধর্মী এবং ইতিহাস উৎসুক মানুষ ছাড়া ওই 'স্টেশন'গুলিতে আজকের জেরুজালেমবাসীর কোনও আগ্রহ নেই।

পঞ্চম স্টেশন, যেখানে শেষ যাত্রায় পুত্রের কাছে ছুটে এসেছিলেন মাতা মেরি, সেখানে সেই পবিত্রকরুণ মিলনতীর্থের ঠিক সামনে বসে ঢালাও বিক্রি হচ্ছে মেয়েদের অন্তর্বাস। এমন করে ঘিরে আছে বিক্রেতা এবং বোরখাবৃত ক্রেতারা যে, দেওয়ালগাত্রে মেরি আর যিশুর খোদিত মূর্তিটিও যেন আড়াল হয়ে যায়।

গলির মধ্যে এবার যেন ঘ্রাণের চেহারাটা বদলাল। মোটি দেখাল পথের দু'ধারে আতরের দোকান। আতর, তামাক, বিশেষ করে আরবি সুগন্ধি বিক্রি হচ্ছে চারপাশে।

মোটি যেন না জেনেই বলেছিল 'these are perfume from Arab', আর আমার কেন যেন মনে পড়ে গেল লেডি ম্যাকবেথের সেই উন্মাদ বিলাপ, আর এ-ও মনে হ'ল তবে কি শেক্সপিয়র কোনওদিন এই রুধির সরণিতে এসেছিলেন? এবং তাই কি এমন অভ্রান্তভাবে জানতেন যে, আরবের কোনও সুগন্ধিই ঐতিহাসিকভাবেও কোনওদিনই পারেনি কটু রক্তগন্ধকে চাপা দিতে!

সাধারণত এই পথে তীর্থযাত্রা শেষ হয় হোলি সিপালকার-এ এসে। আগে যাকে স্টেশন বলছিলাম, সেই চোদ্দটা স্টেশনের শেষ পাঁচটা এই বিরাট গির্জার ভেতর। গলগথা পাহাড়ের মাথায় এই বিরাট গির্জাও যিশুর মতোই প্রাচীন। রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটিনোস-এর রাজত্বকালে এর নির্মাণ শুরু। কনস্ট্যানটিনোস্-এর সিংহাসনাভিষেক ৩১৩ এ.ডি-তে। ৩২৪ এ.ডি-তে খ্রিস্টধর্মকে প্রথম স্বীকার করে নেওয়া হয়, এবং সেই সম্মানে যিশুখ্রিস্টের সমাধিস্থল ঘিরে এই বিশালাকায় গির্জা নির্মাণ করা হয়। প্রায় তিনশো বছরের মাথায়ই ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরবরা এসে প্রথম আক্রমণ করে এই পবিত্র তীর্থ। তারপর এই হোলি সিপালকর-এর নানা অংশ প্রায় দশবার বিনষ্ট হয়েছে এবং পুনর্নির্মিত হয়েছে। কখনও আক্রমণ, কখনও আগুন, কখনও ভূমিকম্প — সভ্যতার যে কোনও শক্তিই, একবারের জন্য হলেও তার টুসকিটুকু আলতো করে মেরে গেছে এই বিশাল তীর্থমন্দিরে। আর মৃত্যুর পরেও পুনরভ্যুদয়ের মতো, নাকি ফিনিক্স পাখির মতো, নাকি সর্বহারা ইহুদি জাতটার মতোই বারবার করে মৃত্যু, ধ্বংস, কারাবরণ, আত্মগোপনের অপমান থেকে বারবার করে জীবনে ফিরে আসার মতো করেই স্বমহিমায় ফিরে এসেছে হোলি সিপালকর।

ইতিহাস বুঝি পুরাণে বিশ্বাস করে না। নাকি মানুষের কল্পবিশ্বাসের মাটিতে পুরাণের জন্ম বলে ইতিহাস তার তেমন তোয়াক্কা-ও করে না। আমি কপিলাবস্তু দেখিনি, কুশীনগরও দেখিনি। কিন্তু সামান্য যে ক'টা মাঝারি মাপের বৌদ্ধ ধর্মস্থান বা মনাস্ট্রি দেখেছি, তাতে করে সত্যিই বুঝিনি, কার

বৈভব বেশি—ইতিহাসের না পুরাণের?

চরম নাস্তিকের জায়গায় দাঁড়িয়েও যদি বিশ্বাস করে নিই যে, এই হোলি সিপালকরের ভেতর যে সমাধিক্ষেত্র, তার মধ্যে অধিষ্ঠান করছে যিশুখ্রিস্টের মানবদেহের ভগ্নাবশেষ, সেই যিশুখ্রিস্টের যাঁকে ঘিরে পৃথিবীর প্রবলতম, সবচেয়ে প্রতাপশালী ধর্মের আস্ফালন— এবং সত্যি একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান বাইবেল-এর কথা বললেও কোন ছবিটা তাঁর মন জুড়ে বসে — রোমের ভ্যাটিক্যান-এর না জেরুজালেমের এই বেলেপাথরের গির্জার, তার সত্যিই কোনও উত্তর পেলাম না।

তখন দুপুর হয়েছে। আশপাশের অঞ্চল থেকে মাইক্রোফোনে আজান ভেসে আসছে। আর আমি শ্রাবণ মাসের সেই তপ্ত বেলেপাথরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি যিশুখ্রিস্টকেও কি রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরীর মতো মরিয়াই প্রমাণ করিতে হইল যে তিনিও একদিন ছিলেন।

লায়ন্‌স গেট থেকে ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। হোটেলে ফিরতে ফিরতে বেলা চারটে। সন্ধেবেলা জেরুজালেম-এ আমার রেট্রোস্পেকটিভ শুরু।

উদ্বোধনী ছবি আগের দিনের মতোই, দোসর। স্টেজে দাঁড়িয়ে ছবির আগে উদ্বোধনী ভাষণে বললাম,

—'আজ সারাদিন আমি আদি জেরুজালেমের রাস্তায় ঘুরেছি। সেটা আমার কাছে বড় আনন্দের ইতিহাসভ্রমণ। আমার কাছে আজ বড় সহজ হয়ে গেল যে, পৃথিবীর ইতিহাস কতগুলো মূল আবেগের ওপর দাঁড়িয়ে। প্রেম, ঘৃণা, আক্রোশ, ক্ষমা এবং সহনশীলতা। আমার ছবিও তার নিজের ক্ষুদ্র পরিসরে এই আবেগগুলিই আপনাদের দেখাবে।'

স্টেজ থেকে নেমে ভাবছি। কথাগুলো কে জুগিয়ে দিল মুখে? মাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না — আশেপাশে।

আর যিশুখ্রিস্ট! তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সমাধির মধ্যে ঘুমোচ্ছেন। তা হয়তো বা, সেই যে পঞ্চম স্টেশনে যেখানে মেরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল শেষ যাত্রায়—' সেখানে এখন সমস্ত অন্তর্বাসের দোকান জাদুবলে অন্তর্হত করে আমাদেরই মতো পাথুরে রাস্তার সিঁড়িতে বসে কত গল্প করছেন মায়ে-ব্যাটায়। (চলবে)

১৫ জুন, ২০০৮

এক

জেরুজালেম শহরে দোসর-এর স্ক্রিনিং হয়ে গেল।

জেরুজালেম সিনেমাথেক-টা আমার বাসস্থানের থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ।

ছোট্ট, সুন্দর, সুচারু একটা বুটিক সিনেমা। এসে থেকেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে আভিভা বলে একজনের নাম শুনছিলাম। তিনি এই সিনেমাথেক-এর যাবতীয় দেখাশোনা করেন।

ছবি শুরু হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

ভদ্রমহিলা চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। মোটাসোটা, কপালের ওপর ব্লান্ট কাট করা কুচকুচে চুল, ঠোঁটের ওপর অল্প গোঁফের রেখা, মুখের আদল অনেকটা আমাদের চিত্রাভিনেত্রী অমৃতা সিং-এর মতো। একটা কালো ফুলের ছাপছাপ গাউনে ঢাকা রয়েছে তার বিশাল শরীর। আভিভা নামটা ইজরায়েলে বেশ প্রচলিত নাম, মানে—বসন্ত। অনেকটা আমাদের বাসন্তী যেমন আর কী!

আভিভার সঙ্গে ছিলেন একজন বর্ষিয়সী মহিলা। সাদা ধবধবে চুল, যেন নরম সাদা পশমের টুপি পরেছেন।

প্রচুর বলিরেখাচিহ্নিত ফর্সা টুকটুকে মুখটায় মার্বেলের মতো দু'টো চোখ, ভদ্রমহিলার নাম লিয়া ভ্যানলিয়ার।

ইজরায়েল-এর ফিল্ম সোসাইটির ইতিহাসে ইনি এক বিশিষ্ট অগ্রজা।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে বহুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সাজ দেখলেন, তারপর অলোক রাজকে ডেকে বললেন

—দ্যাখো! পুরুষরা যদি এরকম সাজতে না পারে, কেবল যদি তোমাদের মতো বোরিং সাজে, তাহলে লাভ কী? অলোককে যেন একটু অপ্রস্তুত দেখাল। তড়িঘড়ি বলল

—না, না। পরলেই তো হয়, তবে সবাই তো আর সমানভাবে carry করতে পারে না।

আগামিকাল ডেড সি দেখতে যাচ্ছি শুনে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

—শুধু শুধু মরুভূমি দেখে কী হবে। বরং জেরুজালেম দ্যাখো। শহরটা আরেকটু ঘুরে দ্যাখো। হলোকস্ট মিউজিয়মটা দ্যাখো।

আমার আবার আগামিকাল রাত্রের ছবির স্ক্রিনিং হাইফা বলে একটা শহরে। জেরুজালেম থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ।

ঠিক হল সকাল সকাল বেরিয়ে শহরের বাকিটুকু দেখে, হলোকস্ট মিউজিয়মটা দেখে তারপর হাইফা রওয়ানা দেব।

পরের দিন সকালে মোটি এসে পৌঁছে গেল আটটার মধ্যে। আজ আমি হাঁটবার জন্য তৈরি। ফলে সাজগোজ সেই ভেবেই। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

দুই

জেরুজালেম-এর বিখ্যাত Western wall, (পশ্চিমের দেওয়াল) দেখাটা একটা অভিজ্ঞতা। মোটি আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বোঝাচ্ছিল জায়গাটার মাহাত্ম্য। রাজা হেরড-এর সময়কালে নির্মিত এই পশ্চিমের প্রাচীর—ইতিহাস বা কিংবদন্তি তাই বলে।

বিশাল একটা চারশো আশি মিটার লম্বা দেওয়াল। তখন এখানে ছিল ইহুদিদের একটি বড় প্রার্থনা মন্দির। আর, যে কোনও ধর্মস্থান ঘিরে প্রথমেই যেটা তৈরি হয়, তাও ছিল। বাজার, কেনাকাটার জায়গা—অনেকটা যেন গ্রিক মার্কেটপ্লেস-এর মতো। এখানে দেশ বিদেশ থেকে সওদাগররা আসতেন, ক্রেতা বিক্রেতা আসতেন। আসতেন সঙ্গীতকার বা বাদ্যসঙ্গীরা, বাজাতেন বসে পথের ধারের এই দেওয়ালের সামনে। বুঁদ হয়ে শুনত জেরুজালেম-এর লোক। চিন্তাবিদরা একত্রিত হয়ে বসতেন। প্রহরের পর প্রহর কেটে যেত দর্শনচিন্তায়, ধর্মব্যাখ্যায়, নতুন নতুন ভাবনা চিন্তার পর্যালোচনার। তারপর একদিন এখানে, এই নগরচত্বরে এলেন এক দিব্যকান্তি যুবা, নাজারেথ শহর থেকে গাধার পিঠে চেপে এসেছেন এতটা পথ। অনুমান করতে পারি, সেই প্রখর রৌদ্রে, মরুভূমির ওপর দিয়ে আসা মানুষটিকে পথশ্রমক্লান্ত, ঘর্মাক্ত দেখাচ্ছিল। এখানে এসে নেমেই মানুষটি প্রথম ঘোষণা করেন তাঁর ধর্মবিদ্রোহ। তারপরের গল্পটা তো সবাই জানি। আর সেই পরিণতির পথের কথা লিখেওছি আগে।

এখানে একটা মজার কথা হল এই যে, মোটি যতবার এই দেয়ালের সৃষ্টিসময়টার উল্লেখ করছে, বলছে

—রাজা হেরড-এর সময়...

আমি কিছুক্ষণ পর জিগ্যেস করলাম

—বারবার রাজা হেরড, রাজা হেরড বলছ কেন? হেরড কি এই দেওয়ালটা নির্মাণ করিয়েছিলেন?

—সেটা অত স্পষ্ট করে বলতে পারা যায় না।

—আচ্ছা! তবে কি এটা হেরড-এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল?

—তাও জানি না সঠিক। তবে সেরকমটাই অনুমান করা যায়।

—হেরড এটা বানানও নি, তাঁর রাজত্বকালীন সময় এটা বানানো হয়েছে কি না, সেটার কোনও নিশ্চয়তা নেই, কেবল এটুকু বলা যাচ্ছে যে, এই পাঁচিলটা নির্মিত হয়েছিল রাজা হেরড-এর জীবদ্দশায়, তা, সেই সময়টা তো যিশুখ্রিস্টেরও সময়কাল। তা সেটা না বলে কেবল হেরড, হেরড বলছ কেন?

মোটি নিরুত্তর। বুঝলাম, ইহুদিদের ইতিহাসে সত্যিই যিশুর কোনও জাগা নেই।

আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, যে মানুষটা পুরাণকে ইতিহাস করে দিয়েছেন, যাঁর জন্ম মৃত্যু

আমাদের, BC, AD-র হিসেব দিয়ে আমাদের দিনলিপি, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। আমাদের আন্তর্দেশীয় যোগাযোগ, আমাদের ইতিহাসের এক নিরন্তর সময়সূত্র সৃষ্টি করেছে—সেই মানুষটার প্রায় যেন কোনও ভূমিকাই নেই তাঁর জন্মভূমির নিজস্ব ইতিহাসপাঠে।

আমি কৌতুকে, আশ্চর্যে একবার জিগ্যেস করলাম মোটিকে

—তোমরা কি সত্যিই যিশুকে নিজেদের লোক মনে করো না?

প্রবল আপত্তিতে মাথা নাড়ল মোটি,

—না মোটেই না, উনি ইহুদি তো বটেই।

উনি জন্মসূত্রেও ইহুদি, আমৃত্যু ইহুদিই থেকেছেন।

তারপর, হয়তো বা আমি নিজে ইহুদি বা খ্রিস্টান নই বলে একটা অদ্ভুত কৌতুকাবিল হাসিতে প্রায় ফিসফিস করে বলল

—একটা প্রচলিত জোক আছে, জানো। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলা হয় যে যিশু মোটেই ইহুদি ছিলেন না। সত্যিই যিশু যদি ইহুদি হতেন, ধনকুবের বলে যে জাতির বিশ্বজুড়ে এত রমরমা, তা হলে যিশু গাধার পিঠে চেপে নাজারেথ থেকে জেরুজালেম আসবেন কেন? মার্সিডিজ-এ করে আসতেন।

তিন

জেরুজালেম-এ রোম সাম্রাজ্য শুরু হওয়ার পর এই পশ্চিমের দেওয়ালকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইহুদিদের প্রার্থনামন্দির নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সদ্য খ্রিশ্চানত্ব প্রাপ্ত শাসকরা।

বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যকালে শাসকরা সেই ধ্বংসস্তূপ জিইয়ে রেখেছিলেন। তার কোনও সংস্কার করেননি ইচ্ছেকরেই।

দণ্ডিত যিশুখ্রিস্ট নাকি অভিশাপ দিয়েছিলেন—এই জেরুজালেম একদিন ছারখার হয়ে যাবে।

যিশুর এই কুপিত অন্তিম উচ্চারণকে অবিশ্বাসী ইহুদিদের মনে চিরজাগ্রত রাখার জন্য পশ্চিমপ্রাচীরের এই ধ্বংসস্তূপ বহুদিন জেরুজালেম-এর কলঙ্ক হয়ে পড়েছিল।

১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিশ্চান ক্রুসেডার-রা উপলব্ধি করলেন যে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে এক বিশাল তীর্থস্থানের সম্ভাবনা। একদিন যে তীর্থস্থানকে বিলুপ্ত করে এই ভগ্নমন্দির তৈরি করা হয়েছিল। তা-ই আবার প্রাণ ফিরে পেতে পারে নব উন্মাদনায়। সৃষ্টি হল Templum Dominique আর Templum Solomonise—ঈশ্বরের উপাসনাস্থল।

১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে আবার যখন ইসলাম আক্রমণে পর্যুদস্ত জেরুজালেম, এই উপাসনা গৃহ ভেঙে সৃষ্টি হল হারাম আশরিফ। এখন এই পশ্চিম প্রাচীরের ওপাশে শেষ সকালের আলোয় ঝলমল করছে এল-আকতা মসজিদের স্বর্ণগম্বুজ, ইসলাম তীর্থস্থান হিসেবে নাকি মক্কা এবং মদিনার পরেই এর স্থান।

এখন এই পাঁচিলের একটা অংশ কেবল ইহুদিরা বেছে নিয়েছেন তাঁদের প্রার্থনাস্থল হিসেবে। এখানে কোনও দেবতা নেই, কোনও বিগ্রহ নেই, কোনও উপাসনা কক্ষ নেই, আছে নীল আকাশ, সাদা মেঘ, সোনা রোদ। আর তার তলায় দু'হাজার বছর আগের এক পাথুরে পাঁচিল।

যার গায়ে মাথা রেখে অগণিত মানুষ প্রার্থনা করেন রোজ, সেই পাথরের ফাঁকে ধর্মপ্রাণ ইহুদিরা গুঁজে দেন ইচ্ছাপূরণের চিরকুট। এই বিশ্বাসে, সেই এই প্রাচীন পাথরের দেওয়াল, যে দেখেছে ইতিহাসের এত ওঠাপড়া, এত রক্তক্ষয়, যে দেখেছে যুদ্ধের রাত্রি, শান্তির সকাল—সে ঠিক তাদের এই নিত্যবঞ্চিতদের আকুতি পৌঁছে দেবে তাদের ঈশ্বরের কাছে।

চাতালটা পাথরের, সেখানে নামলে মাথায় রুমাল বেঁধে নেওয়াটাই রীতি। মোটি আমার হাতে একটা কাগজের টুকরো গুঁজে দিল। বলল,

—তোমার মনের যা ইচ্ছে এই কাগজটাতে লেখো, তারপর ওই পাথরের কোনও একটা ফাঁকে গুঁজে দাও। দেখবে তোমার ইচ্ছে ঠিক ফলে যাবে।

আমি তর্ক করতে যাচ্ছিলাম যে, যে ইহুদিদের অন্তর্যামী আমার বাংলা অক্ষর পড়ে, আমার মনোকামনা বুঝতে পেরে যদি সেটা পূরণ করার ব্যবস্থাও করতে পারেন: তাহলে আমি একটা খালি সাদা পাতা গুঁজে দিলেও তো তাঁর বুঝে নেওয়ার কথা।

দেওয়ালের গায়ে অজস্র কপাল, ফেট্টি বাঁধা মাথা অবুঝ আকুতিতে মগ্ন। দু'হাজার বছর আগের সেই দেওয়ালের গায়ে মাথা রাখলাম। কোনও প্রার্থনায় নয়, আকুতিতে নয়, ইচ্ছেয় নয়—আপনিই যেন চোখ দু'টো বুজে এল।

চোখ খুলতেই দেখি মা। পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

—কী বললি?

একটু আমতা আমতা করলাম,

—চাইলেই যেন তোমায় দেখতে পাই। কথা বলতে পারি তোমার সঙ্গে,

—সেটার জন্য আমার ওপর ভরসা নেই। ঠাকুর ডাকতে হল?

রৌদ্রতপ্ত চাতালে পা ফেলতে ফেলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম আমরা মা আর ছেলে।

ধীরে ধীরে আমাদের চারপাশটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। একদল জোব্বা পরা দাড়িওয়ালা মানুষ বসে আলোচনা করছেন, চকখড়ি দিয়ে আঁক কাটছেন মাটিতে, অন্য একদিকে শেকল বাঁধা অনেকগুলো মানুষ—ক্রীতদাস সওদা হচ্ছে, প্রাচীন জেরুজালেমে। পাখির হাট বসেছে আর একদিকে সেখানে দাঁড়ের মধ্যে বিচিত্রবর্ণ কাকাতুয়া। হঠাৎ পিছনের ধ্বংসস্তূপ বেয়ে ভেসে এল কুলকুল শব্দ।

পেছন ফিরে দেখি—ওমা! একটা গোটা নদী এল কোত্থেকে। মা-ই চিনিয়ে দিল—সরযূ।

আর তার তীর তীরে কোনও এক ভগ্নদেউলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন দু'জন চেনা-অচেনা মানুষ।

দুই রাজা। একজন মহাকাব্যের, একজন ইতিহাসের। ইক্ষাকু বংশের রাম আর মুঘল বাদশা বাবর।

২২ জুন, ২০০৮

কলকাতায় প্রথম যখন ফোন করে অলোক রাজ, জেরুজালেম-এর দ্রষ্টব্য নানা কিছুর মধ্যে বারবার হলোকস্ট মিউজিয়ম-এর নামটা ফিরে আসছিল, আমি সত্যিই অতটা মন দিয়ে খেয়াল করিনি।

আমার দর্শন তালিকায় এর পর হলোকস্ট মিউজিয়ম রয়েছে শুনে এবার একটু মনোযোগী হলাম।

মহাযুদ্ধের সময় হিটলার-এর নেতৃত্বে যে বিশাল ইহুদি নিধনযজ্ঞ হয়েছিল, তারই ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে নানা স্মারক, ছবি, উদ্ধৃতি, ফিল্ম-এর অংশবিশেষ দিয়ে তৈরি এই মিউজিয়ম।

আমার এ ধরনের মিউজিয়ম দেখলে খুব মনখারাপ হয়ে যায়, তারপর সারা দিনটা কেমন যেন একটা বিশ্রী অবসাদের মধ্যে কাটে। ফলে, আমার আর এই মৃত্যুর মিউজিয়ম দেখতে তেমন ইচ্ছে করছিল না।

একবার লন্ডন-এ ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলাম মনে আছে। আমি আমার বন্ধু সঙ্গীতা আর শৌমিল্যদের বাড়িতে ছিলাম। সঙ্গীতা, মানে বুবু, আমাকে মিউজিয়ম-এর সামনে নামিয়ে দিয়ে নিজের কাজে এগিয়ে গেল।

আমার ইচ্ছে ছিল সারাটা দিন মিউজিয়মেই কাটাব।

মিশরের বিভাগটায় কত কিছু দেখার আছে। আর আমার যেহেতু বরাবরই প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আলাদা একটা আগ্রহ, আমি প্রথমেই মিশরের বিভাগটাতে ঢুকলাম। তখন বেলা এগারোটা হবে।

মন দিয়ে দেখছি। কত মামির সারি, রাজাদের পোষা বেড়াল, বাজপাখি, কাকাতুয়া—তাদেরও মামি। তার ছোট্ট কফিন, তেমনই যত্ন করে ছবি আঁকা, নকশা কাটা।

বেলা তিনটের সময় শরীরটা কেমন যেন আনচান করতে লাগল। কেমন একটা ঝিমঝিমে গা-বমি বমি ভাব।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, টানা অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ ঘরের মধ্যে আছি,

হয়তো তাই শরীরটা খারাপ লাগছে। বাইরের হাওয়ায় গেলে ঠিক হয়ে যাবে।

বাইরে এসে মিউজিয়ম-এর সিঁড়ির ধাপে বসেছি। বাইরে লোক চলাচল করছে। রাস্তায় চলন্ত গাড়ি, কোনও একটা স্কুল থেকে অনেক বাচ্চা এসেছে মিউজিয়ম দেখতে—তাদের টুকটুকে লাল সোয়েটার ছেয়ে আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ম-এর চাতাল।

আমি ওখানে, ওই সিঁড়িতে বসেই, হড়হড় করে বমি করে ফেললাম।

নিজেও বুঝিনি, এতক্ষণ পুরনো সভ্যতা দেখার লোভে, এত জীবন্ত শবদেহঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে মৃত্যু, নাকি মৃত্যুর অভিঘাত, এসে আচ্ছন্ন করছিল শরীর-মন। ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসাতে, বাইরের জীবনের স্পর্শ যেন সেই অবসাদকে বেরনোর পথ করে দিল। মৃণালদার (সেন) 'একদিন প্রতিদিন' ছবির দৃশ্যটা জ্যান্ত হয়ে ফিরে এল চোখের সামনে—যেখানে নিখোঁজ মেয়েটির দাদা মর্গে গিয়ে অনেক মৃতদেহ দেখার পর বাইরে এসে বমি করে ফেলে।

পুরনো সেই অভিজ্ঞতার কারণেই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল আবার একটা মৃত্যুর দেশে গিয়ে পৌঁছতে। মৃদু একটা আপত্তি করলাম।

—না, হলোকস্ট মিউজিয়মটা বাদ দিই। আমরা নয় গ্যালিলি উপত্যকাটা দেখে নিই না। আপাতত একটা ইতিহাসের মধ্যে আছি।

বেশ কড়া উত্তর এল আভিভার কাছ থেকে,

—কেন, হলোকস্ট-টা কি ইতিহাস নয়?

—হ্যাঁ সে তো বটেই! কিন্তু...

—কিন্তু কীসের? যিশুর মৃত্যুটা ইতিহাস, আর হলোকস্ট ইতিহাস নয়?

এবার একটু রাগই হল আমার।

—আমি তো সে কথা বলিনি। কিন্তু আমি কোন ইতিহাসটা দেখব, সেটা তো আমার ব্যাপার।

কোনও সদুত্তর এল না। কিছুক্ষণ পর ফোন এল অলোক রাজ-এর।

—তুমি নাকি হলোকস্ট মিউজিয়ম দেখবে না বলেছ?

—হ্যাঁ। কেন বলো তো?

টেলিফোনের ওপাশে অলোক রাজ-এর আমতা আমতা

—পনেরো মিনিট একটু ঘুরে যাও না। সব ব্যবস্থা করা আছে। ওখানে একজন অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য।

—আমি তো কোনওদিন বলিনি যে, আমি হলোকস্ট মিউজিয়ম দেখতে চাই। তাহলে আমার জন্য কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার মানেটা কী?

অলোক এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—আসলে কী জান? এটা তো একটা ডিপ্লোম্যাটিক ভিজিট। আর ইজরায়েল-এর মানুষরা এই হলোকস্ট মিউজিয়ম নিয়ে একটু বেশি সেনসিটিভ। ফলে তুমি যদি একেবারে না যাও, তাহলে হয়তো ওদের একটু খারাপ লাগবে।

আমি তর্কটাকে সহজেই এই বলে বাড়াতে পারতাম, যে আমি কোনও 'ডিপ্লোম্যাটিক ভিজিট'-এ আসিনি। আমি একজন ছবি করিয়ে, আমি আমার ছবি নিয়ে এসেছি এদেশে। আর কোনও দেশ আমাকে ঠিক করে দিতে পারে না যে, আমি আমার ভ্রমণের আনন্দ তার দেশের কোন জায়গা থেকে আহরণ করব...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু মনে হল, থাক! এটা নিয়ে আর কথা না বাড়ানোই ভাল। বললাম

—ঠিক আছে, যাচ্ছি, ওঁদের বলে দাও। তবে, আমার ভাল না লাগলে আমি চলে আসব, ওঁরা যেন কিছু মনে না করেন।

ফোন শেষ করে হোটেল লবিতে পা রাখতেই দেখি মুখ শুকনো করে বসে আছে মোটি, আমার সেই গাইড মোটি রাস। আমি বললাম

—চলো।

শুকনো গলায় মোটি জিগ্যেস করল,

—কী? ডেড সি?

—না। হলোকস্ট মিউজিয়ম। তাই তো কথা হল। মোটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিমেষে,

—দাঁড়াও। একটা ফোন করে ট্যাক্সিটা ডেকে নিই।

দুই

শ্রাবণ মধ্যাহ্নের রোদে ট্যাক্সিটা এসে থামল একটা বিশাল ছড়ানো আধুনিক নকশার বাড়ির কাছে।

বাড়ির স্থাপত্যকল্পনার মধ্যে একটা সংযত, শীলিত প্রসারতা আছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় কোনও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষ। বা, আরও ছড়ানো কোনও একটা ছাত্র সম্মিলনাগার।

মিউজিয়ম কথাটা বললেই আমরা কলকাতার যাদুঘর থেকে শুরু করে সর্বত্রই কেমন যেন বিশাল বিশাল থাম আর অতিকায় করিডর সম্বলিত বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি বুঝি, এটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মিউজিয়মটার নাম য়াদ ভাশেম (Yad Vashem)। য়াদ কথাটা আমাদের চেনা। উর্দু 'ইয়াদ'এরই সমার্থক—স্মৃতি। 'ভা' মানে এবং। 'শেম' হল নাম।

পোল্যান্ডের অস্টউইশ্চ-এর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছারপোকার মতো মারা গিয়েছিল কত

অগুন্তি নামহীন ইহুদি মানুষ—য়াদ ভাশেম, এই অনামী মানুষগুলির যতটা বিশদভাবে পারা যায়, ছবি সংগ্রহ করেছে। এবং কেউ না কেউ পরবর্তীকালে চেষ্টা করে সেই ছবিগুলো থেকে বার করেছে নিহতদের নাম, পরিচয় বা আরও অন্যান্য তথ্যসূত্র।

প্রধান চত্বরটার নাম Hall of Names। 110,000-এর বেশি ছবি, চিরকুট, চিঠি, বা সেই কুখ্যাত নিধনযজ্ঞ সম্পৃক্ত অন্য কোনও ব্যক্তিগত স্মৃতি সম্ভারই কেবল এই সংগ্রহশালায় দ্রষ্টব্য।

বুঝতে পারলাম, আমার গত দু-তিনের পরিচিত সমগ্র জেরুজালেম কেন আমাকে প্রায় জোর করে পাঠালেন এই সংগ্রহশালা দেখতে।

আদি জেরুজালেম যেমন নিষ্ঠুরতার পথে এক করুণাবতারের যাত্রাপথ, এই য়াদ ভাশেম তেমন আজও পৃথিবী জুড়ে সমস্ত ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষদের আধুনিক তীর্থক্ষেত্র।

পুরীর মন্দিরে শুনেছি পান্ডাদের কাছে জাবদা খাতা থাকে। তীর্থযাত্রীরা সেখান থেকে বাপ, পিতামহ বা আদি পূর্বপুরুষদের নাম খুঁজে বার করে, জানতে পারে তার বংশপুরুষও কবে, কখন বা আদৌ এসেছিলেন কি না এই শ্রীক্ষেত্রে।

তেমন হয়তো এই মিউজিয়মে এসেও নেহাৎ সাধারণ কোনও দর্শনার্থীও খুঁজে পেয়ে যান তাঁর কোনও নিখোঁজ পূর্বপুরুষের সন্ধান। অজানা ছবি নাম পায়, পরিচয় লাভ করে। তারপর ধীরে ধীরে নামে, পরিচয়ে, স্মৃতিতে এবং বংশধরদের নীরব অশ্রুতর্পণের সামনে ইতিহাসে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পান কত নামহারা আত্মা।

ঢুকেই প্রথমে একটা ঘেরা জায়গায় জড়ো করা আছে অনেকগুলো বই—মাটিতে অবহেলায় স্তূপীকৃত। তখন ইহুদি লেখকদের বই পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কার্ল মার্ক্স, আইনস্টাইন, এরিখ মারিয়া রেমার্ক, টমাস মান, হ্যানস ক্রিশ্চিয়ন অ্যান্ডারসন। কেমন লাগে ভাবতে যে পৃথিবীর উজ্জ্বলতম আখরগুলো মলিন হচ্ছে চিতাভস্মে, আর সকলে সভয়ে স্মরণ করছেন ১৮২১ সালে হেনরিখ হাইনে'র সেই অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী—

আজ বই পোড়ানো দিয়ে শুরু, এবার মানুষ পোড়ানোর পালা।

ধীরে ধীরে কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে যাই। এবং যে কোনও সভ্য পৃথিবীর ভাগ্যবান নাগরিক হিসেবে ক্রমশ মাথা হেঁট হতে থাকে, হতেই থাকে, এই ভেবে যে কেবলমাত্র ধর্ম আর ধর্মের বৈষম্যের জন্য পুড়িয়ে মারা হয়েছে একটা গোটা জাতিকে আর বাকি পৃথিবী নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে থেকেছে কেবল।

কেমন যেন পরিষ্কার হয়ে যায় সব। মুহূর্তে বুঝতে পারি 'ডেড সি' না গিয়ে হলোকস্ট মিউজিয়ম যাব বললে কেন এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মোটির মুখ।

ইজরায়েলি সামরিক দপ্তর নিয়ম করে নতুন শিক্ষানবিশদের পাঠায় নিয়ম করে হলোকস্ট মিউজিয়ম ঘুরিয়ে দেখাতে। বোধহয়, মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে দিতে চায় না এই অপমানের ইতিহাস।

অল্পবয়সী কয়েকটা ছেলেমেয়ে মিলিটারি পোশাকে লাইন করে এ ঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলে চলেছেন পরিদর্শক। একবার মনে হল জিগ্যেস করি, যে, কেবল প্রতিহিংসার আগুন নিয়েই বেঁচে থাকবে এই যুবক যুবতী? তা-ই কি উদ্দেশ্য ইজরায়েল-এর সমরশিক্ষানীতির? তারপর মনে হল এতখানি অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন পার হয়ে এসে তারপরেও যদি জোর গলায় বলতে পারি যে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তবেই হয়তো আমার এই প্রশ্ন করা মানায়। সাফল্যক্রোড়ে স্থাপিত একজন শৌখিন ফিল্মমেকারের মুখে বোধহয় এই নীতির প্রশ্নগুলো হয়তো একটু বেমক্কা শোনাবে।

তিন

য়াদ ভাশেম-এ একটা অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টার আছে। সারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সেখানে বিভিন্ন ইহুদি পরিবারের ৮মিলিমিটার ক্যামেরায় তোলা পারিবারিক দৃশ্য চিত্র, বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচারের ছবি বেশির ভাগ সময়ই নাৎসি কোনও ক্ষমতা-প্রতিনিধির শুটিং থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গোটা হল অফ নেমস্ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এমন সব ছবির প্রদর্শনী তার সামনে ভিড় করে দেখছে মানুষ। বেশিরভাগই সাদা কালো ফুটেজ, কিন্তু অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ার restoration ঝকঝকে পরিষ্কার এবং অতীতের অস্পষ্টতামুক্ত।

খোঁজ নিয়ে জানলাম এই অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টারটির প্রতিষ্ঠাতা স্টিভেন স্পিলবার্গ স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সারা পৃথিবীর নানা ইহুদি ধনকুবেররা।

প্রতিটি প্রদর্শনী কক্ষেই অনবরত গৃহহারা, ভূমিহারা ইহুদি মানুষদের ছবি, বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচারের ফুটেজ ফিরে ফিরে চালানো হচ্ছে বারবার। ধরা যাক একটা আড়াই মিনিটের ফুটেজ শুরু হচ্ছে, শেষ হচ্ছে—মিনিট খানেক পর আবার শুরু হচ্ছে এবং আবার শেষ হচ্ছে, আবার...

প্রদর্শনীতে স্থিরচিত্র, স্মারকচিহ্ন, বিভিন্ন উদ্ধৃতি'র ব্লো আপ ছাড়াও চারপাশে চলছে চলমান ছবির প্রদর্শনী। অনবরত।

একদল মানুষ এটা-ওটা দেখতে দেখতে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন, দেড় বা আড়াই মিনিটের ফুটেজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বদলাচ্ছে তাঁদের মুখাভিব্যক্তি, তারপর ধীরে ধীরে প্রায় মন্ত্রাবিষ্টের মতো আবার এগিয়ে যাচ্ছেন অন্য কোনও দেয়ালে, অন্য কোনও ফিল্ম ফুটেজ সেখানে হয়তো মাঝপথে।

সেটা শেষ হয়ে তারপর আবার শুরু হচ্ছে ছবি—ততক্ষণে অন্য দর্শকদের একটা স্রোত সেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। কেবল চলন্ত ছবি, তাতে বাজনা নেই, সংলাপ নেই, এমনকী সম্পাদনাও নেই অনেক সময়, শুধুমাত্র শখে তোলা কোনও ফিল্ম ফুটেজ—তাই হাঁ করে দেখছেন

কতশত মানুষ। সত্যিই সিনেমার, চলচ্ছবির এত ক্ষমতা! আশ্চর্য।

কিছু তথ্যচিত্রও আছে এঁদের সংগ্রহে। সেগুলোর নিয়মিত প্রদর্শনী হয় একটা ছোট থিয়েটারে। উৎসাহী মানুষ সেখানেও গিয়ে ভিড় করেন।

আমি ভারত থেকে এসেছি, ছবি বানাই, শুনে অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টার-এর ডিরেক্টর আমায় কফি খেতে ডাকলেন। বেশ অমায়িক ভদ্রমহিলা, নানা গল্প করতে করতে আমায় বললেন,

—আপনি যদি এটা নিয়ে কিছু ভাবেন, আমরা কিন্তু সবসময়ই আপনার পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

অর্থাৎ আমি যদি ইহুদি জাতির এই অবিচারের ওপর ছবি করার কথা ভাবি, আমার ফান্ডিং-এর অভাব হবে না।

আমি নিতান্ত সরলভাবে, একটু বোকার মতোই বললাম,

—আমাদের দেশেও তো পার্টিশনটা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। তাই নিয়ে অনেক ভাল ভাল ছবি আছে, কাজ আছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও গুজরাত দাঙ্গা হয়েছে। আপনারা তারও কিছু তথ্য, বা পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের বৈষম্যজাত হিংসার চিহ্ন যদি চলচ্চিত্রের আকারে রাখেন, তাহলে তো একটা বিশ্ব প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়। সেটা ভাল না?

—না, না। হলোকস্ট-এর মতো ট্র্যাজেডি পৃথিবী জুড়ে একটা দেখান দেখি!

ততক্ষণে বেশ দুপুর। খাওয়াও হয়নি। কফি যেটা দেওয়া হয়েছে বেশ বিস্বাদ। বুঝলাম এঁরা হতভাগ্য, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত হয়ে থাকার মনোপলিটা হস্তচ্যুত করতে চান না। আমার গেল মেজাজটা খারাপ হয়ে।

না বললেই পারতাম, কিন্তু ভদ্রমহিলা যখন আবার জিগ্যেস করলেন যে আমার কোনও মন্তব্য, আছে কি না অডিও ভিস্যুয়াল সেন্টার সম্পর্কে, মনে হল প্রকারান্তরে উনি প্রশংসাবাক্যই খুঁজছেন। আমি শুধু বললাম

—পুরনো ফুটেজগুলো এত ঝকঝকে করে restore না করলেই বোধহয় ভাল হত। প্রথমত, তাতে একটা সময়ের ঘ্রাণ থাকত। দ্বিতীয়ত, এই কসমেটিসাইজেশন-এর ফলে ফুটেজ-এর ভেতরকার ট্র্যাজেডিও কিঞ্চিৎ কৃত্রিম লাগছে। যখন এগুলো ঘটেছিল তখন না হয় এগুলো অভূতপূর্ব, কিন্তু তার পরে তো এ নিয়ে অনেক ছবি আমরা দেখেছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠাতার 'শিন্ডলার্স লিস্ট'-ই মনে করুন না। রেস্টোর করে ছবিগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা একটু ক্ষীণ হয়েছে মনে হচ্ছে।

ভদ্রমহিলা কেমন একটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। কফির কাপ হাতে মাথা নাড়তে লাগলেন যান্ত্রিক সম্মতিতে।

বেরিয়ে যখন আসছি য়াদ ভাশেম থেকে, তখন আরেক দল সামরিক শিক্ষানবিশরা প্রতিহিংসা শিখতে ঢুকছে মিউজিয়মে। ইউনিফর্ম পরে। কুচকাওয়াজ করে।

আমি মোটিকে জিজ্ঞাসা করলাম

—আচ্ছা সত্যি কথা বল তো, কে তোমাদের সব থেকে বড় খল নায়ক—যিশু, হিটলার না সাদ্দাম হুসেন?

মোটি একটু হতভম্ব হল। তারপর কেমন যেন বোকা বোকা একটা হাসি হেসে বলল

—Why do you always have to ask such tricky questions?

২৯ জুন, ২০০৮

তোমার ছবিটা কী? ক্রাইং ফিল্ম না ফাইটিং ফিল্ম?

অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। নীল আকাশ, উঁচুনিচু পাহাড়—বেশিরভাগই রুক্ষ, যেন সবুজের আধিক্য দেখলেই চেঁছে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রস্তরগাত্র থেকে। পাহাড়ের কোল বেয়ে বালুমাটি। গাছ আছে, ছড়ানো ছেটানো।

আপাতত আমি হাইফার রাস্তায়। হাইফা আমার পরের গন্তব্য। জেরুজালেম থেকে হাইফা ঘণ্টা তিনেকের পথ।

আমার সঙ্গে ইন্ডিয়ান এমব্যাসির লোকজন আসতে চেয়েছিলেন। আমিই বারণ করলাম। কেবল একটা জিনিসই বারবার করে বলে দিয়েছিলাম। গাড়ির চালক যেন স্থানীয় হন, এবং কাজ চালানোর মতো ইংরেজি বলতে পারেন।

জেরুজালেম পিছনে ফেলে এসেছি ঘণ্টাখানেক হল। চওড়া হাইওয়ে দিয়ে রাস্তা চলেছে সোজা। বাইরের প্রকৃতি তেমন যে কিছু পাল্টে যাচ্ছে শহর ছেড়ে আসবার পর, তা নয়। কেবল বাড়িঘরগুলো অনেক কম এসেছে। আকাশের রং কেমন যেন আশ্চর্য ঘন নীল। আর তাতে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ—ছাড়া ছাড়া। হঠাৎ মনে পড়ে গেল জর্ডনের খবরের কাগজটায় স্থানীয় মাসের নাম পড়েছিলাম—শ্রাবোন। ওদের সেই শ্রাবণ কি ভাদ্রয় পা রেখেছে, আমার নিজের দেশের মতো?

নানা কথা ভাবতে ভাবতে একবার মনে হল জিগ্যেস করেই দেখি না কেন, বয়স্ক দেখতে মানুষ—হয়তো জানবেন এখানকার স্থানীয় মাসের নাম।

প্রায় যেন মনে মনে প্রশ্নটা করব বলে উশখুশ করছি, এমন সময় হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন এল সামনের সিট থেকে।

আমি বসেছি পেছনে। ছোট বাচ্চাদের পিকনিকে পাঠানোর সময় যেমন জল, টুকিটাকি খাবার

বাড়ি থেকে দিয়ে দেওয়া হয়, আমাকেও তেমন গাড়ি ভর্তি করে পটেটো চিপস-এর প্যাকেট, জলের বোতল—সব দিয়ে দিয়েছে আব্রাহাম। তা ছাড়া, আমার সঙ্গে জেরুজালেম থেকে কেনা একগাদা বইয়ের পাঁজা। য়াদ ভাশেম-এর নানা ধরনের brochure, catalogue ওদের museum bookshop থেকে কেনা হলোকস্ট-এর ওপর অনেক বই।

আমি চিরকালই বেশি বেশি জিনিস নিই সঙ্গে। লম্বা কোনও প্লেন জার্নি হলে, নতুন বই হলেই অন্তত ছ'টা সঙ্গে রাখি—যদি কোনও একটা বেশিক্ষণ পড়তে ভাল না লাগে।

ফলে আপাতত বই, ক্যাটলগ, টুকিটাকি কেনাকাটার প্যাকেট আর নানারকম খাবারের প্যাকেট জলের বোতল কাঁধের ব্যাগ দিয়ে গাড়ির পেছনের সিটটা বোঝাই করে বসে আছি আমি। আমার স্যুটকেস গাড়ির ডিকিতে। আর ফিল্মের ক্যানের দুটো বাক্সর মধ্যে একটা ডিকিতে, আরেকটা সামনের সিটে চালকের পাশে।

বাকি ছবিগুলো যেমন যেমন স্ক্রিনিং হচ্ছে, টেল-আভিভ-জেরুজালেম-হাইফা-র মধ্যে একটা দৈনিক রিলে রেস চলবে, কেবল 'দোসর' যেহেতু উদ্বোধনী ছবি, সেহেতু সেটা ওরা আমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছে, আর কোনও ঝুঁকি নেয়নি।

চৌকো একটা টিনের বাক্স দেখে আমি যে ছবি করিয়ে, সেটা বোঝবার কোনও জো নেই। আমার ধারণা, ইন্ডিয়ান এমব্যাসি থেকে যাঁরা এই ভাড়া গাড়িটি ঠিক করেছেন, তাঁরাই বোধহয় বারবার করে চালককে বলে দিয়েছেন যে, আমি ভারত থেকে আসা একজন ফিল্মমেকার। আমাকে যেন সাবধানে, সযত্নে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

—তোমার ছবিটা কী? ক্রাইং ফিল্ম না ফাইটিং ফিল্ম?

অভিনব প্রশ্ন নিঃসন্দেহে, এবার আমার একটু আমতা আমতা করার পালা।

আমি একটু থেমে থেকে জিগ্যেস করলাম,

—কেন বলছ?

—না, ইন্ডিয়ার ছবিগুলো তো তাই। হয় ফাইটিং ফিল্ম, নয় ক্রাইং ফিল্ম...

আমার চোখের সামনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল। চালকের আসনে বসে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই টিনের চৌকো বাক্সটার দিকে তাকাচ্ছেন, আর প্রায় যেন অন্তর্ভেদী মনশ্চক্ষু দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন—টিনের বাক্সটার ভেতর হয় থরেথরে সাজানো রয়েছেন গ্লিসারিনের শিশি, নয় নকল রক্তের বোতল।

দুই

আমাদের দেশের সিনেমার ইতিহাসের যে এমন একটা সংক্ষিপ্ত, সরল সারাংশ পাব ইজরায়েলের হাইওয়েতে, জেরুজালেম থেকে হাইফা যাওয়ার পথে, একজন ট্যাক্সিচালকের মুখে—ভাবিওনি কোনওদিন।

—কবে থেকে ভারতীয় ছবি দেখছ তোমরা?

—আমার ছেলেবেলা থেকে। যখন থেকে সিনেমা দেখছি।

আমার সামনের চালকের আসনে যে মানুষটি, তার মাথার সব চুল সাদা। পৃথুল গৌরবর্ণ শরীর। বয়স আনুমানিক ষাটের কাছাকাছি হবে—একটু আধটু কম বেশি। তাঁর ছেলেবেলা মানে ধরে নিচ্ছি, বছর পঁয়তাল্লিশ আগের কথা।

তার মধ্যে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইজরায়েলবাসীরা ভারতের ছবি দেখেছেন। ভারতের ছবি কথাটা নিয়ে সম্প্রতি আমি একটু মনোকষ্ট পাই। কারণ, আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিচারে ভারতীয় ছবি বলতেই মানেটা দাঁড়ায় কিন্তু মুম্বই-সিনেমা। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত এবং দক্ষিণ জুড়ে যে অত শক্তিশালী এতগুলো ফিল্ম-ইন্ডাস্ট্রি আছে, বলবার সময় সে কথাটা সবাই হয় বেমালুম ভুলে মেরে দেন, নয় জানেনই না।

ফলে, ধরেই নিলাম আমার গাড়ির চালক ভারতীয় সিনেমা বলতে মুম্বইয়ের হিন্দি ছবিই বুঝছেন।

—ক্রাইং ফিল্ম মানে। বিয়োগান্তক ছবি? মানে যেখানে নায়ক-নায়িকার মিলন হল না।

—হ্যাঁ, সেসব তো আছেই। তারপর আরও কতরকম ক্রাইং ছবি আছে না! মা আর ছেলে আলাদা হয়ে গিয়েছে, কেউ কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে, মা'র সঙ্গে হয়তো দেখাও হয়েছে—চিনতে পারছে না কেউ কাউকে।

হিন্দি ছবির এই চিরকেলে বিনোদন ফর্মুলায় আমরা এমনই অভ্যস্ত যে, এই দৃশ্যগুলো আমাদের সত্যিই আর চোখে জল আনে না। আমরা কেবল ভাবি, শেষ দৃশ্যের মিলটা ঘটবে কীভাবে। কারণ, বিচ্ছিন্ন মাতা আর পুত্র যদি হন দুর্গা খোটে এবং দিলীপকুমার বা নিরূপা রায় এবং অমিতাভ বচ্চন, কেউ কারুর পরিচয় না জেনেই বিদায় নেবেন পর্দা থেকে, এমনটা তো হয় না। ফলে মুখগুলো পর্দায় এলেই আমরা জানি যে এদের এই বিচ্ছেদ সাময়িক। আগামী ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মাতাপুত্রের মিলন দেখে আমরা বাড়ি যাব।

কিন্তু যে মানুষগুলো ইজরায়েলের এই রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে নানা আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হতে হতেও বেঁচে আছে দাঁত কামড়ে, বারবার হারিয়েছে আত্মীয়-পরিজন, তাদের কাছে হয়তো বা মাতা পুত্রের এই সিনেমার বিচ্ছেদ সত্যিই এক ভয়ঙ্কর অশ্রুবর্ষণকারী ট্র্যাজেডি।

আমি জিগ্যেস করলাম,

—আর ফাইটিং ফিল্ম?

—ফাইটিং ফিল্ম তো আমরা ইন্ডিয়ারই দেখতাম। সেগুলো আমাদের বেশ মজার লাগত। কাউবয় ছবির ফাইটিংগুলো বড্ড মারামারি। কেমন যেন সত্যি মনে হত।

—দেখতাম বলছ কেন? এখন আর দেখো না।

—আসলে ব্রুস লি আসার পর থেকে সব পাল্টে গেল।

এবার আর ভারতের সিনেমার ইতিহাস নয়। এ যেন পৃথিবীর সিনেমার বিবর্তনের এক ধারাভাষ্য।

—বললে না তো! তোমার ছবিটা কী? ক্রাইং ফিল্ম না ফাইটিং ফিল্ম?

আমি কী বলব, বুঝতে পারলাম না। বললাম,

—ক্রাইং ফিল্ম-ই বলতে পারো। তবে মা-ছেলের গল্প নয়। স্বামী-স্ত্রীর গল্প। তোমার বোধহয় তেমন দুঃখ কিছু হবে না। দ্যাখো না আজ সন্ধেবেলা। দেখানো হবে তো।

এবার আমার চালকের আমতা আমতা করার পালা। স্বয়ং ফিল্মমেকার ছবি দেখতে আসতে নেমন্তন্ন করছে, তবু তাকে না বলতে হবে। একটু লজ্জিতভাবে বলল,

—আসলে আমার আজ রাত্তিরে জেরুজালেম ফিরতে হবে। কাল সকালেই একজন প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে ন্যাজারেথ যাব। আগে থেকে বুক করা আছে।

তিন

জেরুজালেম থেকে হাইফা যাত্রার এই চালকের নাম আদিভ রোহান। আমার গোটা ইজরায়েল সফরটাতে এই এইজন খ্রিশ্চান মানুষ, যাঁর সঙ্গে আমার একটা দীর্ঘ সময় ধরে কথা হয়েছিল।

ধর্মের বিভেদ যে কোনও দেশে থাকবে না, আমরা সত্যিই একটা ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বমানবতার কথা ভাবব—এ আমার অন্তরের বাসনা হতে পারে, আমার আকাঙ্ক্ষার চিরসত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য যে অধিকাংশ সময়েই বাস্তব নয়, সে তো আমরা জানি। বিশেষ করে আমি এই মুহূর্তে আমার নিজের দেশের পরিস্থিতি দিয়েই পরিষ্কার বুঝতে পারি।

সেখানে বসে একজন খ্রিশ্চানের একজন ইহুদির প্রতি অসহনশীলতা এবং উল্টোটার ইতিহাস আমার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু দুটো মানুষের দেখার ভঙ্গি, ইতিহাসপাঠ, ঐতিহ্য সম্পর্কে হতে পারে, এটা আমি বোধহয় এত প্রত্যক্ষভাবে কখনও বুঝতে পারিনি।

আমার জানলার বাইরে তখন নীল আকাশে বিকেলের সোনালি রং। রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তর ধুয়ে যাচ্ছে সূর্যাস্তের আলোয়। আর আমার ক্রাইং ফিল্ম পাশে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন একজন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ, যাঁকে আবার এতটা পথ চালিয়ে ফিরে আসতে হবে জেরুজালেম কয়েকঘণ্টার মধ্যেই।

তখন হয়তো এই নীল আকাশ বেগনি হয়ে অন্ধকার হয়ে যাবে। রাত্রের নিকষ এসে ঢেকে দেবে বৃক্ষহীন রুক্ষতা। আর সেই পথে গাড়ি চালাতে চালাতে এই মানুষটা ফিরবে আর ভাববে যে—এই আকাশটা তার নয়, এই রাস্তাটা তার নয়, এই শরতের বাতাস তার নয়। তার জন্মভূমি তার দেশ নয়, তার বাসস্থান আসলে পরবাস।

এবং এই জন্মের মতো হয়তো ইজরায়েল থেকে ভিনদেশে—কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় চলে গিয়ে স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছেন যে ক্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী মানুষগুলো, তাঁদের সৌভাগ্যের কথা ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ফিরে আসবেন সেই রাস্তা ধরে। যে পথে একদিন গাধার পিঠে করে এই ইহুদিদের রাজ্যে এসে পৌঁছেছিলেন এক অনিন্দ্যকান্তি বিপ্লবী যুবা।

১৩ জুলাই, ২০০৮

এক

হাইফাতে দোসরের স্ক্রিনিং হয়ে গেল। পরের ঠিকানা রোশ পিনা।

হাইফায় আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল পাঁচতারা একটা হোটেলে। সাধারণত আমার বিদেশি পাঁচতারা হোটেল একেবারেই পছন্দ হয় না। একে তাতে একটা সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং থাকে। ঠান্ডা বাড়িয়ে কমিয়ে নিজের মতো করে নেবার ব্যবস্থা নেই। আর আজকাল দেখি মার্কিন কায়দায় বেশিরভাগ হোটেল থেকেই সিলিং ফ্যান উধাও। কী যে বিরক্তিকর!

হাইফার হোটেলটা, নামটা এখন মনে পড়ছে না, অনেকটা সেইরকমই। কেবল জানলার বাইরেই নীল সমুদ্রে।

নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রে। অতখানি নীল যে সত্যিই প্রকৃতির মধ্যেই আছে, কেবল ক্যালেন্ডারের ছবিতে নয়—দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র যখন দেখছি আর হাইফার এই সমুদ্রতটের হোটেলে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে আবার বুঝলাম।

কাল সন্ধেবেলা স্ক্রিনিং ভালই হয়েছে, হোটেলের কাছেই থিয়েটারটা। ফলে হেঁটেই ফিরলাম হোটেলে। দশটা বাজে, লোকজন কমে এসেছে। গাড়ির থেকেও স্কুটার, মোটরবাইকের আধিক্য বেশি। হোটেলে ঢুকে শপিং আর্কেড-এ একটু ঘোরাঘুরি করছি। দোকানপাট তখনও খোলা। এবার বোধহয় ঝাঁপ পড়বে। দু-একটা দোকানে ঢুকে দেখলাম—দোকানি মানুষরা বেশিরভাগই স্থানীয় ভাষায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। ইংরেজি বলতে পারেন না বললেই হয়।

বুঝলাম, হাইফা শহরটা এখনও তেমন করে ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠেনি। সমুদ্রের ধারের এই বন্দর নগরীতে মাঝে মাঝে বাণিজ্যিক কনফারেন্স ধরনের কয়েকটা সভা সমাবেশ গোছের হয়, তাছাড়া বোধহয় বিদেশি পর্যটক খুব একটা আসেন না। ফলে অন্য ভাষায় কথা বলবার প্রয়োজনীয়তাটা এখানকার স্থানীয় দোকানের মানুষদের একটু কম।

বেলা এগারোটা নাগাদ রওনা দিলে আড়াইটের মধ্যে রোশ পিনা পৌঁছে যাব।

একরাত্রি মাত্র ছিলাম বলে জিনিসপত্র তেমন কিছু ওলটপালট হয়নি। কেবল এখানকার সিনেমাথেক-এর ক্যাটালগগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা নতুন চটের ব্যাগে।

এবারে আরেকজন চালক। নাম বেনি লিভনে। বিশালকায়, গমের মতো গায়ের রং, বেশ বর্ষীয়ান। দেখতে অনেকটা আমাদের এখনকার দারা সিং-এর মতো। দেখলেই বোঝা যায় বিপুল শক্তি বেনির শরীরে। আমার গাবদা গাবদা স্যুটকেসগুলো এক ঝটকায় সোজা তুলে দিল গাড়ির ডিকিতে। এমনকী, আমার ফিল্মের সেই টিনের বক্স—যারা গত ক'দিন হল আমার নিত্যসঙ্গী, তাদেরও অবলীলায় ডিকিতে ভরে দিয়ে হাতটাত ঝেড়ে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসে পড়ল। তারপর পাশের সিটটা দেখিয়ে আমায় বলল—বসো।

বুঝলাম, বেনি বন্ধুত্ব করতে জানে। এর সঙ্গে নানারকম গল্প করা যাবে।

প্রথমেই বেনি আমায় জিগ্যেস করল,

—তোমার কি খুব তাড়া আছে পৌঁছবার?

আমি বললাম

—না, তেমন কিছু না। তবে সন্ধেবেলা তো আমার শো। তার আগে পৌঁছতে হবে।

—শো তো সেই আটটায়।

—হ্যাঁ। আমার ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে পৌঁছে যাবে।

বেনির গাড়ি চলতে শুরু করল। মৃদুমন্দ গতিতে আমরা সমুদ্রকূলবর্তী হাইফা শহরের হাইরাইজগুলো পার হতে হতে এক সময়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়লাম।

ভেবেছিলাম শহরের বাইরে এসে গাড়িটা বোধহয় একটু স্পিড নেবে। কোথায় কী? সেই ধীরগতি—আগের মতোই।

বেনি পাশে বসা যাত্রীর উশখুশ টের পেল সহজেই। উত্তরটা যেন ওর মুখে তৈরিই ছিল।

—আমি তো জিগ্যেস করেই নিলাম তোমার কোনও তাড়া আছে কিনা?

আমি কি করে বোঝাই যে, আমি তাড়া নেই বলেছি এই লোভে, যে ও হয়তো তাহলে আমাকে কয়েকটা নতুন জায়গা দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আর আমার তাড়া নেই মানে নিশ্চয়ই এই না যে, এটা মোটরগাড়ি না গোরুর গাড়ি—বুঝতে পারব না।

বেনি গম্ভীর মুখে বিজ্ঞের মতো জিগ্যেস করল

—আমি কেন আস্তে গাড়ি চালাই জানো?

আমার জানবার কোনও ইচ্ছে নেই। ফলে উত্তর দিলাম না। বেনি নিজেই বলল,

—ইজরায়েলে যত লোক যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি লোক মারা গিয়েছে রাস্তায়। জোরে গাড়ি চালাতে গিয়ে।

এই প্রথম কোনও ইজরায়েলবাসীর মুখে নিজের দেশের দুদর্শা নিয়ে ছলোছলো চোখ-বর্ণনা শুনলাম না। আমি অবাক হয়ে বেনির দিকে তাকালাম।

বেনির সবুজ মার্বেলের মতো চোখ দুটোতে কৌতুক চকচক করছে। আমি ফিরে তাকাতেই বেনি গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

দুই

বেনি সত্যিই মজার মানুষ। একসময়ে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ওর স্ত্রী আর ও মিলে একটা ব্যবসা করেছিল। অভিনব একটা ব্যবসা। 'On the footsteps of jesus' বলে একটা ট্র্যাভেল প্রোগ্রাম।

সারা পৃথিবী থেকে যে ভক্ত খ্রিশ্চানরা ইজরায়েল-এ আসেন, প্রোগ্রামটা মূলত তাদের জন্য। নাজারেথ শহর থেকে যিশু যেভাবে জেরুজালেম-এ এসে পৌঁছেছিলেন গাধার পিঠে চেপে। বেনির ব্যবসার প্রধান আকর্ষণটাই ছিল সেটার পুনর্নির্মাণ। মানে, খ্রিশ্চান ভক্তরা গাধার পিঠে চেপে প্রায় আনুমানিক সেই পথ ধরে জেরুজালেম-এ পৌঁছে একটা অদ্ভুত স্থানমাহাত্ম্যের স্বাদ পেতেন।

নাজারেথ থেকে জেরুজালেম-এর দূরত্ব প্রায় তিনশো কিলোমিটার। রাত্রের বিশ্রাম এবং গাধার স্পিডের একটা গড় অঙ্ক করে দেখা গিয়েছিল যে, এটা একটা দিন আট-দশেকের প্রোগ্রাম। অতএব, অনেক ভক্তরাই 'মহাজ্ঞানী মহাজন'-এর পথ ধরে, গাধার পিঠে চেপে, চিঁড়েমুড়ি বস্তায় বেঁধে, টুকটুক করে ধীরে ধীরে দিনে চল্লিশ কিলোমিটার মতো পথ অতিক্রম করে নাজারেথ থেকে জেরুজালেম পৌঁছে একটা বাড়তি পুণ্য অর্জনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বেনির ব্যবসাও বেশ ফুলেফেঁপে উঠছিল। ছ'টা গাধা দিয়ে শুরু করে বাইশটা অবধি গাধা কিনে ফেলেছে বেনি। সারাদিন ই-মেল-এ নানা দেশ থেকে বুকিং আসছে—বেনি এবং বেনির স্ত্রী—দু'জনেই ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত।

বাদ সাধল গাধাগুলোই। পুণ্যের পথে চলতে গিয়ে কি যে তাদের বেগড়বাঁই হল কে জানে। থেকে থেকে ক্ষেপে গিয়ে এমন চাঁট মারতে আরম্ভ করল যে, পুণ্যার্থীরা পড়ে গিয়ে জখম হয়ে কেটে ছিঁড়ে একশা। শেষ পর্যন্ত ইনস্যুরেন্স-এর টাকা মেটাতে গিয়ে বেনির ঢাকের দায়ে মনসা বিকোলো। সাধের ব্যবসা লাটে উঠল।

আপাতত দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। আর কোনও ই-মেল আসে না। বেনিকে ভাড়ার গাড়ি চালিয়ে সংসার চালাতে হয়। আর সংসারে এখন একচল্লিশজন প্রাণী। বেনি, বেনির স্ত্রী। আর সেই বাইশটা গাধা এখন সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে উনচল্লিশটিতে দাঁড়িয়েছে। ওরাই বেনির ছেলেমেয়ে।

তিন

রোশ পিনায় আমার থাকার জায়গা হল একটু বাড়াবাড়ি রকমের শৌখিন জায়গায়। এমনিতেই জায়গাটা পাহাড়ের ওপর। অনেকটা উচ্চতায়। তার ওপর ভাল দৃশ্যাবলি পাবো বলে আমাকে আরেকটা উঁচু পাহাড়ের ওপরকার নির্জন একটা গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে

আবার শুধু নির্জন নয়—ভয়ঙ্কর রকমের নির্জন।

সাইকো দেখার পর থেকে আমি এরকম নির্জন মোটেল বা গেস্ট হাউসে থাকতে খুবভয় পাই। কিন্তু সেকথা তো আর এখানে বলতে পারি না।

এই গেস্ট হাউসটা চালান স্থানীয় এক মহিলা। সামান্য ক'টি ঘর। প্রতিটি ঘর আলাদা আলাদা রকম সাজানো। বাড়ির বাসনপত্র, ধূপদানিতে ধূপ। মেঝেতে শৌখিন কার্পেট, আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি শুনে আবার বিছানায় একটা পিপলির কাজ করা বেডকভার বিছিয়ে রাখা। হোটেলের মতো মিনিবার নেই—একটা দামড়া পুরনো ফ্রিজ। নীল রং করা। হাতল থেকে ঘণ্টা দেওয়া একটা পাকানো রঙিন দড়ি মতো ঝুলছে—প্রথমে ভেবেছিলাম সেটার কোনও একটা ভূমিকা আছে বোধহয়। টানাটানি করে দেখলাম কোনও কিছু খুলে যায় কিনা, কোনও আলো জ্বলে ওঠে কি না—তারপর বুঝলাম যে—না। এটা নিছক গৃহসজ্জা আর কিছু নয়। পাশে একটা মিটসেফ—সেখানে বাড়িতে করা একটা প্লাম কেক রাখা আছে। পাশে ছুরি, কাঁটা। অদৃশ্য গৃহস্বামিনী আমার জন্য রেখে দিয়েছেন। একবার কেমন যেন মনে হল—হতেই তো পারে মা এখন এখানে থাকে। ইজরায়েল-এর এই রোশ পিনায়। পাহাড়ের ওপর একটা ছোট্ট বাংলোর বড় সাধ ছিল মা'র। একবার গঙ্গোত্রি গিয়ে ওখানে জমির দাম অবধি করেছিল। তারপর শুনেছি, সেখানকারই কোনও মঠের এক সাধু বলেছিলেন,

—বেটি, জমি কিনবি কেন? জমি কিনলি মানেই তো এই জায়গাটায় আটকে গেলি। আর, বাকি যে গোটা হিমালয়টা পড়ে রইল, তার কী হবে? সেই শুনে মা'র আর গঙ্গোত্রিতে জমি কেনা হল না। পাহাড়ের ওপর বাংলোও হল না। তাই বুঝি, মা চুপিচুপি, আমাদের কাউকে না বলে এইখানে, এই রোশ পিনায় এসে রয়েছে পাহাড়ের ওপর এই ছোট্ট দোতলা বাড়িটায়।

ফোন বাজল ঘরে। সিনেমাথেক থেকে ফোন করছে। ন'টায় শো শুরু। আমাকে ওরা নিতে আসবে সাড়ে আটটায়। অতএব আপাতত ঘণ্টা পাঁচেকের বিশ্রাম।

গেস্ট হাউসটা দোতলা হলেও অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা পুরোটাই একতলায়। দোতলায় গৃহকর্ত্রী নিজে থাকেন। আমার ঘরের দরজা খুললেই সামনেটা ছোট্ট একটা খাসজমি।

ঠিক ঘাসের চাতাল যেখানে শেষ হল সেখানে ফুলের ঝোপ।

হাল্কা বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফুলের ঝাড়, আর ঝকঝকে ম্যাজেন্টা বোগেনভেলিয়ার মতো ফুলের ঝোপ। তারপর ঢালজমি নেমে গিয়েছে। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাড়ির ছাদ তাতে ঢালু-পুরনো টালির ছাদ অনেক গ্রীষ্ম-বর্ষার ক্লান্তি আর তার চারপাশে পাহাড়ি কোনিফেরাস গাছের মতো ইতস্তত ঘন নানা আকার সবুজ রঙের বল্লম। কোনওটায় বা হলুদ রং ধরেছে মাথায়, কোনও সবুজকে হলুদ দেখায় রোদে।

বাড়ির ছাদ পার হলেই লম্বা লম্বা পোল। তার গায়ে কাপড় শুকোনোর দড়ির মতো বিষণ্ণ হয়ে

ঝুলে আছে ইলেকট্রিকের তার। আর যথারীতি পৃথিবীর সব দেশের মতোই এদেশের চড়ুইরা তাকে নিজেদের উন্মুক্ত দাঁত করে নিয়েছে।

তারও নীচে সমতল। খয়েরি মাটি, লালচে ঘাস, লম্বা লম্বা ঘন সবুজ বল্লম যেন থাকে থাকে গুচ্ছ করে রাখা। খেলনাবাড়ির টালির মাথা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। দূর পাহাড়ের গায়ে উঁচু উঁচু বহুতল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে দুর্গপ্রাকার মনে হয়। আরও দূরে পাহাড়ের এলানো গা। অলিভ পাতার পোশাক পরে রোদ পোয়াচ্ছে নিঝুম। দূরে, নীচের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায় যেন দেশলাই বাক্স। তবে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে তার আওয়াজ ফিরে আছে যেন সাঁজোয়া বাহিনী যুদ্ধে চলেছে পরপর। তারপরে, আরও দূরে গ্যালিলি উপত্যকা, যিশুর চারণভূমি। মরুভূমির বালুকাচ্ছন্ন বাতাসে দূরের প্রকৃতি আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, কোথায় যেন ধূসর খয়েরি উপত্যকা ইস্পাত মলিন আকাশে মিশে যায়, ভাল করে ঠাহর হয় না।

উত্তর ইজরায়েল-এর এই জায়গাটুকু ধনী ইজরায়েলিদের ছুটি কাটানোর জায়গা। অনেকটা আমাদের গোয়ার মতো।

আমি বসেছি একটা ছাউনির তলায়। ছাউনির সামনে একটা খেজুর গাছ, নীরস, শুষ্ক। ধূসর নীল আকাশের গায়ে মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে সরু সরু পাতা, যেন বৃদ্ধ অশক্ত মানুষের করুণ শিরাওঠা হাত, বয়সের ভারে নাড়তে কষ্ট হয়। নীচের উপত্যকায় গাড়ি যায় মাঝে মাঝে। এ অঞ্চলে এমনিতেই জনবসতি কম, ফলে যানবাহনের প্রাচুর্য নেই। মাঝে মাঝে যখন গাড়ি আসে সূর্যের কঠিন আলো গাড়ির ধাতব শরীরে চোখ ধাঁধানো ছটায় ঠিকরে ওঠে যেন দিনের আলোতে রৌদ্রবিচ্ছুরিত হেডলাইট।

এই উপত্যকায় গত বছরের পুরোটা সময় জুড়ে অনবরত মিসাইল বর্ষণ করেছে লেবানন। তা এমনটাই গা সওয়া হয়ে গিয়েছে এখানকার মানুষদের যে, এখানকার বাসিন্দা এক কেরালীয় ইহুদি মানুষ বলছিলেন যে, তাঁর তিন বছরের নাতনি মিসাইল বর্ষণ শুরু হলে রোজ সন্ধেবেলা ছাদে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে fireworks দেখবে বলে।

বেলা পড়ে এসেছে। পুরো পাহাড়ের ছায়া পড়েছে পশ্চিম হেলে।

একবার ঘরে ঢুকলাম। তৈরি হয়ে নিয়েই বসি। ঘরের মধ্যে মানেই তো ছোট্ট খুপরির মধ্যে বন্ধ। বাইরেটা, রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আরামের হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপরের বাতাস এখন ঠান্ডা মনোরম।

তৈরি হয়ে বাইরে যখন বেরলাম, তখন সূর্য ডুবন্ত। কমলা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত উপত্যকা জুড়ে। আর সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে বালিমাটিতে জমে থাকা সারা দিনের তাপ যেন বাষ্প হয়ে অস্বচ্ছ করেছে দৃষ্টিকে।

রাস্তা জুড়ে সোডিয়াম ভেপারের কমলা আলো সেই বাষ্প পর্দার ভিতর দিয়ে যেন জ্বলন্ত মশালের সারি। আমার চোখের সামনে জ্বলছে গ্যালিলি উপত্যকা।

আমি যেন শুনতে পাচ্ছি যিশুখ্রিস্টের অভিশাপ। সন্ধের পাখিদের আওয়াজ ছাপিয়ে আমার কানের পাশে যেন বোমার মতো ফাটছে লেবাননের মিসাইল।

শুনেছিলাম অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনা আবৃত্তি করেছিলেন ম্যাক্স মুলার।

আমার সামনে যেন মহাভারতের পাতা থেকে উঠে এলেন দ্বারকাধীশ বাসুদেব। শান্ত, প্রশস্ত ললাটে ভ্রূকুঞ্চন রেখা। চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে যদুবংশ।

আর আমি রোশ পিনা পাহাড়ের ওপর সামনের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্নের মতো বসে রইলাম। সমস্ত আকাশ জুড়ে অন্ধকার নেমে আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে গ্যালিলি উপত্যকা। শুধু চোখের সামনে জেগে রয়েছে দিগন্তজোড়া দাবানল।

একটা সময় আর পারলাম না। চোখটা ফিরিয়ে নিতেই দেখি পাশের চেয়ারে বসে আছে মা, হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। শান্তভাবে বলল,

—দেখছিস কেন ওদিকে? ভাল না লাগলে দেখিস না। চোখ বন্ধ করে থাক।

মার হাতের ওপর হাতটা রাখলাম। রোগে ভুগে ঠান্ডা, শিরা বার করা হাতখানা মা'র। কিন্তু কী নরম, কী আরামশীতল ছোঁয়া।

—একটা টুল এনে দিবি, বাপি? দ্যাখ পা-টা কেমন ফুলেছে! বেশিক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকলে মা'র পা দু'টো ফোলে।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকলাম, নিচু মতো যদি কিছু পাই।

ঘর জুড়ে কীসের যেন গন্ধ। কোনও perfume-এর বোতল উল্টে যায়নি তো। ধীরে ধীরে গন্ধটা থিতু হল। নাকের কাছে এসে চেনা দিল। কেকের গন্ধ। প্লাম কেক। মা বানাল না রোশ পিনার মহিলা।

দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখি নিঝুম আকাশ, জ্বলন্ত পৃথিবী। আর ঠিক তার সামনেটায় পিঠ দিয়ে আমাকে আগলে বসে আছে মা, শিরা বার করা রোগা হাত দু'টো তাড়িয়ে দিচ্ছে সব উত্তাপ। ঠান্ডা হয়ে আসছে পৃথিবী।

আঃ! কী আরাম! কী শান্তি।

২০ জুলাই, ২০০৮

আমাদের বয়সী বাঙালিদের কাছে 'অমৃতকুম্ভ' কথাটা কেমন যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে কালকূট শব্দটার সঙ্গে জড়িত। সে কেবল কালকূটের গরল আর অমৃতকুম্ভের বিপরীত সহাবস্থানের জন্যই নয় বোধহয়।

কালকূটের, মানে সমরেশ বসুর ছদ্ম-গদ্যকার নামে রচিত 'কোথায় পাব তারে', 'শাম্ব' বাঙালির কিছু কম জনপ্রিয় নয়। 'নির্জন সৈকতে' উপন্যাসটা অত বহুপঠিত না হলেও ছবিটা আমরা অনেকেই দেখেছি।

কিন্তু কালকূট বললে অনিবার্যভাবে যেই সাহিত্যকর্মটির নামটি এসে আছাড় মারে মনের দরজায় সেটি নিঃসন্দেহে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে। এতটা সাধারণীকরণ না করে বরং নিজের কথাটুকুই বলি—হতে পারে এটিই আমার প্রথম পড়া কালকূট উপন্যাস।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ছবিও হয়েছিল আমাদের ইস্কুলবেলায়।

কত শিল্পী, কী বড় ক্যানভাস! এই উপন্যাসটি ছবি হচ্ছে শুনেই মনে হয়েছিল এ যেন বাংলা ছবির The Passage to India। শুনেছিলাম, পরিচালক দিলীপ রায় একটা আংশিক ইউনিট নিয়ে এলাহাবাদ প্রয়াগে খোদ কুম্ভমেলা চত্বরে গিয়ে শুটিং করেছিলেন। কীরকম একটা শিহরন হয়েছিল ভেতর ভেতর। যাক্, 'কালকূট' তা হলে বাংলা সিনেমাকে টালিগঞ্জের স্টুডিও চত্বর থেকে এক অমৃতোগময় মুক্তি দিলেন।

সিনেমাটা যখন দেখলাম, তখন অবশ্যই উপন্যাসটা পড়ার রোমাঞ্চটা ফিরে আসেনি নতুন করে। লেখকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শুভেন্দুদা, প্রয়াত শিল্পী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। মনে আছে পুজোর ছুটির পর যখন ইস্কুল খুলল, তখন অনেক উত্তপ্ত আলোচনার মধ্যে এটাও জোরদার জমেছিল—যে শুভেন্দুদা না করে সৌমিত্রদা যদি পার্টটা করতেন, বেটার হ'ত কি না?

ছায়াছবি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বাংলা ছবির পর্দায় একটা বড় চমক—সে চমক নিভেও গেল একসময়ে।

ধীরে ধীরে তারকাসম্বলিত ছবিটির শিল্পীদের মুখগুলো মন থেকে মুছে গেল এক এক করে। আমি আবার উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সঙ্গেই ঘর করতে লাগলাম।

আর কালকূট-এর হাত ধরে মাঝে মাঝে অবসরে বেড়াতে যেতে লাগলাম কুম্ভমেলায়।

একদিন হঠাৎ সেই হাতটা এসে ধরল বাবা।

দুই

সালটা মনে নেই। আশির দশকের মাঝামাঝি হবে। বোধহয় ছিয়াশি সাল।

আমি তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। বিজ্ঞাপনের অফিসের তেল-সাবান ঘাঁটার দৈনন্দিনতায় কুম্ভমেলা বড় সহজলভ্য বস্তু নয়।

তবে কিনা, রেসপন্স, যেখানে আমার কর্মজীবন শুরু, এবং রেসপন্স-এর সেই সময়কার পরিবেশটা ছিল বড় খোলামেলা উদার সাংস্কৃতিক—সেখানে লেড জ্যাপলিন থেকে বৈষ্ণব পদাবলী, দু'টোরই সমান কদর ছিল।

বাবা তখন পরপর কয়েকটি তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন। শুরু হয়েছিল শিল্পী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে দিয়ে। তারপর সুন্দরবন। এবার গঙ্গা।

সুন্দরবনের ওপর একটা ছবি বানিয়েছিলেন বাবা। দু'বছর সুন্দরবনে বারবার করে ফিরে গিয়ে। আর গঙ্গার ওপর ছবিটা তৈরি হয়েছিল প্রায় পাঁচ বছর ধরে। গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর অবধি। গঙ্গার তীর ধরে নানা বসতি, নানা নগর, নানা সভ্যতা, নানা তীর্থ, নানা মেলায় বারবার করে ছুটে যেত বাবা। আমরা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলাম ভগীরথ।

একদিন হঠাৎ শুটিং-এর তোড়জোড়ের মাঝখানে আমায় একদিন ডেকে বলল,

—এবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। পূর্ণকুম্ভ। আমরা যাচ্ছি শুটিং-এ। যাবে?

আমি বোধহয় বেরচ্ছিলাম কোথাও। থমকে দাঁড়ালাম।

বসবার ঘরে বাবার ছবির মিটিং চলছে। বাবা, বাবা'র আলোকচিত্রী বিবেকদা (বিবেক ব্যানার্জি) আর আরও কেউ কেউ। সবাই যেন কে বি সি-র একটা লাখ টাকার প্রশ্ন আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে মিটিমিটি হাসছে মনে মনে।

আর, আমার তখন, কালিদাসের উমার মতো 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা।

এখন জানুয়ারি মাস—সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিমের রমরমা সময়। আমার কি এখন ছুটি পাওয়া সম্ভব?

একবার বাবার মুখের দিকে তাকালাম। আর মনে মনে ছন্দাদির মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলাম। ছন্দাদি মানে মধুছন্দা কার্লেকার। অফিসে আমাদের Creative Director। ছন্দাদিকে যত দূর জানি, প্রচণ্ড রেগে গেলেও চেয়ারে বাবু হয়ে বসে চুপটি করে নখ খাবেন। ছন্দাদির রাগের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হল—আমি এত রেগে গেলুম, যে কিচ্ছুটি বললুম না। সেটা বোধহয় সামলে নেওয়া যাবে।

ঢোক গিলে বাবাকে বললাম,

—যাব। কবে রওনা দিচ্ছ তোমরা?

তিন

ছন্দাদি নখও খেলেন না, মুখটা থুম-ও করলেন না। হেসেই বললেন

—তা যাও। ঘুরে এসো!

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিমের কথা উঠলও না। আমি তুললামও না।

জানুয়ারি মাসের দশ-এগারো তারিখ নাগাদ রাজধানী এক্সপ্রেস চেপে রওনা দিয়ে দিলাম দিল্লির উদ্দেশে।

বাবা, বাবার শুটিং ইউনিট। আর আমি সঙ্গে ফেউ। আনাড়ি, বিনে পয়সার সহকারী।

বাড়িতে রইল মা আর চিস্কু। মা'র শরীর খুব ভাল নেই। হরিদ্বারে কোথায় থাকার জায়গা পাওয়া যাবে, সেখানে ঠিকঠাক বাথরুম আছে না নেই, সেখানে গিয়ে যদি মা আবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে—তা হলে আবার বাবার দুশ্চিন্তা এবং শুটিং পণ্ড; ইত্যাদি সাত-পাঁচ ভেবে মা'র থেকে যাওয়াটাই সাব্যস্ত হ'ল। চিস্কুর পাহারায়।

বাবা এমনিতে চিরকালই শক্তসমর্থ। অত্যন্ত স্বাবলম্বী, এবং প্রচুর বেড়ানোর ফলে অত্যন্ত দক্ষ ট্র্যাভেল গাইড। তারপর বাবা এখানে পরিচালক; ইউনিটের দলপতি। তাতে করে বাবাকে যেন আরও উদ্যমী, সাহসী এবং প্রায় যুবকের মতো লাগছে।

দিল্লিতে ললিতকলা আকাদেমি এবং দিল্লি মিউজিয়মে কিছু শুটিং ছিল। গঙ্গার কয়েকটি মূর্তি—নানা যুগের। সেখানে একটা দিন গেল। তার পরদিন গাড়ি করে হরিদ্বার রওনা।

দিল্লিতে তখন বেশ ঠান্ডা। ভাড়া করা একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে দুপুর দুপুর আমরা রওনা দিলাম দিল্লি থেকে হরিদ্বারের পথে। আশা—সন্ধের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

বাবার ইউনিট ছোট—চার-পাঁচজনের। তার সঙ্গে আমি।

মনোরম না হলেও থাকার জায়গা তো একটা লাগবে। আমরা যদিও বা পারি, ক্যামেরা তো সারারাত খোলা আকাশের তলায় শুয়ে থাকতে পারে না।

সাদা অ্যাম্বাসাডর চলছে। যমুনা ব্রিজ পার হয়ে গেল।

বাবার পরনে জলপাই রঙা জ্যাকেট। সঙ্গে খয়েরি চামড়ার ব্যাগে ফিল্ম। সেই মুহূর্তে বাবার কাছে কোনটা বেশি প্রিয়—আমি না সেই ব্যাগটা, জানি না। জানলা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। বাবা হাতল ঘুরিয়ে কাচ তুলে দিল জানলার।

আর ক্ষণেকের জন্য হলেও আমার মনে হ'ল বাবা যেন বাবা নয়। আমি বেশ এতদিনের বইয়ে পড়া ফেলুদার সঙ্গে কোনও একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছি।

আমি, বাবার আনাড়ি বিনে পয়সার সহকারী তোপসে।

চার

হরিদ্বারের মূল তীর্থস্থানের নাম হর কি পিয়ারি। শহরের মাঝখানে গঙ্গাকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা একটা কুণ্ড।

এমনিতে আগে যতবার হরিদ্বারে এসেছি, বেশ শান্ত লাগত জায়গাটা। চওড়া বাঁধানো চাতাল, কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে নদীতে।

পাশের মন্দিরে গঙ্গার আরতি হত সন্ধেবেলা। আর আমরা—মা, চিঙ্কু আর আমি নদীর মাছকে খাবার দিচ্ছি পাড়ে বসে। হরিদ্বার-হৃষীকেশ-লছমনঝুলা অঞ্চলটা প্রায় কঠোরভাবে নিরামিষাশী বলে এখানে মাছ কেউ প্রায় ধরেই না—ফলে মাছগুলো বেশ মোটসোটা, অতিকায় হয়ে বেড়ে উঠেছে। এবং অবাধে খেলে বেড়াচ্ছে কুণ্ডের সরোবরে। প্রথম যখন হরিদ্বার যাই অনেক ছোটবেলায়, এই মাছগুলোকে দেখে মনে পড়েছিল অবন ঠাকুরের 'শকুন্তলা'— যেখানে জেলেদের জালে মাছ পড়বার সেই গা শিরশিরে বর্ণনা। প্রায় যেন বিশ্বাসই করতাম যে এই মাছগুলোর একটা যেন আজও পেটের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শকুন্তলার আংটি। আর সেই আংটি খুঁজে না পেয়ে শকুন্তলা রাজসভা থেকে বিতাড়িতা, অপমানিতা, আজও বসে আছে কোনও এক নদীর ধারে। কোনও জেলের কাছ থেকে দুষ্যন্তর হাতে পৌঁছে যায়নি কোনও রাজ অভিজ্ঞান; ফলে রাজাও চিরতরে ভুলে গেছেন তাঁর অরণ্যবালিকা প্রণয়িনীকে।

মেলার জন্য সেই হর কি পিয়ারি'তে থইথই ভিড়। দোকানবাজার, আলো, মাইক। সেই প্রথম মাইকে শুনলাম রেকর্ড করা গায়ত্রী মন্ত্র বা অন্যান্য সংস্কৃত শ্লোক। তখনও সেগুলো এত ব্যাপক ভাবে মোবাইলের কলার টিউনে ছড়িয়ে পড়েনি।

পরের দিন পূর্ণকুম্ভ স্নান। ফলে রাত্রির পর থেকে হর কি পেয়ারি'তে বেড়া বেঁধে দেওয়া হবে। সন্ধের আগে যে যার মতো পারছে স্নান সেরে নিচ্ছে।

একবার উঁকি মারলাম জলে। সেই যে বড় বড় মাছেরা খাবার ছড়ালেই ঘাই মারত, নির্ভীক ভাবে প্রায় যেন হাত থেকে খাবার খেত চিড়িয়াখানার হরিণ বা বাঁদরের মতো, তারা দলে দলে উধাও। বুঝতে পারলাম, অতগুলো মাইক্রোফোনে সম্মিলিত গায়িত্রী মন্ত্র তাদের বোধহয় অতটা ভাল লাগছে না।

পাঁচ

সকাল আট'টা থেকে হর কি পেয়ারিতে লোক থিকথিক করছে। বেলা ন'টা কত'য় যেন পূর্ণকুম্ভ স্নান। শুরু হবে নাগা সন্ন্যাসীদের দিয়ে।

সকাল থেকে তাদের অবিরাম মিছিল। শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে। যে নগ্নতাকে আমরা বাৎসল্যের এবং পবিত্রতার প্রতীক বলে পুজো করি, আশা করা যায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের নগ্নতাকেও সেইভাবেই দেখবার কথা আমাদের। কিন্তু পুণ্যের প্রথম সারির টিকিট পেয়েছেন যাঁরা সেই নগ্ন সন্ন্যাসীদের সদম্ভ মিছিল থেকে আমার মনে কোনও পুণ্য, পবিত্র ভাবের উদয় হ'ল না। আমার বেশ অশ্লীলই লাগল। এবং বারবার পথের ধারে দর্শনার্থী অগণিত মহিলাদের হয়ে বেশ লজ্জাও করছিল আমার। হয়তো সেটা আমার ভুল, বা অতি-প্রতিক্রিয়া। কারণ মহিলারা

ব্যারিকেডে আটকানো ভিড়ের মধ্যে থেকেই ব্যাকুল ভাবে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন নগ্ন সন্ন্যাসীদের দিকে, নিশ্চত পুণ্যের আশায়। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্ধ করে নানারকম আংটি, দুল ইত্যাদি পরে, মেক-আপের বদলে ছাই মেখে, সর্বাঙ্গে বিচিত্র উল্কি করে, বিবিধ জটাজুটের কেশবিন্যাসে বিচিত্রবর্ণ উদ্দাম মিছিল করে চলেছেন একদঙ্গল রকস্টার। আর তাদের একটু স্পর্শ করবার উদগ্রীব আকুলতা নিয়ে অপেক্ষা করছে অগণিত মহিলা ফ্যান।

পূর্ণকুম্ভ স্নানের মহালগ্নে কুম্ভের জলে প্রথম অবগাহনের অধিকার এই সন্ন্যাসীকুলের। ক্রমে ঘাটের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা প্রায় যেন ব্যূহ রচনা করে।

বাবা সকাল থেকে এসেই একটা জুৎসই জায়গা বেছে নিয়েছে ক্যামেরা বসিয়ে। তখন, আজ থেকে কুড়ি বছরেরও আগে, কোনও নিউজ চ্যানেল জন্মায়নি প্রায়। ফলে আশেপাশে যত ক্যামেরা সবই প্রায় বিদেশি চ্যানেলগুলোর। হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, একটা শ্বেতাঙ্গ জনমণ্ডলীর মধ্যে আমরাই কয়েকজন ভারতীয়।

কিছুক্ষণের জন্য হর কি পিয়ারি'র জল স্থির, যেন আয়নার মতো। কোনও দোকানে আর মাইক বাজছে না। মাছেরা কী খবর পেল?

কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। তীরে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীরা উসখুশ করছেন। মহালগ্ন এগিয়ে আসছে।

তারপর একসময়ে বিশাল একটা সমবেত রণহুঙ্কার দিয়ে সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দিলেন জলে। হর কি পিয়ারি'র আয়না নিমেষে ভেঙে চৌচির। আর সব কোলাহল ছাড়িয়ে বাবার গলা কানে এল

—ক্যামেরা।

আর, ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই মহালগ্নে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ছবি যদি করি কোনওদিন, তথ্যচিত্র করব না।

অন্তত যে ঘটনাটা পুনর্নির্মাণ করার ক্ষমতা আমার নেই, সে ঘটনাটা চোখেই দেখব কেবল সরাসরি—সেই দেখাটা ক্যামেরা দিয়ে না দেখাই ভাল।

ছয়

সন্ন্যাসীর দল স্নান সেরে উঠে গেলেন। এবার অবাধে সাধারণ মানুষের স্নানের ভিড়। সেটা চলল প্রায় গোটা দিনটা ধরে।

বাবারা তখন ঘাটের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অন্য শট নিচ্ছে। আর আমি হর কি পেয়ারি'র চারপাশটা ঘিরে আপনমনে ঘুরছি।

হঠাৎ একটা জটলা দেখে দাঁড়ালাম। না, কোনও সাধুসন্ত নয়—একটি মৃতদেহ। স্বাভাবিক

মৃতদেহ, জলে ডুবে মারা যায়নি কোনও মানুষ।

কাছেপিঠের কোনও বাড়ির কেউ মারা গেছেন, বোধহয় কিছুক্ষণ আগে। তাঁকে দাহ করবার আগে গঙ্গার ধারে নিয়ে এসেছেন বাড়ির লোকেরা।

আর এই মহাপুণ্যলগ্নে যিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন তাঁর সাক্ষাৎ স্বর্গবাস ধরে নিয়ে সেই শবদেহকে প্রণাম করছেন, তাতে মালা পরাচ্ছেন অগণিত তীর্থযাত্রী।

মৃতদেহের মাথার কাছে বসে মৃতর স্ত্রী। বয়স খুব বেশি নয় মহিলার। স্বামীর এই মহান মৃত্যু একবেলার জন্য হলেও তাঁকে সেলিব্রিটি করে দিয়েছে। কারণ শবদেহকে প্রণাম করার পরেই সেই মহিলার পায়ের কাছের মাটিতে আঙুল ঠেকিয়ে কপালে ছোঁয়াচ্ছেন প্রচুর মানুষ। মহিলা যেন এখনও টের পাননি পুরো শোকের অভিঘাতটুকু—কেমন যেন ঘোরলাগা দৃষ্টি।

মনে হল এই, যেন সেই চিরএকাকিনী শকুন্তলা। মুহূর্তের এই গৌরবটুকু যখন ঝরে যাবে প্রহরশেষে, দাহ হয়ে যাবে স্বামীর নশ্বর শরীর, মেলা ভেঙে ফিরে যাবে তীর্থযাত্রীর দল, হঠাৎ নির্জন হয়ে পড়বে হর কি পেয়ারির চাতাল—হয়তো পড়ে আসা বিকেলে বিধবাদের ভজনের জটলায় বসে নদীর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন এক অনন্ত প্রতীক্ষায়।

আর ততদিনে রাজ অভিজ্ঞান পেটের ভেতর লুকিয়ে কুণ্ডের জলে ফিরে আসবে সেই মাছের দল।

সাত

লেখাটা শেষ হয়ে গেল। এখনও ঠিক কোন বছর গেছিলাম কুম্ভমেলায়, মনে পড়ল না।

বাবা বসে আছে বারান্দায়, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম

—বাবা আমরা হরিদ্বার গেছিলাম কবে?

—সে তো অনেকবার গেছি।

—না। তোমার ছবির শুটিং-এ। কুম্ভমেলায়।

বাবা মনে করবার চেষ্টা করল। চোখ বন্ধ করলে বাবার অনেক কথা মনে পড়ে। আমি খেই ধরালাম,

—হর কি পেয়ারিতে বাবা! ওই যে অনেক মাছ...

—মাছ তো নয়, কাঁকড়া।

এবার আমার ভুরু কুঁচকালো। বাবা ধীর গলায় বলল

—কাঁকড়া? বালির তলায় বাসা।

আমি বাবার কথা বুঝতে পারছি না।

—হ্যাঁ। মেলা শেষ হয়ে গেলে আবার সমুদ্রের ধারে ফিরে আসে সব কাঁকড়া। শট নিয়েছিলাম মনে নেই?

মনে পড়ল। বাবা গঙ্গাসাগরের কথা বলছে।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

বাবা চুপ করল। বারান্দার বাইরে চোখ।

বাড়ির বিশ্বস্ত ট্র্যাভেল গাইড অমৃতযাত্রার পথ ভুলে গেছে। ভাল করে বাবার মুখটা দেখলাম। আমার ফেলুদার কপালে পৌষশেষের অনেক বলিরেখা।

পড়ে আসা আলোর মেলা ভাঙার বেলায় আসমুদ্র বালুতটে ঠিক যেন আঁচড়টি ফেলে মিলিয়ে গেছে কাঁকড়ার দল।

১৮ জানুয়ারি, ২০০৯

সাধারণত লাউঞ্জ-এ এনে বসানো বা হ্যান্ড ব্যাগেজ এরোপ্লেন অবধি বয়ে নিয়ে যাওয়ার চলটা কেবল কিংফিশার এয়ারলাইন্স-এর বিমানকর্মীদের মধ্যেই দেখেছি। জেট এয়ারওয়েজ-এ আমি বহুবার যাতায়াত করেছি আগে, এবং বিজনেস ক্লাসে-ই, কোনওদিন এই বাড়তি সার্ভিসটা পাইনি বললেই চলে। এবার কিনা অনেক খবরের কাগজ, বা টেলিভিশন চ্যানেল-এ আমার ডারবান যাওয়ার খবরটা ফলাও করে বেরিয়েছে, দমদমে জেট এয়ারওয়েজ-এর কাউন্টারে চেক-ইন করা মাত্রই একজন তরুণ কর্মচারী আমার hand baggage শুদ্ধু আমাকে ওদের লাউঞ্জ-এ নিয়ে গিয়ে বসালেন, আবার প্লেন ছাড়ার ঘোষণা শোনামাত্র আমাকে হ্যান্ড ব্যাগেজ-সহ প্লেন-এর সিটে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে এলেন।

কলকাতার 'বিগ মুভিজ' অফিসের অরুণ কুমার, যাঁদের প্রযোজিত 'সব চরিত্র কাল্পনিক' ছবিটি নিয়ে আপাতত আমার ডারবান-যাত্রা, তাঁকে অনেক করে বলেছিলাম যে, কলকাতা থেকে সোজা ডারবান যেতে পারলে আমার সুবিধে হয়, দিল্লি বা মুম্বই হয়ে নয়—কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সময় সংকুচিত যে-যাত্রাপ্রণালীটির ব্যবস্থা করা গেল, সেটি মুম্বই হয়ে।

২৮ জুলাই গভীর রাতে, এক অর্থে ২৯ জুলাই ভোর আড়াইটের সময়, আমার সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইন্স-এর টিকিট। ফলে আমি জেট এয়ারওয়েজ-এর দিনের শেষ ফ্লাইটটা ধরে মুম্বই পৌঁছলেও আমার দিব্যি কাজ চলে যাবে। রাত ৮.৪০এ কলকাতা ছাড়বে, মুম্বই পৌঁছনোর কথা রাত্রি ১১.১০। অরুণ একটু গুঁইগাঁই করছি যে, একটু আগের ফ্লাইটটা নিলে হয় না, আমি তীব্রভাবে নাকচ করে দিলাম। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শীতের কুয়াশা নেই—সন্ধে থেকে মুম্বই গিয়ে বসে থাকার মানেটা কী?

শেষ পর্যন্ত অরুণের আশঙ্কাই সত্যি হল। প্লেন মুম্বই এয়ারপোর্টে নামল ১২.২৮-এ। সেখান থেকে লাগেজ সংগ্রহ করে হুড়মুড় করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে, (আন্তর্জাতিক যাত্রার জন্য আবার দু-ঘণ্টা আগে চেক ইন করতে হয়), সময় মতো ভিড়ভাড় সাঁতরে চেক-ইন করাটা এক বিরাট ঝক্কি। তবু মোটামুটি ভালয়-ভালয় উতরে গেল সব।

সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইন্স-এর ২৮৫ বিমানে, ২৯ জুলাই ২০০৯, রাত দু'টোয় ঢুকে এসে বসলাম সিট নম্বর ২৪। এই আমার প্রথম আফ্রিকা-যাত্রা।

যাচ্ছি একটা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে, তবু চোখ বন্ধ করতেই ভেসে উঠল, ছোটবেলার অনেকগুলো বই আর ছবি। হাটারি, আফ্রিকান সাফারি বা বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড়। চোখ খুললাম। আমার পাশের সিটে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক মোবাইল ফোনে কথা বলছেন। একবার মনে হল—মা যদি যেতে চায়? কোথায় বসবে?

তারপর নিজের সিটের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে নিলাম—মা-বেটায় বেশ ধরে। সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইন্স-এর সিটগুলো বেশ প্রশস্ত।

দুই

প্লেন ছাড়ার আগে সাধারণত যে সাবধানবাণীগুলো দেখানো বা শোনানো হয়, এই এয়ারলাইন্স-এ সেটা বেশ নতুন।

প্রথম প্রথম যখন প্লেনে চড়তাম, একটি অদৃশ্য গলা হিন্দি এবং ইংরেজিতে অনেক বিধিনিষেধ বর্ণনা করত এবং দু'জন বিমানসেবিকা মাইম করে সেগুলো দেখাতেন, অবাক হয়ে দেখতাম আর ভাবতাম—যত দুর্যোগ বুঝি এই প্লেনে-ই হবে, নইলে জলে পড়ে গেলে কী করব—সেকথা এত ঘটা করে বলার কী আছে? এ যেন যাত্রারম্ভে অনাবশ্যক কু-ডাক। তারপর ধীরে ধীরে একসময় পুরোটা অভ্যেসও হয়ে গেল। যতক্ষণ সাবধানবাণীর অডিও-ভিসুয়াল চলছে, ততক্ষণে হয়তো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

কেবল একটা বাক্য শোনবার জন্যই ঘুমন্ত কানটাও খাড়া হয়ে থাকত। 'বিমান মে মদিরা পিনা মানা হ্যায়'। 'মদিরা'-র মতো একটা তৎসম শব্দ যে এখনও রোজ কত প্লেনে কতবার ব্যবহৃত হয়, তা-ও কয়েকজন স্কার্ট-ব্লেজার পরা ইংরিজি-মাখা কণ্ঠে। এবং এইটাই যে আমার ভারতবর্ষ সেটা ভেবে খুব মজা পাই এখনও।

এই সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইন্স-এ এইসব ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী টেলিভিশনে দেখাচ্ছে কার্টুন অ্যানিমেশনে—সাবটাইটেল দিয়ে। এবং পুরো অ্যানিমেশন ফিল্মটা যদি একটা গল্প বলে ধরা যায়, তার প্রধান নায়ক হচ্ছেন একজন ধনী, শ্বেতাঙ্গ কর্পোরেট উচ্চপদস্থ কর্মী। যিনি সব ভুল কাজ

করছেন এবং, ফলত, শাস্তিভোগ করছেন। আর যারা বুদ্ধি এবং সতর্কতার দ্বারা বিজয়ী হচ্ছেন তাঁরা সকলেই সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ যাত্রী, প্রধানত যাত্রিণী।

আমি বহুদিন পর এত মন দিয়ে একটা বিমানবার্তার গল্প এতটা উপভোগ করলাম। তাঁর মধ্যে কৌতুকরস আছে, আখ্যান-মাধুর্য আছে, চিরন্তন বর্ণ-রাজনীতি আছে—ফলে গল্পটা কেবল এই প্লেনের আমার ব্যক্তিগত দুর্যোগের সতর্কবাণী হয়ে রইল না।

প্লেন ছাড়ল সময় মতো। যে দু'জন বিমানসেবিকাকে দেখছি, তাঁদের মধ্যে একজন একটু বয়স্ক শ্বেতাঙ্গিনী, আর আমাদের দিকটাতে রয়েছেন একজন স্থূলকায়া, অল্পবয়সী কৃষ্ণাঙ্গী।

যাত্রাশুরুতেই, যখন পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় যাত্রীদের, আমার কাছে এসে আমি 'টম্যাটো জুস' খাবো শুনে, কেন জানি না আমায় একটা বাড়তি বাদামের প্যাকেট দিলেন সেই কৃষ্ণাঙ্গী। কিছুক্ষণ পর কোত্থেকে যেন একচিলতে বিটনুন নিয়ে এসে আমায় দিয়ে গেলেন একটা সাদা চিনেমাটির মাখন-বাটিতে।

পরের দিন সকালে যখন জোহানেসবার্গ পৌঁছব, তখন সেই কৃষ্ণাঙ্গী আমার কানে-কানে এসে জিগ্যেস করলেন—Sir, are you a fashion designer? আমি মৃদুস্বরে বললাম যে, আমি সিনেমা বানাই। শুনে কৃষ্ণাঙ্গী 'Ok, Ok' বলে সহাস্যে চলে গেলেন বটে—কিন্তু মনে হল কাউকে যদি আমরা রাজপুত্তুর বলে ভুল করে পরে জানতে পারি যে সে সওদাগরি অফিসের কর্মচারী, তা হলে সাধারণত মনের অবস্থাটা যেরকম হতে পারে, আমার বিটনুন-দিদির মনটা বোধহয় এখন তেমনই হয়ে আছে।

আমার জীবনের সাতচল্লিশ বছরে পা দেওয়ার একমাস আগে, আমি প্রথম আফ্রিকার মাটিতে পা রাখলাম।

জোহানেসবার্গ এয়ারপোর্টে, সকাল ৮-২০। দেশে এখন এগারোটা বাজতে দশ। গোড়ায় যখন বিদেশ যেতাম, সাধারণত দু'টো ঘড়ি থাকত। একটায় দেশের সময়, অন্যটায় স্থানীয়। স্থানীয় সময়টা কব্জিতে বেঁধে ঘুরতাম আর দেশের সময়টা ব্যাগের ভেতর টিকটিক করত অহর্নিশি।

তারপর ডুয়ালটাইম ঘড়ি কেনবার টাকা হল। একই ডায়ালে দু'টো সময় একসঙ্গে জেগে থাকত চোখের সামনে। এবারও একটা ডুয়ালটাইম ঘড়ি নিয়েছি বটে। জোহানেসবার্গে নেমে আমার রোজকার হাতঘড়িটা স্থানীয় সময়ে বদলে নিলাম, মোবাইলটা ধরে থাকল কলকাতার সকাল-দুপুর-সন্ধে।

জোহানেসবার্গে টার্মিনাল বদল। নানা ধরনের দোকানের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি অন্য

টার্মিনালে। তারই মধ্যে চোখে পড়ছে মাইকেল জ্যাকসন মার্কা চুমকি, জরির কাজ করা নানারকম জ্যাকেট, কৃষ্ণা! পুরুষরা অবলীলায় পরে ঘুরছেন। একটা কোণে অনেকগুলো চামড়ার আরামকেদারা একটু উঁচু প্ল্যাটফর্মে রাখা। খেয়াল করে দেখি তার সামনে কয়েকজন স্যুট পরা কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বসে—তাঁরা জুতো পালিশের খদ্দের খুঁজছেন। দেখলাম পাশে ছোট একটা বোর্ড; তাতে লেখা ওই চকচকে চামড়ার কেদারায় বসে জুতো জোড়া চকচকে করে নেওয়ার মূল্য ১৫ র‍্যান্ড। র‍্যান্ড এখানকার মুদ্রার নাম, এক র‍্যান্ড ভারতীয় ১৫ টাকার কাছাকাছি। মানে জুতো পালিশ করাতে কুল্লে খরচ ২২৫ টাকা। সাউথ আফ্রিকাতে জিনিসপত্রর দাম সাধারণভাবেই বেশি দেখলাম। জানি না, যেহেতু এই শহরগুলোর একটা বড় পর্যটন আকর্ষণ আছে, তার কারণেই হয়তো ডলারের মাপে হয়তো দামটা বিশেষ নজরে পড়ে না।

জোহানেসবার্গে থেকে সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইন্স-এর ডোমেস্টিক ফ্লাইট ধরে ডারবান পৌঁছবার কথা।

কলকাতা বসে অনেকেই সাবধান করে দিয়েছিল যে, ডারবান শহরটা নাকি তেমন নিরাপদ নয়। সন্ধের পর তো বটেই, দিনের বেলাতেও একা-একা হাঁটাপথে না-বেরনোই ভাল, যখন-তখন ছিনতাই হতে পারে। আমার সঙ্গে যদিও ফেস্টিভ্যাল-এর গাড়ি এবং কোনও কর্মীর থাকার কথা সবসময়ে, তবুও খবরটা পেয়ে কেমন মিইয়ে গেলাম।

ফলে সঙ্গে বেশি টাকাও নিইনি, 'বিগ মুভিজ' আমার ভিসা করানোর সময় আমাকে হাজার খানেক র‍্যান্ড দিয়েছিল, আমার ধারণা ছিল, যা-ই কেনাকাটা করি না কেন, ১৫,০০০ টাকার বেশি করব না। বহুবার বিদেশ গিয়ে গিয়ে এখন বিদেশে কেনাকাটা করার উৎসাহটা আমার অনেক কমে গিয়েছে। আগে প্রচুর ডিভিডি কিনতাম, এখন বেশিরভাগই দেশেই পাওয়া যায়। ফলে কেনার মধ্যে থাকে বই। আফ্রিকার ক্ষেত্রে এখানকার পুরনো, আদিম কাঠের বা ঝুরির জিনিস কেনার ইচ্ছে ছিল, যদি পাই, হয়তো বা পেয়েও যেতে পারি, কোনও আকর্ষণীয় মুখোশ, বা কাঠের জাদুলাঠি।

জোহানেসবার্গ এয়ারপোর্টে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ডারবান প্লেনে যখন ঢুকছি, দেখি অগুন্তি শ্বেতাঙ্গ ট্যুরিস্ট। অধিকাংশই হাফ প্যান্ট, আর বড় টুপি পরা। যেন প্লেন থেকে নেমেই জিপে উঠবে, আমার কানের ভেতর যেন হাটারির 'Pratary Elephant walk' -এর সুর বাজছে, বিভূতিভূষণের পাতায় পাতায় আছড়ে পড়ছে ছোটবেলায় নিউ এম্পায়ারে দেখা কিং সলোমন মাইন্‌স-এর চাঁদনি রাতের ছবি।

একদল জাপানি ট্যুরিস্ট প্লেনে উঠল। অল্পবয়সী একটা দল। এক-এক করে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ আমার চোখ পড়ল কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি একটি টিনটিন মার্কা ছেলের দিকে। তার চোখে একটা ঢাউস পুরনো দিনের চশমা। ঠিক যেরকম একটা চশমা আমি ব্যোমকেশ-এর জন্য অনেক খুঁজেছি। একবার প্রায় উঠে গিয়ে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম—কোথায় পেলে? আমাকে

যারা ভাল করে চেনে, তারা জানে প্রয়োজনে আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার চশমাটা খুলেও নিয়ে নিতে পারি—আমার অনেক ছবির অনেক সামগ্রী এভাবেই সংগ্রহ করা। কিন্তু উঠতে গিয়েও উঠলাম না। থাক, এক্ষুনি তো আর ব্যোমকেশ করছি না।

জোহানেসবার্গের মাটি ছেড়ে প্লেন তখন আকাশে—নীচের ধু-ধু প্রান্তর দেখে আলাদা করে আফ্রিকা বলে চেনার জো নেই।

শীতের রোদ পোয়াচ্ছে মাঠ-ঘাট-গাছ-পালা, আর ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি। আর আমি মনে-মনে ব্যোমকেশকে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে রেখে 'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এর জন্য নিজেকে মনে-মনে তৈরি করছি।

তিন

ডারবানে এসে পৌঁছলাম স্থানীয় সময়—বারোটা নাগাদ।

মারভিন বলে একজন, আদতে ভারতীয়, এখন তিন পুরুষের দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী গাড়িচালক, আমাকে নিতে এসেছেন। ঝরঝরে ব্রিটিশ ইংরেজিতে কথা বলেন—জানা গেল এখানে জন্ম-কম্ম হওয়া সত্ত্বেও এই পঞ্চাশোত্তীর্ণ মানুষটি স্থানীয় ভাষা বলতে পারেন না।

বেশ বলিয়ে-কইয়ে ভদ্রলোক। হোটেল কুড়ি মিনিটের পথ—তারই মধ্যে ডারবান শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট জায়গা দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সাহারা ক্রিকেটিং স্টেডিয়াম—ডারবানে ক্রিকেট ম্যাচগুলো এখানেই হয়। দেখতে-দেখতে মনে পড়ে গেল যে, টুম্পাই (সৃঞ্জয়) আমাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিল এই শহরের ছিনতাই-সংকট সম্পর্কে। একবার নাকি টুম্পাই আর মহারাজ (মানে সৌরভ) রাতের ডারবান-এর রাস্তায় বেরতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ-প্রহরা নিয়ে। আমি জিগ্যেস করলাম মারভিনকে—ডারবান শহরের নিরাপত্তার অভাব নিয়ে যে এত গল্প শুনেছি, সেটা কি সত্যি না অনেকাংশে অতিরঞ্জিত? মারভিন অল্পক্ষণ চুপ করে গেল। তারপর বলল,

—একা-একা না বেরনোই ভাল। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হয়। আর হাতে দামি মোবাইল বা ক্যামেরা থাকাটা বোধহয় বাঞ্ছনীয় নয়।

বুঝলাম, সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। আমার চিরকেলে অভ্যেস, নিতান্ত বাধ্য হয়ে দলে না-পড়তে হলে, একা-একা, আপনমনে শহরের একটা ম্যাপ নিয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো। নিজের মতো করে সময় নিয়ে, অন্য কাউকে বিরক্ত না-করে। বা তাদের তাগাদার তোয়াক্কা না-করে, যে কোনও রাস্তার কোণে, পার্কের বেঞ্চে বসে নিজের মতো করে জায়গাটার সঙ্গে একটা বন্ধুতা করার! বোঝা গেল—এ যাত্রায় ডারবানের সঙ্গে আমার তেমন বন্ধুত্ব হবে না।

মারভিনকে জিগ্যেস করেই ফেললাম,

—আচ্ছা শহরটা কি একা বেরনোর জন্য তেমন নিরাপদ নয়?

মারভিন সোজাসুজি উত্তর দিল, না। পাল্টা প্রশ্ন করল,

—কেন, তোমার কি বিশেষ কোথাও যাওয়ার আছে?

আমি বুঝলাম না যে আমার প্রশ্নে ও অসন্তুষ্ট, না সত্যিই আমার ভ্রমণতালিকা জানতে চাইছে!

কী উত্তর দেব ভাবছি, গাড়িটা এসে থামল একটা প্রকাণ্ড হোটেলের সামনে। হোটেল রয়্যাল। আপাতত একদিন ডারবানে এটাই আমার ঠিকানা।

(চলবে)

৩০ আগস্ট, ২০০৯

চার

ডারবান-এ 'হোটেল রয়্যাল' একশো বছরের পুরনো—এই শহরের ঐতিহ্যপূর্ণ যে কোনও স্থাপত্যের মতোই ইতিহাসের অনেকগুলো পরিচ্ছেদের সাক্ষী।

সাত-তলার যে-ঘরটিতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে তার জানলার নীচেই ডারবান বন্দর। বিকেলের চিকচিকে জলে নানাবিধ জাহাজের পাল, মাস্তুলের ছায়া-অবয়ব। এখন জুলাই মাস। আফ্রিকা বলতেই আমরা অসম্ভব যে গরম কল্পনা করে নিই, দেখলাম, তার সঙ্গে চারপাশটার কোনও মিল নেই। যদিও এয়ারকন্ডিশনড ঘরে বসে বাইরের ঠান্ডা-গরম কিছু বোঝা যায় না—তবু আমার আশ্চর্য লাগল হোটেলে কোনও পাখা নেই দেখে।

ফোন করে হাউস কিপিং-এ খবর নিয়ে জানলাম যে এই হোটেলে পাখার কোনও ব্যবস্থাই নেই—এবং এখন তো বিশেষ করে প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এখন নাকি শীতকাল! আমি তো থ।

মনে আছে, এই জুলাই মাসেই আমি সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলাম, লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ। তখন সেখানে ৪২ ডিগ্রি। এবং আমি বলেওছিলাম সবাইকে—এটা সুইজারল্যান্ড না আফ্রিকা বুঝতে পারছি না।

এবার মনে পড়ল, জোহানেসবার্গ এয়ারপোর্টে শীত শীত করছিল কেন। জোহানেসবার্গে সাধারণত ঠান্ডা বেশি পড়ে। আমি যখন ডারবান আসার সময় এয়ারপোর্টে নেমেছি, তখন নাকি ওখানকার তাপমাত্রা দুই বা তিন ডিগ্রি। যেহেতু আমরা ছোটবেলা থেকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরেই নিই যে আফ্রিকায় ঠান্ডা পড়ার কোনও অধিকার নেই, আমিও মনে-মনে ভেবেছিলাম যে, জোহানেসবার্গ বিমানবন্দরের এয়ার কন্ডিশন-টা একটু বেশি ঠান্ডা।

ডারবান-এ এসে দেখলাম, ঠান্ডাটা অতটা নেই। এখন নাকি নয় বা দশ ডিগ্রির ওপরে উঠবে

না। আমাকে ফেস্টিভ্যাল কমিটি থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে সন্ধেবেলা বেরতে হলে হাল্কা গরম-জামা সঙ্গে রাখা ভাল।

আমার আবার যেহেতু ঠান্ডা মানেই মহাফুর্তি, ভাবলাম যাক—চারদিন অন্তত কলকাতার শীতের স্বাদটুকু মিটিয়ে নিই।

আজ সন্ধেবেলা একটা ফরাসি ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার আছে—তার নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দিয়ে গেল রিসেপশন থেকে। গাড়ি আসবে পৌনে সাতটায়। তারপর ককটেল আর ডিনার। যাব কি যাব না—তাই নিয়ে একটা বিশাল দোনামনা চলছিল। মোবাইলে দেখলাম, দেশের সময় এখন রাত সাড়ে দশটা। সাধারণত এতক্ষণে আমি গভীর ঘুমে। আর সেই কথাটা মনে আসতেই সারাদিনের ক্লান্তি, ধকল, যাত্রার অনিদ্রা সব কিছু এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখের পাতায়।

ফোন তুলে রিসেপশনে জানিয়ে দিলাম যে আমি প্রিমিয়ারে যাচ্ছি না।

খাবার অর্ডার দিতে গিয়ে রুম সার্ভিস মেনু কার্ড-এ দেখলাম বাসমতী চাল এবং মাংস—এটা নাকি ভারতীয় খাবার। বাসমতী চাল আর পাঁঠার মাংস শুনে জিভে জল আসে না—এমন বাঙালিদের মধ্যে আমি পড়ি না। ফলে সেটাই অর্ডার করলাম। দেখলাম মাংসটা মন্দ নয়, কিন্তু চালটা অত্যন্ত মোটা, এবং দলা পাকানো। একবার ইচ্ছে করেছিল শেফ-কে ডেকে পাঠিয়ে বাসমতী চালের মহিমাটা একটু বোঝাই, তারপর ভাবলাম—থাক।

খাওয়া শেষ করে জানলার পর্দা টানতে গিয়ে দেখলাম, বাইরের পশ্চিম আকাশ রাঙা, জাহাজে-জাহাজে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে। একবার মনে হল—এই বন্দর থেকেই কি একসময় এইরকম জাহাজে করেই চালান হয়েছিল কতশত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ—ক্রীতদাস হয়ে?

পর্দাটা টেনে দিলাম। ঘর অন্ধকার। মোবাইলটা সুইচ অফ করতে যাব, দেখি—এখন সময় এগারোটা দশ। আর তক্ষুনি মনে হল—বাবাকে ফোন করা হল না তো, এতক্ষণে বাবা নিশ্চয়ই আমার ফোনের অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছে! আর আমার ডারবান-এর প্রথম দিনটা, আফ্রিকায় প্রথম সন্ধেটা কেমন যেন পানসে হয়ে গেল।

বেডসাইড টেবিল থেকে ঘুমের ওষুধটা হাতে নিলাম।

কেবল মনে মনে বললাম—ভেবো না বাবা, আমি ঠিক আছি।

৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

পাঁচ

রয়্যাল হোটেলের চোদ্দ তলার ওপর কফি শপ। বিশাল কাচের জানলাগুলো দেখলে মনে হয়, যেন বিরাট একটা ছাদকে কাচ দিয়ে ঘিরে দিয়েছে কেউ। সকাল ছ'টা থেকে দশটা অবধি এখানে ফেস্টিভ্যাল ডেলিগেটদের প্রাতরাশ ব্যবস্থা। তারপরে ঘরটায় চাবি পড়ে যাবে। ইচ্ছে করলেও যে জানলার ধারের একটা টেবিলে বসে নিজের মনে লেখালেখি করব, তার উপায় নেই।

নীচে সমুদ্র চিকচিক করছে সকালের আলোয়, আর গতরাত্রের ক্লান্ত জাহাজগুলো রাত্রিযাপনের পর অবসাদ ঘুচিয়ে যেন অনেক বেশি তরতাজা।

প্রাতরাশের টেবিলেই দেখা হল অনেক পুরনো পরিচিতের সঙ্গে। যে কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের এটাই সবথেকে বড় পাওনা যে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের সিনেমাতুতো আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এখানেও অনেকে ছিলেন—আগের বিভিন্ন চলচ্চিত্রোৎসবে আলাপ হওয়া সিনেমাবান্ধব। খবর পেয়েছিলাম নন্দিতা (দাশ) এসেছে, ওর ছবি 'ফিরাক' দেখানোও হচ্ছে—ওর সঙ্গে দেখা হল না।

সকালে আমার বেশ কয়েকটা প্রেস ইন্টারভিউ ঠিক করে রেখেছিলেন ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ। আমিই আপত্তি করলাম। ছবির প্রিমিয়ার আজ সন্ধেয়, ছবি না দেখে প্রেস-মিট বা কথা বলবেন আমার সঙ্গে কী করে!

অতএব প্রেস ইন্টারভিউগুলো পরের দিনে পিছিয়ে দেওয়া হল। আপাতত আমার সকালটা খালি। সেই রাত আটটায় প্রিমিয়ার, তার আগে ভারতীয় হাইকমিশন থেকে সান্ধ্যভোজের আয়োজন করা হয়েছে ভারতীয় ছবির সম্মানে—তার মানে সন্ধে সাতটা অবধি দিনটা আমার ইচ্ছাধীন।

কপালজোরে মারভিনকে পেয়ে গেলাম। মারভিন মানে সেই গাড়ির চালক, যিনি আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে নিয়ে এসেছিলেন—এক অর্থে ডারবান শহরে আমার প্রথম সুহৃদ।

ডারবান শহরের পথঘাটের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে মনে হয় কোনও ভারতীয় শহরে আছি। শুনলাম সারা পৃথিবীতে আর কোনও জায়গায় এত ভারতীয়র সমষ্টি নেই। গোটা আমেরিকায় যত ভারতীয় আছেন, কেবল ডারবান শহরটাতেই নাকি ভারতীয়র সংখ্যা তার থেকে বেশি। বেশিরভাগ পরিবারই প্রায় দু-তিন পুরুষ ধরে এখানকার টানা বাসিন্দা। জিগ্যেস করলেই বলেন, ১৮৬০ সালে নাকি তাঁদের পূর্বজরা এসেছিলেন। মনে মনে হিসেব কষলাম, ১৮৬৯ সালে গান্ধীজির জন্ম, তার প্রায় বছর নয়েক আগে থেকেই ভারতীয়রা ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তখনও ইতিহাস জানে না যে এই মাটিতেই একদিন পোঁতা হবে সত্যাগ্রহের বীজ।

গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার বাসস্থানটিকে পরে রংচং করে পর্যটন আকর্ষণ করা হয়েছে—আমাকে

সকলে বলল, গিয়ে দেখে এসো। আমার বিশেষ ইচ্ছে করল না।

মারভিনকে জিগ্যেস করলাম—

সবথেকে জনপ্রিয় দক্ষিণ আফ্রিকান কে?

মারভিন আমতা আমতা করছে দেখে আমিই জুগিয়ে দিলাম মুখে—কে? ম্যান্ডেলা?

মারভিনের কাছ থেকে একটা নির্ভীক উত্তর আশা করিনি। শান্ত স্বরে বলল,

—না। ম্যান্ডেলা নিঃসন্দেহে দক্ষিণ আফ্রিকার সবথেকে শ্রদ্ধেয় মানুষ—কিন্তু জনপ্রিয় কিনা বলতে পারব না।

বলে নিজেই বলল,

—তোমাদের গান্ধীর কথাই ধরো না।

ছয়

আফ্রিকান ট্রাইবাল আর্ট-এর ওপর আমার বরাবরই খুব ঝোঁক। হোটেলে দেখলাম একগুচ্ছ দোকানের ক্যাটালগ—নানা বিদেশি নিশ্চয়ই এখানে এসেই ওইসব দোকানে ছোটেন। ফলে দোকানগুলোর দাম চড়া হতে বাধ্য।

তবু বিশেষ একটা দোকানের নাম করে সবাই বলল,

—এখানে একবার দ্যাখো। এখানে ভাল ভাল জিনিস পাবে।

দোকানটা সস্তা, না চলনসই নাকি গলাকাটা, এ নিয়ে প্রশ্ন করতে কোনও সদুত্তর পেলাম না। বোঝা গেল এখানকার স্থানীয় মানুষ আঞ্চলিক শিল্প সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী নন, ফলে ওয়াকিবহালও নন।

উঁচু নিচু নানা গলি বেয়ে মারভিন আমাকে এনে হাজির করল সেই দোকানটির সামনে। ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস দেখলাম, কোনওটাই তেমনভাবে আমার মনে ধরল না। যে দু-একটা ধরল মারভিনই চোখ টিপে ইশারা করল, এখান থেকে না কিনতে, সমুদ্রসৈকতের রাস্তার ধারে যারা ঢেলে বিক্রি করে জিনিস, তাদের কাছে সুলভে পাওয়ার একটা আশা আছে।

প্রশ্ন করলাম,

—সেটা আগে বলনি কেন?

মারভিন-এর ম্লান উত্তর,

—ওই মাগিং-এর ভয়। মোবাইল টোবাইলগুলো গাড়িতে রেখে নেমো। ক্যামেরা আছে সঙ্গে?

বললাম, না।

মারভিন-এর আশ্বাসী উত্তর,

—তা হলে কিছু হবে না। এসো আমার সঙ্গে। আমি তো আছিই।

সমুদ্রসৈকত জুড়ে সার সার দোকানের মেলা।

রঙিন কাপড়, কড়ি এবং পুঁতির গয়না। নানারকম কাঠের মুখোশ ইত্যাদি। বিক্রেতারা

বেশিরভাগই স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গরা—তাদের মধ্যে আবার মহিলাদের সংখ্যাই বেশি।

খুব বেশি সংখ্যক দোকান নয়—কুল্লে বারো-চোদ্দটা হবে।

সকাল সকাল বিদেশি একজন পর্যটককে দেখে সকলেই আহ্লাদিত—বউনির সময় বলে কথা।

প্রায় সব ক'টা দোকান ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক ক'টা দোকান থেকে ভালমন্দ নানা জিনিস পেয়েও গেলাম।

মুখোশ, বেতের ঝাঁঝি। ছোটখাটো মূর্তি, ছবি। এবং তাছাড়া একটা তাক লাগানো জিনিস, সবক'টাই প্রায় জলের দামে।

শেষ জিনিসটি হল বেতের একটা টুপি। সন্ধেবেলায় ছবির প্রিমিয়ারে যখন পরে গেলাম, সবাই তো হাঁ।

—কী চমৎকার জিনিস! কোত্থেকে পেলে? এটা কি ইজিপ্ট-এর?

'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এ লালনের একটা গান ব্যবহৃত হয়েছে। তার কলিগুলোই ফিরে এল মনে, যেন এইসব প্রশ্নের উত্তর হয়ে,

বাড়ির পাশে আরশিনগর
সেথা পড়শি বসত করে
আহা! একদিনও-না দেখলেম তারে।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

সাত

ফিল্ম প্রিমিয়ার হয়ে গেল সন্ধেবেলা। তারপর নৈশভোজ, ইত্যাদি।

আবার পরশু স্ক্রিনিং আছে—ফলে কালকের দিনটা আমার ছুটি।

আফ্রিকায় আসব, জঙ্গল দেখব না—এ তো হয় না।

সাধারণত যে কোনও আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালেই দেখেছি আমন্ত্রিতদের জন্য একটা সংক্ষিপ্ত পর্যটনলিপি থাকে। আমি জঙ্গল দেখতে চাই শুনে ওঁরা পরের দিন, অর্থাৎ আমার খালি দিনটায়, জঙ্গল-সাফারির ব্যবস্থা রাখলেন।

ভারতীয় হাই কমিশন এবং ফেস্টিভ্যাল কমিটি যৌথভাবে আমার জঙ্গল-ভ্রমণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন যেহেতু ওঁদের লোকজনের পক্ষে আমায় নিয়ে জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব নয়, ফলে ভারতীয় হাই কমিশনের এক ভদ্রলোক, দেখা গেল তিনি আবার

বাঙালিও বটে—রজত ঘোষ, তিনিই যাবেন আমার সঙ্গে।

সবথেকে কাছাকাছি একটা জঙ্গলের খোঁজ করতে হল। উচ্চারণটা বুঝতে পারলাম না স্পষ্ট—'কাটলং' ফরেস্ট না 'কাটলা'?

ডারবান থেকে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। সকাল দশটায় বেরলে যথেষ্ট, বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব—ঘণ্টা তিনেকও যদি কাটাই, ফিরতে ফিরতে খুব বেশি হলে বিকেল পাঁচটা।

আজ সন্ধেবেলা আবার নন্দিতার ছবিটার স্ক্রিনিং। 'ফিরাক' বলে গুজরাত দাঙ্গার ওপর ওর পরিচালিত প্রথম ছবি। গতকাল সন্ধেয় ও 'সব চরিত্র কাল্পনিক'-এর স্ক্রিনিং-এ এসেছিল। এবং তখনই চুক্তি হয়েছে যে, ওর ছবিটা আমি পরের দিন দেখতে আসবই আসব। ফলে সন্ধেবেলায় ওর ছবি দেখতে যেতে হবেই হবে।

দশটায়, সময় মতোই বেরলাম আমরা হোটেল থেকে। ঘণ্টা দেড়েকের পথ। রজতবাবুর সঙ্গে নানারকম অড্ডা মারতে মারতে উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলল।

এখানে এই যে মাগিং নিয়ে একটা আতঙ্ক, সেটা নিয়ে রজতবাবুকে প্রশ্ন করতে উনি দেখলাম ভীষণভাবে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। ফলত বোঝা গেল যে, ভয়টা নেহাতই অমূলক নয়। একটু বিশদ করে চেপে ধরাতে বুঝলাম—বেকার উপার্জনরহিত কৃষ্ণাঙ্গ যুবকরা, যারা প্রায় চুরি ছিনতাই করেই বেঁচে থাকে—তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই হল ভারতীয়রা। দু'টো কারণ আছে। এক, তাদের মনের ভেতর একটা চাপা আক্রোশ কাজ করে প্রায় সবসময়ই এই ভারতীয়দের ওপর। যারা—তাদের মতে, উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদেরই জায়গায় তাদেরই নায্য উপার্জন ছিনিয়ে নিচ্ছে। দুই, শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে কিছুটা বিদ্বেষ থাকলেও বহুদিনের দাসত্বের প্রভাবে এখনও মানসিক ভাবে সাদা চামড়ার সামনে এরা কিছুটা পদানত, আর শ্বেতাঙ্গরা নাকি এদের চুরি-ছিনতাই-এর খুব একটা পরোয়া করে না। সোজা গুলি চালিয়ে দেয়। ফলে ভারতীয়রাই এদের প্রধান টার্গেট। আর এখানকার ভারতীয়রা বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে এখানে বাস করলেও শারীরিক বৈশিষ্ট্যে এখনও নিখাদ ভারতীয়ই বটে—কারণটা জানা গেল যে, চিরন্তনভাবে ভারতীয় পরিবারগুলোই পারস্পরিক ভাবে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে এই এত বছর ধরে। ফলে, ভারতীয় অবয়বে কোনও অন্য দেশীয় ভেজাল প্রবেশ করেনি। আর তাই ভারতীয় বলে চেনাটা, এবং তার সামনে গিয়ে পেটে বন্দুক ঠেকানোটা বাস্তবিকই তেমন কঠিন কাজ নয়।

কাটলা ফরেস্টের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। ছোটবেলায় শোনা 'হাটারি'-র বেবি এলিফ্যান্ট ওয়াকের সুরটা আবার যেন ফিরে এল গুনগুন করে।

আট

এই অরণ্যে সিংহ বা হাতি নেই। চিতা আছে বলেও শোনা যায় না। ফলে এই জঙ্গলটা আফ্রিকার অরণ্যানীর তালিকায় কৌলীন্যের দাবি করতে পারে না। জায়গাটাও যে বিশাল উন্মুক্ত

প্রান্তর, তা নয়, কোনওদিকে না-তাকিয়ে জিপে করে কেবল একপাক চক্কর খেয়ে আসতে গেলেও আধঘণ্টার বেশি লাগে না। কোথাও সেই লম্বা-লম্বা ঘাসওয়ালা সাভানা প্রান্তর নেই। ঘাসের জঙ্গল, মাঝে মাঝে দু-একটা গাছ। তারপর ধীরে ধীরে নজরে পড়তে লাগল এক-একজন বাসিন্দা। হঠাৎ দেখি একটা উন্মুক্ত সরোবরে একপাল জলহস্তী, কখনও বা একদঙ্গল বাইসন। জেব্রা বা জিরাফ, তারা যে কেবল 'ডিসকভারি চ্যানেল' বা চিড়িয়াখানার একচেটিয়া নয়, তারা যে এক অচেনা দেশের অজানা প্রান্তরে আমার সম্মুখবর্তী সঙ্গী—এ কথাও জানা হয়ে গেল জঙ্গল-সফরের ফাঁকে ফাঁকে। আমি যথারীতি ক্যামেরা নিয়ে যাইনি। মোবাইলে যত দূর ছবি তোলা যায়, চেষ্টা করলাম।

জিরাফের ছবি তোলা কি সোজা! সে নিজের মনে গাছের ডাল থেকে পাতা চিবোচ্ছে, আর আমি পারলে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে তবে ফোকাস করছি। ওখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম, সত্যি অতিকায় কাকে বলে!

বারবার করে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, গাড়ি থেকে নেমে ছবি না তুলতে। জঙ্গল-পুলিশের জিপ মাঝখানে এসে সাবধান করে দিয়েও গেল।

কিন্তু সেই উন্মুক্ত জঙ্গলে কোথা থেকে যেন একটা নীরব আশ্বাসবাণী ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত জুড়ে। আমি যেন জানতাম আমার কোনও বিপদ হবে না।

অনেক বন্ধুকে এসএমএস করলাম,

এই মুহূর্তে আমি জেব্রা, জিরাফ, বাইসন এবং জলহস্তীর ছবি তুলছি। সব উত্তরেই নানাবিধ উচ্ছ্বাস এল। কেবল মন্টুদা (সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা) লিখল—দেখিস, তোকে আবার যেন rare species, প্রায় extinct বলে রেখে না-দেয়। ফিরতে ফিরতে বিকেল। রজতবাবু কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীতের সিডি নিয়েছিলেন সঙ্গে। তার একটা চালিয়ে দিলেন ফেরার পথে।

পাহাড়ি উঁচু-নিচু রাস্তা বেয়ে উপচে পড়ছে গান,

—তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম
হত যে মিছে

আর আমার চোখের সামনে নত হয়ে খসে পড়ছে বেকার কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের ছুরি, বিকেলের আলোয় ভেসে যাচ্ছে গাছ-রাস্তা, অরণ্য-প্রান্তর, প্রায় যেন মনে হল ঘাড় ঘোরালেই দেখতে পাব আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই ঘাড়-উঁচু জিরাফটা।

৪ অক্টোবর, ২০০৯

যাওয়ার কথা ছিল পাহাড়ে, শেষমেশ সমুদ্দুর।

হ্যাঁ, আমার সাম্প্রতিক ছবি 'চিত্রাঙ্গদা'-র আউটডোর-এর কথা বলছি।

দৃশ্যগুলো ভাবা হয়েছিল পাহাড় ভেবে—আর বাঙালির পাহাড় মানেই তো দার্জিলিং। তারপর দার্জিলিঙে গন্ডগোল শুরু হল, এমনকী ডুয়ার্সও বাদ নেই। আমরা দুরুদুরু বুকে দিন গুনছি।

এদিকে পাহাড়-দৃশ্য বলে পোশাকআশাক যা কেনা হয়েছে সব শীতের। প্রচুর সোয়েটার, কোট, জ্যাকেট কস্টিয়ুম ট্রাঙ্ক-এ ন্যাপথেলিন চাপা পড়ে আছে বহুদিন।

আর, আমরা নানাভাবে, নানা সূত্রে খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি যে, সত্যিই দার্জিলিঙে শুটিং করা যাবে কি না।

উত্তর যা সব আসছে সবই ভাসা-ভাসা। কোনও স্থির নিশ্চয়তা নেই।

শেষ অবধি লোকেশনের আমূল পরিবর্তন। পাহাড় থেকে সমুদ্র। দার্জিলিং ছেড়ে কোণার্ক।

ততদিনে কলকাতাতে বেশ গরম। গরম পোশাক দেখলেই আমার সহকর্মী দেবপ্রিয়া 'উ-উ-ল' বলে আঁতকে উঠছে।

অতএব পুরো পোশাক-পরিকল্পনা বদলাল। দৃশ্য-ভাবনা বদলাল, এবং কেবল পাহাড়ে ভাবা কতগুলো দৃশ্য সমুদ্রের ধারে আলটপকা নেমে এসেছে—এটা যাতে মনে না হয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিত্রনাট্যে সমুদ্র এবং তার সামগ্রিক পরিবেশটুকু যত্ন করে ঢোকানো হল।

মার্চ মাসের দু'তারিখ দুপুর অবধি শুটিং করে আমরা রাতে পুরী এক্সপ্রেসে চাপলাম। গন্তব্য কোণার্ক।

দুই

সাত তারিখ রাতের মধ্যে বাকি ইউনিট এসে পৌঁছে গেল।

আমি কোণার্ক আগে একবার এসেছি কেবল দিন দেড়েকের জন্য। রীণাদির (অপর্ণা সেন) 'যুগান্ত'-র শুটিংয়ের সময়। সে স্মৃতি এই ষোলো বছরে এবং সতেরোটা ছবির ভিড়ে বড় ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

ভাগ্য ভাল, বান্টি (সঞ্জয় নাগ, যে এ-ছবিতে আমার সহযোগী পরিচালক এবং কিছুদিন আগে যার পরিচালনায় Memories In March-এ আমি অভিনয় করেছি) জায়গাটা খুব ভাল করে চেনে। 'যুগান্ত' ছবিটার সঙ্গে ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, এবং সেই সুবাদে কোণার্ক জায়গাটার বিশদ খুঁটিনাটিও ও চেনে। আর ছিল দিলীপ (দিলীপ পাত্র, আমার ছবিতে আর্ট সেটিং-এর কাজ করলেও, ও আদতে আমার বাড়ির গৃহিণী—আমার কোন সিন্দুকে কী আছে দিলীপের মতো ভাল কেউ জানে না)। দিলীপের দেশ কোণার্ক। আসার আগের দিন ওর বাড়িতে গেলাম। কত কষ্ট করে উপার্জন করে একটা পাকা বাড়ি বানিয়েছে, সেখানে ওর মা, স্ত্রী, সন্তানরা—পরলোকগত বাবার ছবি দেওয়ালে। দিলীপই বলল, আমি জানতাম না—ওর বাবার শেষ অবস্থায় আমার মা

নাকি ওকে কিছু অর্থসাহায্য করেছিল যেটা ও এখনও ভোলেনি। বারবার উঠল সে কথা।

যাক ধান ভানার কাজেই ফিরে আসি। সাত তারিখ রাতের মধ্যে সবাই এসে পৌঁছে গেল।

আট ভোর থেকে শুটিং। ভোর মানে কাকভোর। সূর্য ওঠার আগের আলোয় আমার আর অঞ্জনের (দত্ত) কতগুলো টুকরো টুকরো স্বপ্নদৃশ্য।

তিন

দার্জিলিঙের সমস্যায় যেমন ভারাক্রান্ত হয়েছিল মন, জোর করে সমুদ্রতীরে চালান করতে হল দৃশ্যগুলোকে বলে ভিতরে একটা কাঁটা ক্রমাগত খচখচ করছিল—সেদিন ভোর চারটের সময় তারাভরা আকাশের তলায় সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মনটা ভাল হতে শুরু করল।

এখন আমার কাছে কোনও অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি এসে পৌঁছলেই আমার মনে হয়, এ যেন বাবা-মা'র যুগ্ম অভিসন্ধির ফল, সে কথাও একবার উঁকি মেরে গেল মনে। পুরী এবং কোণার্ক ওদের দু'জনেরই খুব প্রিয় বেড়ানোর জায়গা ছিল।

শিল্পী বলতে আমি আর অঞ্জন। অন্ধকারের মধ্যে অভীক ক্যামেরা বসিয়ে সমুদ্রমুখী হয়ে প্রথম আলোর অপেক্ষা করছে। বান্টির মোবাইলে আবার দিক্‌নির্ণায়ক কম্পাসও আছে। তাতে করে ঠিক কোন দিকে সূর্য উঠতে পারে, তার একটা আন্দাজ পাওয়া গেল।

আমরা অপেক্ষা করছি। সাড়ে চারটে, পৌনে পাঁচটা। আলোর কোনও দেখা নেই।

অথচ হোটেল থেকে স্থানীয় সংবাদপত্র দেখে বলে দিয়েছে আমাদের যে, সোয়া পাঁচটা নাগাদ সূর্যোদয়।

পাঁচটা বাজল, সোয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা বাজল—সূর্যের কোনও দেখা নেই।

ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা ধোঁয়াটে আলো ফুটল, বুঝতে পারলাম সমুদ্র জুড়ে ঘন কুয়াশা। সেই টলটলে আলোয়—সমগ্র দৃশ্যপট যখন কেমন তরল স্বপ্নিল হয়ে আছে—তার মধ্যে আমাদের শুটিং শেষ হয়ে গেল।

সত্যি! বাবা-মা'র চক্রান্ত ছাড়া এটা আর কিছু নয়। সমুদ্রতীরে চিরাচরিত সূর্যোদয়ের চিত্রকল্পের বাইরে, পুরো দার্জিলিঙের সমস্ত কুয়াশা এনে সমুদ্রের ওপর উজাড় করে দেওয়া—এটা চাওয়ার দুঃসাহস তো আমারও হয়নি।

অভীক খুব খুশি, খুশি আমরা সকলেই। সমুদ্রতট যেন কুয়াশা মেখে আমাদের ছবির স্বপ্নদৃশ্যের প্রেক্ষাপট হবে বলে অপেক্ষা করছিল। ভোরের শুটিং শেষে যখন আমরা ঝাউবনে টেবিল পেতে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। তখন দেখি ছেঁড়া মেঘের মাঝখানে কুয়াশা কাটিয়ে সূর্যদেব কতকটা সাঁতরে উঠেছেন ওপরে।

বিকেলবেলার ঘটনাটা আরও আশ্চর্য। তখন আমার আর যিশুর একটা দৃশ্য। সেটা বাস্তব, স্বপ্ন নয়।

দুপুর তিনটে থেকে আমরা আবার সমুদ্রতটে উপস্থিত।

সর্বনাশ! একটু দূরে উপুড় হয়ে একটা নিস্পন্দ শরীর পড়ে রয়েছে। পাশে একটা হেলমেট। চারপাশে মৃত কচ্ছপের অবশিষ্টাংশ। কেমন যেন গা-ছমছমে ব্যাপার।

আমরা একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। তা হলে কি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত? কাকে জানাব? কী করব?

এসব দুর্ভাবনা-আশঙ্কার মধ্যেই এক স্থানীয় যুবক বাইকে চেপে এল। গটগট করে গেল অসাড় শরীরের কাছে। তাকে কী সব বলল, ঠেলাও মারল দু'-একবার। কিছুক্ষণ পর উপুড় অসাড় চিত হল, আরও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সোজা দাঁড়িয়ে উঠে হেঁটে চলে গেল স্থানীয় সঙ্গীর সঙ্গে। এমনকী, যাওয়ার আগে বালিতে পড়ে থাকা হেলমেটটা কুড়িয়ে নিতেও ভুলল না।

যাক, নিশ্চিন্তে শুটিং শুরু করা যেতে পারে। সমুদ্রতট তখন পড়ে আসা সূর্যের সোনালি আলোয় ভাসছে। সমুদ্র জুড়ে গলানো সোনার দাম আর আটাশ টাকা দিয়ে মাপা যাবে না।

তারই মধ্যে আমার আর যিশুর দৃশ্য। অভীক একটা দিক ঠিক করে দিল। যাতে আমাদের হাঁটবার সময় সঠিক আলোটা পাই।

প্রথম শটটা নিয়ে আমার একটু খুঁতখুঁতানি ছিল। ফলে আবার।

এবার চতুর্দিক থেকে তাড়া। আলো চলে যাবে। আবার আলোর দিকে মুখ পেতে আমার আর যিশুর হাঁটা।

মন দিয়েই অভিনয় করছিলাম, তবু ভিতরে কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি।

অভিনেতারা কেবল আলো নিতে পারে, গায়ে মাখতে পারে, আলো দেখতে পারে না, পরিচালক হিসেবে যেটা চিরকাল করে এসেছি।

আমি আলোটা দেখলাম শটের শেষে। যখন প্লেব্যাক করে দেখানো হল।

সে তো আপনারা সবাই দেখবেন। তা হলে আর পরিচালক হয়ে বাড়তি কী হল বলুন?

২৭ মার্চ, ২০১১

কোণার্ক বলতে প্রথমেই যেটা বুঝি আমরা, সেটা হল কোণার্কের সূর্যমন্দির। রাজা নরসিংহদেবের কালে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই বিরাট সূর্যমন্দির এক সময়ে হিন্দু তীর্থযাত্রী ছাড়াও প্রচুর শিল্পরসিককে আকর্ষণ করেছে, তবে মন্দির নির্মিত হওয়ার কিছুকাল পরেই সূর্যভক্তের সংখ্যা কমতে থাকে। কালক্রমে পৌরাণিক দেব-দেবীরা এসে এই

বৈদিক দেবতাকে প্রায় ব্রাত্য করে দিয়েছেন।

ফলে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কোণার্কে তীর্থযাত্রীর সমাগম কমে এসেছে। বেনারসে বেড়াতে গেলে অধিকাংশ পর্যটকই যেমন একবার সারনাথ ঘুরে আসেন, পুরীর পর্যটকরাও পারলে একবার কোণার্ক মন্দিরটা দেখে যান।

আদি মন্দিরটি এখন বিলুপ্ত। শোনা যায় ভিতরে অধিষ্ঠিত সূর্যদেবের আসল বিগ্রহটি হয়তো বা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে কোথাও আছে। কিন্তু সত্যাসত্যের কোনও প্রামাণ্য অবকাশ নেই।

কোণার্কের মূল মন্দিরটি, যার নাম রেখা—সেটি ধীরে-ধীরে ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ায় তারই নানা অংশ, যেমন সপ্তাশ্বের এখনও যে ঘোড়াগুলো অক্ষত রয়েছে, কিংবা রথচক্রগুলো অধুনা কোণার্ক মন্দিরের গায়ে স্থাপিত হয়েছে।

কোণার্কে এখন যেটাকে মন্দির বলে দেখতে পাই আমরা, সেটা বিগ্রহবিহীন।

আসলে কোণার্ক ছিল সূর্যসম্পৃক্ত অনেকগুলো ছোট-ছোট মন্দিরের সমাহার। তার মধ্যে উষার মন্দির, পূষার মন্দির ইত্যাদি ছিল বলে শোনা যায়।

আর এখন আমরা Sun Temple বলে যেটাকে দেখতে পাই, সেটা শুনেছি আদতে ছিল নাটমন্দির, জগমোহন মন্দির বলে খ্যাত।

এ-ও শোনা যায় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু বরাবর বিশ্বাস করতেন এবং নিকটজনের আসরে বারবার বলেছেন, কোণার্কের মন্দির শিল্পকার্য হিসেবে তাজমহলের থেকে বহুগুণ উৎকৃষ্ট।

দুই

আজ আমাদের শুটিং সেই সূর্যমন্দিরে। ভুবনেশ্বর থেকে একটা অনুমতিপত্র করাতে হয়। খরচ তেমন বেশি নয়।

আগের দিন লোকেশন দেখতে এসে আলোর অবস্থা, কোথায় কাজ করব ইত্যাদি ঠিক করে গিয়েছি আমি, অভীক, বান্টি (সঞ্জয় নাগ)। অঞ্জনও বেড়াতে-বেড়াতে সঙ্গে চলে এল।

মোটামুটি জায়গা দেখার পালা সাঙ্গ করে আমার ফিরছি, হঠাৎ পিছন থেকে ফিসফাস শোনা গেল,

—ওই তো ঋতুপর্ণ...ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণ...

আমি অঞ্জনের দিকে তাকালাম। অঞ্জনের মাথায় একরাশ পরচুলা—ও বোধহয় তাৎক্ষণিক সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।

বুঝতে পারলাম, আমার এতদিনকার ন্যাড়ামুন্ডু চেহারা কেবলমাত্র সদ্য-সাজানো চুলের আস্তরণে মানুষের মন থেকে ভুলিয়ে দেওয়াটা অত সহজ নয়।

আমার অনুমান প্রায় অভ্রান্ত পরিণত হল। তক্ষুনি ভেসে আসা এক মহিলাকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত চিৎকার,

—এই তো দর্শন হয়ে গেল, দর্শন হয়ে গেল।

বিশ্বাস করুন, প্রথমটায় বুঝতেই পারিনি যে এটা আমার কথা বলা হচ্ছে। তারপর পিছন-পিছন ধেয়ে আসা একটা সম্মিলিত বাংলা ভাষার কলরোল শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, একদল বাঙালি টুরিস্ট সবেগে আমার দিকে ধেয়ে আসছেন। প্রত্যেকের হাতে মন্দিরে ঢোকার টিকিট। কারও কাছে কলম নেই, আমাকে প্রায় আঙুল দিয়ে অটোগ্রাফ দিতে হবে।

ভাবলাম, ফেঁসেই যখন গিয়েছি, তখন পরচুলার আড়ালে অঞ্জনই বা বাদ যায় কেন? ডেকে বললাম,

—এঁকে আপনারা বোধহয় চিনতে পারছেন না। উনি অঞ্জন দত্ত।

সবাই অমনি সমস্বরে 'রঞ্জনা', 'বেলা বোস' করে ঝাঁপিয়ে পড়ল অঞ্জনের ওপর। আবার সেই কলম-বিভ্রাট। কেন কারও কাছে কলম নেই, তাই নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যেই বাগবিতণ্ডা শুরু হল। সেই ফাঁকে আমরাও 'কাজ আছে দেরি হয়ে যাচ্ছে' বলে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লাম।

তিন

আজ শুটিং করতে এসে দেখি গিজগিজ করছে ভিড়। আমরা সকাল-সকাল কাজটা সেরে ফেলব বলে ন'টার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। তারই মধ্যে বেড়াতে আসা অজস্র মানুষ।

আর যে কোনও শুটিংয়ের প্রধান স্টার যেহেতু ক্যামেরা, সেই যন্ত্রটি স্থাপিত হলেই কোথা থেকে যেন চুম্বক-আকর্ষণে ভিড় তৈরি হয়ে যায়।

তারই মধ্যে শুভেন, দেবপ্রিয়া, অঞ্জন, পিনাকী এবং ইউনিটের অনেকে ভিড় সরাতে মগ্ন।

আমি শট দিচ্ছি। গতকালের আলোচনা অনুযায়ী অভীকই মোটামুটি নির্দেশনার কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে।

বান্টির আজ আবার অন্য একটা ভূমিকা। ও ছবিতে একটা ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিয় করছে। ওর আজ অভিনয়ের দিন। ফলে বান্টি ভিড় সরাতে-সরাতে ঘেমে-নেয়ে কোনওরকমে মুখটা মুছে শটের জন্য এসে দাঁড়িয়েছে।

ভাবতেও মজা লাগছে যে, কত তাড়াতাড়ি ভূমিকা পাল্টে যায়। বান্টির ছবি 'মেমরিজ ইন মার্চ', এই শুক্রবার যেটা মুক্তি পেয়েছে, তাতে আমি অভিনয় করেছি। আবার তার পরেই আমার ছবিতে বান্টি ছোট-চরিত্রে হলেও অভিনেতা।

ভাবতে গিয়ে মনে-মনে হাসি পেয়ে গেল—'চিত্রাঙ্গদা'-র ইউনিটে চারজন পরিচালক। বান্টি, অভীক, অঞ্জন, আর আমি।

শুটিং চলছে। আর চারদিকের ভিড় থেকে নানারকম মন্তব্য কানে আসছে। একটা দেখলাম বেশ গোছানো,

—ও! 'চিত্রাঙ্গদা'-র শুটিং হচ্ছে!

কিন্তু আমার যেটা সব থেকে ভাল লেগেছে,

—ওই দ্যাখ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

—ভ্যাট! ও ঋতুপর্ণা কেন হবে?

—সবাই তো বলছে...

—জানে না।

—তবে এটা কে?

—ওই নতুন উঠেছে না একজন...

শুটিং শেষের পর যিশুর ওপর জনতার আক্রমণ। বেচারা পায়ে ব্যথাও পেল। আমরা যে যা গাড়ি পেলাম, উঠে পড়লাম। সোজা হোটেলে।

সূর্যমন্দির-কে ভাল করে বিদায় বলা হল না। কেবল পরদিন কাকভোরে সূর্যোদয়ের আগে ভোরের শুটিং করতে যাওয়ার পথে ঝাপসা আলোয় মনে হল এই কি উষা? সঙ্গে বেদের বর্ণনাটাও মনে পড়ল : একজন পুরুষ যেমন সুন্দরী নারীর পিছনে ধাবমান হন, সূর্যও তেমনই উষাকে অনুসরণ করেন।

বুঝলাম, সূর্য উঠতে আর দেরি নেই।

৩ এপ্রিল, ২০১১

কোণার্কের শুটিং শেষ হয়ে এল। দুপুরের মধ্যে গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়তে হবে। সন্ধেবেলা পুরী থেকে কলকাতা ফেরার ট্রেন—তারই মধ্যে নানাজনের নানারকম বায়নাক্কা।

নাটের গুরু দু'জন। সুশান্ত (পাল), সম্প্রতি কলকাতায় পুজোর থিম-শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত (সুশান্ত আমার ইউনিটের বহুদিনের সদস্য, ওর তরুণ বয়স থেকে—'চোখের বালি'-র কস্টিউম-এর জন্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে), আর সঞ্জীব (ঘোষ)—সেও এক খ্যাপাটে আলোকচিত্রী, বড় ভালবেসে নিজের কাজটা করে।

ওরা গোটা কোণার্কের দিনগুলো শুটিং শেষ হয়ে গেলেই কোথায় না কোথায় গিয়ে স্থানীয় ভাস্করদের ডেরায় পৌঁছে যেত এবং রোজ ভূরি-ভূরি মূর্তি নিয়ে ফিরত। তারপর একটা উত্তপ্ত আলোচনায় আমরা শুনতাম যে কীভাবে কোন মূর্তির দাম আটশো টাকা থেকে তিনশো করা হয়েছে, হাজার টাকা থেকে পাঁচশোয় নামিয়ে আনা গিয়েছে। মাঝে মাঝে আমার বুঝতে অসুবিধে হত, তাদের আসল আনন্দটা কি মূর্তি সংগ্রহে, না দরদাম করে বিক্রেতাদের পর্যুদস্ত করায়?

এখন সুশান্ত আর সঞ্জীব একটা ছোট জাদুঘর নিয়ে বাড়ি ফিরছে। এবং ওদের দেখাদেখি ইউনিটের অন্যান্য সকলেও ভাস্কর্যপ্রেমী হয়ে উঠেছে। বেশির ভাগই একটা গণেশ মূর্তি অন্তত চায়, কারণ সেটা নিরাপদ—তাতে ভীষণ ভক্ত-হিন্দু বলে বদনাম হওয়ার ভয় নেই, গণেশ তো আধুনিক ভারতের শহুরে সভ্যতায়, একমাত্র গদির ব্যবসাদারদের বাদ দিলে, অত্যন্ত জনপ্রিয় গৃহসজ্জা-উপযোগী শিল্পদ্রব্য হয়ে গিয়েছে।

কয়েকজনের আবার দেখলাম বুদ্ধমূর্তির ওপর লোভ। একসময় হিন্দুবাড়িতে একটা কুসংস্কার ছিল বলে শুনেছি যে বাড়িতে বুদ্ধমূর্তি রাখলে, সে সংসার সুখের হয় না। অধুনা দেখি থাইল্যান্ড-ব্যাংকক প্যাকেজ ট্যুরের দৌলতে বুদ্ধমূর্তিও সেই সাবেকি কুসংস্কার ভেঙে গৃহস্থের কাছে বেশ কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠছে।

আমি গণেশ জমাতাম ছোটবেলায় ক্লাস নাইন থেকে। কলেজের পর, গুনতিতে ১৩২টা গণেশ জমিয়ে, পর সে নেশা ছুটে গেল। আর বাবা বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে বুদ্ধমূর্তির replica নিয়ে আসতেন এবং আমাদের বাড়ির মতো সুখী বাড়ি যেহেতু আমি খুব কম দেখেছি—আলাদা করে বুদ্ধও আর এখন আমায় টানে না।

দু'টো মূর্তিই আমার সংগ্রহ করতে ইচ্ছে করে। সরস্বতী আর অর্ধনারীশ্বর। দু'টোর কোনওটাই খুব সুলভ নয়। আর, এখন হুজুগে জমাই না বলে সত্যিকারের ভাল কারুশিল্প না হলে কিনতে ইচ্ছে করে না।

সে যাই হোক, আমরা সুশান্ত এবং সঞ্জীবের নেতৃত্বে পৌঁছলাম এক মূর্তি-নির্মাণ আখড়ায়।

দু'গাড়ি শহুরে মানুষদের নামতে দেখে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা দামটা বেশ উঁচু তারে বেঁধে দিলেন। সেখান থেকে আর নামতে চাইলেন না।

সুশান্তর মহা অপ্রস্তুত অবস্থা। এতদিন ও bargaining?-এর বীরত্বের গল্প শুনিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, অথচ একটা পয়সা দাম কমছে না। এবং সবাইয়ের নীরব অভিযোগ কোথাও না কোথাও সুশান্তকে বিঁধছে। ও প্রায় আস্তিন গুটিয়ে একটা ঝগড়ায় নামল। ততক্ষণে ঘুরে-ঘুরে মূর্তিশালা দেখছি। কিছু বড় বড় অপ্সরা মূর্তি, মন্দিরগাত্র ছাড়া সাধারণত ধনীদের বাড়ির বাগানে এদের অবস্থিত দেখেছি।

অত্যন্ত সাধারণ মানের কাজ। তারই মধ্যে একটি মূর্তি বেশ পছন্দ হল। ভরাট শরীর এক নারী, বসা অবস্থায়, কাঁখের কলসি গড়িয়ে গিয়েছে, ডান হাতের তর্জনীটি কেমন বঙ্কিম যত্নে থুতনিতে ঠেকানো।

বিশাল একটা দাম হাঁকল। একা থাকলে হয়তো কিনে নিতাম। কিন্তু সারা ইউনিট, যারা চাইলেও এত দাম দিয়ে কিনতে পারবে না আর আমার ঘটনাচক্রে সে সঙ্গতিটুকু আছে—তাই আর হাত বাড়ালাম না। যদি সবাই সস্তায় মূর্তি কিনতে এসে থাকি, তা হলে সস্তায় কেনাটাই প্রধান

হোক। সেখানে টিম-ক্যাপ্টেন হয়ে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।

সেখানে সেই পড়ন্ত বেলায় মূর্তির মেলায় দাঁড়িয়ে কেমন একটা আনন্দ হল ভেতর থেকে। দু'বছর অভিনয় করার পর আবার নিজেকে বেশ পরিচালক পরিচালক মনে হতে লাগল।

১০ এপ্রিল, ২০১১

কোণার্কের মূর্তির দোকান থেকে বিফলমনোরথ দু'টি গাড়ি রওনা দিল পুরীর দিকে। তখন দুপুরের রোদ সোনালি হতে শুরু করেছে।

পুরীতে পৌঁছলাম প্রায় পাঁচটা নাগাদ। আমাদের আটটায় কলকাতা ফেরার ট্রেন। দলের অনেকেই নানারকম ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল যে পুরীতে পৌঁছে যে-যার মতো ঘুরে-টুরে বেড়াবে। শেষ অবধি সব হুজুগ একটা ইচ্ছেতেই মিশে গেল—জগন্নাথ মন্দির দর্শন।

যিশু আবার তড়িঘড়ি কলকাতায় কোন এক চেনা হোমরাচোমরাকে ফোন করে আমাদের দর্শনের ভিআইপি ব্যবস্থা করে ফেলল।

অভীক কেবল মন্দিরে যেতে অনিচ্ছুক। ও বলল,

—তোরা ঘুরে আয়। আমি বরং কফি খাই।

আমি একবার ভাবলাম অভীকের সঙ্গে থেকে যাব কি না, তারপর সবার অভিমান করা মুখগুলো দেখে মন্দির-যাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমার এক আধ্যাত্মিকা মাতামহী আমার জন্মের আগেই একটা সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন যে, মা'র প্রথম সন্তান জন্মাবে জন্মাষ্টমীর দিন, সেদিন প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি হবে। এবং আমাকে যেন ছ'বছর বয়স অবধি পুরী যেতে দেওয়া না হয়। তাঁর ভাষায় 'আমায় জগন্নাথ টেনে নেবেন।'

আমি জন্মেছিলাম জন্মাষ্টমী তিথিতে, প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে—ফলে মা-ও কেন যেন দিদিভাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর বাকি অংশটুকুও সত্যি মনে করে আঁকড়ে বসেছিল।

ক্রমশ ছ'বছর পার হল, বিপদের সীমা বারো বছরে গিয়ে ঠেকল, তারপর আঠেরো (কেন যে ছ'-এর multiple-এ আমার সর্বনাশের বছরগুলো বাড়ত, জানি না), তারপর একসময় দিদিভাই নিদান দিল কোনওদিনই পুরী না যাওয়া ভাল। বিশেষ করে জগন্নাথ মন্দিরে তো নৈব নৈব চ।

পুরী বাবা-মা'র দু'জনেরই খুব প্রিয় বেড়ানোর জায়গা। শুনেছি, পুরী বেড়াতে গিয়েই মা আমাকে conceive করে। ফলে বড় হয়ে বাবা-মা যতবার পুরী গিয়েছে আমায় রেখে যাওয়া হয়েছে অন্য কোথাও।

এ নিয়ে বাবার সঙ্গে মা'র প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা হত। বাবার মনে হত, আমি পুরীর মন্দিরের ভাস্কর্য দেখব না, এ বড় অবিচার। আর আমার শিল্পী মা তখন আপ্রাণ শক্তিতে সন্তানের আয়ুরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ভাবে বাবার সঙ্গে তর্ক করে যেত।

আমার পুরী যাওয়া নিয়ে এত গৃহবিবাদ আমারও ভাল লাগত না। আমি তাই জেদ না করে বলতাম—না, আমার একটা কাজ আছে। তোমরা ঘুরে এসো।

আজ আর বারণ বা সমর্থন করার দু'জনের কেউই নেই। সঙ্গের কাউকে বলতেও হবে না, বাড়ি গিয়ে যেন মা-কে বলে না দেয় যে, আমি জগন্নাথ মন্দির গিয়েছিলাম। যদি অক্ষত ফিরে এসে দাঁড়াতাম মা-র কাছে, তা হলে মা কী ভাবত—জানি না। কিন্তু এই ঝুঁকিটুকুও মা বাবাকেও নিতে দেয়নি। আর আমায় যখন সকরুণ স্বরে বলত,

—কত তো জায়গা আছে পৃথিবীতে। যা্ না তোর যেখানে খুশি। একটা জায়গা বারণ করছি, না গেলে তোর চলছে না?

তখন মনটা মা-র জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত, মনে হত আমি গেলেই মা-র টেনশন হবে, ফলে সুগার বাড়বে। ফলে আরও নানা ব্যারামের উপসর্গ দেখা দেবে। তা ভেবে আর জোর করিনি।

বড় হয়ে যখন বিজ্ঞাপনের চাকরিতে ঢুকলাম, আমার তখনকার প্রেমিক আমাকে প্রায় জোর করে নিয়ে গিয়েছিল পুরীতে।

—চল তো, কিছু হবে না।

ও ভেবেছিল, আমার নিজেরও একটা মৃত্যুভয় আছে ব্যাপারটা নিয়ে।

আমি বলেছিলাম,

—চলো, কিন্তু ওখানে গিয়ে বাই চান্স পটল তুললে ঝামেলাটা কিন্তু তোমারই।

ও কোনও সাড়া দেয়নি। আর সমস্ত প্রেমিকের মতোই বলেছিল,

—আমি তো আছি।

আসলে ভালবাসার ক্ষেত্রে বোধহয় এই তিনটে শব্দের উচ্চারণই পরম স্বস্তির। তার অন্তর্নিহিত প্রতিশ্রুতিটুকু যে-কোনও সময় ভেঙে চুরচুর হয়ে যেতে পারে, আমরা জেনেও সেটা বিশ্বাস করি না।

তাই, ওই তিনটে শব্দকে সম্বল করে, বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে, অফিসের কাজে অন্য কোথাও যাচ্ছি এই অজুহাত দিয়ে আশির দশকের কোনও এক সন্ধ্যায় পুরী এক্সপ্রেসে উঠে বসেছিলাম।

ভোরবেলা ট্রেনটা যখন পুরী পৌঁছল আমার সঙ্গী তখন তাড়াহুড়ো করে মালপত্র নামাচ্ছে। আর আমি ট্রেনের দরজায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। যেন ট্রেন থেকে স্টেশনে পা ফেললেই আমার মৃত্যুভূমি আমাকে আলিঙ্গন করবে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে তখনও বোধহয় সেই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা ছিল।

যাই হোক, আমার প্রণয়ীর অন্যান্য অনেক আসক্তি ছিল বটে, ধর্মে ছিল না। ফলে আমরা দু'টো দিন সমুদ্রের ধারেই কাটিয়েছিলাম। জগন্নাথ মন্দিরে যাইনি।

Rule of Elimination-এ নিজের কাছে নিজেই আশ্বাস দিয়েছিলাম।

—তা হলে পুরী জায়গাটা নয়, জগন্নাথ মন্দিরটাই আসল বিপদগৃহ।

তারপর রীণাদি যখন 'যুগান্ত'-র শুটিং করছে, তখনও দিন তিনকের জন্য গিয়েছিলাম পুরী।

তখন শুটিং শুরু হওয়ার মুখে। তুমুল ব্যস্ততা, অব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ। এবং শুটিংয়ের উৎকণ্ঠায় কেউ মন্দিরের ধারও মাড়ায়নি। আমিও ফিরে এলাম নিরাপদে।

আজ 'চিত্রাঙ্গদা'-র সমস্ত ইউনিটের সদস্যর সঙ্গে পুরীর মন্দিরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একবার ওপরের আকাশের দিকে তাকালাম। পরিচিত বিশ্বাস অনুযায়ী, বাবা-মা যদি ওপর থেকে সত্যি সব দেখতে পায় এবং আমার মন্দিরে যাওয়ার পথে কোনও বাধা সৃষ্টি না-করে, তা হলে ধরে নিতে হবে বাবা ইতিমধ্যে মা-কে convince করে ফেলেছে।

হঠাৎ দেবপ্রিয়ার গলা এল,

—দেখে হাঁটো, ঋতুদা।

একটা রিকশা প্রায় ঘেঁষে চলে গেল।

বান্টিকে (সঞ্জয়) বললাম,

—আর কদ্দুর রে?

বান্টি দেখাল,

—ওই তো। (চলবে)

২৪ এপ্রিল, ২০১১

কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির যাওয়ার জন্য যে দু'পাশের দোকানসারির মধ্যে একটা সরু আঁকাবাঁকা গলি আছে। যেটা বিশ্বনাথের গলি বলেই পরিচিত—পুরীর মন্দিরে সেরকম কিছু দেখলাম না।

বেশ চওড়া বড় রাস্তার ওপরেই মন্দিরে প্রবেশদ্বার। বিশাল একটা চত্বর, নানারকম ছোটবড় মন্দিরে ভরা।

তার মধ্যে এক কোণে রয়েছে শাক্তযুগের বিমলা মন্দির—শোনা যায় এই আদি মন্দির পীঠস্থলেই পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য মন্দিরগুলো এবং জগন্নাথের মন্দিরও গড়ে উঠেছে।

সিংহদ্বারের পাশেই কাশী বিশ্বনাথের এক অনুকৃতি। রয়েছে এক প্রাচীনে বৃক্ষ—কল্পবট। তার তলায় অধিষ্ঠান করছেন বটগণেশ। জগন্নাথ মন্দিরের পিছনে নৃসিংহ মন্দির। নবগ্রহ এবং সত্যনারায়ণ।

তবে যতটুকু জানা গেল, বিমলা দেবীর মন্দিরটিকেই আদি মন্দির বলে শনাক্ত করেছেন অনেকেই।

আজও বিমলা-কে মন্দিরের এক প্রধান দেবী বলে গণ্য করা হয়। এই বৈষ্ণব মন্দির প্রাঙ্গণে আজও নাকি দুর্গাপুজোর সময়ে বিমলা মন্দিরে পশুবলি হয়। সেটা গুপ্তপূজা বলেই পরিচিত।

বিমলা দেবীর বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় একটি বিশেষ দৈনিক আচারে। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্র, প্রসাদভক্ষণের পর, সেটি নিয়ে যাওয়া হয় বিমলা মন্দিরে। দেবীর সেই প্রসাদ স্পর্শ না করা অবধি তা মহাপ্রসাদের গৌরব পায় না।

জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোড়োগঙ্গাদেব বলে এক রাজার রাজত্বকালে। কিন্তু জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে এক অদ্ভুত লোককথা বা আঞ্চলিক পুরাণ আছে, যেটা শুনে বেশ মজা লাগল।

কোনও এক সময় পুরীর কোনও এক রাজা, নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীর ওপর তাঁর অবারিত আধিপত্য স্থাপন করার উদ্দেশে এক মহান শক্তির সন্ধান করছিলেন।

সেই সময় পুরীর প্রত্যন্তে অত্যন্ত শক্তিশালী এক শবর জাতির অধিষ্ঠান ছিল। শোনা যেত তাদের এক গোপন দেবতার শক্তিতেই তারা এত বলীয়ান। সব রাজারাই লোভী। অতএব ইন্দ্রদ্যুম্ন কেনই বা অন্যরকম হবেন! তাঁর নজর পড়ল শবরদের এই আরাধ্য দেবতার ওপর। কিন্তু সেই দেবতার সন্ধান বংশ পরম্পরায় জানেন কেবল শবরপ্রধান।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন পাঠালেন তাঁর এক অনুচর বিদ্যাপতিকে সেই শবর গ্রামে। তখনকার শবরপ্রধান বিশ্বাবসুর কন্যা ললিতাকে প্রণয় জালে আবিষ্ট করে বিদ্যাপতি ধীরে ধীরে বিশ্বাস অর্জন করলেন শবর গোষ্ঠীর। বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে হন ললিতাকে বিবাহ করে।

এবার স্ত্রীকে অনেক ভুজুং ভাজুং দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বশুরের কাছে আবদারটা পৌঁছে দেওয়া হল—যে বিদ্যাপতি অন্তত একবার এই প্রজাতির আরাধ্য দেব কিটুং-কে দর্শন করতে চান। জামাতার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না বিশ্বাবসু। তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল কিটুং দেবতার অধিষ্ঠানালয়ে, কোনও এক বৃক্ষের কাছে। শর্ত রইল যে সারাটা পথ বিদ্যাপতির চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে রাস্তাটা তিনি চিনতে না পারেন। চতুর বিদ্যাপতি সঙ্গে নিলেন একটি ছোট সরষের পুঁটলি। পুরোটা পথ সেই সরষেদানা ছড়াতে ছড়াতে শেষে এসে পৌঁছলেন কিটুং সমীপে। বিশ্বাবসু তাঁর চোখের বাঁধন খুলে দিলেন।—বিদ্যাপতির কিটুং দর্শন হল।

গ্রামে ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই গর্ভবতী ললিতাকে ফেলে রেখে বিদ্যাপতি ফিরে এলেন ইন্দ্রদ্যুম্নের সভায়।

এবার সসৈন্য আক্রমণ। ফেলে আসা সরষেদানা ইতিমধ্যে ছোট ছোট গাছ হয়ে পথনির্দেশিকা হয়ে উঠেছে। কিটুং-এর কাছে পৌঁছে কিটুং অধিকার করলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন-র সৈন্য শবরদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করে।

পরাজিত বিশ্বাবসু ইন্দ্রদ্যুম্নের হাতে কিটুংকে তুলে দেওয়ার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন বছরে একবার কিটুং ফিরে আসবে তার নিজের গোষ্ঠীর কাছে।

এরপরেই নাকি জগন্নাথের দারুমূর্তির নির্মাণ। জগন্নাথের মূর্তির মধ্যে কিটুং-কে প্রবিষ্ট করানো হল। এখনও সেই প্রথা অব্যাহত। রথযাত্রার কয়েকদিন আগে জগন্নাথের চলন্ত প্রতিমা নারায়ণকে নিয়ে চন্দনযাত্রা উৎসব হয়। মন্দির সংলগ্ন চন্দন সরোবরে জগন্নাথ বিকেলবেলা হাওয়া খেতে বেরোন। সঙ্গে যান পুরোহিতেরা এবং দেবদাসীরা (ওড়িশার ভাষায় তাঁদের 'মাহারি' বলে)।

একুশ দিন বিকেলের ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে জগন্নাথের জ্বর হয়। তখন তাঁকে ভিজে গামছায় ঢেকে রাখা হয়। তারপর জ্বর সারলে নেত্রপুজো। তাতে তিন বিগ্রহের রং নতুন করে লাগানো হয়।

এরপর রথযাত্রা। বছরে ওই একবারই জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সহ মন্দির থেকে বেরোন গুণ্ডিচায় মাসির বাড়ি যাওয়ার জন্য।

এই মাসির বাড়িতেই আদি শবরদের সেবায় সুস্থ, পরিতৃপ্ত হন জগন্নাথ। আর রাজপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কিটুং বছরে সাতটা দিন ফিরে আসে তার নিজের মানুষদের কাছে।

প্রতি বারো বছর অন্তর যখন জগন্নাথের নবকলেবরের প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মূর্তিনির্মাণ সমাপ্ত হলে জগন্নাথের প্রাণপ্রতিমা কিটুংকে পুরোহিতরা চোখ বাঁধা অবস্থায় বার করে আনেন পুরনো মূর্তি থেকে—স্থাপন করেন নবকলেবরের মধ্যে।

কৃষ্ণ জগন্নাথ, পীত বলরাম এবং শুভ্র সুভদ্রার আসল রূপকটি নাকি সমগ্র পৃথিবীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একত্রীকরণ। Negrail, Mongoloid এবং Caucasian দের একত্রীকরণ।

শুনে বড় ভাল লাগল। আর তখনই প্রশ্ন জাগল যে আন্তর্জাতিকতার ভাবনা নিয়ে সত্যি যদি এই মন্দির নির্মিত হয়, তা হলে বিশ্বদেবতার এই মন্দিরে আজও অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ কেন?

১ মে, ২০১১

এবার সন্ধে হয়ে আসছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা তোলা হবে, সে নাকি এক দেখার মতো জিনিস।

এক সময় মন্দিরের প্রধান ছত্রিশ ধরনের কাজের জন্য ছত্রিশটি পরিবারকে নিয়োগ করা হয়েছিল—তাঁদের বলা হত 'ছত্রিশ নিয়োগী'। তাঁরা মন্দিরের নানারকম দৈনিক কাজ, যেমন—ভোগ রাঁধা, মালা গাঁথা, পুজোর ফুল আনা—এগুলো প্রায় বংশ পরম্পরায় করে আসতেন। আর পালাপার্বণের সময় আরেকটি দল উপস্থিত থাকতেন, যাঁদের কাজই ছিল উৎসবের কিছু বিশেষ বিশেষ কাজ করা, যেমন—রথের কাঠ কাটা, রথ সাজানো ইত্যাদি। শোনা যায়, একসময় মাহারি-রাও (দেবদাসীকে ওড়িশায় এই নামে ডাকে) নারী-প্রতিনিধি রূপে এই 'ছত্রিশ নিয়োগী'-র অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন। কীভাবে, কখন, সময় তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে সে-তথ্য আজ চাপা পড়ে গিয়েছে মাহারিদের নিয়ে বিবিধ রহস্য ও কলঙ্কের স্তরে স্তরে।

মন্দিরের চূড়ায় এই নিত্য ধ্বজা যিনি তুলবেন, তিনি বংশপরম্পরায় এই ছত্রিশটি পরিবারের কোনও একটির সদস্য। আকাশে এখনও বেগুনি আভা। সন্ধে হতে আর দেরি নেই। অনেক ভক্ত বা পর্যটকই দেখলাম ধ্বজা তোলা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। মন্দিরের দরজা এখন বন্ধ— মিনিট দশেকের মধ্যেই খুলবে।

আমরা মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাদের গাইড-এর সঙ্গে সঙ্গে। একদল বাঁদর এখান থেকে ওখানে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। এটা আমার কাছে বড় চেনা দৃশ্য। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির থেকে নেপালের পশুপতিনাথ অবধি নানা জায়গায় দেখেছি। কিন্তু পুরীর মন্দিরে আরেকটা জিনিস দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম—যত্রতত্র অজস্র বেড়াল।

আমার মার্জারাতঙ্ক এখন আর প্রায় কারওরই অবিদিত নেই। ফলে ইউনিটের সবাই হয় বেড়াল দেখলে তাদের তাড়াচ্ছে, নয় আমায় সরাচ্ছে।

জগন্নাথ মন্দিরের একটা বৈশিষ্ট্য বেশ মজার লাগল। সাধারণত বিষ্ণু মন্দিরে নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। আর অনেক কৃষ্ণ মন্দিরেই মুরলীধরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্রীরাধা। জগন্নাথ মন্দিরের গোটা চত্বরে রাধার কোনও স্থান নেই। এখানে জগন্নাথ নিতান্তই পারিবারিক দেবতা, দাদা বলভদ্র ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে এক মন্দিরে থাকেন। পাশেই তাঁর স্ত্রী রুক্মিনীর মন্দির।

অথচ রাধাবর্জিত এই 'পবিত্র' পারিবারিক চত্বরের অনতিদূরেই একটা ছোট কুটিরে বসে কোনও একসময় জয়দেব লিখে গিয়েছেন রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমবিলাস-কথা—'গীতগোবিন্দ'। আজও যার ছন্দোবদ্ধ সারা ওড়িশা তাদের একান্ত সাংস্কৃতিক গৌরব বলে বহন করে চলেছে।

মন্দির খোলার সময় হল। আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাঁরা ছিলাম, একত্রিত হলাম। আমাদের মন্দির প্রদর্শক তাঁর বিশেষ ক্ষমতার জোরে আমাদের সোজা নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন গর্ভগৃহের সামনে।

কে জানে কোত্থেকে, সবার মনের অগোচরে, বোধহয় সেই অজানা আতঙ্ক ফিরে এল। সত্যিই কি এবার সেই সময় এল, সেই অশুভক্ষণ? এবার কি দিদিভাই-এর ভাষায় 'জগন্নাথের আমাকে টেনে নেওয়ার সময়?'

দেবপ্রিয়ার হাত আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। আমার সামনে যিশুর পাহারা।

দীপালোকিত সেই গর্ভগৃহের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ধ্রুপদী ভাস্কর্যের পাথরের মূর্তিখচিত মন্দিরের মধ্যে তিনটি দারুবিগ্রহ। তাঁদের পিছনে থিয়েটারের সাইক্লোরামার মতো এক কৃষ্ণ প্রেক্ষাপট। আর এতদিনের নিত্য অর্চনার ধূপ, ধুনো, ধোঁয়ার কালো আস্তরণের ছাপ চারদিকের দেওয়ালে, ছাতে, এমনকী রেশমের চাঁদোয়ায়।

সেই নিকষ মন্দিরের মধ্যে প্রদীপের আলোয় প্রথম দেখলাম আমার কৃতান্ত দেবতাকে। কেমন সুন্দর বড় বড় তিনটি মূর্তি। জগন্নাথের পরনে মন্দির-পাড় একটা চমৎকার সবুজ ওড়িশার শাড়ি—ঘাগরার মতো করে বাঁধা।

অপলক সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জানিও না কখন ভুলে গেলাম দিদিভাইয়ের সতর্কবাণী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ। আমার বাড়িতে আমার যে-কবি থাকেন, তাঁরই একটি গান ঘুরেফিরে আসতে লাগল মাথার মধ্যে—

'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান'।

৮ মে, ২০১১

শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে এলাম।

শেষবার গিয়েছিলাম আমার 'রোববার', 'আমি' আর 'পপকর্ন'-এর বন্ধুদের সঙ্গে। আমাদের নয়-নয় করেও বিশাল পরিবার, প্রায় একান্নবর্তীই বলা চলে—যে হারে খাবার ভাগ করে খাওয়া হয় আমাদের ছাতের ঘরের দপ্তরে!

তখন বাবা সবে চলে গিয়েছে। আমি কেমন যেন ঘরকুনো, কোথাও বেরতে ইচ্ছে করে না—কারও সঙ্গে দেখা করতে ভাল লাগে না। এমন সময় অনিন্দ্যর কড়া হুকুম এল—আমরা সবাই মিলে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি, তুমিও চলো। আর গাড়ি নিয়ে যাবে না, আমাদের সঙ্গে ট্রেনে করে চলো।

অনিন্দ্যর যে কোনও শাসনের মধ্যেই একটা অপরিসীম স্নেহ থাকে। সেটা আমাদের পরিবারের কনিষ্ঠতম জনের প্রতিও যেমন, আবার আমি দামড়া বলেও, সেই স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই না।

সেবারের শান্তিনিকেতন ভ্রমণ আমার বিষাদগ্রস্ত মনের এক অদৃশ্য আরোগ্য—তারপরেই অনেক সহজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলাম।

তাই এবার বড্ড মনে পড়ছিল সেই সদলবলে বেড়ানোর কথা।

মা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে, এটাই বোধহয় আমার প্রথম পারিবারিক ভ্রমণ।

এমনিই, কেন জানি না, শান্তিনিকেতনে গেলে আমার একটা 'প্রাণের আরাম' হয়। মহর্ষির সঙ্গে তার হয়তো কোনও মিলই নেই। ওইটুকু তো জায়গা! বইয়ের দোকান বলতে সেই আদিকালের 'সুবর্ণরেখা' আর উত্তরায়ণ চত্বর। এ ছাড়া, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানা প্রতিষ্ঠান। তবে প্রতিটি গৃহস্থ আবাসনের স্থাপত্যেও একটা রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য আছে—প্রচুর মেয়ে সাইকেল চেপে পড়তে যাচ্ছে, আবার সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার ধারের দোকান থেকে গয়নাও কিনছে। দেখতে ভারি ভাল লাগে।

এবারেরটা নিছক বেড়াতে যাওয়া নয়, কিছু কাজও ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা তথ্যচিত্র বানানোর ভার এসেছে আমার ওপর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে।

প্রথমত তথ্যচিত্র আমি আগে বানাইনি, তার ওপর সত্যজিৎ নির্মিত 'রবীন্দ্রনাথ' আজও জনমানসে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে—স্বাভাবিক ভাবেই আমার একটু সংকুচিত লাগছে।

চিত্রনাট্যের খসড়া একটা হয়েছে বটে, কিন্তু দেড়শো বছর পরে আবার রবীন্দ্র-জীবন নির্মাণ! বড় সহজ যে নয়—সেটা আমি কেন, আমার প্রতিটি পাঠকই বুঝতে পারছেন।

তার ওপর, শান্তিনিকেতনের 'বিচিত্রা' ভবন—রবীন্দ্রজীবনের সংগ্রহশালা, এখন নবনির্মাণের মাঝখানে—ফলে মিউজিয়ম বন্ধ। তবু, বিশেষ আধিকারিক নীলাঞ্জন আমাকে যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে দেখাল।

আগামী তিনমাসের মধ্যে সংগ্রহশালা আবার খুলবে—তখন অনেক কিছু সুসংবদ্ধ অবস্থায় দেখা যাবে।

এর মধ্যে বিদেশের শুটিং শেষ হয়ে যাবে।

এবং ভাল লাগছে এই ভেবে যে, শিগগির আবার শান্তিনিকেতন যাওয়ার একটা সংগত অজুহাত তৈরি হবে।

৩১ জুলাই, ২০১১

ইদানীং আমার কিঞ্চিৎ মদিরাসক্তি হচ্ছে, মনে হয়।

দূর পাল্লার প্লেন-এ উঠলে সেটা আরও বেশি করে বুঝতে পারি। প্লেন ছাড়লেই বিমানসেবিকারা নানাবিধ পানীয় পরিবেশন করেন আর আমি পূর্বে অবধারিত ভাবে হয় ডায়েট কোক বা টোম্যাটো জুস-এর দিকে হাত বাড়াতাম।

সাম্প্রতিক কয়েকটা যাত্রায় দেখলাম একটু সময় নিয়ে বলছি—রেড ওয়াইন।

Bailey's-এর Irish Cream-টা আমার বড় প্রিয়। কিন্তু ওটা একেবারে মিষ্টি গুড়ের মতো। আমার মতো ডায়বেটিস রোগীর পক্ষে প্রায় বিষ। তার থেকে বরং রেড ওয়াইন-টা মন্দ নয়।

আসলে প্রায় অর্ধশতাব্দী একটা মদিরাবর্জিত জীবন পালন করে আসার একটা অসুবিধে আছে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 'ভাল মদ' নিয়ে যখন আলোচনা হয়, ভ্যাবলার মতো চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। আমার মদবিদ্বেষ কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতা, বা নীতিবাগিশতার জায়গা থেকে যে নয়, বাকি পৃথিবীকে বোঝাতে এটা আমার বেশ সময় লেগেছিল।

আমার আসলে অ্যালকোহলে একটা অ্যালার্জি আছে, গলা দিয়ে এক ঢোঁক নামলেই গলা

চুলকোয়। আমি নিজেও এটা বুঝেছি অনেক দেরিতে।

কলেজবেলায় বন্ধুরা জোর করে মদ খাওয়ানোর ঝোঁকে লুকিয়ে Thums up-এর সঙ্গে দু'ছিপি রাম ঢেলে দিত। আমি নিষ্পাপ মনে দু'টো চুমুক মেরেই মুখটা বিকৃত করে গেলাসটা নামিয়ে রাখতাম—

—অ্যাই, তোরা এই Thums up-টা খাস না। এটা বোধহয় Spurious, আমার কেমন গলা জ্বালা করছে।

দু-একবার এইরকম ঘটার পর ধীরে-ধীরে বন্ধুরাও বুঝে গেল যে, আমাকে এইভাবে র‍্যাগ করে কোনও লাভ নেই।

পরবর্তী কালে, আমার চলচ্চিত্রকার পেশার বিভিন্ন বিদেশ সফরেও, নিজেকে ভীষণ যত্ন করে মদিরা-বিচ্যুত রাখতে হয়েছে।

রেড ওয়াইন-এর স্বাদ প্রথম পেয়েছিলাম লোকার্নো-য় বসে। সেটা আমার দ্বিতীয়বার লোকার্নো চলচ্চিত্রোৎসবে যোগদান। 'অন্তরমহল' ছবিটি 'এ বি কর্প'-এর প্রযোজনা, ফলে জয়াদি (বচ্চন) গিয়েছিলেন প্রযোজনা-প্রতিভূ হয়ে।

অনেকেই জানে না, জয়াদি একজন উঁচুমানের ওয়াইন-বিশারদ। এবং বছর কয়েক আগে মুম্বইয়ের বন্যার সময়, বাড়িতে জল ঢুকে ওঁদের সযত্নসঞ্চিত প্রায় হাজারখানেক ওয়াইন বোতল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এহেন জয়াদি বোতলের নাম দেখেই ওয়াইনের জাত চেনেন। এবং আমরা লোকার্নো-য়, পড়ে-আসা সন্ধেগুলোয় নানা পথের ধারের রেস্তোরাঁ বা ছোট কাফে-তে রুটি আর ওয়াইন খেতে-খেতে প্রভূত আড্ডা মারতাম। ধীরে-ধীরে রোদ পড়ে আসত, বেগুনি হয়ে উঠত দূরের আকাশ। রেস্তোরাঁর কর্মী এসে বাতি রেখে যেতেন টেবিলে আর রূপা (গঙ্গোপাধ্যায়) থেকে-থেকেই উঠে যেত, একটু দূরে গিয়ে জয়াদি-র থেকে লুকিয়ে সিগারেট খাবে বলে।

লাল ওয়াইন-এও যে প্রথম-প্রথম অস্বস্তি হয়নি, তা বলব না। তবু সেটা তেমন প্রকট নয়। এখন, কোনও মদের আড্ডায় প্রবল চাপাচাপি এলে ছোট একটা ওয়াইন নিয়ে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থের অনুরোধ রক্ষা করতে পারি।

প্লেনে উঠেও দেখেছি একটা বা দু'টো স্বল্প পরিমাণ ওয়াইন খেয়ে নিয়ে রাতের খাবারটা খেলে ঘুমটা ভাল হয়। শুধু-শুধু ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না।

দুবাই থেকে মাদ্রিদ প্রায় সাত ঘণ্টার ফ্লাইট। ওয়াইন আর ব্রেকফাস্ট-এর পর ক্রমশ যখন প্লেনের আলো ঢিমে হয়ে এল, আশেপাশের যাত্রীরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে, বা টিভি দেখতে ব্যস্ত— আমি জানলাটা নামিয়ে দিয়ে কম্বলটা টেনে নিলাম।

দুই

মাদ্রিদ এ পৌঁছনোর ঘোষণা যখন হচ্ছে, তখন মাদ্রিদ্রের সময় বেলা একটা, দেশের ঘড়ি সময় দেখাচ্ছে সাড়ে চারটে। ধীরে-ধীরে চশমা, বই, খবরের কাগজ গুছিয়ে নিতে-নিতে হাতঘড়ির সময় বদল করলাম। জানি কব্জি থেকে খসে গেলেও, হাতের মুঠোফোনে জ্বলজ্বল করবে দেশের সময়।

তখনও জানি না, ব্ল্যাকবেরি ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে আপনিই নিজের সময় পাল্টে নেয়।

মনে মনে হাসলাম, সময়কে আঁকড়ে রাখার এত যে চেষ্টা সে তো সালভাদোর দালি-র দেশে পা রাখার আগেই বিগলিত হয়ে গড়িয়ে পড়ারই কথা।

আমাদের প্লেন থামল—টার্মিনাল ফোর স্যাটেলাইট-এ। আমাকে এখান থেকে আভ্যন্তরীণ টিউব ট্রেনে পৌঁছতে হবে টার্মিনাল ফোর-এ। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলল। দরজা যখন খুলল, নামতে-নামতে দেখি, সামনে দেওয়াল জোড়া একটা ম্যুরাল হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পাবলো পিকাসো। সবার তখন ইমিগ্রেশন-এ ছোটার তাড়া। একটু কাছে গিয়ে পিকাসো টা দেখছি। পাশে যেন এসে ধীর পায়ে দাঁড়ালেন দু'জন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বাবা আর মা। ইমিগ্রেশন চুলোয় গেল। তিনজনে মিলে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলাম পিকাসো-র দিকে।

৩০ অক্টবর, ২০১১

মাদ্রিদের দুপুরের রোদটা বড় সুন্দর। কিছু রুক্ষ কিছু শ্যামল, পাহাড়ি বনভূমি প্লেন থেকেই চোখে পড়েছিল—মাদ্রিদে নেমে আর সেসব দেখতে পেলাম না। ঝাঁ চকচকে একটা শহর, আর পাঁচটা ইউরোপীয় দেশের রাজধানী যেমন হয়।

পৌলমী এসেছিল নিতে। পৌলমী মানে পৌলমী ত্রিপাঠী—ভারতীয় হাই কমিশনে কর্মরতা। বেশ কয়েকবছর মাদ্রিদেই রয়েছে। পৌলমী আদতে বাঙালি-গুপ্ত। পড়ার সময় সহপাঠীকে বিয়ে করে ত্রিপাঠী।

পৌলমীর স্বামী ভারতেই থাকে, দিল্লিতে। অধ্যাপনা করে কিরোরিমল কলেজে। আর পৌলমী একটা তিন বছর দশ মাস, আর একটা শুধু দশ মাস কাঁখে করে দিব্যি অনর্গল স্প্যানিশ বলে ওর হাই প্রোফাইল চাকরি সামলায়। পৌলমীর সঙ্গে এখানে থাকেন ওর শাশুড়ি।

পৌলমীর বড় ছেলে শুনলাম নির্ভুল উচ্চারণে স্প্যানিশ বলে। পৌলমীর স্প্যানিশ-শিক্ষা কলকাতায় বা দিল্লির কোনও বিদেশি দূতাবাস আয়োজিত আন্তর্জাতিক ভাষাশিক্ষার কোনও institute-এ। আর পৌলমী-পুত্র তো বড়ই হচ্ছে স্পেনের জলহাওয়ায়। আকাশ-বাতাস গায়ে

চুলকোয়। আমি নিজেও এটা বুঝেছি অনেক দেরিতে।

কলেজবেলায় বন্ধুরা জোর করে মদ খাওয়ানোর ঝোঁকে লুকিয়ে Thums up-এর সঙ্গে দু'ছিপি রাম ঢেলে দিত। আমি নিষ্পাপ মনে দু'টো চুমুক মেরেই মুখটা বিকৃত করে গেলাসটা নামিয়ে রাখতাম—

—অ্যাই, তোরা এই Thums up-টা খাস না। এটা বোধহয় Spurious, আমার কেমন গলা জ্বালা করছে।

দু-একবার এইরকম ঘটার পর ধীরে-ধীরে বন্ধুরাও বুঝে গেল যে, আমাকে এইভাবে র‍্যাগ করে কোনও লাভ নেই।

পরবর্তী কালে, আমার চলচ্চিত্রকার পেশার বিভিন্ন বিদেশ সফরেও, নিজেকে ভীষণ যত্ন করে মদিরা-বিচ্যুত রাখতে হয়েছে।

রেড ওয়াইন-এর স্বাদ প্রথম পেয়েছিলাম লোকার্নো-য় বসে। সেটা আমার দ্বিতীয়বার লোকার্নো চলচ্চিত্রোৎসবে যোগদান। 'অন্তরমহল' ছবিটি 'এ বি কর্প'-এর প্রযোজনা, ফলে জয়াদি (বচ্চন) গিয়েছিলেন প্রযোজনা-প্রতিভূ হয়ে।

অনেকেই জানে না, জয়াদি একজন উঁচুমানের ওয়াইন-বিশারদ। এবং বছর কয়েক আগে মুম্বইয়ের বন্যার সময়, বাড়িতে জল ঢুকে ওঁদের সযত্নসঞ্চিত প্রায় হাজারখানেক ওয়াইন বোতল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এহেন জয়াদি বোতলের নাম দেখেই ওয়াইনের জাত চেনেন। এবং আমরা লোকার্নো-য়, পড়ে-আসা সন্ধেগুলোয় নানা পথের ধারের রেস্তোরাঁ বা ছোট কাফে-তে রুটি আর ওয়াইন খেতে-খেতে প্রভূত আড্ডা মারতাম। ধীরে-ধীরে রোদ পড়ে আসত, বেগুনি হয়ে উঠত দূরের আকাশ। রেস্তোরাঁর কর্মী এসে বাতি রেখে যেতেন টেবিলে আর রূপা (গঙ্গোপাধ্যায়) থেকে-থেকেই উঠে যেত, একটু দূরে গিয়ে জয়াদি-র থেকে লুকিয়ে সিগারেট খাবে বলে।

লাল ওয়াইন-এও যে প্রথম-প্রথম অস্বস্তি হয়নি, তা বলব না। তবু সেটা তেমন প্রকট নয়। এখন, কোনও মদের আড্ডায় প্রবল চাপাচাপি এলে ছোট একটা ওয়াইন নিয়ে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থের অনুরোধ রক্ষা করতে পারি।

প্লেনে উঠেও দেখেছি একটা বা দু'টো স্বল্প পরিমাণ ওয়াইন খেয়ে নিয়ে রাতের খাবারটা খেলে ঘুমটা ভাল হয়। শুধু-শুধু ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না।

দুবাই থেকে মাদ্রিদ প্রায় সাত ঘণ্টার ফ্লাইট। ওয়াইন আর ব্রেকফাস্ট-এর পর ক্রমশ যখন প্লেনের আলো ঢিমে হয়ে এল, আশেপাশের যাত্রীরা অধিকাংশই ঘুমিয়ে, বা টিভি দেখতে ব্যস্ত—আমি জানলাটা নামিয়ে দিয়ে কম্বলটা টেনে নিলাম।

দুই

মাদ্রিদ এ পৌঁছনোর ঘোষণা যখন হচ্ছে, তখন মাদ্রিদ্রের সময় বেলা একটা, দেশের ঘড়ি সময় দেখাচ্ছে সাড়ে চারটে। ধীরে-ধীরে চশমা, বই, খবরের কাগজ গুছিয়ে নিতে-নিতে হাতঘড়ির সময় বদল করলাম। জানি কব্জি থেকে খসে গেলেও, হাতের মুঠোফোনে জ্বলজ্বল করবে দেশের সময়।

তখনও জানি না, ব্ল্যাকবেরি ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে আপনিই নিজের সময় পাল্টে নেয়।

মনে মনে হাসলাম, সময়কে আঁকড়ে রাখার এত যে চেষ্টা সে তো সালভাদোর দালি-র দেশে পা রাখার আগেই বিগলিত হয়ে গড়িয়ে পড়ারই কথা।

আমাদের প্লেন থামল—টার্মিনাল ফোর স্যাটেলাইট-এ। আমাকে এখান থেকে আভ্যন্তরীণ টিউব ট্রেনে পৌঁছতে হবে টার্মিনাল ফোর-এ। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলল। দরজা যখন খুলল, নামতে-নামতে দেখি, সামনে দেওয়াল জোড়া একটা ম্যুরাল হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পাবলো পিকাসো। সবার তখন ইমিগ্রেশন-এ ছোটার তাড়া। একটু কাছে গিয়ে পিকাসো টা দেখছি। পাশে যেন এসে ধীর পায়ে দাঁড়ালেন দু'জন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বাবা আর মা। ইমিগ্রেশন চুলোয় গেল। তিনজনে মিলে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলাম পিকাসো-র দিকে।

৩০ অক্টবর, ২০১১

মাদ্রিদের দুপুরের রোদটা বড় সুন্দর। কিছু রুক্ষ কিছু শ্যামল, পাহাড়ি বনভূমি প্লেন থেকেই চোখে পড়েছিল—মাদ্রিদে নেমে আর সেসব দেখতে পেলাম না। ঝাঁ চকচকে একটা শহর, আর পাঁচটা ইউরোপীয় দেশের রাজধানী যেমন হয়।

পৌলমী এসেছিল নিতে। পৌলমী মানে পৌলমী ত্রিপাঠী—ভারতীয় হাই কমিশনে কর্মরতা। বেশ কয়েকবছর মাদ্রিদেই রয়েছে। পৌলমী আদতে বাঙালি-গুপ্ত। পড়ার সময় সহপাঠীকে বিয়ে করে ত্রিপাঠী।

পৌলমীর স্বামী ভারতেই থাকে, দিল্লিতে। অধ্যাপনা করে কিরোরিমল কলেজে। আর পৌলমী একটা তিন বছর দশ মাস, আর একটা শুধু দশ মাস কাঁখে করে দিব্যি অনর্গল স্প্যানিশ বলে ওর হাই প্রোফাইল চাকরি সামলায়। পৌলমীর সঙ্গে এখানে থাকেন ওর শাশুড়ি।

পৌলমীর বড় ছেলে শুনলাম নির্ভুল উচ্চারণে স্প্যানিশ বলে। পৌলমীর স্প্যানিশ-শিক্ষা কলকাতায় বা দিল্লির কোনও বিদেশি দূতাবাস আয়োজিত আন্তর্জাতিক ভাষাশিক্ষার কোনও institute-এ। আর পৌলমী-পুত্র তো বড়ই হচ্ছে স্পেনের জলহাওয়ায়। আকাশ-বাতাস গায়ে

মেখে—তার ভাষাটায় তাই ওখানকার ধুলোবালি। কাঁকরকণা মেশানো।

পৌলমী নিজেই স্বীকার করল—যে কোনও উচ্চারণ নিয়ে সংশয় থাকলে আমি আমার ছেলেকে জিগ্যেস করি। ও বলে দেয়।

পৌলমী এসেছে একটা বিশাল গাড়ি নিয়ে। সাধারণত আমরা বিদেশে নিমন্ত্রণে গেলে এই ধরনের বড় গাড়িতেই আমাদের নিতে আসা হয়। আয়োজকরা নিশ্চয়ই অনুমান করে নেন যে, বিদেশে থেকে আসছেন যেহেতু এই অতিথি, তাঁর ভারী মালপত্র ছোট গাড়িতে আঁটবে না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গাড়ির চালকরাই আসেন আমাদের নামাঙ্কিত প্ল্যাকার্ড হাতে। কখনও বা তাঁদের সঙ্গে আসেন একজন কোনও নির্দিষ্ট চলচ্চিত্রোৎসব-কর্মী—যাঁর গোটা উৎসবটা ধরে কেবল আমার তত্ত্বাবধানেই থাকার কথা।

অনেক সময় অনেক ছোটখাটো চলচ্চিত্রোৎসব এই ধরনের ব্যক্তিগত খাতিরযত্নের আয়োজন করে উঠতে পারে না সীমিত লোকবলের চাপে।

এবারে দেখলাম খোদ পৌলমীই এসেছে।

পৌলমী যদিও সরাসরি Hay festival-এর সঙ্গে যুক্ত নয়। ভারতীয় হাই কমিশন-এর তরফ থেকে ওর দায়িত্ব ভারতীয় অতিথিদের দেখভাল করার। শেষ মুহূর্তে রিঙ্কুদির টিকিট ক্যানসেল করতে হয়েছে—উপমন্যু নিজে একজন সরকারি চাকুরে, তাঁর বিভাগ তাকে অনুমতি না-দিলে তার বিদেশ যাওয়া সহজ নয়। এই সব ঝামেলা সামলাচ্ছিল পৌলমী। মাদ্রিদে বসে।

প্লেনে ওঠার আগে শেষ যখন কথা হল, জিগ্যেস করেছিলাম,

—কী করে চিনতে পারব তোমাকে? কী পরে থাকবে তুমি?

ছোট্ট একটা উত্তর এসেছিল,

—শাড়ি।

মাদ্রিদ বিমানবন্দরের ঠিক বাইরে রোদছায়ার সীমারেখায় উড়ছিল একটা শাড়ির আঁচল। আর আমার কোনও প্ল্যাকার্ড প্রয়োজন হয়নি।

নানারকম পরিকল্পনা ছিল সন্ধেটা জুড়ে। বুবু (সঙ্গীতা দত্ত), বাবুয়া (সৌমিল্য, বুবুর স্বামী)—ওরা দু'জনেই আমার লন্ডনবাসী বন্ধু। ও! বুবুকে আপনারা চিনবেন। ও সম্প্রতি 'লাইফ গোজ অন' বলে একটা ইংরেজি ছবি করেছে। কলকাতাতে মুক্তিও পেল ছবিটা—তাতে রিঙ্কুদি, সোহা দু'জনেই আছেন মা-মেয়ের ভূমিকায়।

তা ছাড়া রয়েছে উপমন্যু—যার সঙ্গে এখনও আমার আলাপই হয়নি।

আজকের সন্ধেটা শুনলাম বুবু, বাবুয়া, উপমন্যু টোলেদো (উচ্চারণটা অবধারিতভাবে ভুল, জানবেন) বলে একটা নিকটবর্তী শহরে বেড়াতে যাচ্ছে। টোলেদো যাওয়ার কথা আমার সঙ্গে পৌলমীর বহুবার হয়েছিল কলকাতায় বসে। আমার যেহেতু আঞ্চলিক শিল্পদ্রব্যের বিষয়ে খুব

আগ্রহ (লোভ কথাটা বললে অশোভন শোনায়, তাই আগ্রহ বললাম—আসলে আমার বেজায় লোভ শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে), তাই আগে থেকেই পৌলমী আর আমি অনেক গোপন পরিকল্পনা করেছিলাম মূল উৎসবের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার আগেই এগুলো করে ফেলব।

তবে এতগুলো মানুষ আমাদের সেই গোপন পরিকল্পনার শরিক হয়ে গিয়েছে শুনে একটু অবাক হলাম।

তা ছাড়া, জানা গেল টোলেদো ভ্রমণের পর আমাদের নৈশভোজের নিমন্ত্রণে ডাকা হয়েছে।

সেটা শুনেই মনটা একটু বেজার হল। আবার সেজেগুজে নেমন্তন্নে যাওয়া—তাও হাই কমিশনারদের সরকারি নিমন্ত্রণ—সব কিছুই যেখানে ভীষণ ঠিকঠাক। সেই মুহূর্তের জন্য যেন অন্তর্যামী হল পৌলমী।

কী হল? যাবেন না ভাবছেন?

উত্তরটা আমি দিলাম না। আমার বোকা-বোকা ধরা পড়ে যাওয়া হাসিটুকুই বুঝিয়ে দিল সব।

পৌলমী যেন ওর তিন বছর দশ মাসের ছেলেকে ভোলানোর মতো করে বলল,

ঠিক আছে। আমি এগিয়ে যাই ওদের নিয়ে। এবং বলছি আপনি খুব টায়ার্ড? ভাল কথা। উপমন্যু কিন্তু খুব আলাপ করতে চেয়েছিল আপনার সঙ্গে।

বললাম, আমিও চেয়েছিলাম। কাল তো দেখা হবেই।

উপমন্যু যে আগামিকাল সকালে ফেরত যাচ্ছে, ভাবিনি। ফলে আলাপ হলেও আড্ডা হবে না। এটা ভেবে একটু দমে গেল মনটা। কিন্তু তক্ষুণি প্রায় এসি-সিনেমার মতোই চোখের সামনে ফুটে উঠল হাই কমিশনের বাড়িতে নৈশভোজের টেবিলে শীতল রৌপ্যবাসন, আর নিষ্প্রভ আমলাতন্ত্র। তড়িঘড়ি বললাম,

ঠিক আছে, ওকে বোলো, যদি কাল সকালে আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে চায়।

পৌলমী আমার ঘরের থেকেই রুম সার্ভিসকে ফোন করে রাতের খাবার বলে দিল।

জানলার বাইরে দিনের আলো মেদুর হয়েছে। এবার আঁধার হওয়ার পালা—ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে নটা।

আর সেই সঙ্গে, রুম সার্ভিসের সঙ্গে পৌলমীর কথোপকথনের ফাঁকে, আমার তিনশো চোদ্দো ঘরের নম্বরটার স্প্যানিশ অনুবাদটাও শিখে গেলাম,

তেত্‌রো, উনো, কোয়াত্‌রো।

৬ নভেম্বর, ২০১১

স্পেন যাওয়ার প্রাক্কালে যখন গোছগাছ করছি, বন্ধুবান্ধবরা বারবার সাবধান করছিল—লাল কিছু পরে যেও না যেন? ওখানে যা ষাঁড়!

স্পেন মানেই যেন ষাঁড়, ব্যস! আমি অনেকক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে স্পেন-এর ষাঁড়ের লড়াই জগদ্বিখ্যাত হলেও, স্পেনটা ঠিক আমাদের বেনারসের গলি নয়, যেখানে ষাঁড় আর মানুষ প্রায় সমসংখ্যক। (তবু তো হালে বিশ্বনাথের গলিতেও অত ষাঁড় আর দেখতে পাই না।)

তা ছাড়া, ষাঁড় আদতে রং-কানা। তার কাছে লাল বা নীলের কোনও প্রভেদ নেই—সামনে একটা কাপড় দোলানো হয় বলে ষাঁড়ের আক্রমণ সেই অযাচিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে। বন্ধুরা তবু নাছোড়।

—কেন, তোমার কি পোশাকের অভাব হয়েছে? লাল রং ছাড়া জামাকাপড় নেই? বলতেই পারতাম—হয়েছে। তোরা কিনে দে? তবে জানি সে-মিথ্যে চলবে না। আসলে, যত পোশাক আমি পরি, তার থেকেও অনেক বেশি সংখ্যক পোশাক আমার তোলা আছে—ঝোঁকের মাথায় যেগুলো কিনেছি বা বানিয়েছি কোনও সময়। আর পরাই হয়নি। এবং সত্যিই যত না পোশাক আছে আমার, দর্শক বা পাঠক-কল্পনায় সেটা তার বহুগুণ বেশি।

তারপর, ওরা যত জেদ করতে লাগল, আমি উল্টে বলতে লাগলাম—থাক না, ছেড়ে দে। যদি সত্যিই ষাঁড়ের গুঁতোয় মরি, তা হলে কত লোকের কত ফুর্তি হবে বল তো! শুধু-শুধু তাদের এমন একটা অকাল-আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার কোনও মানে হয়?

অমনি আরেক প্রস্থ 'রে রে'।

—ছাড়ো তো। যত আজেবাজে কথা।

দুই

আগের দিন সন্ধেবেলা পৌলমী সেই যে তিনশো চোদ্দো নম্বর ঘরে পৌঁছে দিয়ে ভারতীয় হাই কমিশনের নৈশভোজে গেল, তার কিছুক্ষণ পরই আমার খাবার এল ঘরে।

স্নান-টান সেরে ততক্ষণে শরীরটা জুড়োলেও, ওই বিশাল এয়ারপোর্টে দৌড়াদৌড়ি করায় পা-ব্যথা, গা-ব্যথারা ততক্ষণে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে।

ঘুমোলেই তারা আপনাআপনি প্রশমিত হবে, কিংবা আগামী দিনে নতুন করে পা রাখার জন্য আমাকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে দিতে তারা অন্তর্হিতও হতে পারে রাত ফুরনোর সঙ্গে-সঙ্গে—এই বিশ্বাসটুকু আমি কবে যেন হারিয়ে ফেলেছি। তাই ব্যথার ওষুধ আর ঘুমের ওষুধ খেতে-খেতে মনে হল, দেশে এখন প্রায় রাত তিনটে। আর ঘণ্টা দেড়েক পরে আমার ঘুম ভাঙার সময়।

তিন

ঘুম ভাঙল নির্ধারিত সময়েই। তবে সেটা দেশের সাড়ে চারটে নয়। স্পেন-এর সাড়ে চারটেয়।

ঘুমোতে যাওয়ার অল্প আগে অন্ধকার হয়েছে। দিনের তাপ মরে গিয়ে রাত্রির শীতলতা আলাদা করে বুঝতে পারিনি।

হোটেলের এয়ার কন্ডিশন যথাসম্ভব ঠান্ডা করলেও আমার আতপ্ত শরীর জুড়োবে না, এটা এতদিনে এত ভাল করে জেনে গিয়েছি আমি যে, যেখানেই যাই, আগে থেকে আমার ঘরে একটা সিলিং ফ্যান কিংবা পেডেস্ট্যাল ফ্যান রাখার অনুরোধ পাঠাই।

কে জানে, আসলে ছোটবেলা থেকে পাখার হাওয়াতেই বড় হয়েছি! এয়ার কন্ডিশন তো আমাদের বাড়িতে আমার শেষ-যৌবনের অতিথি। আমার তাই পাখার হাওয়াই ভাল লাগে। 'ভাল লাগে'টা কমিয়ে বললাম। পাখা ছাড়া আমার চলে না।

পৌলমীকে উপর্যুপরি বলে রেখেছিলাম, আমার পাখা-বাতিকের কথা। ও-ও কলকাতায় বড় হওয়ার সুবাদে বোধহয় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি আর পাখার সম্পর্কটা জানে।

হোটেলের ঘরে ঢুকতেই দেখি, আমাকে সহাস্যে স্বাগত জানাল একটা সাদা পেডেস্ট্যাল ফ্যান।

ফ্যানটা আদৌ চলবে কি না, তার হাওয়ার গতি কত শক্তিশালী—এসব ভাবতেই হল না আমার। আমার ঘরে একটা ফ্যান আছে—এই আশ্বাসটাই আমার শরীরটাকে অর্ধস্নিগ্ধ করে দিল। [illegible] হল।

এবার ওষুধ আর হাওয়ার সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে ঘুম আসতে দেরি হল না। ভাঙলও তার চিরবরাদ্দ [illegible] মাথায়।

এবার পর্দা সরিয়ে লম্বা Vertical blind একদিকে ঠেলে জানলা খুললাম। এবং তারপরেই আমার অবাক হওয়ার পালা।

নীচের রাস্তা—ঝলমলে আলোকোজ্জ্বল। প্রচুর যানবাহন এবং পথচারীতে ভর্তি। অনেকগুলো দোকানের সাইনবোর্ডে দিব্যি আলো জ্বলছে।

আর অজস্র অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে আমার জানলার নীচ থেকে ফুটপাতে নেমে রাস্তা পার হয়ে চলে যাচ্ছে উল্টোদিকে। কখনও ট্রাফিক বাঁচিয়ে, কখনও প্রায় চলন্ত গাড়িকে ইশারায় থামিয়ে।

একটু অবাক লাগল। কী, ব্যাপারটা কী? এখানে কি সারা রাত সব খোলা থাকে না কি?

ধীরে ধীরে অন্ধকার ফরসা হতে লাগল। রাস্তায় গাড়ি এবং মানুষ কমতে লাগল। একে-একে নিভতে থাকল দোকানের সাইনবোর্ড!

তখন খেয়াল হল গতকাল শুক্রবার ছিল। এই সবার ফ্রাইডে নাইট উদ্‌যাপন করে বাড়ি ফেরার পালা।

এবার বুঝতে পারলাম, সারা রাত ঘুমের মধ্যে যে অবচেতনে অনবরত বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম, সেটা আসলে এই হোটেল-এর ডিস্‌কোতেই বাজছিল। তারই রেশ চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আমার ঘুমের মধ্যে ঢুকেছে। আর যাই হোক, ঘুমের মধ্যে একটা বাজনার সংগত ভেবে নেওয়ার মতো কল্পনাপ্রবণ আমি নই।

১৩ নভেম্বর, ২০১১

সকালবেলা তৈরি হয়ে হোটেলের রিসেপশনে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম এক ভারতীয় ভদ্রলোক বসে কাগজ পড়ছেন এককোণে একটা সোফায় বসে। চেনা-চেনা লাগছে কেন ভাবছি, এমন সময় ভদ্রলোক কাগজ থেকে অন্যমনস্ক ভাবে মুখ তুললেন, বাইরের দিকে একবার তাকালেন, তারপর আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন,

—এসো ঋতুপর্ণ, বসো এখানে।

উপমন্যু। বেশ বয়স হয়ে গিয়েছে, চুলগুলো প্রায় সাদা। কিন্তু মুখটা তেমনই রয়ে গিয়েছে—English August-এর কভার জ্যাকেট-এ যেমনটা দেখেছি। সে তো আজ প্রায় বছর কুড়ি হতে চলল।

উপমন্যুকে দেখে গম্ভীর মনে হয়। কিন্তু এক নম্বরের আড্ডাবাজ।

যতক্ষণ না গাড়ি এসে পৌঁছল, সেটা খুব বেশি হলে মিনিট কুড়ি হবে, তার মধ্যেই দুনিয়ার আড্ডা মারা হয়ে গেল আমাদের। নানা বিষয় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। আমরা দু'জনেই অপেক্ষা করছি পৌলোমীর জন্য। পৌলোমী এসে আমাদের মিউজিয়াম-এ নিয়ে যাবে। Reigna Sofia Museum। যেখানে পিকাসো আর দালি-র অনেক অরিজিনাল কাজ আছে।

উপমন্যুর দেশে ফেরার ফ্লাইট আর কিছুক্ষণ পরেই। ফলে আমরা মিউজিয়াম দেখে সোজা এয়ারপোর্টে যাব। উপমন্যুকে ছেড়ে তারপর আমার সেগোভিয়া রওনা দেওয়ার কথা।

হোটেলের প্রধান দরজাটা কাচের। সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের রাস্তাটা খালি। কোনও গাড়ি-ঘোড়া চলছে না। কেবল পথচারী মানুষের ভিড়। আমি আর উপমন্যু দু'জনেই এটার মানে বুঝতে প্রায় অসমর্থ। ফলে নানারকম কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করছি—এমন সময় কাচের দরজা ঠেলে হাঁফাতে হাঁফাতে পৌলোমী ঢুকল। কিছু একটা স্থানীয় উৎসব আছে এই রাস্তায়, আজ ট্র্যাফিক নো-এনট্রি। আমাদের কিছুটা হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হবে।

দুই

Reigna Sofia Museum-টা তুলনায় অনেক আধুনিক। মাদ্রিদের অন্যতম আকর্ষণ। তার প্রধান কারণ বোধকরি 'গোয়ের্নিকা'। স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধর সময় ১৯৩৭ সালে আঁকা 'গোয়ের্নিকা'-র স্পেনে ঢুকতে সময় লেগেছিল আরও বছর পঞ্চাশেক। কারণ পিকাসো-র শর্ত ছিল, যতদিন না স্পেনে গণতন্ত্র ফিরে আসবে, 'গোয়ের্নিকা' ততদিন স্পেনের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই ১৯৩৭ থেকে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত ঠাঁই নিয়েছিল নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত মিউজিয়াম MOMA (Museum of Modern Art)-তে।

১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে MOMA থেকে 'গোয়ের্নিকা' রওনা দিল স্পেনের উদ্দেশে।

পাঁচ আট বছর আগে পিকাসো এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

উত্থান পতন, যুদ্ধ-শান্তির ইতিহাস-সমৃদ্ধ 'গোয়ের্নিকা তখন' থেকে মাদ্রিদে বাস করছে।

তিন

Reigna Sofia Museum-এ পৌঁছতে মিনিট কুড়ি লাগার কথা। নানা রাস্তায় অপ্রত্যাশিত নো এন্ট্রি বোর্ড দেখে বিচলিত চালক প্রায় আধ ঘণ্টার মাথায় আমায় মিউজিয়াম চত্বরে নামিয়ে দিল।

গাড়িতে ওঠার পর থেকেই উপমন্যু একটু চুপচাপ—নানা রাস্তা বন্ধ দেখে ওর নিশ্চয়ই সময়মতো এয়ারপোর্টে পৌঁছনোর দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমার দুশ্চিন্তাটা একটু অন্যরকম—সময়মতো পৌঁছতে না-পারলে, মিউজিয়াম ঘুরে দেখার বরাদ্দ সময়টুকু কমবে।

Reigna Sofia Museum একটা বড় আধুনিক বাড়ি। একদিকটা পুরো কাচের। তাতে রৌদ্রালোকিত মাদ্রিদ ছড়িয়ে বসে নিজের মুখ দেখছে। আর বিশাল অট্টালিকা ছায়াবৃত একতলায় একটা ছোট্ট ক্যাফে।

এক গ্লাস জল খাব বলে ক্যাফেতে ঢুকেছি। হঠাৎ একটা টেবিলের দিকে নজর পড়তে অবাক হলাম।

বাবা মা কোণের টেবিলে বসে খাচ্ছে। কাছে যেতেই মা থরথর হাতে ধরা চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। হেসে বলল—বোসো।

আমি জানি মা'র পুরো মিউজিয়াম ঘুরে দেখার শক্তি নেই। বহুদিন থেকেই। আর বাবার অসীম উদ্দীপনা বাবাকে সবসময় আমার থেকেও কমবয়সি করে দেয়।

অতএব, এক্ষেত্রে যা ঘটার তাই ঘটল। মা-কে ক্যাফেতে বসিয়ে রেখে আমি আর বাবা মিউজিয়াম-এর দিকে রওনা দিলাম।

মা থরথরে হাতে কফির কাপটা আবার তুলে নিয়ে রোদ্দুর দেখতে লাগল।

চার

একটা বিশাল দেওয়াল জুড়ে শুধু 'গোয়ের্নিকা'। স্পেনের ষাঁড় ওদেশের মাটিতে ওই প্রথম দেখলাম—পিকাসো-র ক্যানভাসে। ছবিটা যে এত বড়, আক্ষরিক অর্থে 'একঘর'—সেটা সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে বোঝা যায় না। এ-ও বোঝা যায় না যে, যুদ্ধবিরোধী এত মহৎ একটা বার্তাকে পরিস্ফুট করার জন্য বড় বা ছোটর যে সঠিক মাপবোধ, সেটা কত যথার্থ হলে পিকাসো-কে আমার পিকাসো বলি। ঠিক যত বড় হলে আমরা 'অতিকায়' বলি ততটা নয়, আবার ঠিক যতটা ছোট হলে আমাদের মাথা নত হবে না, তার থেকে বড়—এই সঠিক পরিমিতির সামনে দাঁড়িয়ে 'গোয়ের্নিকা' নামে যে-গ্রামটা বোমারু আক্রমণে তছনছ হয়ে গিয়েছিল, ১৯৩৭ সালের জুন মাসে—এবং চিরস্থায়ীভাবে শিল্পীর সাদা-কালো ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে রইল স্বৈরাচার, হিংসা ও মানুষের যন্ত্রণার

বিশ্বপ্রতীক হয়ে—সেই গ্রামটা চিরসঞ্জিবীত হয়ে ওঠে প্রতিটি মানুষের সত্তায়। অমরত্ব বোধহয় একেই বলে।

মিউজিয়াম থেকে যখন শেষমেশ বেরলাম তখনও কীরকম একটা ঘোরের মধ্যে যেন। চট করে এক কাপ কফি খেয়ে নেবে বলে উপমন্যু কাফেতে ঢুকল।

মা তখনও রোদ্দুরের দিকে চেয়ে বসে। কাছে গিয়ে বললাম,

—যেতে পারতে। লিফ্‌ট আছে। সিঁড়ি ভাঙতে হত না। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে ফোকলা মুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন স্প্যানিশ বৃদ্ধা। তারপর জালি-জালি শাল আর লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ঠুকঠুক করে হেঁটে চলে গেলেন ছায়া থেকে রৌদ্রের মধ্যে।

২০ নভেম্বর, ২০১১

সেগোভিয়া শহরটা মাদ্রিদ থেকে হাইওয়েতে গাড়ির দূরত্বে ঘণ্টা দুয়েক।

স্পেন দেশটার (যেটুকু আমি গাড়ির জানলা দিয়ে দেখেছি) কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য পাইনি। ধু-ধু রুক্ষ প্রান্তর, পাথুরে জমি—সে আমাদের পুরুলিয়াতেই পাওয়া যায়। বা, আগে প্লেনে করে মুম্বই যাওয়ার সময় যখন ঘোষক বলতেন, আমরা এখন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ওপর দিয়ে চলেছি, আর আমি সন্তর্পণে নীচে তাকাতাম প্রায় যেন শিবাজি-র অশ্বারোহী বাহিনীকে দেখতে পাব ভেবে—ঠিক তেমনটাই খয়েরি সবুজ পাথুরে প্রান্তর স্পেনের অধিকাংশটা জুড়ে।

সকাল এগারোটার রোদে আমাদের দেশের বেলা তিনটের তাপ। গরমও বেশ, এয়ারকন্ডিশনড গাড়ির মধ্যে বসে অবশ্য সেটা ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। আমার বাঁদিকে জানলার বাইরে আরেকটা টিলা দেখতে পেলাম। তার ওপরে একটা অতিকায় ক্রস পোঁতা। সেদিকে চোখ পড়তেই কৌতূহলবশত ঝুঁকে এগিয়েছি। পাশে-বসা পৌলোমী হাঁ-হাঁ করে উঠল।

—ওদিকে তাকাবেন না, তাকাবেন না।

—কেন?

—বলছি তাকাবেন না। আগে মুখটা ফেরান। আমি যারপরনাই আশ্চর্য। আর পৌলোমী কাঠ হয়ে ডানদিকের জানলার বাইরেটা দেখিয়ে বলছে,

—এদিকে দেখুন না!

কিছুক্ষণ পর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কারণটা পরিষ্কার হল। ওটা ফ্রান্সিস ফ্রাঙ্কো-র সমাধি।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের কলঙ্কিত ইতিহাসের খলনায়ক মারা গিয়েছেন 1975 সালে। ওটা তাঁর সমাধিক্ষেত্র।

জানার পর একবার ফিরে না-তাকিয়ে পারলাম না। নিশ্চিদ্র নীল আকাশের গায়ে, পাথুরে টিলার মাথায় একটা বড় কাঠের ক্রস। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মানুষের অভিশাপ কুড়োতে কুড়োতে প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নিঃসীম নিসঙ্গতায়।

পৃথিবীর যে ক'জন ঘৃণিত সত্তা, জীবদ্দশায় যাদের শক্তির সামনে মানুষ নিশ্চুপ থেকেছে এবং মৃত্যুর পর তাদের যথেচ্ছ কলঙ্কলেপন করেছে, তাদের সকলের কথাই মনে হল। মনে হল, দুষ্কর্মের আয়ু তো জীবনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। তারপর বাকিটা পড়ে থাকে কেবল অভিশাপের অধ্যায় হয়ে। তখন তার মধ্যে ভালর কণিকামাত্রও যদি থেকে থাকে, সেটার আর কোনও আলোচনা হয় না। জীবনও তাকে সুযোগ দেয় না কোথাও আর মানবিকতার গহীন থেকে উঠে এসে অনুশোচনায় নতজানু হতে, যে কেবল মানুষের মনে এক নিষ্পুণ্য দুষ্কৃতী। কেন যেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর কথা মনে হল। যেহেতু তাঁর প্রস্থানের পথটুকু জনমনে কয়েক বছরের প্রতিকূল অনুভূতি দিয়ে গড়া, অনেক সুকীর্তি সত্ত্বেও তিনি কি কেবল নন্দীগ্রামের কলঙ্কিত নায়ক হয়েই বেঁচে থাকবেন মানুষের মনে?

দুই

সেগোভিয়া শহরটা ছোট্ট। প্রায় হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো শহরটা চলচ্চিত্রোৎসবের সময়টা বাদ দিলে যেমন নিরিবিলি—অনেকটা তেমনই।

উঁচু-নিচু পাথুরে গলি এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অনেক পুরনো বাড়ির মধ্যবর্তী পথ হয়ে। দু'পাশে নানা ধরনের বাড়ি—আর প্রত্যেকটার ছোট্ট বারান্দা বা জানলায় যে কী অপূর্ব রেলিং সব! দেখলেই মনে হয় খুলে নিয়ে আসি।

এই একটা জিনিস আমি সারা পৃথিবী ঘুরে দেখলেও বোধহয় আমার সাধ মিটবে না। বাড়ির বারান্দা। ছোট, বড়, মাঝারি, নানা আয়তনের। সান ফ্রান্সিসকো-য় একরকম। আমেরিকার পূর্ব উপকূলে আবার বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট্ট ডেক-এর চল। তারপর রাজস্থানের ছোট বারান্দা। বেনারসের জালি-ঢাকা বারান্দা, বাঁদরের যথেচ্ছ প্রবেশ আটকাতে। আর কলকাতার বারান্দার তো কথা-ই নেই।

'বারান্দা' শব্দটার ব্যুৎপত্তি দেখতে ইচ্ছে হল। 'চলন্তিকা' বলছে ফারসি 'বরাম্‌দহ' কথাটি এর আদি জননী। তবু, আমার সংকীর্ণ ভারতীয় মন ভাবতে চাইল—নিশ্চয়ই এটা কোনও সমার্থক ভারতীয় শব্দের অজ্ঞাত সন্তান—নইলে নিতান্তই কাকতালীয় ভাবে অলিন্দ-র 'দন্ত্য ন-এ দ'-টা অত স্বচ্ছন্দে বারান্দা বানানে এসে জুড়ে বসল—এটা কি একটা রহস্য নয়?

তিন

সেগোভিয়া পৌঁছতে-পৌঁছতে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। খিদেও পেয়েছে কিছুটা। একটা পুরনো অট্টালিকার সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াল। এটাই নাকি আমাদের হোটেল—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় কোনও ধনীগৃহ। কিন্তু তাতে গৃহোস্তবটাই প্রবল, পৃথিবী জুড়ে পান্থাবাসের যেমন একটা একঘেয়ে ধাঁচ হয়েছে আজকাল, এটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক নয়নাভিরাম।

অনেক সময় আবার এই রাজগৃহ বা কোনও প্রাচীন ধনীর অট্টালিকাকে পরবর্তী কালে হোটেলে রূপান্তরিত করার কতগুলো সমস্যাও আছে। পুরনো স্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্য তেমন অবলীলায় মিল খায় না। অথচ পয়সা দিয়ে হোটেলে যাঁরা থাকেন, তাঁরা আজকের দিনের স্বাচ্ছন্দ্যের কোনওরকম ঘাটতিটুকু প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন না। তাই দুই কালকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে একটা বিভ্রাট ঘটে।

এই হোটেলের ভেতরটা সাদামাঠা, সহজ—কোনও বাহুল্য নেই, আবার এমনটাও নয় যে, মিউজিয়ামের কোনও ঘরে কষ্ট করে রাত কাটাতে হচ্ছে!

খবর এল নীচে আমার লাঞ্চ বলা আছে। সেখানে 'Hay festival'-এর কয়েকজন অপেক্ষা করছিলেন।

চার

বাড়ির মাঝখানটাতে একটা বড় চৌকো উঠোন, সাধারণত যাকে পোর্টিকো বলে। সেখানেই চেয়ার-পরিবিষ্ট ছোট-ছোট টেবিল পাতা। রোদের ঝাঁজ মোটা দেওয়ালের আবরণ ভেদ করে এখানে এসে পৌঁছয়নি—ফলে জায়গাটা অনেকটা ঠান্ডা।

ঢুকতেই দেখি বুবু (সঙ্গীতা), আর গ্যুয়েরমো। গ্যুয়েরমো-র সঙ্গে আগে বহুবার ফোনে কথা বলেছি। ই-মেল এবং ফোনে মেসেজ বিনিময় হয়েছে বহুবার। কিন্তু ওকে চাক্ষুষ দেখলাম এই প্রথম।

দেখামাত্রই প্রায় দীর্ঘ পরিচিতের মতো আড্ডা শুরু হয়ে গেল। আজ বিকেলের 'Hay festival'?এ আমার প্রেজেন্টেশন, তারপর আমার সঙ্গে কথা বলবেন একজন, বরিস—কী যেন একটা।

ইউরোপের রুটি জিনিসটা এমন চমৎকার যে, কেবল রুটি আর চিজ খেতে-খেতে আড্ডা মেরে চললেই কখন যেন পেট ভরে যায়, খেয়াল থাকে না। আমরা মশগুল হয়ে আড্ডা মারছিলাম। পরিবেশ আর আহার্য মিলে এমন একটা আরামের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হল—পথশ্রান্তির অবসাদ কখন মিলিয়ে গিয়েছে খেয়ালও করিনি।

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সমানে সাঁতরে যাচ্ছি আমরা—এমন সময় বলিষ্ঠ চেহারার একজন স্প্যানিশ যুবক হঠাৎ কোনও একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাকে দেখে গ্যুয়েরমো আর

সঙ্গীতা আমার দিকে এমন অর্থপূর্ণ ভাবে তাকাল, তখন তার মানে বুঝিনি। তারপর প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘটা করে যখন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল, ভদ্রলোক কেমন একটা লাজুক-লাজুক মুখ করে,

—আচ্ছা, আসি।

বলে কেটে পড়লেন, তখনও আমি একটু বিস্মিত। বুবু আর গুয়েরমো-র দিকে তাকিয়ে দেখি, দু'জনেই আমার দিকে দুষ্টুমিভরা চোখ নিয়ে মুখ টিপে হাসছে। বুবু মুচকি হেসে জিগ্যেস করল,

—পছন্দ হয়েছে বরিসকে?

প্রথমটায় একেবারেই কিছু বুঝিনি। তারপর মনে পড়ল কিছু ছেঁড়া-ছেঁড়া ই-মেল অংশ, আর গুয়েরমো-র কতগুলো ফোন।

ততক্ষণে আমার মাথাটা দুয়ে-দুয়ে চার মেলাতে শুরু করেছে।

এতক্ষণ কী তা হলে গুয়েরমো আর বুবু দায়িত্ব নিয়ে আমার সঙ্গে বরিস-এর ঘটকালি করছিল?

(ক্রমশ)

২৭ নভেম্বর, ২০১১

ভদ্রলোকের নাম বরিস ইজ্যাগোরে। ভাল করে যখন পরিচয় হল বিকেলবেলা, তখন জানলাম বিশদে বরিস-এর পরিচয়। বরিস কবি, নামকরা কলাম-লিখিয়ে। ভীষণ জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব। একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ—অনেকটা প্রীতিশদা (নন্দী) যেমন ছিলেন যৌবনে। তার ওপর বরিস আবার স্পেনের একজন নামকরা গে-অ্যাক্টিভিস্ট।

এবার কিছুটা মেলাতে পারলাম। সারা পৃথিবীর এত অভ্যাগত থাকতে কেন বেছে-বেছে আমার সঙ্গে কথোপকথনের ভারটুকুই বরিস-কে দেওয়া হয়েছে।

এবং শুধুমাত্র আমরা কথোপকথনের জন্য মঞ্চে উঠব, এইটুকুতেই উৎসব-উদ্যোক্তারা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা আপ্রাণ চাইছেন সন্ধে অবধি বাকি সময়টুকু আমি আর বরিস যাতে নিভৃতে কাটাই।

ওঁরা মুখে বলছেন 'ইন্টিমেট ইন্টেলেকচুয়াল এক্সচেঞ্জ'—যাতে মঞ্চে আমরা পরস্পরের সামনে সাবলীল হই; বেশ বুঝতে পারছি ওঁরা মানে করছেন, 'ইন্টেলেকচুয়াল কোর্টশিপ'।

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এই আটচল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়সে এসে কলেজের ফার্স্ট ইয়ার এর এই র‍্যাগিং-ও আমার কপালে ছিল? তাও কিনা ভিনদেশে?

আমি দেখলাম এবার আমার স্টারডম না ব্যবহার করলে কোনও অব্যাহতি নেই। গম্ভীরভাবে বললাম,

—আমার মাথাব্যথা করছে। আমি একটু ঘুমোব। এবং সেটা একা। আর মঞ্চের জন্য আমার কোনও প্রস্তুতির দরকার নেই। এরকম বক্তৃতা বা কথোপকথন আমি পূর্বে বহুবার করেছি।

একবার ভাবলাম বলি, আমিও টেলিভিশন টক শো-তে কম সফল নই। তারপর মনে হল, সেটা অনেকটা এদের মনগড়া স্বয়ংবর সভায় পাত্র বনাম পাত্রীর তুলনামূলক গুণবিচারে গিয়ে ঠেকবে।

দেখলাম উৎফুল্ল মুখগুলো একটু দমে গেল। একটু মায়াও হল আমার। তবু গলার স্বরের গাম্ভীর্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সামান্য মোলায়েম করে জিগ্যেস করলাম,

—সন্ধেবেলা বরিস কি পরছে?

ভঙ্গিটা এই যে, তার সঙ্গে মানানসই পোশাক পরাটুকুতে আমার আপত্তি নেই। উত্তরটা এল বরিসের কাছ থেকে,

—ছাইরঙা স্যুট।

এই প্রথম তাকিয়ে দেখলাম বরিসের মুখটা। অপরাধীর মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। তাও একটা সৌজন্যের কাষ্ঠ-হাসি। আমার থেকে ছোটই হবে ছেলেটা। কেবল কাঁচাপাকা চুলের জন্য ঠিক বোঝা যায় না।

একবার মনে হল, সত্যিই নিভৃতে ডেকে জিগ্যেস করি যে, ও-ও কি উপভোগ করছে এই কল্পনার জুটিবাঁধা? কী মনে হল, অল্প হেসে বললাম,

—ok! আই উইল ট্রাই অ্যান্ড ফাইন্ড সামথিং দ্যাট গোজ উইথ ইট।

দুই

বিকেলবেলা তৈরি হয়ে যখন লবি-তে নামলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করছে বুবু, আর গুয়েরমো—সেজেগুজে সন্ধের অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি। আমাকে দেখে চোখ ছানাবড়া করে বুবু গুয়েরমোকে বলল,

—লুক অ্যাট রিতু!

মনে হল বুবুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে দিই ঠাস করে একটা। যেন, ও আমাকে এই প্রথম সাজতে দেখল!

আসলে, আজকে আমার সাজের একটা অন্য অর্থ করা হবেই। এটা সম্পূর্ণভাবে আমার অনুমানের বাইরে ছিল না। বুঝলাম, অনুষ্ঠান শেষ হওয়া অবধি এই কনে-খ্যাপানো ব্যাপারটা চলবেই। এটাকে পাত্তা না-দেওয়াই সমীচীন।

গুয়েরমো জিগ্যেস করল,

—গাড়ি আছে। কিন্তু তুমি চাইলে হেঁটেও যেতে পারো। খুব দূরে নয় ভেনু।

মুহূর্তে আমার মন ভাল হয়ে গেল। বিদেশে এই ধরনের সভা সমিতিতে যোগ দিতে আসার একটা বিষম বিপদ এই যে, নিজের মতো করে জায়গাটা ঘুরে দেখা যায় না। অতএব এই আমন্ত্রণ সত্যিই নিতান্তই লোভনীয়।

বুবু একটু গাঁইগুঁই করল,

—বাইরে কিন্তু গরম, ঋতু। পারবে?

সত্যিই, হোটেলের জানলা দিয়েই দেখা যাচ্ছে কড়া সোনালি রোদ্দুর, তাতে এখন চায়ের লিকারের রং ধরেছে। একটু ঘাবড়ে গেলাম না, তা নয়। তারপর বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মাঝপথে যদি বিচ্ছিরি রকমের হাঁপাই—একে তো ইউরোপে ভারতীয়দের ঘরকুনোপনা এবং অকর্মণ্য আলস্য নিয়ে প্রভূত হাসিঠাট্টা হয়— সেটাকে সশরীরে প্রমাণ না-করলেও বোধহয় আমার চলবে।

আবার বাইরের দিকে তাকালাম। হোটেলের বাগানটুকুতে কেয়ারি-করা ফুল রোদে ঝলমল করছে। লম্বা-লম্বা গাছের পাতাগুলো মৃদু হাওয়ায় শিরশির করে কাঁপছে। হঠাৎ মনে হল- আমি না রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বলতে এসেছি! জানলা বন্ধ এসি গাড়িতে চেপে সে-মানুষটার অপমান নয় না-ই করলাম। তাতে আমার একটু কষ্ট হয় হোক।

গুয়েরমো-কে বললাম,

—গাড়ি ছেড়ে দাও। আমরা হেঁটেই যাই।

তিন

হেঁটে যাওয়া মানে যে জায়গা দেখার বাইরে এত বড় একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা অপেক্ষা করছিল আমার জন্য, কে জানত। গুয়েরমো তক্ষুনি নিজের ভাষায় গাড়ির চালককে কোনও একটা নির্দেশ দিল। হোটেলের মোরাম-বিছানো পথ বেয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের রাস্তার ডানদিকের বাঁকের আড়ালে। গুয়েরমো তখনও ফোনে কার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। বুবু-র কাছে গিয়ে বললাম,

—তা হলে এগোই, চল।

বুবু একটু গলা নামিয়ে বলল,

—দাঁড়াও। ও ফোন করে ডেকে নিচ্ছে এখানে।

—কাকে?

—বরিসকে। আসলে আমরা ওকে বলেছিলাম যে তুলে নেব।

অজান্তে আমার মুখটা নিশ্চয়ই বদলেছিল। সেটা দেখে বুবু বলল,

—ও কাছেই থাকে। দেরি হবে না বেশিক্ষণ। আমি একটু ভুরু কোঁচকালাম।

—কী শুরু করেছিস বল তো তোরা?

মুখ টিপে হাসল বুবু,

—তুমি এনজয় করছ না বলো। সত্যি কথা বলবে।

চার

বরিস এসে পৌঁছল সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই। বোঝাই যাচ্ছিল, খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছে বেচারা। অল্প হাঁপাচ্ছে। কপাল জুড়ে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। আর হাতে একটা লম্বা ডাঁটির মস্ত গোলাপ ফুল।

কোনওরকমে সেটা এগিয়ে দিল আমার দিকে,

—এটা তোমার জন্য।

এখন ভাবি, সেই মুহূর্তে কেউ আমার ছবি তোলেনি কেন? এই যে আমি নিজেকে চরমতম দুঃসাহসী মনে করে পটাপট নানারকম ঘটনা ঘটিয়ে ফেলি, তারপরেও আমার মধ্যে এখনও এই বুড়োবয়সে এসে যে লজ্জা বলে কিছু অবশিষ্ট আছে, সেটা বোধহয় এ-টনাটা ছাড়া বোঝাই হত না আমার।

সত্যি, নিজেকে চিনতে কত সময় লাগে আমাদের! কত বয়ে যাওয়া মুহূর্ত কীভাবে যেন আমোঘ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমার না-জানা 'আমি'-টাকে।

অনেক ধন্যবাদ বরিস! আমার কঠিন মনে এখনও যে কোনও কোমলতার ছিটেফোঁটাও পড়ে আছে, সেটা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য।

৪ ডিসেম্বর, ২০১১

সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানটা মিটে গেল নির্ঝঞ্ঝাটে। আমার রাগের কথাটাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত। কোনওরকম আলাদা প্রস্তুতি ছাড়াই বরিস আর আমি মঞ্চে বসে ঘণ্টাখানেক গল্প করে গেলাম। অবলীলায়। কথা বলতে-বলতে মনে হচ্ছিল আমরা যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত। বুঝলাম টেলিভিশনে বরিস-এর শো কেন এত জনপ্রিয়।

অনুষ্ঠান শেষ হল যখন, ঘড়ি বলছে সাড়ে ছ'টা। কিন্তু বাইরের আকাশ বলছে—ঘড়ি দেখে অন্ধকার হয় বুঝি?

হাঁটাপথে আমরা সেগোভিয়ার প্রধান চত্বরটার দিকে চলেছি। বাকি সবাই—গ্যুয়েরমো, বুবু, Hay Festival-এর প্রধান কর্মসচিব শীলা—সবাই হাঁটছি একসঙ্গে। ওরা ইচ্ছে করেই একটু

এগিয়ে গিয়ে আমাকে আর বরিসকে নিভৃতি দিতে চাইছে। সেদিন রোববার বিকেলবেলা। গির্জা ফেরত যত মহিলা বরিসকে দেখে কেমন যেন বিস্ফারিত চোখ করে হাতের ফুলগুলো ছুড়ছে ওর গায়ে। বুঝলাম মহিলা-মহলে ও সত্যিই বেশ জনপ্রিয়, বহু নামজাদা চিত্রতারকার সঙ্গে নানা জায়গায় গিয়েছি আমি, কিন্তু এরকম স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা চোখে পড়েনি।

কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম বরিস-এর পাশে আমার উপস্থিতিটা ওর মহিলা ভক্তবৃন্দের কাছে মোটেই আনন্দদায়ক নয়। বরিসকে দেখে ওদের যতই ফুর্তি, ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে আমায় দেখে ততটাই বিরক্তি। দু'-একজন কেবল চোখ গোলগোল করে দেখল না, ভেংচিও কাটল। যত প্রাণপণই চেষ্টা করুক বরিস, আমাকে বরিস-এর পাশে মেনে নিতে ওর ভক্তদের চরম আপত্তি।

এমতাবস্থায় যা করে এসেছি চিরকাল, তাই করলাম। একটু জোরকদমে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে গেলাম একা। একে উঁচু-নিচু এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তা, তায় আমার পায়ে চামড়ার চটি পিছলোচ্ছে। তার মধ্যেই আমি লম্বা ডাঁটির একটা বিরাট গোলাপফুল হাতে সোজা এগিয়ে চলেছি। আর বরিস বেচারা 'রাধা রাখি না কুল রাখি'—মুখ করে অসহায় ভাবে আমার পেছন পেছন আসছে। এক্ষেত্রে, রাধিকাটি কে, সেটা আর বললাম না, 'কুল' বলতে বরিস-এর ভক্তকুলই ধরে নেওয়া যাক আপাতত।

দুই

সেগোভিয়া-র প্রধান চত্বরে একটা বহু পুরাতন গির্জা। প্রতি রোববার গির্জা থেকে মাতা মেরি (এখানে তিনি Black Madonna রূপে অবস্থিতা) পরিভ্রমণে বেরোন। আমাদের পুরীর মন্দিরের জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি যাওয়াটা যদি বার্ষিক না-হয়ে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হত—ঠিক সেরকম। বিশপ, আর্চবিশপ-রা সবাই মূর্তি ঘিরে থাকেন। আর পেছনে-পেছনে কুচকাওয়াচ করে চলে সেনাবাহিনী, ঝকঝকে খোলা তলোয়ার হাতে।

এমনিতেই স্প্যানিশরা বেশ সুদর্শন।

তরুণ সামরিক দলটা যেন সেই রূপবান জাতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বছর ৩২-৩৫ বয়সি যুবারা সম্মুখভাগে, আর বয়স অনুসারে কমছে পেছনের সারি। একেবারে শেষে, যেখানে সতেরো আঠেরো বছররা দৃপ্তপায়ে খোলা তরবারি হাতে হেঁটে আসছে—খেয়াল করে দেখলাম, তাদের মধ্যে কয়েকজন নারী, মাথার টুপি কোনওক্রমে আড়াল করেছে তাদের সোনালি বেড়াবিনুনি। দেখে মনে হল, চিত্রাঙ্গদার গল্পটা তা হলে কেবল আমাদের দেশেরই নয়।

পথের দু'ধারে প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছেন এই বৈকালিক অনুষ্ঠান। বোঝা গেল যে, প্রায় গ্রাম্য একটা শহরে আজও সপ্তাহান্তের এই ধর্মশক্তির আস্ফালন তাঁদের কাছে প্রাচীন স্পেনের বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাসের এক মনোরম পুনরাভিনয়।

হঠাৎ একটা বাজনা বেজে উঠল। সবাই একটু নড়ে-চড়ে উঠল—তারপর আবার শিথিল

শরীরে পূর্ববৎ। খোঁজ করে জানলাম, এটা স্পেনের জাতীয় সংগীত। সেটাকে সম্মান জানানোর কোনও বিশিষ্ট প্রথা নিতান্তই যখন চোখে পড়ল না, গুয়েরমো-কে আবার জিগ্যেস করলাম। গুয়েরমো অল্প হাসল। তারপর ওর কাছ থেকেই জানতে পারলাম যে এটা শুধু স্পেনের জাতীয় সংগীতের সুরটুকু মাত্র। এখনও বাণী রচিত হয়নি। সারা স্পেন জুড়ে প্রতিযোগিতা চলছে, যেটি শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাবে, সেটিই জাতীয় সংগীত বিবেচিত হবে। এ যেন বিনাকা গীতমালা। বা Nivea Quotation Contest, এরকম করে জাতীয় সংগীত তৈরি হয় কে বা ভেবেছিল। পরে মনে হল বরিস-এর সঙ্গে ভাবটা একটু গাঢ় করে নিয়ে একবার রবীন্দ্রনাথের 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটা স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিলে কেমন হয়? মধ্যে 'ভারত তবু কই'-টা স্পেন করে দেওয়া নিশ্চয়ই বরিস-এর পক্ষে কঠিন হবে না—ও না কবি? আর মধ্যে থেকে আমি পুরস্কার হিসেবে সরকার থেকে একটা ভিলা-টিলা চেয়ে নিতে পারি।

এই প্রথম বুঝলাম বরিসকে আমি miss করছি। অবশ্য যে কোনও কারও দাক্ষিণ্যেই যদি তেমন মূল্যবান একটা পুরস্কার প্রাপ্তি হয়, তবে তাকে মনে পড়াটাই স্বাভাবিক।

তিন

বরিস এসে পৌঁছে গিয়েছিল বেশ আগে। কিন্তু চলমান মিছিল ততক্ষণে ওর পথ আটকে দিয়েছে। উল্টো দিকের ফুটপাথে একা দাঁড়িয়ে যত পেরেছে অটোগ্রাফ দিয়েছে। এমন করে এসে বলল যেন মশা কামড়াচ্ছিল ওকে।

মিছিল পার হয়ে যেতে চত্বরটা খালি হয়ে গেল। আমরা ধীরে-ধীরে রাস্তার ধারে একটা কাফের দিকে এগোলাম। আমার হাতে তখনও ধরা বরিস-এর দেওয়া সেই লম্বা-ডাঁটি বিরাট গোলাপ ফুলটি।

সবাই মিলে গোল হয়ে এসে বসেছি পথপার্শ্বের সেই কাফে-তে। এখানকার মানুষদের আবার স্প্যানিশ খাদ্য বিষয়ে একটা বিশাল অহংকার। নৈশভোজে গিয়ে Rissotto খাব বললে এদের চরম অপমান করা হয় নাকি—কেন আমি স্পেনে এসে ইতালীয় খাবার বেশি পছন্দ করছি?

আপাতত বিকেলের এক কাপ কফির জন্য সবাই মিলে বসা, কফির সঙ্গে বড়জোর একটা কেকের টুকরো। আমার ডায়বেটিক কপালে আবার তাও মানা, এ ধরনের বৈকালিক আড্ডায় সবাই মিলে গোল হয়ে বসবে—সেটাই দস্তুর বলে জেনে এসেছি এতদিন। আজ দেখলাম অন্য ব্যবস্থা। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গীদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

আমাকে আর বরিসকে পাশাপাশি দু'টো চেয়ার দেওয়া হয়েছে। আর উল্টোদিকে জনাচারেক বসেছে অন্য টেবিল থেকে চেয়ার টেনে এনে। জানি এটা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই—তাই চুপ করে বসে ওদের নাটক দেখছি, এমন সময় কে যেন বলল কথাটা।

স্পেনে আজ শেষবারের মতো ষাঁড়ের লড়াই হয়ে গেল। এরপর থেকে সারা দেশ জুড়ে এই খেলা নিষিদ্ধ। জানি না আমার মনখারাপ হওয়া উচিত কি না, তবু কেমন যেন উদাস হল মনটা। কফির টেবিলে তখন তুফান উঠেছে—এটা ভাল হল, না মন্দ হল তাই নিয়ে। সাতশো বছরের ঐতিহ্য বলে কথা, আবার অন্য কেউ বলছে একটা নিষ্ঠুর ঐতিহ্যকে ভাঙতে তো হবে কোনও সময়। আর আমি মন দিয়ে শুনে চলেছি।

তারপর একসময় যখন দেখলাম এবার আড্ডার তীব্রতা এলোমেলো হতে শুরু করেছে, সামনেই ছিল শীলা একটা চ্যাপ্টামতন দুল পরে—সোনার, কিন্তু মোটেই চকচকে নয়, মোটের ওপর ভারি সুন্দর—শীলাকে বললাম—দুলটা ভারি সুন্দর তোমার, কোথা থেকে কিনেছ? শীলা একে ব্রিটিশ, তায় বিষম কেতাদুরস্ত। হঠাৎ প্রশংসায় মুখটা নিমেষে লাল হয়ে গেল। অনেকবার Thank you, Thank you বলে জানলে যে, এই Hay Festival-এর জন্যই একবার কলম্বিয়া গিয়েছিল, সেখান থেকে কেনা।

শুনে মন এবং মুখ দু'টোই বেজার হল। এক্ষুনি কে আর কলম্বিয়া যাচ্ছে? শীলা সমানে বলে চলেছে যে জায়গাটা কত সুন্দর, আর ও আমাকে যতটুকু বুঝেছে, আমার নাকি ভীষণ ভাল লাগার কথা। আমি শুনছি, মাথা নাড়ছি আর মনে-মনে আক্ষেপ করছি যে পৃথিবী জুড়ে কত না সুন্দর জায়গা পড়ে আছে—এ জীবনে তার সিকির সিকিও দেখা হবে না, এমন সময় জলদগম্ভীর গলায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বরিস বলল,

—তুমি যাবে কলম্বিয়া? আমি নিয়ে যাব তোমায়।

সেই শুনে স্বাভাবিক ভাবেই টেবিলে একটা উচ্ছ্বাস-কলরব উঠল। সবাই একসঙ্গে এমন করে হাততালি দিয়ে উঠল, যে, পাশের টেবিলের ওয়েটার মেয়েটিও তাড়াতাড়ি এসে হাততালি দিতে লাগল, তারপর ভীষণ নিচুস্বরে বলল,

—আমরা জন্মদিনের কেক-ও বানাই। দেব?

আমি দেখলাম, এই তামাশাটা অগ্রাহ্য করার একটাই সোজা উপায়। বরিস-এর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললাম—যেতে পারি।

আবার একজোট হইহল্লা। সমবেত কণ্ঠে 'ইয়ে, ইয়ে, ইয়ে'। বরিস-ও দেখলাম পাত্তা না দেওয়ার সংকল্প করেছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলল—জানুয়ারিতে চলো। ভাল লাগবে তোমার। খুব সুন্দর সমুদ্র আছে, বিচ আছে, আর কাছেই ভেনেজুয়েলা, আমি ওখানেই জন্মেছি। সেটাও দেখিয়ে আনব তোমায়।

আমার কানে কথাগুলো ঢুকছে, মনেও নিশ্চয়ই ঢুকছিল—তখন বুঝিনি। আজ লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি।

আমার যতদূর মনে আছে, আমি চুপ করে তাকিয়েছিলাম বরিস-এর মুখের দিকে। গির্জার ফাঁক দিয়ে অস্তরবির আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর। আর আমার বড় আপশোস হতে লাগল যে কেন আমি বরিস-এর চেয়ারটায় বসলাম না। ওই আলোটুকু তা হলে আমার মুখে এসে পড়ত, অন্তত।

(শেষ)

১১ ডিসেম্বর, ২০১১

বরিসের সঙ্গে তারপর আর আমার দেখা হয়নি। একটা ই-মেল এসেছিল—ও লন্ডনে আছে। আমি রবীন্দ্রনাথের তথ্যচিত্রর কাজে যদি মার্চে লন্ডনে যাই, যেমনটা যাওয়ার কথা, তা হলে বরিসের সঙ্গে দেখা হবে—এমনকী এও জানিয়েছে—ও আমাকে অপেরা দেখাতে নিয়ে যেতে পারে।

সেদিন সন্ধেবেলা সেগোভিয়া-র হোটেলে ফিরে এসে, রবিসের দেওয়া গোলাপ ফুলটা হোটেলের কাউন্টারের মেয়েটিকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এটা তুমি এখানে সাজিয়ে রেখো। কিন্তু আমি জানি, আমরা যখন বিকেলবেলা হোটেল থেকে বেরই, মেয়েটি দেখেছিল বরিসকে। মেয়েটা জানত, ফুলটা বরিসেরই আনা। ফলে ও-ফুলটা কাউন্টারে সাজিয়ে রেখেছিল, না কি নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে, সেটা আর আমি জানি না। দ্বিতীয়টা যদি ঘটে থাকে, তা হলে আমার নিজেরই ভাল লাগবে এই ভেবে যে, বরিসের কষ্ট করে আনা গোলাপ ফুলটা কাউকে-না-কাউকে একটা আনন্দ দিয়েছে।

যাই হোক, আপাতত-যে কথা হচ্ছিল, লন্ডনে গিয়ে অপেরা দেখা, বরিসের সঙ্গে। আমার মনে হয় সেরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম। আমি মার্চে যখন আমার গোটা টিম নিয়ে গিয়ে লন্ডনে এবং ইউরোপের অন্যান্য শহরে শুটিং করব—তখন শুটিং-ই আমার একমাত্র প্রেমিক—আর কারও সঙ্গে তার ফাঁকে টাইমিং করার জন্য মনে-মনে নিজেকে প্রস্তুত করা আমার পক্ষে শক্ত। অতএব, লন্ডনে, বরিস-এর সঙ্গে দেখা হলে কেবল টেলিফোনিক বা চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের বেশি যে কিছু হবে না, তা আমি জানি।

স্পেনের নীল আকাশ এখন আমার জানলার বাইরে ধূসর ইস্পাতের মতো দেখায়। মনে আছে, ভায়াদ্‌লি শহরে সেরভান্তিসঞ্জ-এর পুরনো দোতলা বাড়ির প্রেক্ষাপটে নীল আকাশের গায়ে একটা প্লেন যেতে দেখেছি, যেন কোনও নীল বোর্ডের গায়ে চকের আঁচড়। কলকাতায় ফিরে অনেক খুঁজেছি। তেমনটি আর দেখিনি।

স্পেনের ফুটপাথের ধারে গয়না-বিক্রেতা মহিলারা বসেন—ঠিক যেমনটি বসেন পৌষ মেলায়, শান্তিনিকেতনে। সেখান থেকে পছন্দসই কয়েকটা গয়না গাঁথিয়ে এনেছিলাম—পরা হয়নি। সেই সময়টা—রোদে পিঠ দিয়ে বসে গয়না বানানো—চমৎকার কেটেছিল—ভাষার সমস্যা কোনও বাধাই হয়নি কারও মধ্যে।

বরিস ইংরেজি জানে—তা ছাড়া আরও অনেক ভাষা।

ও আমাকে কলম্বিয়ার সোনালি স্বর্ণসৈকতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। চেয়েছিল, আমার পছন্দ হওয়া শীলার কানের সোনার দুল কিনে দিতে। এই সোচ্চার ভালবাসার উচ্ছ্বাস আমি পাইনি। কখনও বললেই চলে। তবু ভাবি, বরিস কি বাংলায় রবীন্দ্রনাথ জানে? ইচ্ছে করলে কি শক্তি চাটুজ্জের কবিতা গড়গড় করে বলতে পারবে?

এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন
পৃথিবীর সমস্ত রঙিন
পর্দগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা
গোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে রবে সূর্যমুখী-পাড়া
এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন।

যদি কোনো পৃথিবীর কিশলয়ে বেসে থাকো ভালো
যদি কোনো আন্তরিক পর্যটনে জানালার আলো
দেখে যেতে চেয়ে থাকো, তাহাদের ঘরের ভিতরে—
আমাকে যাবার আগে বলো তা-ও, নেবো সঙ্গে করে।

ভুলে যেয়োনাক' তুমি আমাদের উঠানের কাছে
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

বুঝেছি, এই বাংলা ভাষাই আমার মরণফাঁদ।
কিংবা জীবনদেবতা।
আমি বাঁচলুম।

১৮ ডিসেম্বর, ২০১১

বোলপুর গেলাম আবার। এবার বসন্তোৎসব-এর শুটিং করতে। আগে থেকে বুকিং ছিল না বলে, দুর্গাপুরের একটা হোটেলে রাত্রিযাপন করে পরের দিন কাকভোরে শান্তিনিকেতন। বসন্তোৎসবের ছবি তুলে তৎক্ষণাৎ কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর, এই প্রথম এতটা ধকল, একসঙ্গে। ফলে বন্ধুবান্ধবরা একটু চিন্তিতই ছিল—পারবে তো?

পারলাম। শেষ অবধি পারলাম। শুটিং সেরে ফিরে এসেই রাতের ট্রেন ধরে পাহাড়ে। ওখানে আবার দিন ছয়েকের শুটিং।

পাহাড় আমার আলাদা করে ভাল লাগে কি না, জানি না। তবে আমার বাবা-মা দু'জনেই খুব পাহাড় ভালবাসত। তাদের পাহাড়-প্রেমও ধীরে-ধীরে তাদের অন্য অসুখগুলোর মতো যেন আমার মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

মা'র শরীর একটু ভাল থাকলেই দেখেছি বুড়ো-বুড়ি পাহাড়ে যাওয়ার টিকিট কাটছে। কখনও সিকিম, কখনও দার্জিলিং বা কালিম্পং। আবার কখনও কুলু-মানালি, বদ্রীনাথ-কেদারনাথ।

মনে পড়ে বাবা-মা যেবার কেদারনাথ গেল, ওদের আসল গন্তব্য ছিল গঙ্গোত্রী। কেদারনাথ থেকে গঙ্গোত্রী-র পথ তেমন সুগম নয় বলে, মা কেদারনাথ-এ একদিন থেকে গিয়েছিল এক সাধুর কুঠিয়া-য়। আর বাবা অসীম উদ্দীপনা নিয়ে গঙ্গোত্রী অবধি রওনা দিল।

মা বলত—ওই কুঠিয়া-র দিনগুলোর মতো শান্তি আর আনন্দ একসঙ্গে খুব কমই পেয়েছি।

একবার মা, সেই কুঠিয়া-র সাধুকে জিগ্যেস করেছিল,

—আচ্ছা, এখানে জমির দাম কত? একটা বাড়ি বানিয়ে থাকা যায় না?

সাধুবাবা উত্তরে বলেছিলেন,

—কেন জমি কিনবি? ইচ্ছে করলে আমার এখানে এসে থাকবি। আরে বেটি, পুরো হিমালয়টাই তো তোর, শুধু-শুধু একটা কোণে পড়ে থাকবি কেন?

সেই হিমালয়ের ডাক যেন এখন আরও বেশি করে কানে আসে। মনে পড়ে, আমার প্রিয় ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা'-র অসম্ভব প্রিয় এক দৃশ্য।

নীতা অসুস্থ হওয়ার পর, চারপাশ থেকে গান ভেসে আসে, কারা যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে গায়,

—আয় গো উমা, কোলে লই।

এ যেন গিরিরাজ হিমালয় তাঁর আদরের মেয়েকে কাছে ডাকেন! জানি না, আমার মা-বাবাও পাহাড় হয়ে আমায় হাতছানি দিয়ে তেমনই ডাকছে কি না?

হয়তো পৌঁছে দেখব পরিষ্কার আকাশ, নির্মল বাতাস, সরস লতাগুল্ম। ঝরনা আর শিলার মিলন।

নীতার শেষ অবধি ঠাঁই হয়েছিল পাহাড়েই। এক যক্ষ্মা আরোগ্যালয়ে। সেখানে বসেই তার

সেই অবিস্মরণীয় প্রতিধ্বনি,

—দাদা, আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম।

আমি বাঁচতেই চললাম। সেই পাহাড়ের কাছে।

১৮ মার্চ, ২০১২

যাওয়ার পথে

পাহাড় কেন যে বাবা-মা'কে হাতছানি দিত বারবার, সেটা বুঝতে-বুঝতে বহুবছর কেটে গেল। এবার দার্জিলিং-এর রাস্তায়, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও-তে বছরের এই সময়ে শুটিং করাটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

বছরের এই সময়টা, মানে ফাল্গুন মাস যখন চৈত্রে গিয়ে পড়বে, সেই সময়ে আমাদের প্রদেশের এই পাহাড়াঞ্চল কেমন দেখায়, কতটা গরম অথবা কতটাই বা শীত—লোকমুখে নানারকম শুনেছি; কিন্তু নিজের কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না।

দেখলাম, সত্যিই বেশ মনোরম। অতএব যাঁরা এতদিন বাচ্চাদের মাধ্যমিক পরীক্ষাটুকু শেষ হওয়ার জন্য অধীরে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা বেড়িয়ে আসতে পারেন, মন্দ লাগবে না।

আমার এই কথায় অনেক পাঠকই বলবেন,

—ও তো আমার দেখা। কতবার গিয়েছি। আবার যেতে পারেন নিশ্চিন্তে। দেখবেন পাহাড় আপনার জন্য অন্য কোনও এক অদেখা রূপের দরজা খুলে দেবে—আপনি জানেনও না, আপনি কী দেখবেন।

আমিও জানতাম না। সত্যি!

সেবক রোড ছেড়ে আমাদের গাড়িটা লাভা-র দিকে এগোচ্ছে। দু'টো গাড়ি। আমাদের পরিচালনা বিভাগ, আর চিত্রগ্রহণ বিভাগ। উদ্দেশ্য—পথে যদি মানানসই কিছু পড়ে, যা আমাদের ছবির জন্য জুতসই পটভূমি হতে পারে—তুলে নেব।

এই দু'টো গাড়ি বাদ দিয়ে, বাকি সদস্যরা অন্য অনেক গাড়ি ধরে সোজা কালিম্পংয়ের রাস্তায়। ফলে আমরা দলছুট।

দিব্যি যাচ্ছিলাম আমরা। পথে-গাড়িগুলোর পেটভর্তি হল এক পাহাড়ি পেট্রল পাম্পে। আর আমরাও মধ্যাহ্নভোজ সারলাম একটি ছোট্ট নিরিবিলি ধাবায়।

খেয়ে-দেয়ে তৃপ্ত হয়ে, ধাবায় ভাজা মৌরির সঙ্গে মিছরিদানা নেই কেন, তা নিয়ে খোশগল্প করতে-করতে বেশ এগোচ্ছিলাম। খেয়ালই করিনি, কখন গাড়ির ডানদিক থেকে সাঁ করে এগিয়ে যাওয়া একটি বাইক রাস্তা আটকে থেমে গেল। কশাঘাতের মতো নেমে এল অল্পবয়সি একটি

পাহাড়ি ছেলে—সে-ই-বাইক-চালক। আর তার পিছনে বসা ঈষৎ শ্যামবর্ণ এক মধ্যবয়স্ক পাহাড়ি মানুষ। দু'জনেরই রণমূর্তি।

সোজা আমাদের গাড়ির দিকে ধেয়ে এল দু'জন। তারপর চালকের জানলার ওপর উদ্দাম ঘুষির বর্ষণ। জানলার কাচ নামাতেই ফেটে পড়ল তারা, ক্ষোভের উদ্‌গীরণ। বহু আগে কোথাও একটা ওদের বাইককে ওভারটেক করার চেষ্টা করেছিল আমাদের গাড়ির চালক, সমতলের বাঙালি একটি অল্পবয়সি ছেলে (নামটা ইচ্ছে করেই গোপন রাখছি)—এই তার ভয়ংকর অপরাধ।

পাহাড়িদের মুখের ধরনে আমি সাধারণত গৌতম বুদ্ধ-র আদল খুঁজে পাই। ফলে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও, ওদের প্রতিকৃতিতে সেই বিরক্তির ছাপ খুঁজতে কষ্ট করতে হয়। সেই ধরনের মুখাবয়বের দু'জন মানুষ যে কী অসম্ভব উত্তেজিত এবং ক্রোধান্বিত, কেবল পাহাড়ে ওঠার দৌড়ে কোনও এক সমতলের চালক তাদের অতিক্রম করার চেষ্টামাত্র করেছিল বলে—সেটা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

গাড়ি থেকে ইউনিটের সবাই নামল। তাদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমাভিক্ষা করা হল চালক ছেলেটির তরফ থেকে। তখনও প্রশমিত হয় না তাদের উত্তেজনা।

তারপর একটা সময় স্থানীয় কয়েকজন বাঙালি মানুষের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি শান্ত হল।

প্রভূত কাকুতি-মিনতি অর্জন করে পাহাড়ি দু'টি মানুষ তিরবেগে এগিয়ে গেল বাইক চালিয়ে। স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল উপত্যকায়।

ততক্ষণে বাইরের বাতাসও ঠান্ডা হয়ে এসেছে। ফলে কাচ না-তুলে দিলে, ঝপ করে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

তার ওপর আমি সদ্য হাসপাতাল ফেরত। আমাকে নিয়ে শশব্যস্ত পুরো ইউনিট—এই না হিমোগ্লোবিন নেমে যায়, এই না রক্তের শর্করা হঠাৎ করে বিদ্রোহ করে বসে।

পাঁচ কিলোমিটার মতো চলল গাড়ি। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে, চা বাগানের মধ্যে দিয়ে, নীচের শুষ্ক নদীপথ আঁকড়ে, তারপর থামতে হল এক বাঁকের মোড়ে।

রাস্তা থেকে কুড়নো পাথরের চাঙড় হাতে অপেক্ষা করছে একদল পাহাড়ি যুবক। বোঝা গেল, সমতলের মানুষের মধ্যস্থতা তারা মেনে নেয়নি। বাইকটি আমাদের পিছনে ফেলে রেখে তিরবেগে এসে পৌঁছেছে তার নিজস্ব ডেরায়; সংগ্রহ করেছে আরও অনেক পাহাড়ি মানুষদের সমর্থন। বলা যায় না—অনুমান করছি—ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনাতেই হয়তো ক্রোধের বন্ধনেই একত্রিত হয়েছে সকলে। বাইকের পিছনে বসা সেই মধ্যবয়স্ক মানুষটি ঠিক আমার জানলার বাইরে। তার আমাকে দেখার অবসর বা প্রবৃত্তি কোনওটাই নেই। তার ক্ষুধার্ত হিংস্র দৃষ্টি কেবল শিকার চিনে নিচ্ছে। সেই মুখটা কোনও দিন ভুলব বলে মনে হয় না। হাতে ধরা নির্মম পাষাণখণ্ডও তার তুলনায় অনেক ক্ষমাশীল।

আবার সবাই গাড়ি থেকে নামল। কাজটা সহজ ছিল না। ওরা অতজন, আর আমরা দু'টো গাড়ি মিলিয়ে কুল্লে জনা ন'য়েক। তবু অজস্র বাক্‌বিতণ্ডার পর, চালকের আভূমি-নত কাকুতির পর

একটা সময়ে ঠিক যেমন মরা টিকটিকিকে কাঠি দিয়ে দূরে ফেলে দেওয়া হয় ঘৃণায়, তেমনই প্রার্থনারত চালক যুবকটিকে ঘৃণামিশ্রিত কৃপাভরে দূরে ঠেলে দিল তারা। বোঝা গেল, তার অপরাধ ওভারটেক-এর চেষ্টা নয়, তার আসল অপরাধ হল সে সমতলের ও অন্য জাতির।

বাকি রাস্তাটা গাড়ির সবাই চুপ। কাচবন্ধ গাড়িতে প্রায় প্রত্যেকের নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

বাইরে গাছভর্তি শ্বেতকরবী, রক্তিম রডোডেনড্রন। কিন্তু সব কাব্য, নিসর্গ, নিমগ্নতা মিথ্যে মনে হচ্ছে তখন।

মুখ ফেরালাম অন্য দিকে। দূরে, নানা স্তরে, হিমালয়ের ওঠানামা। কোনওটা ধূসর, কোনওটা বা নীল, আবার কোনওটায় তখনও লেগে আছে দিনশেষের হলুদ রোদের রেণু।

এতদিন ভাবতাম—স্থবির বলেই বোধহয় শান্ত বলা হয় হিমালয়কে। সেদিন মনে হল : কত সহস্র বছরের কত বিদ্বেষ দেখেছে এই পর্বতমালা। যুদ্ধকালে এরই গুহা-কন্দরে লুকিয়ে থেকেছে পলাতক মানুষের দল। আবার এরই পর্বতপথ দিয়ে সদম্ভে একের-পর-এক দর্পী নৃপতির বাহিনী ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে। বিকেলবেলার আলোয় মনে-মনে প্রণাম করলাম সুদূর দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ সেই চিরস্থিতধীকে।

পাহাড়ের যে এই অনন্য রূপটাও আছে—কই বাবা-মা কখনও বলেনি তো!

২৫ মার্চ, ২০১২

কেবল পাহাড় থেকে ফেরাটুকুরই অপেক্ষা। তারপরেই, আমার পথ তাকিয়ে যে বসেছিল এতখানি অসুস্থতা—জানতাম না।

ছবি-করিয়ের আসলে শুটিং করার একটা নিজস্ব মাদকতা আছে, সব-ভুলানো এক গভীর নিঃসঙ্গতা আছে—যা সাময়িক ভাবে সব মন্দ-থাকাকেও অর্থপূর্ণ করে তোলে।

তা ছাড়া পাহাড়ের আবহাওয়ার মধ্যে একটা প্রাণশক্তির উদ্দীপনা আছে—তাই বোধ করি অসুবিধেটা তেমন সরাসরি বুঝতে পারিনি।

আমরা তেমন বিলাসবহুল ভাবে যাতায়াতও করিনি—গিয়েছি ট্রেনে, এসেছি ট্রেনে। শিলিগুড়ি থেকে অনেকটা ওপরেও উঠেছি। নিয়মিত পাহাড়ি রাস্তার ঝাঁকুনি নিয়ে নেমেছি, উঠেছি, আলোর পথ করে কখনও, কখনও না ছায়ার দৌড়ে। এখন বাড়িতে রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়ে ভাবি—কী করে পারলাম? জানি না। তখন সকলে মিলে ঘিরেও অবশ্য ছিল।

বাড়ি ফিরে দু'টো দিন সবে গেল। একেবারে শয্যাশায়ী। বুঝলাম, অন্তরের শেষ উদ্দীপনাটুকু খরচ হয়ে গিয়েছে ওই পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে। বাড়িতে ফিরল কেবল পঙ্গু শরীরখানা।

ডাক্তার বললেন,

—আবার ভর্তি হোন হাসপাতালে।

আমি চুপ করেই ছিলাম। কিছুটা সদয় হয়ে বললেন,

—ঠিক আছে বাড়িতেই ইঞ্জেকশনগুলো নিন।

হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর ইঞ্জেকশন চলছে আপাতত। সপ্তাহে দু'টো করে। আর বরাদ্দ হয়েছে সারাদিনে সাকুল্যে এক লিটার জল। কোনও স্যুপ বা স্টু খেলেও, সেই এক লিটার থেকে অতটা জল বাদ।

কফি খাওয়া বন্ধ। আর লবণকে নির্বাসিত করতে হয়েছে সাময়িক ভাবে সমস্ত আহার্য থেকে। পাতে নুন তো ছেড়েই দিলাম।

এইরকমই বিবর্ণ, পানসে, ব্যাধিগ্রস্ত একটা শরীরকে টেনে নিয়ে হয়তো বা পার হয়ে যাব এই বাংলা বছরটা।

দেখি, ততদিনে এই ব্যাধির দাবদাহ কোনও আরোগ্য বরিষণে জুড়োয় কি না?

পাহাড় থেকে নামার দিন দেখেছিলাম উজ্জ্বল পর্বতগাত্রে ঘন কালো মেঘ। সেদিন তারিখ ছিল পয়লা চৈত্র। ভেবেছিলাম, কালিদাস কেন আষাঢ় মাসের প্রথম দিনেই মেঘসন্দর্শনে যক্ষের মন বিরহমথিত করেছিলেন? এই চৈত্র মাসে বর্ষার মেঘ এসে জড়ো হয়ে পাহাড়কে কী নতুন করে তুলেছে—অকালবসন্তের কবি তা হলে কেন অন্য কোনও ঋতু বেছে নিলেন না?

কে জানে, এমনটাই বোধহয় হয়।

পৃথিবীর থেকে সব প্রত্যাশা অবলীলায় পূর্ণ হয়ে গেলে পৃথিবীকে আর ভালবাসতামই না হয়তো।

৮ এপ্রিল, ২০১২

বহুদিন পর আবার বিদেশ যাচ্ছি।

এবার নিউ ইয়র্ক-এর এক চলচ্চিত্রোৎসবে, সঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা'।

দীর্ঘদিন অসুস্থতাকে সঙ্গী করে থাকতে হয়েছিল। ফলে মনটাও যেন সারাক্ষণ বিষাদগ্রস্ত, অন্ধকার এবং শূন্য মনে হত।

সতেরো ঘণ্টার বিমানযাত্রার ধকল রোগশয্যায় শুয়ে ভাবতেই পারতাম না। এখন উল্টোটা মনে হচ্ছে। জানি না রুগ্ণতাকে আপাতত অতীত করে দিতে পারলাম কি না। কিন্তু এই যে রোগগ্রস্ত বন্দিদশা, সেটা ভেঙে বেরনোর ডাক যখন অন্তর থেকে পেলাম, তখনই নিউ ইয়র্ক থেকে আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছল।

মনে হল, এর মধ্যে যেন কোনও অদেখা বিরাটের অভিপ্রায় লুকিয়ে আছে।

নিউ ইয়র্ক শহরটাতে গরমকালে বেশ গরম পড়ে।

তবে কলকাতার এখন যা তাপমাত্রা, তার কাছাকাছিও নয়।

যেটা ভরসার কারণ, নিউ ইয়র্ক-এর প্রাণকেন্দ্র টাইম স্কোয়ার-এ কোনও এয়ার কন্ডিশনড গাড়ির বিলাসিতা পোষায় না। ওখানে গাড়ি পার্ক করা এক বিরাট সমস্যা।

অতএব প্রচুর হাঁটতে হবে।

কলকাতার বাইরে যদি কোনও শহর আমার প্রিয়তম হয়, তা হলে সেটা হয় লন্ডন নয়, নিউইয়র্ক। কারণ, দু'টোই অনেকটা কলকাতার মতো।

বহুদিন বাদে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি।

ফিরে এসে গল্প বলব'খন।

৩ জুন, ২০১২

পরপর দু'টো 'ফার্স্ট পার্সন' একটু স্ফীত কলেবরের ছিল।

তাই আবার সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় লেখার অজুহাত। আসলে, অজুহাতটা কম লেখার নয়। আবার বিদেশ-ভ্রমণের প্রাক্কালে গোছগাছের তাড়া।

অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি সাতদিনের জন্য। যতদিনে আপনারা এই সংখ্যা পড়ছেন, ততদিনে ফিরেও এসেছি হয়তো।

অস্ট্রেলিয়াতে চলচ্চিত্রোৎসবে 'মেমরিজ ইন মার্চ' আর 'চিত্রাঙ্গদা' দেখানো হবে।

কলকাতা থেকে মেলবোর্ন। সেখান থেকে সিডনি হয়ে কলকাতা ফেরত। এই মহাদেশটায় আগে কখনও যাইনি। ফলে নতুন জায়গা দেখার একটা প্রবল রোমাঞ্চ।

আর, সুখের কথা এই যে, অস্ট্রেলিয়াতে এখন শীতকাল। তাপমাত্রা ঘোরাঘুরি করছে ১৫০ আর ৭০-র মধ্যে।

জানি, এই একটিমাত্র সংবাদে আমি কলকাতা-সুদ্ধু মানুষের হিংসার পাত্র হয়ে গেলাম।

১ জুলাই, ২০১২

উৎসব
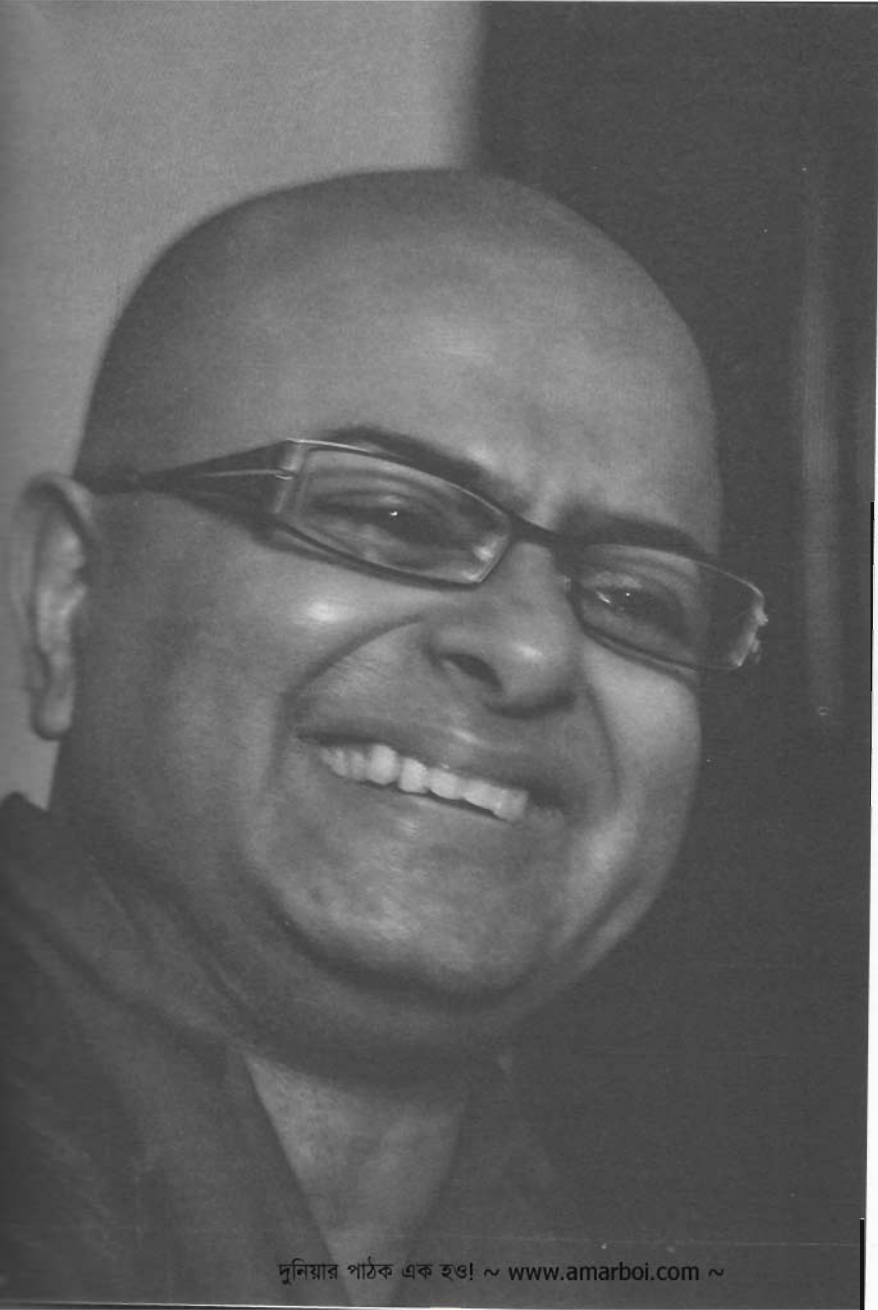
দিন আসছে। দিন যাচ্ছে।

একঘেয়েমির ছন্দ নিয়ে। আম কাঁঠালের গন্ধ নিয়ে।

তারিখ যাচ্ছে। তিথি আসছে।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যজিৎ বারবার করে জন্মাচ্ছেন বাঙালির মনে।

বাংলা নতুন বছর থমকে অপেক্ষা করছে পঁচিশে বৈশাখের জন্য।

তারপরেই বাংলা ক্যালেন্ডার বাসি হয়ে যাবে একবছরের মতো।

শুভ নববর্ষের অনেক এসএমএস এখনও ঘুমিয়ে আছে ইনবক্সে।

অনেক শুভেচ্ছা, অনেক প্রীতিকামনা, অনেক নতুন প্রতিজ্ঞার।

এই সব ঘুমন্ত উদ্দীপনা একদিন কখন ক্লান্ত নিদ্রার মধ্যেই বিদায় নেবে মোবাইল থেকে অন্য অনেক কেজো এসএমএস এসে জায়গা করে নেবে সেখানে।

1415 ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাবে।

নিদাঘ বৈশাখ পার করে জ্যৈষ্ঠে, তারপর আষাঢ়ে, তারপর...

রোববার দপ্তরে যাই না কতদিন!

রোববার কেন, কোথাও-ই যাই না। কেবল শ্যুটিং ছাড়া।

সকালে ঢুকি, রাত্রে বেরুই।

যেতে আসতে চোখে পড়ে একচিলতে কলকাতার আকাশ।

সকালে ধূসর, রাত্রে নিকষ।

আমার সামনে আলো বলতে কেবল
হ্যালোজেন ল্যাম্প।
আমার সামনের পৃথিবীটা টুকরো টুকরো, অলীক, ভঙ্গুর, নিত্য পরিবর্তনশীল।

আমারই তৈরি করা।

সেই পৃথিবী থেকে দুটি আনন্দের মুহূর্ত পাঠালাম আপনাদের জন্য।

রোববার-এর পাঠক, এই গ্রীষ্মের কলকাতায় আপনি ভাল আছেন তো?

৪ মে, ২০০৮

মেঘ রোদ্দুরের চু কিতকিত খেলার মধ্যে দিয়েই অর্ধেক পার হয়ে গেল শরৎকাল। শেষ হয়ে এল ভাদ্রমাস।

ক্যালেন্ডারের পাতায় আগামী মাসের অনেকগুলো তারিখ উৎসবের আবির-রাঙানো।

আর মেঘ-রোদ্দুর আকাশের গায়ে অনেকগুলো রঙিন কাগজের পাখির মতো ঘুড়িদের ভিড়। রীনাদির (অপর্ণা সেন) কাছে একটা গল্প শুনলাম ক'দিন আগে। গল্প নাকি রূপকথা!

রীনাদি ওঁর সাম্প্রতিক ছবি 'দি জাপানিজ ওয়াইফ'-এর শুটিং-এ ঘুড়ি ওড়ানোর এলাহি পর্ব শেষ করে বাড়ি ফিরছিল এক বিকেলে, শহরতলির পথ দিয়ে।

পথে পড়ল একটা বিরাট খাল, ছোট্ট ব্রিজের নীচে যেন একফালি স্থির নদীর আয়না।

তাতে সেই বিকেলবেলার থুমমারা আকাশের ছায়া, গাছগাছালির ছায়া, সাঁঝরাঙা মেঘের ছায়া। ঠিক যেন ব্রিজের তলায়, আরেকটা আকাশের গালচে বিছানো।

সুতো কেটে হঠাৎ একটা ঘুড়ি পড়ল। ওপরের আকাশ বেয়ে মেঘের গা ছুঁয়ে উড়তে উড়তে পড়ল নীচের আকাশের দিকে। যেন এবার ডুবে যাবে আরেকটা আকাশের মধ্যে।

রীনাদির গোটা ইউনিট তখন পিছনে। অন্য গাড়িতে। ক্যামেরা, আলোকচিত্রী—সকলে।

ফলে পথের ধারে দাঁড়িয়ে অঝোর আক্ষেপ নিয়ে নীচের আকাশে সেই ঘুড়ির অবগাহন দেখল রীনাদি। একা একাই।

তার কোনও ছবি উঠল না।

আর সব ফিল্মমেকার-এর মতোই ভাবল রীনাদি যে, জীবনে যে যে শটগুলো নিতে পারিনি আমরা, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি—শুধু সেগুলো দিয়েই হয়ে উঠতে পারত একটা নতুন ছবি, একটা অন্য সিনেমা।

পুজো আসছে। পুজো মানে যেন বাঙালির নতুন বছর। যা কিছু অধরা, যা কিছু অপূর্ণ, তার দীর্ঘশ্বাস যেন আর আমাদের ব্যাকুল না করে এই শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করি এবারের শারদোৎসবকে।

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৮

দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের টোল ট্যাক্স-এর গলি ছাড়ালেই কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে। এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। গাড়ির কনভয়। শুটিং শুরু হয়ে গেল নতুন ছবির। নৌকাডুবি।—কেন, 'চোখের বালি'র সব্বোনাশ করে হয়নি?

আবার রবীন্দ্রনাথ?

ঠিক জানি, মনে মনে গাল পাড়ছেন অনেকে।

আবার কারও কারও মৃদু আপত্তি,

—রবীন্দ্রনাথই যদি করতে হয়, নৌকাডুবি কেন? আর উপন্যাস ছিল না?

সঙ্গে ম্যাটাডোরে চেপে চলেছে দুগ্গাপ্রতিমা।

নৌকাডুবির পর কাশবনে পড়ে থাকবে কাঠামো।

পোটোপাড়ার অরুণ পাল—'উৎসব'-এর সময় ঠাকুর গড়ে দিয়েছিলেন। এবার শেষ মুহূর্তের কাকুতি-মিনতিতে তিনিই বাঁচালেন।

নানারকম গাড়ি। কোনওটায় যন্ত্রপাতি। লাইট, ট্রলি।

আর পলিথিন ঢাকা দুগ্গা পিতিমে।

পথের ধারের চাষি বউ হাত তুলে পেন্নাম করল। সিনেমার ঠাকুর হলে কী হবে, ঠাকুর তো বটে!

মা আসছেন কীসে? ম্যাটাডোরে, আবার কীসে?

বুকের ভেতর টিপটিপ। অজয়ের ধারে কাশবন দেখেছিলাম। থাকবে তো? নাকি কেটে জ্বালানি করে ফেলবে পড়শি গাঁয়ের মানুষ?

পদ্মদিঘির একটা শট নেবার ছিল। পছন্দসই কিছু পেলাম না।

কেন যে ছোটবেলা থেকেই 'প্রিয় ঋতু শরৎকাল' রচনা লিখতে গিয়ে শিখেছিলাম সেইসব রূপকথার গল্প।

নীল আকাশে পেঁজা তুলো মেঘ। শরত আলোর কমল বনে অরুণ রোদের ছটা। সব যেন বটের আঠার মতো ভেজাল ছাড়া দুধ। কেবল গপ্পেই শোনা যায়।

আকাশ কেমন ধূসর! যেন একপোঁচ কালি লেপে ধ্যাবড়া করে দিয়েছে দিগন্তরেখা।

সিঙ্গুরের পথে সাইকেল ভ্যানের নাম হয়েছে ভ্যানো।

তাতে চেপে অন্যদিকে যাচ্ছে দশভুজা। পুজো প্যান্ডেলে।

আর এদিকে মা চলেছেন আমাদের সঙ্গে। শুটিং করতে।

লোকেশন থেকে খবর আসছে—বৃষ্টি হতে পারে।

গেল! সব জোগাড়যন্ত্র শেষ! পুরো শুটিংটাই মাটি।

পানাগড়ের আগে পথের ধারে হাট, নতুন জামা কিনছে ঘরফিরতি মানুষ।

যেমনটা কিনেছিল হরিহর। দুগ্গার জন্য শাড়ি।

অজয়ের অন্যপাড়ে সারাদিন বালি তুলবে?

আমার তো আবার পিরিয়ড ছবি। নদীর ওপারে লরি থাকলে চলবে কেমন করে?

না, তেমন জুতসই পদ্মবন পাওয়া যাচ্ছে না! সব ফুল তুলে নিয়েছে গ্রামের লোক। পাতায় ঢাকা দিঘির জল। কী করা এখন?

নীল পলিথিনে মোড়া দুগ্গাঠাকুর সঙ্গে নিয়ে অজয়ের কাশবনে শুটিং করতে যাচ্ছি আমরা।

কী হবে! অত পদ্ম পাব কোথায়?

পার হয়ে গেলাম সদর হাসপাতাল। আই-এন-টি বিভাগে পা ফেললেই শুয়ে আছে চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা শত শত পদ্মপলাশলোচন।

অকালবোধনের দেবী অনেক পদ্ম চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তাতেই চক্ষুহীন অভিরাম, জায়েদ, শ্যামল। পাশাপাশি বেডে শুয়ে।

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি। পদ্মপুকুর ফাঁকা।

দমকা হাওয়ায় পলিথিন একটু সরলো।

দুগ্গার মুখে একগাল হাসি। কেন?

আজ যে অকালবোধন।

সারা বাংলার অকাল-অন্ধদের নয়নপদ্ম দিয়ে দেবী অভিষেক।

যুদ্ধপ্রস্তুতি, নাকি দাঙ্গার? খুনোখুনির? জমি দখলের?

কে রাম, কে রাবণ-জানা নেই।

কেবল পদ্ম চাই। যেখান থেকেই হোক।

বল দুর্গা মাঈ কী...

৫ অক্টোবর, ২০০৮

ক'দিন আগে বিরহ নিয়ে সংখ্যা বেরল আমাদের।

আমার বন্ধু-কাম-ভাজ দীপান্বিতা বলল,

—কীরকম এডিটর রে তুই? বিজয়া দশমী নিয়ে কাউকে লিখতে বললি না!

সব বাঙালির একসঙ্গের সবচেয়ে বড় বিরহ আর কী আছে?

সত্যিই তো! ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল ভাসান দিয়ে ফিরে এসে খালি প্যান্ডেলে টিমটিম করে জ্বলছে প্রদীপ।

শূন্য মন্দির মোর। নাই বা ছিল ভরা বাদর।

একবছর ধরে প্রতীক্ষা। পাঁচটা দিনের দেখাশোনা। তারপর হুড়মুড় করে মুখে পান-সন্দেশ ঠুসে বিদায়। পাছে বেশিদিন থাকলে লোকে বলে কবে বাড়ি যাবে?

এ বছরের মতো বাংলার বুক থেকে বিদায় নিয়েছেন দুগ্গাঠাকুর। নীলকণ্ঠ পাখি এতক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে কৈলাসে। মা একটু পিছিয়ে। চার-চারটে ছেলেপুলে নিয়ে, একটু জিরিয়ে, একটু হাঁপিয়ে পথ চলছেন।

লক্ষ্মী ঠাকুরের সত্যিই অত ধকল সয় না। দু'দিন পরেই আবার ফিরতে হবে। বাড়িতে বাড়িতে। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে।

—থেকে যাই না মা, কারও বাড়ি?

কার্তিকেরও মনটা চনমন করে উঠল। সত্যিই তো! তারও তো এই মাসখানেক বাদেই ফেরা। এতটা উজিয়ে গিয়ে লাভটা কী? কৈলাস মানেই তো সেই নিঝুমপুরী! সাধে কী আইবুড়ো নাম খণ্ডাল না এ জন্মে আর?

মাঘ মাসে সরস্বতীর পালা। সে নয় দেরি আছে। সরস্বতীর ধবধবে মুখ—খুশিতেও শুভ্র। রাগেও শুভ্র। একেবারে একটুও অভিমান যে হচ্ছে না, তা নয়। আজকাল সংগীত সম্মেলন যে দু একটা হয় কেউ কি আর অপেক্ষা করে শুক্লাপঞ্চমী অবধি? ফলে কিছুই আর শোনা হয় না।

গণেশদাদার ডাক পড়বে বৈশাখে। সে অনেক দেরি। তবে সে তো বাংলায়।

এর মধ্যে সারা উত্তর ভারত জুড়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে ডুয়েট অ্যাপিয়ারেন্স আছে দীপাবলী, ধনতেরাসের সময়। আর এখন কালেক্টরদের দৌলতে সারাবছর বাজার গরম।

মা চলছিলেন জোরকদমে। ছেলেমেয়েদের বেজার মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

লক্ষ্মীর অধৈর্য মুখ, কার্তিকের অবিন্যস্ত টেরি। সরস্বতী অভিমানেও সাদা, অভিযোগেও সাদা। গণেশ শুঁড়ের ভেতর দিয়ে ঢোঁক গিললেন।

মা দুগ্গার ত্রিনয়ন একবার পড়ল ছানাপোনার মুখে।

তারপর রাঙা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হনহন করে হাঁটা।

অমনি ছুটে এল ছেলেমেয়ে হাঁ হাঁ করে।

—রাগ করছ কেন মা?

—একবার বোঝো। তুমি তো আবার সেই পরের বছর। আমাদের আসতে হবে না মধ্যে!

—একা যেতে তোমার কষ্ট হবে, মা? তুমি পারবে না!

মোক্ষম কথা—তুমি পারবে না!

পারতে তো হবেই, বাঙালির সব থেকে বড় স্টার দশভুজা দুগ্গা। এমন কী কাজ আছে যা সে পারবে না?

উত্তর দিলেন না দুর্গা। একা হাঁটাপথ ধরলেন খালবিল-খানাখন্দ পেরিয়ে।

গলার কাছটা একটু যে ধরে এল না, তা নয়। নিজেকে কেবল বোঝালেন—এত বড় সেলিব্রিটি হতে গেলে দাম তো একটা দিতেই হবে।

উচ্চতা মানে যে নিঃসঙ্গতাও, বছরভরের কৈলাস পর্বত এতদিনে তা কি আর বুঝিয়ে দেয়নি!

১২ অক্টোবর, ২০০৮

নতুন বছরের গোড়ার দিকটা বড় গোলমেলে।

হঠাৎ যেন নিজেকে পাল্টে ফেলার তাগাদায় আমরা দুমদাম সব প্রতিজ্ঞা করে বসি। রোজ ডায়রি লিখব।

কিংবা, সকালে নিয়ম করে একঘণ্টা হাঁটব।

নিদেনপক্ষে ১০ মিনিট প্রাণায়াম করব রোজ।

ক্রেডিট কার্ডের সীমা ছাড়িয়ে যাব না কোনও মাসে।

এইরকম নানা কিছু।

নিজেকে আরেকটু ভাল করার।

নিয়ম করে খুচরো পয়সা সঙ্গে রাখার প্রতিজ্ঞা করি না আমরা।

ফলে গাড়ির জানলায় দাঁড়ানো ভিখারি ছেলেমেয়েরা শূন্যহাতেই ফিরে যায় বরাবর।

প্রতিজ্ঞা করি না যে, মিথ্যে কথা বলবই না। কারও ভয়ে, কোনও চাপে বা কিছুর লোভেই নয়।

একটা ছোট্ট প্রতিজ্ঞা করা কিন্তু সোজা।

সেটা বজায় রাখতে পারলে ভাল। ভেঙে গেলে সত্যভ্রষ্ট দশরথের মতো দুঃখ পাওয়ার কারণ নেই।

দিনে দু'টো নতুন পৃষ্ঠা লেখা পড়ব।

যে-ভাষাতেই হোক, আগের পড়া নয়—সম্পূর্ণ নতুন দু'টো পৃষ্ঠা।

চেষ্টা করে দেখুন, খুব শক্ত নয় কিন্তু।

ভাল কথা, তার মধ্যে আবার 'ফার্স্ট পার্সন'টাকে ঢোকাবেন না।

২০০৯ সুন্দর হোক। শুভ হোক।

শান্তির, আনন্দের হোক।

৪ জানুয়ারি, ২০০৯

চলে যাবার ভয় যেন আমাদের নিরন্তর।

এ যেন প্রায় সেই ধর্মবকের প্রশ্নের অব্যর্থ উত্তরের মতো।

আশ্চর্য কী! না, এই যে চলে যে যাবে সেটা অমোঘ বলে জানি, তবু মেনে নিতে পারি না।

সবই তো চলে যায়। জীবন, যৌবন, ধনমান—তো ছেড়েই দিলাম, নিজের মধ্যে থেকে কত কিছু চলে যায়। কত সুকুমার, কত অকপট, কত স্বতোৎসার ঝরে পড়ে যায় নিজের মনে—আর আমরা সেই প্রস্থানটুকু প্রাজ্ঞতার ভবিতব্য বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিই।

যে প্রিয়জনের আজীবন পাশে থাকার অন্য কোনও দায় ছিল না, কেবলমাত্র হৃদয়ের অঙ্গীকার ছাড়া—সেও তো চলে যায়। মাঝে মাঝে অবলীলায়, আমরা ভাবি বুঝি এ ভারি অন্যায্য হল, অবিচার হল।

তখন অন্ধকারই আশ্রয়, সঙ্গোপনই স্বস্তি—তাই বুঝে উঠতে পারি না যে জানলা খুললেই হয়তো দেখতে পাব বাইরের গাছটা যে গতকাল অবধি সব পাতা ঝরিয়ে ফেলে দারুভাস্কর্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানলার বাইরে, তার প্রতিটি ডালেই আবার নতুন পাতার ইশারা।

অনেক কিছুই চলে গেছে এত শত বঙ্গাব্দে। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক—সার্বিক জীবন।

এসেছেও হয়তো বা অনেক কিছু।

ঠিক যেভাবে কোনও চলে যাওয়াই সবার কাছে সমানভাবে বেদনার নয়, তেমনই সব নবাগমন সকলের কাছে বরণোৎসব নয়।

কিন্তু এই কথাটা সত্যি যে চৈত্রমাসের প্রহরশেষের যে রাঙা আলো ধীরে-ধীরে বৈশাখের দিকে এগোচ্ছে—তা চিরন্তন হলেও একটু আলাদা।

হয়তো সেই আলোয় এ বছর আরও অনেক বেশি ধূলিকণা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর তাপ, গত বছরের থেকে একটু অন্তত আলাদা।

তা হলে কি নতুন বছরের প্রথম সূর্যকিরণও এবার একটু আলাদা হবে?

আমরা তো দৈবজ্ঞ নই। ভবিষৎবাণী করতে পারি না।

তবে, আশা করতে তো দোষ নেই।

বিদায় ১৪১৫

১৪১৬ সুস্বাগত।

১২ এপ্রিল, ২০০৯

আমলকী গ্রামের কানু কাইনের ছেলের নাম গোপী কাইন। তার গানবাজনার শখ ছিল বলে গ্রামের লোক ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল গুপী গাইন। একদিন গ্রামের রাজা গুপীর বেমক্কা বেসুরো বাজখাঁই গানের রেওয়াজ শুনে, তাকে গ্রাম থেকে গাধার পিঠে চাপিয়ে তাড়িয়ে দেন। গুপীর গাধা গ্রামের পথ ধরে বেরিয়ে যায় ধীরে ধীরে, আর গুপীর বাবা একমনে দাঁড়িয়ে রইলেন বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে, ধুতির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে।

গুপী গাইন শেষমেশ অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে দিয়ে গিয়ে রাজার জামাই হল বটে। কিন্তু আমলকী গ্রামের কানু কাইনের কী হল, আমরা আর জানতে পারলাম না।

গল্পের প্রথমেই যে পুত্রহারা-বৃদ্ধ পুত্রের বসবাস-বিরহ সহ্য করার প্রথম ধাপটুকুতে পা রাখলেন, ছবির শেষে তিনিও পুত্রবিহনে অন্ধ দশরথের মতো একাকী—জীবনের শেষ আলো ঝাপসা হতে দেখেছিলেন কি না জানি না, তবে রাজার জামাই গুপী গাইন যে তার রাজকন্যা বধূ-সহ নিজের বাপের বাড়িতে আর কোনওদিন ফিরে আসেনি—সে আমরা অনুমান করে নিয়েছিলাম।

বাপের বাড়ি কেবল মেয়েদেরই হয় বুঝি? ছেলেদের হয় না?

যে অপু অসুস্থা, শীর্ণা, অপেক্ষামাণা মা-কে ফেলে রেখে ভিক্টোরিয়া-র বাগানে বসে মুড়ি খেতে খেতে, এবং বন্ধুর সদ্য ধরানো সিগারেট সলজ্জ প্রত্যাখ্যান করতে করতে কখন যেন মায়ের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তারই যে ভবিতব্য অপু-কাহিনির শেষ দৃশ্যে পুত্র কাজলকে কাঁধে নিয়ে বাপ আর ছেলের এক নিরুদ্দেশ যাত্রা বাপের বাড়ির পথে—তা দেখে দু'টো চোখ সজল হয়ে ওঠেনি এমন বাঙালি দর্শক কমই আছেন।

আজকাল সত্যিই দু'টো বাপের বাড়ি-ই বসে থাকে সন্তানের পথ চেয়ে—তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই।

কিংবা আর থাকতে না পেরে উদগ্রীব মধ্যবিত্ত পিতামাতা অন্তরের টানে কখন যে পৌঁছে যান উপার্জনশীল পুত্রের বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে। হয়তো তখন ছেলে ব্যস্ত বন্ধুবান্ধব, অফিস-সহকর্মীদের নিয়ে, ('সীমাবদ্ধ'-র শ্যামলেন্দুকে মনে পড়ছে?) আর অপ্রস্তুত বৃদ্ধ দম্পতি এককোণে দাঁড়িয়ে থাকেন—না পারেন ছেলেকে ভাল করে দু'দণ্ড দেখতে, না পারেন না-দেখে ফিরে যেতে; আর আমাদের গলার মধ্যে কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে আসে।

পুজো এসে গেল। বছরের উৎসব, বাঙালির উৎসব। বাপের বাড়ির উৎসব।

যে বাপের বাড়িতে এখন যে কোনও ফোনের আওয়াজই ভণ্ডুল করে দিচ্ছে তেলফোড়নের ফোঁসফাঁসকে—তারপর হতাশ পায়ে কিছুক্ষণ পর রান্নাঘরে ফিরে আসছেন বুবুর মা। না, টেলিফোন-কর্মীরা লাইন চেক করছিল।

যে বাপের বাড়ির বুবুর বাবা এখনও বাজারে গিয়ে বড় সাবধানে হিসেব করে বাজার করছেন। পুজোর সময় বুবু আসবে বলেছে। তখন তো ভালমন্দ বাজার করতে হবে।

পুজো এসে গেল। মা এসে গেলেন। এবার বুবু আসার পালা।
তাই জানলার সামনে, বা বারান্দায় বসে বাপ-মায়ের অনন্ত প্রতীক্ষা।
সে বুবু ছেলেই হোক। আর মেয়েই হোক।
সব অপেক্ষার অবসান ঘটুক। আনন্দে ভরে উঠুক শারদোৎসব।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

কবে যেন পড়েছিলাম সুকুমার সেনের কোনও লেখায় যে, 'চালচিত্র' কথাটা এসেছে বাড়ির চাল থেকে। যে-চালের তলায় একসঙ্গে বাস করেন দুর্গা তাঁর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে।

বাপের বাড়ি আসছেন এক বছর পর, কোনওটাকে তো আর রেখে আসতে পারেন না। তাই কোলে-কাঁখে চারটেকে নিয়ে কোনওরকমে, নৌকো, বা হাতি, না-পেলে ঘোড়া, কখনও-বা দোলায় চেপে বাপের বাড়ি আগমন। একচালার ঠাকুর আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গিয়েছে। কেবল বাড়ির পুজো এবং কতগুলো সাবেকি পুজো এখনও ধরে রেখেছে দুর্গাঠাকুরের যৌথ পরিবারের সেই মূর্তি। এদিকে জয়েন্ট ফ্যামিলি কথাটা ক্রমশ একটা বিশেষ বর্ণনার শব্দতে পরিণত হচ্ছে। স্বাভাবিক একটা পারিবারিক গঠন ভাঙতে-ভাঙতে এখন কেবল বাপ-মা, আর তাঁদের নাবালক সন্তানের সংসার। জ্যাঠা, কাকা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা অবধারিত ভাবেই যেন ছড়িয়ে থাকেন বিক্ষিপ্তভাবে নানা জায়গায়।

স্কুলের বন্ধুরা, যাঁরা যৌথ পরিবারে রয়ে গিয়েছেন এখনও, তাঁরা যেন নিজেদের কিছুটা পিছিয়ে-পড়া মনে করেন, বলতে গেলে প্রায় যেন ঢোঁক গিলে বলেন— আমাদের তো জয়েন্ট ফ্যামিলি...ঠিক যেমন ব্যাপকভাবে আমাদের শৈশবে 'হাম দো হামারা দো-র বিজ্ঞাপন চালু হওয়ার পর, যে সহপাঠী বন্ধুদের অনেকগুলো সহোদর, তারা যেন পারলে চেপে যায় তাদের নিজস্ব বংশতালিকা, আর মনে-মনে যেন দোষারোপ করে তাদের অসংযমী পিতামাতাকে—এই মনগড়া সামাজিক লজ্জার সামনে দাঁড়িয়ে।

'জয়েন্ট ফ্যামিলি' কথাটা সত্যিই একটা কথার কথা। যাঁরা সিত্যিই-সত্যিই সেরকম কোনও বাড়ি থেকে আসেন, এবং অসংকোচে বলতে পারেন 'আমাদের তো জয়েন্ট ফ্যামিলি...' দেখা যায় বেশিরভাগ সময়ই তাঁদের পেল্লায় বাড়ি, প্রায় খানকুড়ি ঘর এবং পারিবারিক ব্যবসা আছে। বিত্তবানদেরই যেন যৌথভাবে থাকা মানায়, কারণ তাঁদের ঠেসাঠেসি করতে হয় না অপরিসর কয়েকটি কামরায়।

কিন্তু যাঁরা সত্যিই এখনও চাকুরিজীবী এবং সাধারণভাবে রয়ে গিয়েছেন সেই সাধারণ একটা বাড়িতে, তাঁদের কাছে 'জয়েন্ট ফ্যামিলি' কথাটা গৌরবের নয়—বরং তাঁর পিতার আলাদা করে সংসার স্থাপন না-করতে পারার আর্থিক অসামর্থ্যের সাক্ষী।

পাড়ায়-পাড়ায় দেখি দুর্গা আসছেন আলাদা লরিতে আর লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আরেকটা লরিতে। তাঁরা এখন মা-র আঁচল ধরে একচালার অধিবাসী নন। তাঁরাও ভিন্ন হয়েছেন নিজেদের মতো করে। তবু এক ছাঁচে গড়া সবার মুখ। পারিবারিক সূত্র তো কোথাও থাকবে! একচালার ঠাকুর ধীরে-ধীরে কোণঠাসা হচ্ছেন। সেখানে দুর্গা মাঝখানে, তাঁর সন্তানরা ঠিক নিজস্ব নির্ধারিত স্থানে। আকারে কেউই অতটা অতিকায় নন। যেন নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রসার স্বাভাবিকভাবেই বিনম্রতায় সংকুচিত হয়ে আছে ওই একচালার নির্দিষ্ট অর্ধচন্দ্রের মধ্যে। অন্যদিকে পাড়ার পুজোয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ক্রমশ বড় হয়ে উঠছেন। একচালার নির্দিষ্ট নিয়মে মায়ের দু'পাশে দুই মেয়ে। আর তাঁদের ঠিক নীচেই পুত্রদ্বয়ের আসন—এই প্রথা ভেঙে গিয়েছে। প্রত্যেকেই এখন একক এবং বিশিষ্ট। তারই মধ্যে কার্তিক চিরকুমার, গণেশের সঙ্গে নবপত্রিকা স্ত্রী—আমরা বলি কলাবউ। মনে পড়ে যায় পুরনো প্রবাদ—

ও গণেশের মা, কলাবউকে খোঁটা দিও না,
তার একটি মোচা ফললে পরে, জুটবে অনেক ছানাপোনা।

ভাবতে কেমন মজার লাগে, যে-দুর্গাকে আজীবন 'মা' ছাড়া ডাকা হয় না, তিনিও কেমন সহজে 'ঠাকুমা' হয়ে যাচ্ছেন যৌথ পরিবারের নিয়মে। সর্বগুণদাত্রী দেবীও সাধারণ শাশুড়ির মতো ছেলের বউকে খোঁটা দিতে পারেন। এবং অবধারিতভাবে প্রসূতি পুত্রবধূর আঁতুড়ের দায়িত্ব তখন তাঁরই।

দুই

'উৎসব' বলে একটা ছবি করেছিলাম, আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে। সেখানে এই ক্ষয়িষ্ণু, ক্রমভঙ্গুর যৌথ পরিবারের গল্প ছিল দুর্গাপুজোর প্রেক্ষিতে। মায়ের কাছে পুজোর সময় এসেছে দুই ছেলে, দুই মেয়ে, তাদের সংসার-সন্ততি নিয়ে।

এখন সাবেকি দুর্গাপুজোর সঙ্গে এই যৌথ পরিবারের সূত্রস্থাপনটাকে বড্ড সরাসরি মনে হয় আমার নিজের। তবে সত্যি বোধহয় বৎসরান্তে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানদের পুনর্মিলনের মধ্যে একটা তৃপ্তির আনন্দ আছে। জানি না, অনেকেই বলেছেন 'উৎসব' তাঁদের খুব প্রিয় ছবি। সেটা কি বাঙালি পরিবারের এই অতৃপ্ত একান্নবর্তিতাকে সাময়িকভাবে উপভোগ করার জন্য—না কি

পরিবারের সব সদস্যই তাদের নিজস্ব সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটা বড় পারিবারিক ভরসা পায়—এই ভেবে?

এই পুজোয়, আমার আর আমার বাবা-মা'র কাছে ফেরা হল না। আমাদের বাড়ির গোল দক্ষিণের বারান্দাটা জুড়ে পাড়ার পুজোর আলোয় মালা। আর সেই বারান্দায় দু'টো বেতের চেয়ার—মা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ওই বারান্দায় বসেই মা'র দুর্গাপুজো দেখা।

এ-বছর সেই গোল বারান্দা জুড়ে যথারীতি আলোর মালা। আর চেয়ার দু'টো খালি। এই বিশাল শারদ চালচিত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি একা।

সত্যিই, উৎসব তো কারও জন্য থেমে থাকে না।

আপনাদের যদি কোনও বিষাদ থাকে তার পুরোটা আমায় দিয়ে দিন।

আপনাদের পুজো সুন্দর, আনন্দময় হোক।

১৭ অক্টোবর, ২০১০

যা কিছু স্থবির, যা কিছু জড়—ধীরে ধীরে জীবনের জরায় আক্রান্ত হয়ে ক্লান্ত, ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল, আজ থেকে ঠিক আটদিন আগে তাকে এসে পুনরুজ্জীবিত করেছে এক নবীন নূতন।

এবার নূতনের সঙ্গে এক নতুন জীবন আমাদের।
সেই জীবন সুন্দর হোক, শুভ হোক, কল্যাণময় হোক। জরামুক্ত, কলুষবিহীন হোক।

আমরা সকলে মিলে নূতনকে চেয়েছিলাম—আমরা পেয়েছি।

এবার আমরা সবাই নূতনের নিত্যপ্রবহমানা কল্যাণস্রোত যদি দেখতে চাই—আমাদের প্রত্যেকেরই এক কঠিন পর্যবেক্ষকের ভূমিকা থাকবে।

নিকষ নিশার ভিতর থেকে উঠে এসেছে এক উষসী উষা।

তার আলো দিবসভর বিকিরিত হোক,
আমাদের সর্বজনীন অস্তিত্বে।

স্বাগত হে নূতন।

২২ মে, ২০১১

আপাতত আমার পুরী-ভ্রমণ মুলতুবি থাক, এক কিস্তির জন্য।

ঠিক যেমন এক বিশেষ উজ্জ্বল নতুনের জন্য আমরা নিত্যনৈমিত্তিককে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখি।

বাড়িতে রঙের কাজ হলে, তাঁদের ডেকে বলি—

—কালকের দিনটা থাক বাবা, আবার পরশু থেকে কোরো। আর তোমাদের বুরুশ, বালতি, মই—ওগুলো একটু সরিয়ে রেখো। কাল শুভদিন।

নতুন বছর আসছে। যদিও পয়লা বৈশাখের দ্যোতনা কেবলমাত্র বাংলা ভাষার ছন্দে আর হালখাতার নিমন্ত্রণে এসে দাঁড়িয়েছে (শেষেরটাও আর হয় কি না জানি না)। আর প্রত্যেক বছর এই সময়টায় কালীঘাটের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দিস্তে-দিস্তে লাল শালুর খেরোর খাতা দেখে লোভ হয়, গুটিকতক কিনে নিই। যেন তা হলেই আমার চিত্রনাট্যগুলো সুন্দর হয়ে যাবে।

এই পয়লা বৈশাখে বাবার জন্য আর নতুন জামা কেনার নেই। কিনে আনলে পাকা চুলের ভুরু দু'টো কুঁচকে বলত,

—আবার কেন পয়সা নষ্ট করলে? এই তো সেদিন দিলে।

সেদিন মানে পুজো। বা, বাবার জন্মদিন। দু'টোই শরৎকালে।

তারপর অন্য ঘর থেকে কানে আসত ছবি, অর্চনা (বাবার দিনরাত্রির সেবিকা) আর ছবির মেয়ে কাজলের গলা। বাবা তাদের ডেকে আহ্লাদ করে নতুন জামা দেখাচ্ছে। সে আহ্লাদ নতুন জামার, না আমার ছেলে এখনও মনে করে আমার জন্য নতুন বছরের জামা আনে, সেই গৌরবের—সেটা বুঝতে পারতাম না। এখন আর বুঝতে চাইও না।

জানি, এবার একটা ফোন আসবে বন্ধু। ভ্রাতৃবধূ দীপান্বিতার কাছ থেকে,

—ঋতু, কী নিবি বল?

আমিও একই প্রশ্ন পাল্টা করব। বা, আমি হয়তো করবই না।

বরাবরই দেখে এসেছি এটা দীপান্বিতার প্রায় একচেটিয়া উদ্বেগ—ঋতুকে তো কেউ কিছু দেয় না!

আবার পাশাপাশি এটাও বলে,

—তোকে কী দেব বল? তোর জন্য কিছু কেনা এত মুশকিল! তোর এত জিনিস।

শেষ পর্যন্ত প্রতি বছরই ব্যাপারটা গিয়ে শেষ হয় বইয়ে। জানে, ওই একটা ব্যাপারে ঋতুর কোনও অরুচি নেই।

সব বছরই অনেক আনন্দ, অনেক বিপদ নিয়ে আসে।

হঠাৎ করে যদি ভাবতে আরম্ভ করি যে, এ বছরটা অন্যরকম হবে, প্রতিটি দিন আনন্দমোড়া gift wrapped হয়ে পৌঁছবে আমাদের কাছে—সে তো আমাদেরই অলীক কল্পনা।

আসুক। আরও দুঃখ, আরও দুঃসহ কঠিন পরীক্ষা আসুক—আমরা ঠিক পার হয়ে যাব। সমুদ্রের বড় ঢেউয়ের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে নেই। তা হলেই সমুদ্র আছাড় মেরে ফেলে সবেগে। আর ঢেউয়ের সামনে মাথাটা নিচু করে দিলে, অল্পক্ষণের দমবন্ধ হাঁসফাঁসানি, তারপর আবার বালি চিকচিক ভিজে গা। কঠিনতম বিপর্যয়েও তো আমরা বেঁচে থাকার অন্তস্থ কৌশল জেনে গিয়েছি।

তারপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঠিক দিগন্ত দেখতে পাব। অনন্ত আকাশ, উজ্জ্বল বিবস্বান আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

শুভ নববর্ষ।

১৭ এপ্রিল, ২০১১

পাঞ্জিকা বলছে—দেবী গজে আসছেন। ফল, নাকি শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা।

আর, তারই মধ্যে বিশাল ভূমিকম্পে চুরমার হয়ে গেল উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্যভূমি। ভূমিকম্পনের মৃদু আভাস আমরা কলকাতায় বসে পেয়েছিলাম। কিন্তু কেউই নিজের টলমলে অনুভূতিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে বিশ্বাস করে উঠিনি।

আমাদের মধ্যবিত্ত পাড়ায় ঘরে-ঘরে শাঁখ বেজেছিল—আমি গোড়ায় ভেবেছিলাম বিশ্বকর্মা পুজো সংক্রান্ত হবে।

আশ্বিনের প্রথম দিনটা এল বিপর্যয়ের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে।

হিমালয়-কন্যা পার্বতীর আগমন-পথ এখনও বিপদসংকুল। এক যদি না সেই অলৌকিক গজবাহন কোনও নিরাপদ পথ খুঁজে পায়। নিম্নচাপ, অতিবৃষ্টি, বন্যা এবং অবশেষে এই ভূমিকম্প।

পঞ্জিকা-প্রতিশ্রুতি মিথ্যে করে দিয়ে প্রলয়বিলাসী শঙ্করের তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে আসছেন ভুবনমোহিনী।

আশা করি, ফিরে যাওয়ার সময়ও 'দোলায় গমন, ফল—মড়ক'-এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে করে দিয়ে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির বর দিয়ে যাবেন আনন্দময়ী। আপনাদের শারদোৎসব সুন্দর হোক।

২ অক্টোবর, ২০১১

সম্প্রতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নব নামকরণ নিয়ে ঝড় বয়ে গেল।

আমরা অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলাম এই বলে যে 'পশ্চিম' শব্দটির ব্যঞ্জনা এক নিষ্ঠুর ইতিহাসের কলঙ্ক-স্মৃতি। অতএব সেই গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে নব-পরিচয়ে ভূষিত হোক আমাদের এপার বাংলা।

আমরা সকলেই হয়তো জানি কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোর উদ্‌যাপন সেই তথাকথিত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত।

'কোজাগরী' শব্দটা এসেছে 'কে জাগর' থেকে। লক্ষ্মী নাকি সেই পূর্ণিমা রাতে স্বয়ং নেমে আসেন মর্ত্যধামে—বাড়ি বাড়ি নিঃশব্দ চরণে গিয়ে দেখেন যে কোন গৃহস্থ জেগে আছে তাঁর নৈশ-আবাহনের জন্য—তাকেই দিয়ে যান সমৃদ্ধির আশীর্বাদ।

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্মীপুজো আদতে কালীপুজোর দিন।

সময় এবং ইতিহাস এসে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে দুই বাংলার ঐতিহ্য। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এখন কোজাগরী পূর্ণিমা সর্বজনীন কমলা-উপাসনা তিথি।

তারপরেও আমরা আলাদা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ নামটা নিয়ে পড়ে থাকব বাকিটা জীবন? কোনও পূর্ণিমার রাত্রে, কোনও অলৌকিক আবির্ভাবেও হবে না সেই কলঙ্কমোচন? ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু শারদোৎসব আনন্দের। বছরের এই ক'টা দিন আনন্দ করুন সবাই।

৯ অক্টোবর, ২০১১

রবীন্দ্রনাথের জীবনীভিত্তিক ছবিটির কাজ শুরু হয়ে গেল পুরোদমে।
আপনারা যখন এই লেখাটা পড়ছেন, তখন আমি গ্রাম-বাংলার কোনও এক সর্ষেখেতে এ রোদের মিঠেকড়া আলো দেখে চিত্রগ্রাহককে ক্যামেরা বসাতে বলছি।

শীতের প্রকৃতি বিশুষ্ক, রসহীন বলেই জানি। তার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই কি খেজুরগাছগুলো উজাড় করে দেয় তাদের মধুরতম রসের ধারা? চাকা-চাকা খয়েরি রঙের তালপাটালি বারবার মনে করিয়ে দেয়—কেন হে? কঠিনে কি রস নাই? রস মানেই কি তরল হতে হবে?

ভীষণ ভয় ছিল সকলের—শীতের দিনে-রাত্রে, ভোরে-সাঁঝে ঠান্ডার নানারকম তারতম্য হবে। ইউনিটের সবাই সেই বুঝে নানা স্তরের শীতবস্ত্র সঙ্গে এনেছে। দেখা গেল বেলা দশটা থেকে চারটে অবধি সবাই সুতির টি-শার্ট পরনে, সোয়েটার বা জ্যাকেটগুলো গলায় বাঁধা।

নদীর জল ভরা টলটলে না-হলেও, তেমন অগভীর কিছু নয়। সকালবেলার কুয়াশার অস্বচ্ছ মশারির মধ্যে দিয়ে মনে হয় যেন স্থির জলাশয়।

তারপর রোদ ওঠে। জলের তরঙ্গে সূর্যালোক খেলে, নদী ধীরে-ধীরে প্রাণমতী হয়, বেগবতী হয়।

ওই ওপারের যে ধূসর সবজে দিগন্তরেখা, কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যা চোখেই পড়ে না ভাল করে, রোদের আলোয় তার আভাসটুকু দেখতে পাই কেবল।

সেই অজানা দিগন্ত থেকেই কি ভেসে আসবে নতুন বছরের যত সুখ-সংবাদ?

অনেক ঝড়ঝাপ্টা, অনেক মনীষীর মৃত্যু, অগ্নি-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্পের ঝড় গেল এ বছরের ওপর দিয়ে।

আগামী বছর যেন এই সূর্যকরোজ্জ্বল-স্নাত পৃথিবীর মতোই শুচি হোক।

১ জানুয়ারি, ২০১২

কোনও-না-কোনও কিছুকে বাতিল করে তবেই না নতুন।
ঠিক যেমন পাকা ধানের গায়ে হেমন্তের শিশির দিয়ে এক সময় নতুন বছর শুরু হত বাংলা জুড়ে। সে মাসের আদি নাম মার্গশীর্ষ—মৃগশিরা নক্ষত্র থেকে। পরে নাম বদলে দাঁড়াল অগ্রহায়ণ।

হ্যাঁ, সেই পাকা ধানের গন্ধে ম-ম করা খেতখামার পার হয়ে ভেসে আসত নতুন বছরের ডাক। তাহার আবাহন হত নতুন ধানের ছড়ায়। প্রথম অন্নের আস্বাদে। সঙ্গে থাকত পিঠেপুলি, আরও হরেক রকম কত না মিষ্টি!

সব পাল্টাতে-পাল্টাতে এখন নতুন বঙ্গাব্দ শুরু হয় বৈশাখ মাসে। ওই দিনটা, আর বৈশাখের ২৫ তারিখ—এই দু'টো দিনই এখনও বাঙালি বাংলা তারিখ দিয়ে চিনতে চায়।

'রোববার'-এর নববর্ষ সংখ্যা এবার ভরা থাক নবীন কয়েকটি গল্পে।

তারপর সারাটা বছরই তো নানারকম গল্পে-গড়া জীবন আমাদের।

'রোববার'-এর এই সংখ্যা দিয়েই না-হয় তার একটা ভূমিকা হল।

আশা করি, আপনাদের এ বছরে পথ-চলতে শুরুর স্বাদটা কতক বদলাবে।

শুভ নববর্ষ।

১৫ এপ্রিল, ২০১২

'ভিড়' কথাটার সত্যি মানে কী?

কেবলমাত্র এক সুবিশাল বহুবচন?

না, অবাঞ্ছিত মানুষের সমাহার?

'ভিড়ে যাওয়া' বলে যে-ক্রিয়াপদটি তৈরি হয়েছে সাম্প্রতিক, সেটাও যেন নিষ্কর্মার দলভারী করার গল্প ('ভিড়'-এ যাওয়া)।

কিন্তু তারপরেও যখন শরৎকাল আসে, মেঘেরা ভিড় করে আকাশজুড়ে, বাৎসরিক স্বপ্নরা ভিড় করে দোকানে-দোকানে উৎসবের নতুন সাজে, শহরে ভিড় করে প্যান্ডেলরা, আর কুমোরটুলি ভিড় করে বসে থাকেন কত-কত জগজ্জননী, তখন মনে কি হয় না যে, বছর-বছর এই ভিড়টুকু না-থাকলে আমরা বাঁচতাম কী করে?

আজকাল পুজোয় অনেকেই আর পথে বেরতে চান না—ভিড়ের ভয়।

অনেকেই পঞ্চমী-ষষ্ঠী'র দিন ঠাকুর দেখে নেন—পরে আর ভিড়ের ঠেলায় বেরতে পারবেন না বলে।

তবু, শারদীয়া-র এই পাঁচটা দিন 'ভিড়' শব্দটা কেমন যেন একটা নিজস্ব বর্ণিল জীবন পেয়ে যায়।

পুজোর জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য পুজো—এই সংশয়ের দোলাচলে, নাগরদোলা চড়ে, ফুচকা খেতে-খেতে, সারারাত ঘুরে বেড়িয়ে, নতুন চটিতে ফোসকা পড়ে কখন যেন মানুষ তার অনেক অলৌকিক অভীপ্সার কাছে পৌঁছে যায়।

তা হলে জয় হোক এই মানবসমুদ্রের আনন্দধারার। জয় হোক আনন্দময়ী-র। জয় হোক আমার

সমস্ত ভিড়-করা-ইচ্ছের।

শুভ দুর্গোৎসব।

শুভ হোক ঈদের উৎসব পালন।

২১ অক্টোবর, ২০১২

শুভ বিজয়া।

মা দুর্গার বাৎসরিক বিদায় হয়ে গেল।

আবার বৎসরান্তের প্রতীক্ষা।

মধ্যে অবশ্য রয়েছেন দুর্গার 'হ্যাংলা' ছেলেমেয়েরা। যাঁরা মা-র সঙ্গে একবার মর্ত্যভ্রমণ করে গিয়েও, আবার একা-একা বেড়াতে আসেন।

প্রথম পালা লক্ষ্মী-র। তারপর কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক।

শুনেছিলাম যেন, আশ্বিনের শুক্লপূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা-র চলটা আদতে ছিল পূর্ববঙ্গের। অধুনা বাংলাদেশ অঞ্চলের। প্রথা অনুযায়ী, এপার বাংলায় লক্ষ্মীপুজো হত দীপান্বিতার দিন।

এখন কালীপুজো এসে সেই দিনটাকে যেন অধিকার করে নিয়েছে।

চালের গুঁড়োর আলপনা ছাড়া লক্ষ্মীপুজো যেন ভাবাই যায় না। সেখানে ধনী আর দরিদ্রের কোনও প্রভেদ নেই।

উপচারের ব্যাপারে লক্ষ্মী বড়ই গণতান্ত্রিক। অতএব ভক্তদের কাছে তাঁর দাবিও বড় সামান্য। বর্ণাঢ্য দুর্গোৎসবের পর লক্ষ্মী আসেন যেন নীরবে। তাঁর গোপন-চলন এঁকে দিয়ে যায় শুভ্র-কোমল পদচিহ্ন।

সত্যিই, লক্ষ্মীপুজোর একমাত্র প্রতীক যেন ওই পায়ের ছাপ।

আবাহন জানাই সেই পুণ্য-আগমনকে। শ্রী, সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীকে।

তারপর সেই পদচিহ্ন ধরেই তো সারা বছর পথচলা।

২৮ অক্টোবর, ২০১২

লাইটিং

এখানে উৎসব। শেষ। অন্য প্রান্তে, বড়দিন। আসছে। সাজগোজ শুরু।

উৎসবের মরশুম শেষ হয়ে এল।
যে ঢাকের শব্দগুলো মাঝে-মাঝে।
কারণে-অকারণে ভেসে আসছিল কানে,
তারাও ধীরে-ধীরে স্বপ্নের মতো
অন্তর্হিত।
সিনেমাপ্রেমীদের বাৎসরিক উৎসবও
সাতদিন ধরে নন্দন চত্বর দাপিয়ে
অবশেষে বিদায় নিয়েছে এ বছরের
মতো। এরপর পুরোটাই 'আসছে বছর
আবার হবে।'
তাই হোক তা হলে।
উৎসব মরশুমের জাজ্বল্যমান
ভিস্যুয়াল আলোকমালা ধীরে-ধীরে
নিভতে শুরু করেছে শহরের বুকে।
আর পৃথিবীর অন্য প্রান্তে
থ্যাংক্সগিভিং এবং বড়দিনের জন্য
সাজগোজ শুরু হল এবার।
সেই আলোকাঞ্জলির উদ্দেশে
আমাদের এবারের সংখ্যা।

২৫ নভেম্বর, ২০১২

প্রেম আবার অসম হয় নাকি? যেমন বিশ্বাস আবার অন্ধ হয় নাকি? মানানসই, বেমানান, বৈষম্যে, আপাত-অসামঞ্জস্যের জন্য উন্মাদনার নামই তো প্রেম।

প্রেম আমাদের এক গভীর অন্তরঙ্গ অনুভব।

কিন্তু এত জাগ্রত, এবং এত বেগবতী যে, সামাজিক বাধানিষেধের সামনেও সে নিরন্তর কুলপ্লাবিনী।

কেবল আমরা সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন সেই প্রেমের কোনও প্রথাগত পরিণতি খুঁজি, তখনই সম বা অসম-র উদ্ভব।

সংসারের সাম্য রক্ষা করার দায় নেই প্রেম-এর। তাই প্রেম বারবার আসে, নানা মুক্তির দরজা খুলতে-খুলতে। তারপর, হয়তো সে-প্রেম নির্জীব হয়ে পড়ে কোনও ক্লান্তির ক্ষণে, বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার জো থাকে না। কারণ ততদিনে যে-আধারে বাস করে গিয়েছে সেই উজ্জ্বল অনুভব, সেই আধার দু'টি এক অভ্যাস-বিজড়িত সম্পর্কের বন্ধনে সম ও সামাজিক।

কারণ ভালবাসা-ই তো পারে আমাদের চোখে সকলই বিমল, সকলই শোভন করে দিতে।

প্রেমপার্বণের শুভেচ্ছা সহ।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

প্রসঙ্গ: রোববার

ক্রিকেট বেটিং নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি। কোথায়? না, শেন একটা ম্যাগাজিনে, যার সম্পাদক —আমি। বিশ্বাস হচ্ছে?

কী করে হবে? আমারই হচ্ছে না।

শুটিং নিয়ে নাজেহাল। তারই মাঝে অনিন্দ্যর ফোন এল—'ঋতুদা, বব উলমার নিয়ে একটা কভার স্টোরি ভাবব?'

তখন বোধহয় শট বিরতি। অমিতদার মেকআপ চেঞ্জ হচ্ছে। একেবারে মাথার (ন্যাড়ামাথার) ঘায়ে কুকুর পাগল। অনিন্দ্য যদি বলত, 'ঘেঁটুপুজো নিয়ে কভার স্টোরি করব' তাতেই রাজি হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

তবু সম্পাদক বলে কথা।

কিছুক্ষণ গম্ভীর নীরবতা, মোবাইল নিয়ে দু'তিন পাক পায়চারি করে বললাম, 'অ্যাঙ্গলটা কী?' (উফ, মনে হল ফাটিয়ে দিয়েছি)

ততক্ষণে অমিতদা তৈরি হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে রাগ হয়! এত তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়ারই বা কী দরকার! বম্বে স্টার কেমন মেকআপ রুমে ঢুকলে বেরতেই চায় না—আর এই চৌষট্টি বছরের বুড়োকে দ্যাখো! চটপট করে তৈরি হয়ে নিয়ে একেবারে গটগট করে ফ্লোরে। আর, আমি কি না তখনও স্টুডিও চত্বরে পায়চারি করে করে প্রচ্ছদকাহিনি ভাবছি। 'যা খুশি কর' বলে ফোন বন্ধ করে সোজা ফ্লোরে।

আবার শুটিং শুরু। আবার বহির্জগৎ সম্পূর্ণ লোপাট আমার সমস্ত অস্তিত্ব থেকে।

শঙ্করাচার্যর মায়াবাদ যে কাকে বলে, শুটিং করার ক'দিন বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাই।

দুই

দুটো লেখা এসে পৌঁছেছে দপ্তরে। শুটিং শেষ করে যখন 'রোববার'-এ ফিরলাম, তখন এই সংখ্যার কাজ মোটামুটি শেষ।

ফার্স্ট পার্সন আর 'চলতি রহে জিন্দেগি' সরবরাহের ভার যেহেতু আমার, ওই দুটোই কেবল আটকে আছে।

আমি তো আবার শুটিং-এর ফাঁকে ভীষণ আদিখ্যেতা করে অমিতদাকে 'চলতি রহে'র পুরনো কিস্তিগুলো পড়ে শোনাতে গেছি। অমিতদা যা একটা নিমপাতা খাওয়া মুখ করলেন! আমি নাকি আদ্ধেক কথা লিখিইনি।

বৃন্দা কারাত আসলে যে কত 'ওয়াইল্ড' ছিলেন, আমায় অমিতদা বলেছিলেন—আমার নাকি সেটা লেখা উচিত ছিল। 'মেরে অঙ্গনে মে' গানটা আসলে অমিতদা প্রতীক্ষায় কোনও একটা হোলির দিন ঢোলক বাজিয়ে গেয়েছিলেন। সেই শুনে প্রকাশ মেহরা 'লাওয়ারিশ'-এ গানটা ব্যবহার করেন—এই ডিটেলটা লেখায় থাকা উচিত ছিল।

এই করতে করতে টীকা টিপ্পনীর তালিকা এমন বাড়তে লাগল, যে তাতে করে 'ভ্রম সংশোধন' বা 'নতুন তথ্য' বলে আরও দুটো কিস্তি লিখে ফেলা যায়।

স্মার্টলি বললাম, 'ঠিক আছে, বই যখন হবে, কারেক্ট করে দেব।' অমনি সবাই বলল 'ও! ওটা বই হচ্ছে বুঝি? বই হচ্ছে বুঝি?'

আমি খুব রহস্যময়তার সঙ্গে হাসলাম। পাগল! আর কথা বাড়াতে আছে?

তিন

ভেবেছিলাম এবারের 'ফার্স্ট পার্সন'-এ সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের নাম করব না। কেবলমাত্র খবরের কাগজ পড়ে, আর টিভি দেখে এর থেকে বেশি লেখা যায় না।

সত্যিই যদি মাঠে নেমে আক্রান্ত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি, তবেই আর লিখব—নইলে ঠাণ্ডা ঘরে বসে বুলি কপচানোর কোনও মানে হয় না।

এমনিতেই এখন প্রচুর বুদ্ধিজীবী মাঠে নেমে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বেশ একটা 'রাবণ রাবণ' চেহারা দেওয়া গেছে। 'বুদ্ধদেব নিপাত যাক' বলতে পারাটা এখন যেন একটা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।

অতএব, সে দায়িত্ব অন্যরাই পালন করুন।

বব উলমার-এর কভার স্টোরিটা পড়তে গিয়ে কোথায় যেন এই 'প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা'র জায়গাটা একবার একঝলক আলোর মতো চোখের সামনে ঝলসে উঠে মিলিয়ে গেল।

নন্দীগ্রামে আর বব উলমার—কোথাও কোনও মিল কি আছে?

সে গায়ের জোরে মিল খুঁজলে তো সবকিছুর সঙ্গেই সবকিছুর মিল। কলকাতার কোনও এক ফিল্মপণ্ডিত সম্প্রতি যেমন 'দোসর'-এর সঙ্গে কিয়সলস্কির 'থ্রি কালার্স—ব্লু'-এর মিল বের করেছিলেন। অশোক বিশ্বনাথন তার একটা উত্তরও দিয়েছিলেন চমৎকার। এই একই কথা বলে—তা-হলে তো সবকিছুর আর সব কিছুর মতো, মৌলিক বলে আসলে কিছু নেই।'

আছে বোধহয়। পৌঁছবার এক বিপুল তাড়া। আর সেখানে থেকে জন্ম নেওয়া এক

দিগ্বিদিকশূন্য হঠকারিতা, আর পর্বতপ্রমাণ অধৈর্য। যার সামনে দু-দণ্ডের প্রশান্তি নেই, থমকে দাঁড়িয়ে দুবার ভাবা নেই।

সাফল্যের পথের বাধারা ক্ষমাহীনভাবে অপাংক্তেয়। সে দলের কোচ-ই হোক, আর ভূমিপুত্রকন্যাই হোক।

দেখেছেন, এই বললাম ভারি ভারি বিষয় নিয়ে কথা বলব না, সে হক অন্যদের। তবু!

অমিতাভ বচ্চন খুব ভাল লোক। সত্যিই লম্বা। গলার আওয়াজ অতটা বাঘের মতো নয়। আর, খুব মনোযোগী শিল্পী।

ঐশ্বর্য আর অভিষেক-এর কথা আর একদিন বলব।

৮ এপ্রিল, ২০০৭

আজ রোববার একবছর পূর্ণ হল। সেদিক থেকে হিসেব করতে গেলে এটি আমার বাহান্নতম ফার্স্ট পার্সন। আমি লিখিয়ে নই। তার মানে অবশ্য এমনও নয়, যে আমি বিরাট ছবি করিয়ে। তাও নই।

যতদূর বুঝি, আমি সাধারণ বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। মাথার ভেতরে অনেক সময়ই অনেক কিছু কিলবিল করতে থাকে—তার অধিকাংশটাই হাবিজাবি।

কিন্তু, কী করে জানি, প্রায় নিজেরও অজান্তে মাথার ভেতর জমে থাকা সেই অপাংক্তেয়রা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায় মাঝে মাঝে—সে ব্যাপারে আমার নিজেরও বিশেষ কিছু করবার থাকে না।

এই করেই বাহান্নটা লেখা পার করে দিলাম। আমার হাবিজাবি ছাইপাঁশ দিয়ে।

রোববার-এর সূচিপত্র পাতায় আমার সম্পাদক বলে নাম যায়।

তার থেকে যদি ধরে নিতে হয় যে ফার্স্ট পার্সন বিভাগটা আদতে সম্পাদকীয়, তাহলে বাহান্নটা সপ্তাহ ধরে পাঠকরা নিশ্চয়ই নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছেন।

কারণ ফার্স্ট পার্সন-এ অধিকাংশ সময়েই যে লেখাগুলো আমি লিখেছি, তার সঙ্গে সেই সংখ্যার রোববার-এর বিষয়গত, আঙ্গিকগত কোনও সম্পর্কই নেই।

সেগুলো একান্তভাবেই আমার নিজের কথা। আমার আত্মপ্রলাপ।

সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম নিয়ে কোনও প্রতিবাদী ভঙ্গি নেওয়ার কোনও প্রত্যাশিত 'সামাজিক' দায় ছিল না আমার। কোনওদিন।

কেউ কখনও ভাবেনওনি, আশাও করেননি আমার থেকে—যে আমি এই বিষয় নিয়ে কোনও

কথা বলব। বরং বলব না, এমনটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

পেলব লালিত্যই ঋতুপর্ণ ঘোষের স্বাভাবিক চিরচেনা ভঙ্গি। তার সঙ্গে রোববার এর সম্পাদককে মেলাতে কোথাও যেন একটা অস্বস্তি হয়েছে অনেকের।

অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন এটা একটা শৌখিন ফ্যাশনেবল সময়োপযোগী কোরাস শৃগাল দলের হুক্কা হুয়া। নামান্তরে পাবলিসিটি স্টান্ট।

যাঁরা আমাকে আরেকটু ভাল করে চেনেন, তাঁরা ভেবেছিলেন—একে আবার কোন ভূতে কিলোল?

কারণ এসব কথা লিখে বা না লিখে আমার সিনেমার বিক্রি এক পয়সা বাড়বেও না, কমবেও না।

অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে বিপাশা বসু অবধি সবাই ঋতুপর্ণ ঘোষের সঙ্গেই কাজ করতে আসেন।

রোববার-এর সম্পাদককে নিয়ে তাঁদের কারওরই কোনও মাথাব্যথা নেই।

তাহলে লিখলাম কেন?

সত্যি কথাটা বলি? অন্য কিছু লিখতে পারলাম না বলে। এটা কৃতিত্ব না অপারগতা জানি না। কেবল জানি আমার লেখার কাগজের সঙ্গে আমাকে তখন জুড়ে রেখেছিল যে অক্ষরগুলো সেগুলো, আসলে আমার মাথার মধ্যে নিত্য গজানো সেই ছাইপাঁশগুলোর কিলবিল।

আমি পণ্ডিত নই। প্রতিভাবান নই। চিন্তাবিদ নাই। কেবল, নিজের মতো করে যেটুকু ভাবতে পারি, সেটুকুই আমার কলমের কালি।

আমার আত্মপ্রলাপ।

কোনও না কোনও সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, এমনকী পাতা ছাড়ার ডেডলাইনের চাপের মুখেও দেশ বিদেশের নানা কোণ থেকে যখন দিশেহারার মতো ফার্স্ট পার্সন ফ্যাক্স বা মেল করতে হয়েছে, আঁকড়ে ধরার মতো একটাই জিনিস ছিল আমার সামনে। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিটুকু। সেটা প্রাসঙ্গিক হল কিনা—সময়োপযোগী হল কিনা, সামাজিকভাবে মানানসই হল কিনা এসব চিন্তা করার সময় পাইনি কোনওদিনই।

অনেকসময়ে তাতে সমস্যাও হয়েছে।

কোনও এক মুহূর্তের ব্যক্তিগত ভাবনা যখন দেড় সপ্তাহ পরে ছেপে বেরিয়েছে, তখন দ্রুতপরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রেক্ষিতে তাকে অনেক সময় বাসি, মৃদু, অতীব্র মনে হয়েছে।

কিছু করবার ছিল না আমার। কোনও আক্ষেপও হয়নি কোনওদিন।

আমার আর আমার 'ফাস্ট পার্সন'-এর নিরন্তর গোল্লাছুট-এর সামনে দাঁড়িয়ে অনেক সময়ই সরিয়ে রাখতে হয়েছে আরও জমা হতে থাকা কিলবিলে ছাইপাঁশ।

কারণ, জীবনের পাতায় স্মৃতির ছবি যে-ই আঁকুক, তার অন্তত আগের শুক্রবার পাতা ছাড়ার কোনও দায় নেই।

আবার আত্মপ্রলাপে ফিরি।

আমি জন্মবার মাস তিনেক আগে আমার মাসির, আমার মা'র একমাত্র দিদির, স্বামীবিয়োগ ঘটে। মাসীমণির বয়স তখন পঁচিশ।

শুনেছি, আমি জন্মানোর পর মাসিমণির অনেকটা সময় কেটেছিল আমায় নিয়ে। সদ্য অকালবৈধব্যের তীব্র হাহাকার হৃদয়ের সামনে আমিই নাকি ছিলাম কাঁথায় মোড়া একপুঁটলি মলম।

মা চলে যাওয়ার মাস চারেকের মাথায় রোববার শুরু হল।

যে অপরিমেয় শূন্যতা কোনওদিন পূর্ণ হওয়ার নয়, নতুন রোববার এসে বুজিয়ে দিয়েছিল তার অনেক বন্ধুর খানাখন্দ।

মাঝে মাঝে মা'কে নিয়ে ফার্স্ট পার্সন লিখতে লিখতে কেমন যেন সংকোচ হয়েছে।

মনে হয়েছে এ যেন পরম মূল্যবান এক গোপন সম্পদের নির্লজ্জ প্রদর্শনী।

তারপরে লেখাটা বেরিয়েছে। অনেক ফোন এসেছে। এসএমএস পেয়েছি।

বন্ধুদের। অগ্রজ সাহিত্যিকদের। অচেনা পাঠকের। মনে হয়েছে মায়ের আলনা থেকে ছাড়া শাড়ির সুবাস কেমন করে যেন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। রোববার-এর ডানায় ভর করে।

আমাদের পাণ্ডিত্যশাসিত মনের কাছে অনেক সময়ই নিছক ব্যক্তিগত ভাবনার তেমন কোনও সামাজিক মূল্য নেই। অন্তত, তেমনটাই শিখে এসেছি বরাবর। তেমনটাই জানতাম। রোববার শুরু হওয়ার আগে অবধি।

গত একটা বছর আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে, যে কোনও আন্তরিক সেতুই সামাজিকভাবে মূল্যবান। কারণ বিশ্বাস আর সহমর্মিতা দিয়েই মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

আজকে, রোববারের জন্মদিনের তিথি তাই মুখর হয়ে উঠেছে অনেক বিশিষ্ট মানুষের নিভৃত সঙ্গোপন আলাপচারিতায়। ব্যক্তিগত গদ্যসংকলনে।

ম্যাগাজিনের জন্মদিন কেমন করে হয় আমি জানি না।

কে তার পায়েস রাঁধে? কোন দোকান তার কেক বানায়?

শুধু আমি কেন, অর্পিতা বা বর্ণিনী গত এক বছর ধরে যারা পালা করে রান্নাঘরে হেঁসেল সামলে এসেছে, ওরাও বলতে পারল না।

কিন্তু জন্মদিনের উপহার চাইতে তো কোনও বাধা নেই।

ভাল হোক, মন্দ হোক—একটা বছর কাটিয়ে তো দিলাম।

ফাঁকি না দিয়ে। না ঠকিয়ে।

আমরা সবাই জানি রোববার এর পাতা তেমন উৎকৃষ্ট নয়।

রোববার-এর ছাপা নিয়মিত সুদৃশ্য নয়। নির্ভুলও নয়। একসময়ের বিজ্ঞাপনকর্মী হিসেবে এই বাহ্যিক ত্রুটিগুলো গোড়ার দিকে আমায় বড় পীড়া দিত।

গত একবছর আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে আমার এই সদ্য হাঁটতে শেখা বন্ধুটির হাত ধরে পরম নির্ভরতার আশ্বাস পেতে।

সেই আশ্বাসের মধ্যে আপনাদের প্রত্যেকের শুভেচ্ছা মিশে আছে।

যতদিন আমরা না ফাঁকি দিই, আপনাদের এই বিশ্বাসটুকু, এই শুভেচ্ছার সুঘ্রাণ যেন অম্লান থাকে। প্রথম জন্মদিনেই এর থেকেও বড় উপহার চাইলে সে বড় হ্যাংলামি হবে।

চরৈবেতি।

২৩ ডিসেম্বর, ২০০৭

'বিনা অনুমতিতে ঢুকবেন না। আর দরজা ফাঁক করে অনুমতি নেবেন না।'

রোববার-এর সম্পাদকের দপ্তরের ফ্লাশ করা একপাল্লা দরজায় এই মর্মে একটা নোটিশ সাঁটা আছে গত একবছর।

নতুন কেউ অফিসে এসে ওই নোটিশ-এর সামনে অবধারিতভাবে ভ্যাবাচাকা, এবং তারপর একটা দ্বিধান্বিত আমতা আমতা—

তাহ'লে ব্যাপারটা কী হ'ল?

অমনি পাশের ঘর থেকে একগাল হেসে আমাদের মানে 'রোববার'-এর সদা অমায়িক সম্পাদক মহাশয় বেরিয়ে আসেন।

—আসুন, আসুন! না, না,... ওটা কিছু নয়... ঋতুদাকে তো চেনেনই, আসলে ওটা...

হ্যাঁ, আমাদের সম্পাদক মশাই। অনিন্দ্য। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

যে অনিন্দ্য এতদিন ছিল কেবল চন্দ্রবিন্দুর অনিন্দ্য। গত এক বছর তার সঙ্গে এখন নতুন বিসর্গ যুক্ত হয়েছে। বিসর্গ বা উপসর্গ —রোববার।

অনিন্দ্য আমাদের বড় ভাল সম্পাদক।

একা হাতে গোটা রোববারটা সামলান। আমাকে কোনওরকমে শ্যুটিং কিংবা এ শহর ও শহরের ফাঁকে খপাৎ করে ধরে কভার স্টোরি ঠিক করিয়ে নেন। আমি শ্যুটিং করতে যাব বললে দরাজ হাতে অনুমতি দেন, এবং নিজের শো এবং রেকর্ডিং-এর পাশাপাশি এমনভাবে রোববারটা সাজিয়ে-গুছিয়ে টানিয়ে টুনিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেন, যে কাউকে উইকলি অফ-ডে বলিদান করতে হয় না প্রায়, রাত জাগতে তো হয়ই না।

আপনারা যে ভাবেন আমি কেমন ক্যামেরা ছেড়ে কলমচি হয়েছি,.. নিয়ম করে ফি সপ্তাহে একটা গোটা ফার্স্ট পার্সন লিখে ফেলছি—তার জন্য কোনও কৃতিত্ব যদি কারুর থেকে থাকে সে হল আমাদের সম্পাদকমশাই, এবং আমাদের গোটা 'টিম রোববার'-এর। কতবার এমন হয়েছে শ্যুটিং-এ প্রচণ্ড ব্যস্ত, অনিন্দ্যকে বলেছি—এবার আমার ফাস্ট পার্সনটা তুই লিখে দে, লক্ষ্মীসোনা ...অনিন্দ্য অমনি ওর ভুবনভোলানো হাসি দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ় বিনয়ের সঙ্গে আমার প্রস্তাব বানচাল করে দিয়েছে।

—ওটা হয় না, ঋতুদা, সবাই তোমার লেখা চেনে। লে ঠ্যালা! আমি কি জেমস জয়েস, না কমলকুমার মজুমদার—যে আমার লেখা সবাই চিনবে?

শ্যুটিং করছি মুসৌরিতে, এডিট করছি মুম্বইতে—দিনক্ষণ, সপ্তাহ বার সব গুলিয়ে একশা। হঠাৎ একটা অমায়িক এসএমএস

—ঋতুদা, ফার্স্ট পার্সনটা... বুঝলাম আজ বৃহস্পতিবার।

আমাদের রোববার-এর দপ্তরে সব লেখকরা বড় লক্ষ্মী।

সমরেশদা তো কবে থেকে অগ্রিম কিস্তি পাঠিয়ে দেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও তাই। জয়ের বিভাগটা সবে শুরু হয়েছে। এখনও সঠিক জানি না। জয়াদিও এই দিচ্ছি, এই দেব করে বেশ ম্যানেজ করে চালিয়ে দিল। ঝোলানোর মাস্টার হচ্ছি আমি আর নবনীতাদি।

আমাকে তো তবু সম্পাদক মশাই বাঁশের তাগাদা দিয়ে লেখাটা যেমন করে হোক শনিবার, না হলে রোববার সকালের মধ্যে লিখিয়ে নেন।

নবনীতাদি তো অন্য লিগের প্লেয়ার একেবারে। আজ আমেরিকা, কাল সাউথ আফ্রিকা, পরশু নার্সিং হোম।

'ভালবাসার বারান্দা'র মতো অমন চমৎকার রোদ্দুরমেলা জায়গাটা যে প্রায় যখন তখন হিচককের 'রেয়ার উইন্ডো' হয়ে যায়, নবনীতাদির লেখা এসে পৌঁছবে কি পৌঁছবে না, সেটা যে কোনও আন্তর্জাতিক মানের থ্রিলার ছবির ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য, প্রায় এটা আমার 'রোববার'-এর দপ্তরে সবাই জানি।

যে দরজাটায় নোটিশটা সাঁটা আছে বললাম সে ঘরে আমি বসি। আমাদের সেই ঘরের ছবি বহুবার ফার্স্ট পার্সনে বা রোববার-এর আড্ডার ছবিতে দেখেছেন আপনারা।

আমাদের সেই ঘরের একটা দেওয়াল লাল, একটা সাদা আর দুটো কালো। ঘরে কোনও ডেস্ক-চেয়ারের বালাই নেই, পুরোটাই যেন একটা মজলিশি আড্ডার পরিবেশ।

আমার একটা টিনের স্যুটকেশ আছে—তার মধ্যে দরকারি কাগজপত্র থাকে। দরকারি কাগজপত্র মানে এডিটোরিয়াল নোটস। আর এডিটোরিয়াল নোটস মানে কতগুলো সম্ভাব্য কভার স্টোরির একটা দীর্ঘ তালিকা—প্রায় তিরিশ চল্লিশটার মতো। তৈরি করা হয়েছিল রোববার

বেরনোর আগে—তার থেকে পাঁচটারও শেষমেশ প্রচ্ছদ কাহিনি হয়েছে কিনা, জানি না।

ঘরটাকে সিনেমার সেটের মত সাজিয়ে রাখার দায়িত্ব শম্ভু, উজ্জ্বল আর দুর্গাদার।

আমাদের 'রোববার' লেখা কফি মাগ আছে। যে অতিথিই আসুন না কেন—রূপা গাঙ্গুলি থেকে সোহা আলি খান, তাঁরা সেই মাগে চা বা কপি খান, এবং বাড়ি যাওয়ার আগে নিশ্চিত বলেন—কী সুন্দর মাগগুলো তোমাদের। আমাকে দিও, প্লিজ!

সিনেমার শ্যুটিং-এ যেমন একজন Prop Co-ordinator থাকেন রোববার-এ সেটা দুর্গাদা। অফিসঘরের কোন ছবি শ্যুটিং-এ যাবে, তাকে গুছিয়ে প্যাক করে পাঠানো, আবার ফেরত এলে যথাস্থানে রাখা—পুরো হ্যাপাটাই দুর্গাদা সামলান।

আমার হাতের কাছে একটা রিমোট বেল আছে। সেটা বাজালেই দুর্গাদা, উজ্জ্বল, শম্ভু বিনা অনুমতিতেই ছুটে আসতে পারে। আর বেলটা কোনও কারণে না বাজলেই আমি চ্যাঁচাই এই বলে যে—আমার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

উল্টোদিকের ঘরটা আমাদের সম্পাদক মশাইয়ের বৈঠকখানা। দিনের যে কোনও সময় অনিন্দ্য, অর্পিতা, বর্ণিনী, রিংকা, রাজু থাকলে দরজায় যদি আড়ি পাতেন—কল কাতায় পাওয়া যায় এমন কোনও খাবার সম্পর্কে একটা লেটেস্ট আপডেট পেয়ে যাবেন। আর, রূপাই থাকলে তো কথা নেই।

প্রত্যেকে প্রথমে ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পর্কে একটু আড়ষ্ট ছিল। এখন ঋতুদাকে নিয়ে ওদের অধিকারবোধ অপরিসীম।

ঋতুদা খামোকা ন্যাড়া হল, আবার উইগ পরে অফিসে এল, বেরবার সময় উইগটা খুলে ফেলল—

অতশত পাগলামো সহ্য বা অগ্রাহ্য করার হাসিমুখটা এখন সকলেরই প্রায় অটুট।

কেবল বিপুলদা মাঝে মাঝে দেখা হলে একটা লজ্জা পাওয়ার বা লজ্জা দেওয়ার মতো মুখভঙ্গি করার চেষ্টা করেন। কোনও লাভ হয় না।

শান্তনু আমাদের ডিজাইন সহকর্মী, প্রথমে Layout রিজেক্ট করলে বেশি নার্ভাস হত। এখন একটু বেশি তড়পায়।

এখন কথা হচ্ছে, এতসব পাগলামোর মধ্যে ম্যাগাজিনটা বেরয় কী করে!

আমাদের সম্পাদকমশাই আমাদের প্রত্যেককে একটা অদৃশ্য রিমোট বেল দিয়েছেন। সেটা যখনতখন বাজে।

আর বাজামাত্র শত কাজের মধ্যেও ভোর চারটেয় উঠে আমি ফার্স্ট পার্সন লিখি, অর্পিতা হাসিমুখে রাত দশটা অবধি তার পাতা করে, বর্ণিনী নেট থেকে কোনও খবর দেওয়ার থাকলে তৎক্ষণাৎ সেটা বার করে দেয়, রাজু যতবার প্রয়োজন রি-টাইপ করে।

এই বেলটা বাজলে কোনও পড়িমরি নেই। কোনও পেয়াদাপনা নেই। কেবল একটা ফুরফুরে আনন্দ আছে।

সেটুকুই রোববার-এর সম্বল।

আর সম্পদ।

দু'হাজার আট আনন্দের হোক।

৩০ ডিসেম্বর, ২০০৭

গত চোদ্দোই মার্চ, সারা কলকাতা শহর যখন নন্দীগ্রাম নারকীয়তার বর্ষপূর্তি নিয়ে বিষাদমনা, আমাদের সংবাদ প্রতিদিন-এর দফতরে এক নবজাতক ভূমিষ্ঠ হল।

সংবাদ প্রতিদিন-এর শুক্রবারের বিনোদনী ক্রোড়পত্র, পপকর্ন।

এখন থেকে প্রতি শুক্রবার 'রকমারি'র বদলে এই নতুন ক্রোড়পত্রটি বেরবে।

ক্রোড়পত্র সম্পাদনার দায়িত্ব আমাদের রোববার-এর সম্পাদক অনিন্দ্য চাটুজ্যে মশাইয়ের। সঙ্গে বিপুল উদ্যমে মদত দিয়ে যাচ্ছে, বিপুলদা—আমাদের ডিজাইনার বিপুল গুহ।

সবাই আমায় বলে, আমি নাকি একসঙ্গে একগাদা কাজ করি। অনিন্দ্য আমায় এ বিষয়ে গোটা একটা মাধ্যমিক পরীক্ষা নিতে পারে।

বলিউডের হালহকিকতটা এখনও বোধহয় অনিন্দ্য তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেনি। কলকাতায় বসে সেটা খুব সহজ কাজ নয়ও। 'আনন্দলোক' সম্পাদনার সময় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেতাম। আপাতত, অনিন্দ্যর হাতের কাছে একটা ভাঙা কুলো আছে, যার নাম ঋতুপর্ণ ঘোষ।

—ঋতুদা, তুমি একটা 'আমার নায়িকারা' ধারাবাহিক লেখো না। দেবশ্রী, ইন্দ্রাণী, রূপা, ঋতুপর্ণা, কঙ্কণা, রাইমা এদিকে আবার রাখী, শর্মিলা, জয়া, অপর্ণা। বম্বে থেকে, ঐশ্বর্য, প্রীতি, সোহা, মনীষা, বিপাশা। দারুণ খাবে! বোঝো! আমিও অমনি বাড় খেয়ে ক্ষুদিরাম! কী-ই বা করব। হলই বা সতীনের বাচ্চা! বাচ্চা তো! মেঝেতে বসে পা ছড়িয়ে তারস্বরে কাঁদবে, একবার কোলে তুলে ভোলাব না, চাঁদমামা দেখাব না, খেলা দেব না—তাও কি হয়!

শুরু করে দিতে হল কিস্তি। বিপাশাকে দিয়ে। অনিন্দ্যর আবার কড়া আদেশ। কেবল ফ্ল্যাশ ব্যাক হলেই চলবে না। উল্টোদিক থেকে শুরু।

মানে চুমকী আর রীণাদির পালা এক্কেবারে শেষে। আমার তো 'আমার নায়িকা' বলতে লিখতে ইচ্ছে করছে বিনোদিনী দাসীর কথা। তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, কেতকী দত্তর কথা। মঞ্জু দে, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী-সুপ্রিয়া-মাধবী, অরুন্ধতী দেবী, কাবেরী বসু, অনুভা গুপ্তর কথা। যাঁদের

লাবণ্যের ছায়ার বা স্মৃতিকথার পাতা থেকে রূপসাগরে ডুব দিতে শিখেছে আমার কিশোরকাল। অষ্টনায়িকার প্রতিটি ভঙ্গি আলাদা করে কেমন চিনতে শিখেছি এই এক একজন অনন্য জাদুকরীর কাছ থেকে।

থাক! সে যদি কখনও লিখি, রোববার-এই লিখব'খন।

পপকর্ন-এ এসব লিখতে গেলে বিপদ আছে।

অনিন্দ্য এমনিতে তো ভাল বাড়ির ছেলে। নিজে মারবে না। গুন্ডা দিয়ে মার খাওয়াতে পারে। ফলে, এখন থেকে সপ্তাহান্তে দু-দু'টো লেখার তাগাদা।

আজকাল প্রায়ই স্বপ্ন দেখি, মোবাইলে রোববার লেখাটা ঝনঝন করে বাজছে। ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে যায়।

এতদিন জানতাম, অনিন্দ্য শখ করে দাড়ি রাখে।

ও যে আসলে বড় হয়ে কাবুলিওয়ালা হবে, সেটা আমায় বলেনি তো কখনও।

৩০ মার্চ, ২০০৮

মা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার জন্মদিনটা কাছে এলেই ভয় করে। বাবাকে গিয়ে প্রণাম করা মানেই তো একবার একরাশ উথালপাথাল কান্না।

প্রথম সন্তানের জন্মতিথির স্মৃতিমালা তো একটা মানুষের সঙ্গেই ভাগ করে নেওয়া যায় সব থেকে বেশি—সে স্ত্রী।

মা চলে যাওয়ার পর আমাকে অন্য একটা জন্মদিন দিয়ে গিয়েছে।

'রোববার'-এর জন্মদিন।

আর দিয়ে গিয়েছে সপ্তাহে অন্তত দু'পাতা লেখবার দায়িত্ব। কারণ মা মনে করত, আমি যদি একটু মন দিই, আমি নাকি 'লেখক' হতে পারি। মা'র বড় সাধ ছিল ছেলে 'লেখক' হবে।

মা জানে না, বা হয়তো জানেও, যে, এর মধ্যে আমি ১০৩ 'ফার্স্ট পার্সন' লিখেছি। এটা ১০৪ নম্বর।

মাঝে মাঝে মনে হয় 'ফার্স্ট পার্সন' বিভাগটার নাম বদলে 'পথে প্রবাসে' বা 'দেশে বিদেশে' করে দিই।

নাই বা হলাম মুজতবা আলি বা অন্নদাশংকর-এর মতো লেখক—তাঁদের রচনানামটা ধার করতে দোষ কী।

নিদেনপক্ষে 'গেছোদাদার গদ্য'। যে হারে নানা কাজে টুকরো টুকরো হয়ে থাকি সারাবছর! শুটিং, এডিটিং, ডাবিং, টক শো—আর অনিন্দ্য বেচারা কী হয়রান-ই না হয় সময়মতো আমার

হলদে প্যাডের কয়েক পৃষ্ঠা কাগের ঠ্যাং-বগের ঠ্যাং জোগাড় করতে।

পুরোটা যে অনিন্দ্যর কথা শুনেই আমি 'ফার্স্ট পার্সন' লিখে ফেলি, তা নয় কিন্তু। কোথাও যেন মা'র একটা প্রচ্ছন্ন শাসনও থাকে। ছেলেবেলার হোমওয়ার্ক না করলে যেমন থাকত, অনেকটা সেরকম।

বন্ধু ও কবি জয়ও এ-ব্যাপারে অনেকটা মা'র মতো। ওরও ধারণা, আমি বড় হয়ে লেখক হব। আমার 'ফার্স্ট পার্সন'গুলো যাতে একত্রিত হয়ে ছাপা হয়, সে-ব্যাপারে ওর বিশাল আগ্রহ। আমার কোনও আপত্তি ও ধোপে টিকতেই দেয় না।

আমার স্থির বিশ্বাস এটা মা আর জয়ের একটু যুগ্ম ষড়যন্ত্র।

এই সংখ্যায় 'রোববার' দ্বিতীয় জন্মদিনে পড়ল।

আপনারা সবাই 'রোববার'-এর শুভায়ু কামনা করুন—এটুকুই অনুরোধ।

তাতে 'রোববার'-এর আমরা সবাই খুশি হব। মা-ও খুব খুশি হবে।

২৮ ডিসেম্বর, ২০০৮

কয়েক দিন আগে সমরেশদার (মজুমদার) সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল।

অবধারিত ভাবে 'রোববার'-এর প্রসঙ্গ উঠল। এবং সেই সূত্রে 'ফার্স্ট পার্সন'-এর কথা।

সমরেশদা বললেন,

—ঋতু, আমার মেয়ে তোমার কাছে একটা অনুরোধ করেছে।

—কী সমরেশদা?

—যে যে সপ্তাহে তুমি সম্পাদকীয় লেখবার সময় পাবে না যথেষ্ট, সাদা পাতায় লিখে দিও, 'এই সপ্তাহে ফার্স্ট পার্সন লিখলাম না।'

মনে হল যেন এ এক বিশাল ভারমুক্তি।

আমার আদরের পাঠকেরা যারা আমার এলোমেলো গদ্য, এলোমেলো ভাবনার মধ্যে থেকেও খুঁজে পান সাপ্তাহিক আনন্দ, তাঁদের সেটুকু থেকে বঞ্চিত করার অধিকার আমার কোথায়?

তাই এ সপ্তাহে আমি 'ফার্স্ট পার্সন' লিখলাম না।

ভয় নেই এরকম সপ্তাহ ঘনঘন আসবে না।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

এবারের সংখ্যাটা আক্ষরিক অর্থেই রোববার-এর রান্নাঘর সংখ্যা।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই একটা হেঁসেল থাকে। সেখানে ঢুকে না-পড়লে সেই জায়গার হাঁড়ির খবরের গন্ধটা নাকে এসে পৌঁছয় না।

আমি আগেও বোধহয় লিখেছি, এই 'ফার্স্ট পার্সন' কলামেই যে, রোববার-এর দপ্তরে যে কোনও সময় 'দরজা' ঠেলে ঢুকলেই আপনার নাকে কোনও না কোনও (কিছু সময় একাধিকও বটে) খাবারের গন্ধ এসে ঠেকবে।

না, এখনও অনিন্দ্য দপ্তরের মধ্যে একটা আস্ত রন্ধনশালা বসিয়ে ফেলতে পারেননি। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে সেটা হবে।

কী করে যে আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনিগুলো, বিভিন্ন বিভাগীয় রচনা, নিয়ম করে, সময়মতো, পাতা হয়ে ছেপে বেরোয়, সেটা ভেবে আমার প্রায়শই আশ্চর্য লাগে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যখনই দপ্তরের দরজা ঠেলে মুখটা বাড়াই, অবধারিত ভাবে কানে আসে কোনও কোনও খাবারের বিশদ বিবরণ।

সত্যি কথা বলব, 'রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ' বিভাগটা আছেই বোধহয় আমাদের ইন হাউস বিনোদনের জন্য।

খাবার নিয়ে কোনও লেখা যদি না বেরোত নিয়ম করে, সত্যি 'টিম রোববার' প্রচণ্ড বদহজমে ভুগত, সব থেকে বেশি অখুশি হতেন নিশ্চয়ই আমাদের সম্পাদক মশাই অনিন্দ্য চাটুজ্জে।

এর থেকে দু'জনকে বাদ রাখছি। এক, জয়—আমাদের কবি জয় গোস্বামী। বেচারা খাবার বলতে বোঝে চা আর বিস্কুট। আর আমাদের 'টিম রোববার'-এর নবীনতম সদস্য চন্দ্রিল ভট্টাচার্য। এই দু'জনকে বাদ দিলে রোববার-এর বাকি সকলে প্রায় সর্বভুক ও খাদ্যরসিক, 'ফুডপাথ' সংখ্যাটি আমাদের সেই হেঁসেলের তপ্ত ভাবনা—ফুড ফর থট যাকে বলে। বলা যায় না, তারিয়ে তারিয়ে পড়ে আপনারা যদি খুব তারিফ করেন, ভবিষ্যতে হয়তো 'রোববার' একদিন রান্নার রেসিপি ম্যাগাজিনও হয়ে যেতে পারে।

'টিম রোববার' তো কেবল আমাদের দপ্তরের লোকজন নন।

যাঁদের ভালবাসা এবং প্রেরণায় এতদিন ধরে 'রোববার' ক্রমশ সুস্বাদু হয়ে উঠেছে, পাঠকদের মধ্যে সেই বিশেষ 'ফুডি'দের জন্য এবারের সংখ্যা 'ফুডপাথ'।

লজ্জা করে খাবেন না প্লিজ। অনিন্দ্য দুঃখ পাবে।

৩১ মে, ২০০৯

ঠিক তিন বছর আগের কথা।

এমনই এক শেষ ডিসেম্বরের বিকেল।

প্রায় বছর দু'য়েকের পর আবার কতগুলো চেনা শব্দ—ফর্মা, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি।

'আনন্দলোক'-এর সম্পাদনার মেয়াদ ফুরিয়েছে, বেশ ক'বছর হল। এবং সত্যি কথা বলতে কী—আনন্দেই আছি। আর নিত্য গসিপ ঘাঁটার কাজ নেই। কলকাতা বা মুম্বইয়ের তারকাদের পেছনে ফেউ লাগানো নেই—কারুর হাঁড়ির খবর টেনে বের করার দায় নেই। ফলে অগাধ শান্তি।

এমন সময় উদয় হল 'রোববার' নামক এক প্রস্তাবের। অনেক দোনমনা করেও কেন রাজি হয়েছিলাম জানি না। কেন প্রথম দু'দিন কাজ করে 'না রে টুম্পাই, আমার দ্বারা হবে না' বলে চলে আসিনি, জানি না।

যতটুকু স্মরণ বা অনুমান করতে পারি—আমার তখনকার সহকর্মীদের টানে। অনিন্দ্যর সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের। 'তিতলি'-র ডিরেকশন টিমে অনিন্দ্য ছিল। 'শুভ মহরৎ'-এ অভিনয় করেছে।

বাকিরা যারা ছিল : অর্পিতা, বর্ণিনী, রিংকা, নীলাঞ্জনা—ইতিমধ্যেই সবাই মিলে একটা একান্নবর্তী পরিবার টাইপ তৈরি হয়ে গেছে। শুধু একান্নবর্তী নয়, 'ভীষণ ভোজনরসিক পরিবার'।

শুরু তো হল। লেখক পাই কোথায়? নবনীতাদিকে ফোন করলাম—রাজি হয়ে গেলেন। সমরেশ মুজমদার কথা দিলেন একবছর ধারাবাহিক উপন্যাস লিখবেন। তারাপদ রায় ফিরে আসবেন ডোডো-তাতাই নিয়ে।

শিল্পের দায়িত্ব বিপুল গুহ'র।

প্রথমে মনে হয়েছিল জমবে না। বড্ড বেশি রগচটা ধরনের। 'না' বলবেন না মুখের ওপর খুশি হয়েও খুব একটা ভাব করবেন না। গোমড়ামুখো হয়ে কাজটুকু কোনওরকমে নামিয়ে দেবেন।

এই তো গেল লোকজন। এবার বিষয়। বিভাগের নাম। তার লোগো।

মনে আছে বত্রিশটার বেশি নিয়মিত বিভাগ ভাবা হয়েছিল, যাতে দশটাও যদি যায় প্রতি সংখ্যায়, প্রত্যেকটার জন্য ৩.২ গুণ option থাকে। শেষ পর্যন্ত তার থেকে চার-পাঁচটা বোধহয় ছাপা রোববার-এর পাতায় পৌঁছেছিল।

সবার মনে দারুণ শঙ্কা—পড়বে তো? চিকণ কাগজ নয়, বাহারে ছবি নয়, 'সর্বাধিক বিক্রীত আনন্দলোক'-এর সঙ্গে যাচ্ছে না—পাঠক পড়বে তো?

ভয়ে ভয়ে প্রথম সংখ্যা বাছা হল অমিতাভ বচ্চন। মোক্ষম টোপ। আমি দৌড়োলাম বম্বেতে ইন্টারভিউ করতে। যদি সত্যি ভদ্রলোকের বড় সাক্ষাৎকার আর ধারাবাহিক জীবনী দিয়ে কয়েকটা মাস টেনে দেওয়া যায়। একেবারে বেপরোয়া অবস্থা আর কী!

দিন এগিয়ে আসছে। গোমড়ামুখ বিপুলদা আর সদাব্যঙ্গাত্মক আমি, দু'জনেই ক্রমশ কম যুযুধান হয়ে মৈত্রীর দিকে। পুরো সন্ধি তখনও হয়নি।

প্রথম সংখ্যা বেরোবে ২৪ ডিসেম্বর। আর সপ্তাহখানেক বাকি। অন্যান্য পাতা মোটামুটি তৈরি। 'কলিকাতায় নবকুমার'-এর জন্য সমরেশদার ফোটোসেশন, হয়ে গেছে। নবনীতাদির প্রচুর ছবি তোলা হয়েছে 'ভালো-বাসার বারান্দা'-য়। ডোডো-তাতাই' এর অনেক ছবি তুলেছেন সনৎ ঘোষ। একটা একটা করে ফর্মা (form-কে আমরা ভালবেসে 'ফর্মা' বলি) চলে যাচ্ছে ছাপতে।

আমার সম্পাদকীয় বিভাগের নামও সেভাবে ঠিক হয়নি। মুচমুচে মুখরোচক একটা সম্পাদকীয় লিখেছি বটে। মনের মতো হয়নি তেমন।

একবার ভেবেছিলাম সম্পাদকীয়র নাম দেব 'ঋতুপর্ণোগ্রাফি'। অমনি সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠল। এমনকী অনিন্দ্যও। যে নাকি কেবল একটা ভাল 'পান' করা যায় বলে একটা প্রচ্ছদকাহিনি অবধি ভাবতে রাজি আছে।

সারাটা দিন সংবাদ প্রতিদিন অফিসেই কেটে যায়। সকালে আসি, রাত্রে ফিরি—ধর্মতলায় শুনছি সিঙ্গুরের প্রতিবাদে মমতা অনশন মঞ্চে বসেছেন। আরেকটা নতুন গিমিক বলে পাত্তা দিচ্ছি না।

তবু যেন, হয়তো বা খবর কাগজের অফিস বলেই, সিঙ্গুরের নানা খবর এসে পৌঁছে যাচ্ছে আমার দপ্তরের লাল-কালো দেওয়াল দেওয়া কিউরিও দোকানের মতো ছোট্ট সম্পাদকের ঘরটায়। হয়তো বা পাক খাচ্ছে আমাকে ঘিরেই। আমি তখন প্রুফ দেখতে ব্যস্ত, বানানবিধি নিয়ে তর্ক করছি, কিংবা কোন হরফটা আরেটু ছোট হলে পাতাটা আরও ছিমছাম, আরও স্মার্ট দেখায়—সেই চুলচেরা নান্দনিক বিচারে ডুবে। তবু বাইরের খবর পাক খাচ্ছে। মানুষের খবর প্রদক্ষিণ করছে অলক্ষ্যে। কেবল ধরতে পারছে না আমায়।

শুনলাম 'দৈনিক স্টেটসম্যান'-এ মহাশ্বেতাদি নিয়মিত কলাম লিখছেন। কেবল তাঁর গদ্য পড়ব বলেই কাগজটা রোজ আনাই, সিঙ্গুরের খবরের ব্যাপারে কোনও প্রত্যক্ষ আগ্রহের কারণে নয়। তবে মহাশ্বেতাদির কলম এমনই এক বেগবতী ঝরনা, সে যে কোনও শিলাকে ক্ষীয়মাণ করতে পারে অন্তত কিছুটা—তাই সেই লাল-কালো সুসজ্জিত কামরার দেওয়ালে দেওয়ালে কখন যে লেপে যাচ্ছে নানা মানুষের খবর, আমি জানতে পারছি না।

ঘটনাটা ঘটল এমনই এক ডিসেম্বরের পড়ন্ত বেলায়।

কী একটা কারণে আমায় ওপরে আর্টরুমে যেতে হয়েছে কোনও একটা পাতা ছাপতে যাওয়ার আগে একবার শেষবারের মতো দেখে নেওয়ার জন্য।

এমন সময় বিপুলদাই খবর দিলেন যে, বিকাশদা (শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য) মারা গিয়েছেন।

সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনার পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, সংবাদপত্রের মতো তাৎক্ষণিকতা নিয়ে কোনও খবর প্রকাশ করার সৌভাগ্য থেকে আমরা চিরবঞ্চিত। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ছাপা হয় বলে আমাদের প্রতিটি পাতার সব আনন্দ, সব দীর্ঘশ্বাস, সব প্রশংসা, সমস্ত অভিসম্পাত, সবই সাতদিনের বাসি।

তবু বিকাশদাকে যেহেতু বিপুলদা আর আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম এবং বিকাশদা এই কলকাতা শহরটাকে বর্ণহীন করে দিয়ে চলে যাবেন আর আমাদের নতুন রঙিন ম্যাগাজিন সে-কথা স্মরণও করবে না একবার, কেবল মলাটের অমিতাভ বচ্চনের গৌরব নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবে—এই ভেবে আমি আর বিপুলদা কেবল পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। সেই বোধহয় আমাদের ভবিষ্যতের বন্ধুত্বের অদৃশ্য সূচনা।

আমি বিপুলদাকে বললাম,

একটা ছবি জোগাড় করতে পারবে?

বিপুলদা আমাকে তখনও 'আপনি' বা 'তুমি' কিছু বলে না। স্বভাবসিদ্ধ ভাববাচ্যে বলল,

কিন্তু, ছবির সঙ্গে তো একটা লেখা বা ক্যাপশন কিছু দরকার। সেটা কী করে পাওয়া যাবে?

দেখছি।

আমার সেই লাল-কালো ঘরে নেমে এলাম। মিনিট পাঁচেক লাগল কয়েক ছত্র লিখতে। লেখাটা নিয়ে যখন ওপরে পৌঁছেছি, নিউজ রুম থেকে খবর এল তাপসী মালিক মারা গিয়েছে।

মহাশ্বেতাদির বাংলা পড়তে পড়তে কবে যে একটা দগ্ধদেহ যুবতী আমার সেই লাল-কালো মনে বাসা বেঁধেছে—আমি জানতাম না। আমি শীতকালে এসি চালাই, হয়তো ওর সেই [illegible] শরীরটা একটু ঠাণ্ডা চাইছিল। তাই লুকিয়ে ছিল আমার কেদারার কোণে।

আমার হাতে ধরা সম্পাদকীয়র প্রুফ। আমি শেষ সংশোধন করে বিভাগের নাম দিয়ে দিলেই প্রেসে যাবে। আমি সেই প্রুফ হাতে যন্ত্রবৎ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম।

জীবনে একবারই বোধহয় আমার সম্পাদকের ঘরের ছিটকিনি বন্ধ হয়েছিল। সাধারণত দরকার হয় না। আমাকে, আমার একাকিত্বকে কেউ বিরক্ত করে না অফিসে।

রাইটিং প্যাডটা টেনে নিয়ে যেটা লিখলাম, তার সঙ্গে আমার আগের লেখা সম্পাদকীয়রও যেমন কোনও সম্পর্ক নেই, আমার অফিস থেকে আধ কিলোমিটারেরও কম দূরত্বের অনশন মঞ্চে বসে আছেন যে বিরোধিনী—তাঁর সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই।

এ যেন কেবল আমার আর আমার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে ঘাপটি মেরে থাকা একটা পোড়া শরীর গ্রামের মেয়ের যুগ্ম কথোপকথন।

লেখা শেষ করে দরজা খুললাম। বিপুলদাকে খবর দিয়ে ডেকে পাঠানো হল। আমার সব সহকর্মী জমায়েত হল আমার লাল-কালো ঘরে। আমি কিন্তু-কিন্তু করে বললাম,

আমি জানি আমার আগে লেখা সম্পাদকীয়টার প্রুফ অবধি চলে এসেছে। এখন যদি সেটা পালটাই?

ঘরে সব ক'টা ভুরু উঁচু-নিচু হল। বিরক্তিতে, কৌতূহলে এবং অধৈর্যে।

আমি ঢোক গিলে বললাম,

—একটু পড়ব? তা হলে বোধহয় বুঝতে পারবেন।

সবাই মাথা নাড়ল। ভাবটা এই যে—আমরা না-বললে যেন পড়তে না।

পড়লাম, শেষ প্যারায় এসে একটু গলার কাছটা ভারি ঠেকল।

নতুন অভিজ্ঞতা। চিত্রনাট্য পড়ার সময় চরম দুঃখের দৃশ্যেও এটা অভিনয় দিয়েই বের করে দিয়ে থাকি।

লাল-কালো ঘর চুপচাপ।

প্রথমে উঠে দাঁড়াল বিপুলদা। আর্ট ডিপার্টমেন্ট-এর সবাইকে বলল,

—চলো! কী হবে? একটা রাতই তো জাগতে হবে!

আমার পাণ্ডুলিপি চলে গেল আমার হাত থেকে। ওপরের ঘরে।

তখনও বুঝিনি যে, যে-অক্ষরগুলো এতদিন লুকিয়ে ছিল আমার ঘরের আনাচেকানাচে, তারাই বাক্য হয়ে নেমে এসেছিল রুল-টানা প্যাডে; এখন তারাই তাদের মতো করে মিছিল করে ছড়িয়ে পড়বে আমার প্রথম সংখ্যার পাঠকদের মধ্যে।

প্রথম 'রোববার' বেরল।

তারপর সময় যেতে লাগল। পাঠকদের ইচ্ছেতেই বলি, বা সপ্তাহান্তে দপ্তরের তাগাদা থেকেই হোক—একটা সপ্তাহও যায়নি যে আমার লেখা বন্ধ পড়েছে।

ভীষণ কাজ, শুটিং-এর চাপ, আউটডোরে যেতে হবে—তার মধ্যে 'ফার্স্ট পার্স্টন'-টা যেন কোথায় একটা মাথার ভেতর অভ্যন্তরীণ তাগাদায় বৃহস্পতিবার থেকেই সব কাজের মধ্যে অদৃশ্য কোনও ভ্রমরের মতো গুনগুন করতে থাকে। কখনও স্বেচ্ছায়, বেশিরভাগ সময়ই গজগজ করতে করতে, কাগজ-কলম নিয়ে বসি।

যেই পাতায় কলমটা ঠেকাই, তারপর সেই নানা লুকনো অক্ষর, শব্দ, বাক্য যারা কিনা এই তিন বছরে আমার সেই লাল-কালো ঘর ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার আকাশে-বাতাসে, নতুন করে ডেরা বেঁধেছে বাড়িতে, আমার লেখার চেয়ারটার তলায়—তারা এসে জড়ো হয়।

তারা আপনা থেকে চিনিয়ে দেয় নানা মানুষকে, তাদের নানা কাহিনি—সে নতুন, পুরনো। আগে শোনা, ভুলে যাওয়া ঘটনাগুলো সিনেমার ফ্ল্যাশবাক্যের মতো স্পষ্টতায় এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে।

গোড়ার দিকে দু-তিনটে 'ফার্স্ট পার্সন' দেখে সবাই ভেবেছিলেন আমি বোধহয় আধা-রাজনৈতিক লেখাই লিখব। সবাই বলছি কেন? আমি নিজেও যেন ধীরে ধীরে নিজেকে বেশ একটা গুরুগম্ভীর সমাজ-প্রশাসন-বিরোধিতার এক নিরপেক্ষ প্রতিবেদকের দায়িত্ব দিয়ে ফেলছিলাম।

বিরুদ্ধমতপোষণকারী দু'টো কাগজ পড়ি, যদি সত্যকে নিয়ে এই চু-কিতকিত খেলার ঘুঁটিটা

কখনও কোর্টের বাইরে বসে থাকা দর্শকাসনে আমার কোলে এসে পড়ে, অমনি সেটাকে তুলে নিই আমার পার্স্ট পার্সন-এর রসদ হিসেবে।

তারপর একদিন মনে হল যে, কেবল খবরের কাগজ পড়ে আর টেলিভিশন দেখে গভীর কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করাটা বোধহয় ঠিক নয়, সমীচীন নয়।

আমার চারপাশে ফিসফিস করছে যে গলাগুলো, তারা আমাকে জুগিয়ে যাচ্ছে তাদের নিত্যদিনের যন্ত্রণাকাহিনী। কিন্তু সব যন্ত্রণার তো একটা উৎসমুখ আছে। সব ইতিহাসেরও যেমন ইতিহাস আছে—সেইখানে না পৌঁছতে পারলে কেমন করে বুঝব যে কোনও যন্ত্রণা, যে কোনও বঞ্চনার প্রেক্ষাপট। আমার না আছে সেই ক্রমিক সামাজিক ইতিহাসচর্চা, না আছে সেই অদৃশ্য গলাগুলোর দৃশ্যমান প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ-পরিচয়। তবে কি কেবল আবেগ, সংবেদনশীলতা আর কাগজে-পড়া যুক্তি সম্বল করেই, আর লেখার ধরন দিয়ে পাঠযোগ্য করেই লিখে যাব সপ্তাহ'র পর সপ্তাহ? তা হলে তো আমার পাঠকদের ঠকানো হবে। সব থেকে বড় কথা, ঠকানো হবে নিজেকে। নিজের চারপাশের আকাশে-বাতাসে, ঘরের কোণে সবক'টা অদৃশ্য লিপিকে, সব অশ্রুত ফিসফাসকে—যারা কেবল কতগুলো সংকেত দিয়ে আমাকে চালনা করছিল এতদিন; সবাইকে ঠকানো হবে।

'দ্য লস্ট লিয়র'-এর শুটিং করতে গেলাম কোনা এক্সপ্রেসওয়ের এক ধাবায়। ফেব্রুয়ারির শেষে। ইউনিটের অনেকেই রাস্তার বাঁদিকের একটা পাঁচিল তোলা জমি দেখিয়ে বলল,

—সিঙ্গুর, সিঙ্গুর।

সেই আমি চাক্ষুষ সিঙ্গুর দেখলাম। তাও গাড়ির জানলা থেকে শুটিং-এ যাওয়ার পথে।

অন্যরা কী ভাবছিল জানি না, আমার গাড়ির ভেতর থেকে এবার কতগুলো অন্য ফিসফাস শুরু হয়ে গেল। তারা ধিক্কার, তারা কঠিন সমালোচনা। এতদিন এই জায়গার মানুষদের নিয়ে আমি লিখছি; লিখেছি যে সিঙ্গুর আন্দোলন মমতার আন্দোলন নয়, এই মানুষগুলোর আন্দোলন—কই, আমি নিজে তো একবার এখানে এসে সত্যিকারের মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলিনি, দেখা করিনি।

যে খবরের কাগজের অধিকাংশ খবর আমি নিজেই নানাবর্ণে রঞ্জিত বলে মনে করি—তাদের ভরসাতেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছি 'ফার্স্ট পার্সন'? এ তো হতে পারে না।

শুটিং শেষে ফিরে এলাম অফিসে। আমার লাল-কালো ঘরে। দেখলাম অন্য একটা স্বর, অন্য একটা কণ্ঠ। সে-কণ্ঠ অনেক মানুষের ফিসফাস নয়, কান্নার শব্দ নয়। গভীর, নিশ্চিত এক কণ্ঠস্বর। তার মধ্যেই মিশে আছে আমার আগের শোনা নানা মানুষের গলা। সেই স্বর আমায় বলল,

—কেন? বিষয়ের কি অভাব? নিজের যা ইচ্ছে করে তাই লেখো। সেটাই বিষয় হবে।

কোথা থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল কাঁধ থেকে। এমন একটা দায়িত্বের ওজন, যা যেন আমি নিজেই তুলে নিয়েছিলাম—নিজেকে আরেকটু দায়িত্ববান সম্পাদকের চেহারা দেব বলে।

তারপর ধীরে ধীরে 'ফার্স্ট পার্সন'-টা আপনাআপনিই হয়ে উঠল আমার ব্যক্তিগত গদ্যের

সিরিজ। আমার সপ্তাহান্তের ডায়রি লেখা।

আমার লাল-কালো ঘর আমাকে শিখিয়ে দিল যে, পাঁচজনের জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারাটা যেমন জরুরি, নিজের কথাটা পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াটাও কম জরুরি নয়।

আমার সেই লাল-কালো ঘর আজও প্রায় তেমন আছে, মাঝে মাঝে শুটিং-এর প্রয়োজনে নানা জিনিস বেরয়, ঢোকে। তবু মূল চোহারাটা একইরকম।

আমি যখন থাকি না, রোববার-এর কোনও অতিথি এলে ওখানে তাঁদের বসানো হয় সময়ে-অসময়ে, সবাই ঠাট্টা করে বলে ওটা নাকি 'রোববার ভিজিটর লাউঞ্জ।'

আমিও এখন নিয়মিত অফিস যাই না।

জয় আর চন্দ্রিল অনিন্দ্যর অনেকটা দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। অর্পিতা 'রোববার' ছেড়ে চলে গিয়েছে, ভাস্কর এসেছে।

'রোববার'-এর মূল দপ্তরটা আগে ছিল আমার সাক্ষাৎ প্রতিবেশী। এখন ওরা চলে গিয়েছে ওপরে, নতুন বানানো একটা বিশাল প্রশস্ত ঘরে।

আমি কেবল এখনও আমার সেই ছোট্ট ঘর আঁকড়ে পড়ে আছি।

দোতলার সেই লাল-কালো ঘর। আমার Confession room। যে-ঘরে ঢুকলে আজও আমি রোজ একটা নেমন্তন্নর চিঠি পাই।

খামের ওপর আমার নাম। চিঠির বয়ানটা খুব সোজা।

—Be Yourself. Be Happy!

৩০ ডিসেম্বর, ২০০৯

তিন বছরের পুরনো। কথাটা অদ্ভুত শোনায়, না?

তবে রাত পোহালেই যদি বাসি হতে পারে, ঠিক রাত বারোটার ঘণ্টাটা বাজলেই যদি একসঙ্গে ইতিহাস হয়ে যেতে পারে তার আগের ৩৬৫ দিনের প্রতিটি মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড, তা হলে তিন বছরটা তো অনেক বড় সময়।

শুরুর দিন থেকে আজ অবধি 'রোববার' প্রায় যেন তেমনই আছে।

কতগুলো চেনা বিভাগ, এক প্রত্যাশিত পাতা ওল্টানোর যাত্রা।

আমাদের ভাল কাগজ নেই, ছাপা চমৎকার নয়। ফলে কাগজটাকে সবসময় যে মননশীলভাবে মনাভিরাম করতে পেরেছি, তা নয়।

এ এটি আমাদের দিনের পর দিন পীড়া দিয়েছে—কিন্তু সীমিত শক্তিতে এর বেশি কিছু আমরা দিতে পারিনি সারা শহর এবং অধুনা শহরের বাইরে কিছু কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আমাদের বিশাল 'রোববার' পরিবারকে।

আমাদের সম্বল ছিল বা আছে কিছু উজ্জ্বল গদ্য। এবং যে কোনও বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি সাজাবার দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহস।

প্রত্যেকবার যে আমাদের সাহস আমাদের নিজেদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে, তা বলছি না।

কিন্তু বাঙালির জীবনে প্রোথিত নানা ছোট, খাটো, অকিঞ্চিৎকর উপাদান, যাদের কোনও এক ধারাবাহিকতার মধ্যে ফেললেই হয়তো রচিত হয় সামাজিক ইতিহাস, সেই উপাদানগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখার কথা ভেবেছি আমরা—আমাদের চটি ম্যাগাজিন কতটুকুই বা ধারণ করতে পারে? হয়তো এই সব সূত্র থেকেই বিষয়গুলো নিয়ে আরও সুগভীর, আরও বিস্তৃত কোনও কাজ হতে পারে।

তিন বছর সময় পেয়েছিলাম একটু একটু করে সংসার পাতার জন্য, এবার বাড়ি সাজানোর পালা।

না না, তা বলে মসৃণ কাগজ, বাহারে ছবি—কিছুই আশা করবেন না। তবে কাজটা হয়তো আরেকটু সুষ্ঠু, আরেকটু ছিমছাম হবে। রোববারটা ২০১০-এ হয়তো বা আরেকটু স্মার্ট দেখাবে-এটাই আমাদের ভাবনা।

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁর খুশবু এবার থেকে 'রোববার'-এর পাতায় নিয়মিত পাবেন না। খাবারদাবার যদি আসে, মাঝে মাঝে হয়তো বা ফিরে আসবে অন্যান্য ভাবে বা চেহারায়।

নতুন সাপ্তাহিক কলাম লিখছেন সমরেশদা (মজুমদার) 'কলিকাতায় নবকুমার'-এর পর 'রোববার'-এর পাতায় দ্বিতীয় ধারাবাহিক। সুদূর নির্বাসন থেকে নিয়মিত কলাম লিখবেন তসলিমা নাসরিন। সঙ্গে ছবি আঁকবেন নিয়ম করে।

বাণীদি (বসু) শুরু করেছেন 'অষ্টম গর্ভ'-র সিকোয়েল (sequel) এবার 'রোববার'-এর পাতায়। আর ইতিহাসনির্ভর একটা থ্রিলার উপন্যাস লিখছেন রূপক সাহা।

তা ছাড়া আরও অনেকগুলো নিয়মিত কলাম, কোনওটা সাপ্তাহিক, কোনওটা ষান্মাসিক, কোনওটা আবার মাসে একবার করে। আপাতত এইটুকুই।

তারপর একসময়ে যেমন ক্ষীণ জলধারা ধীরে ধীরে নদী হয়, ক্ষুদ্র অঙ্কুর হয়ে ওঠে পুষ্পপত্রশোভিত মহীরুহ, আশা করা যাক না কেন, কালক্রম আমাদের ধীরে ধীরে পৌঁছে দেবে কোনও এক বিশাল ভবিষ্যতের দিকে।

২০০৬-এর ডিসেম্বর-এ 'রোববার'-এর জন্ম। ২০১০-এর জানুয়ারিতে সেই শিশু নিজের পায়ে হাঁটতে পারবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা অলিম্পিয়ান চাই না, সুস্থ স্বাভাবিক একজন সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে 'রোববার' তার স্বাধীনতার নানা গলিঘুঁজি খুঁজে পাক এই শহরের বুকেই।

যেমন আমরা সবাই খুঁজছি।

২০১০ আমাদের সকলের সেই সম্মিলিত ইচ্ছেকে প্রাণ দিক।

হ্যাপি নিউ ইয়ার!

৩ জানুয়ারি, ২০১০

জীবনটাকে কি উপন্যাস বলব? না নানা ছোট ছোট গল্পের মালা? বেশির ভাগ সময়ই দেখি অন্য মানুষের জীবন—তার সূচনা-বিস্তার-সমাপ্তি নিয়ে আমাদের চোখে উপন্যাসাকারে ধরা পড়ে।

—যেন বই লেখা যায়? বা, কি ভাল সিনেমা হয়।

কারণ সেখানে আমরা অজান্তেই যেন দর্শকের ভূমিকা নিই।

আর যেই এসে পড়ে নিজের জীবনের কথা। সেটা অমনি একরাশ খণ্ড খণ্ড ছোট গল্প। কোনও আয়নাই যেমন নিজের সর্বাঙ্গকে সবদিক থেকে পূর্ণাবয়বে দেখায় না, নিজের জীবনগাথার সামনে আমরা বেশিরভাগ সময়ই ক্লান্ত আচ্ছন্ন দৃষ্টি। কিম্বা অনিচ্ছুক-মনা।

ফলে জীবনের এই নানা খণ্ডগুলি কখনও বয়সের কালচিহ্নে, কখনও বা কোনও বিশেষ বছরের স্মৃতি হয়ে জাগরক হয়ে থাকে।

১৪১৭ শুরু হল।

রোববার-এর জীবন এখনও উপন্যাসের মহার্ঘতা পেয়েছে কিনা জানি না। কারণ আমরা যারা এই পত্রিকাটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাঁরা সত্যিই নিছক দর্শকমাত্র।

তবে রোববার-এর নানা খণ্ড খণ্ড গল্পমালা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে বিধৃত হয়ে আছে আমাদের টিম রোববার-এর নানাজনের মানসপটে নানাভাবে।

তাই ১৪১৭ শুরুই করছি অনেকগুলো গল্প দিয়ে।

এ গল্প টিম রোববার-এর নয় নানা কথাকার। বিশিষ্ট, প্রবীণ বা নতুন, অনেকেই গল্প লিখেছেন।

টিম রোববারে সঙ্গে এতগুলো গল্প একত্রিত হলে রোবরার-এর নটেগাছটি ক্রমশ তরতর করে বেড়ে উঠবে।

১৪১৭. অনেক উষ্ণ শুভেচ্ছা—

১১ এপ্রিল, ২০১০

নিয়ম করে যাঁরা এতদিন আমার 'ফার্স্ট পার্সন' পড়ছিলেন এবং উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন আমার অসুস্থতা নিয়ে; প্রথমেই তাঁদের জানাই—আমি আগের থেকে ভাল।

দুর্বলতাটা যে রাতারাতি কেটে যাওয়ার নয়, এ তো আমরা জানি। কিন্তু আবার ধীরে ধীরে নিজের কাজের জগতে ফিরে আসবার আনন্দ, উদ্যম এবং স্বাভাবিক ইচ্ছেটা ফেরত পাওয়া জরুরি।

আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় ধীরে ধীরে সেই রাস্তাগুলো খুলে যাচ্ছে।

মাথার সঙ্গে কলমের, আর কলমের সঙ্গে কাগজের সম্পর্কটা যে কী—গত সাড়ে তিন বছর ধরে নিয়মিত 'ফাস্ট পার্সন' লিখতে লিখতে সেটা আর এখন আলাদা করে বুঝতে পারি না।

কিন্তু এই অসুখটার পর সেই স্বাভাবিক যাতায়াতটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আসছিল মাঝে মাঝে। কলম যেমন দিব্যি লেখে, আবার লেখা না-পড়লে ঝাঁকিয়ে নিলেই নতুন করে শুরু হয় অক্ষরমালা—এ যেন অনেকটা সেরকম।

কর্পোরেশন নিয়ে গত সপ্তাহেই আমি লিখলাম তো। তাই আর এই সংখ্যায় লিখছি না। তার থেকে নিজের কথাই লিখি—সেটাই ভাল লাগছে।

প্রথম-প্রথম রোববার যখন শুরু হয়েছিল তখন মলাট-কাহিনির সূত্র ধরে ফার্স্ট পার্সন লেখার একটা প্রয়াস চালিয়েছিলাম বহুদিন। অনেক পাঠকও চাইতেন কভার স্টোরি-র ওপর আমার কোনও বিশেষ আলোকপাত।

আস্তে আস্তে 'রোববার' বাড়তে লাগল সপ্তাহে-সপ্তাহে, মাসে-বছরে। প্রত্যেকবার প্রচ্ছদ বিষয়কে নিয়ে 'ফার্স্ট পার্সন' লেখার চাপটা কেমন যেন ফরমায়েশি মনে হতে লাগল আমার।

যে-বিষয়টা আমরা সকলে মিলে ঠিক করেছি, তাতে আমার একটা বিশিষ্ট মতামত থাকতেই হবে—এটার জন্য লেখনীর একটা মুনশিয়ানা লাগে। সেটা যে আমার নেই।

আমার পাঠকদের আমি বারবার বিশ্বাস করাতে চাই যে, আমি কিন্তু লেখক নই। কেবলমাত্র নবনীতাদি, জয়, সমরেশদার সঙ্গে লিখতে পারার সৌজন্য বা অনিন্দ্য ও চন্দ্রিলের মতো চমৎকার দুই লেখক-সহকর্মী থাকলেই ছোঁয়াচে রোগের মতো লেখক হওয়া যায় না। তাই আমি আমার ইচ্ছের কথাই লিখি। আমার মনের কথাই লিখি। সেই কথাগুলো মাঝে মাঝে পাঠককে ছোঁয়, তাঁরা ভালবেসে সেগুলো পড়েন।

আবার 'ফার্স্ট পার্সন' স্বল্প কলেবর হলে অনুযোগও করেন।

তবে এবারেরটা সংক্ষিপ্ত-ই হবে। নইলে আমার ডাক্তার বকবেন।

যাই, শুয়ে পড়ি গে।

২০ জুন, ২০১০

আমাদের অফিসে প্রতি সপ্তাহে একটা যুদ্ধ চলে।
যাতে সপ্তাহের শেষে 'রোববার' পত্রিকাটা বেরয়।

এবং সেই যুদ্ধে আমাদের দপ্তরভর্তি শিশুসৈনিক।

ভোটার কার্ড অনুযায়ী তাদের সত্যি শিশু বলা যায় কি না জানি না, কিন্তু আমি মনে করি এক্ষেত্রে আমার ধারণাটাই বড়।

সেখানে ভোটার কার্ডের কোনও ভূমিকা তেমন নেই।

আমাদের শিশুসৈনিক দল সপ্তাহের সাতদিন যুদ্ধ করে। এটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক কুচকাওয়াজ।

ছাদের পাশে আমাদের যে নতুন 'রোববার' দপ্তরটা হয়েছে, তার সামনে গিয়ে আড়ি পাতলে আপনারা যে কেউ সেই যুদ্ধনিনাদ শুনতে পাবেন।

লেখা আসেনি সময়মতো, কেউ টেলিফোনে পরিত্রাহি ধমকাচ্ছে। কেউ বা অন্য কারওর সঙ্গে বিশাল তর্কাতর্কি জুড়ে দিয়েছে। কেউ সরোষে কম্পিউটারে টাইপ করে চলেছে, রাগের প্রকাশ কি-বোর্ডের ওপর ঠকঠক শব্দে ভারী বুটের আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে।

তবে সৈনিকরা যেমন নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ মৈত্রী বজায় রেখে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় নিশ্চিদ্র মনোযোগে, আমার শিশুসৈনিক দলও ততটা যায়—এ-কথা হলফ করে বলতে পারি না। কেবল খাবার সময় তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রশান্ত মিত্রতা।

সেখান থেকে আবার আমার শিশুতম সৈনিক জয় গোস্বামী বঞ্চিত।

সে বিস্কুট খেয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিল।

আমাদের বালক সেনাপতি অনিন্দ্যের নেতৃত্বে আমার শিশুসৈনিক দল ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠছে। দক্ষতায়, পারস্পরিক কুশলতায়।

এবং তাদের বৃদ্ধির চেহারা আপনারা প্রতি 'রোববার' দেখতেও পাচ্ছেন আশা করি।

আমার শিশুসৈনিক দলকে অভিবাদন জানাই, আপনাদের জানাই উৎসব শেষের শুভেচ্ছা।

১৪ নভেম্বর, ২০১০

ভোটের উত্তেজনা, হঠাৎ হঠাৎ কালবৈশাখীর পর শহর এখন কিছুটা শান্ত।
বৈশাখের প্রখর রৌদ্রের জ্বালার পর কখন বাদল আষাঢ়ের পালা আসবে—তারই অপেক্ষায়।

আমাদের দপ্তরে এবং 'রোববার' পরিবারে একগুচ্ছ কবির বাস।

চন্দ্রিল কবি, আবার ‘আদরের নৌকো’-ও লেখে। অনিন্দ্য আর চন্দ্রিল তো জুটি বেঁধে গানের কথা ও ছন্দের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেল ‘অন্তহীন’ ছবিতে। তা ছাড়া নবনীতাদি তো আছেনই।

আর রয়েছে জয়—জয় গোস্বামী, যে-নামটা আজও, এই এসএমএস বাংলার যুগেও, বাংলা কবিতাকে অবশ্যপাঠ্য করে রেখেছে। এতজন কবি এবং আমাদের চারপাশের কবি-বন্ধুদের নিয়ে কোনওদিন আমরা কবিতা-সংখ্যা করিনি।

এই করলাম। জয়ের কবিতাগুচ্ছ দিয়ে। পয়লা আষাঢ় এসে পড়ল বলে।

এ আমাদের অগ্রিম মেঘদূত।

৯ মে, ২০১১

প্রত্যেকটা শুটিং-এ অনেকগুলো গল্প থাকে। সিনেমার মূল কাহিনি বাদ দিলেও নানা গল্পগাথা তৈরি হয় সিনেমার কলাকুশলী মণ্ডলে। সেই গল্প নিষ্কলুষ হলেও একটা নিষিদ্ধতায় মোড়া, সিনেমা জগতের একেবারে ভেতরকার মানুষগুলোর মধ্যেই তার বাস।

আমার সাম্প্রতিক শিক্ষক মহাশয় শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (আমার ছবিতে তিনি একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন) হঠাৎ শুটিংয়ের মাঝখানে বলে বসলেন—তুমি, অনিন্দ্য দু'জনেই এখানে। তার মানে সামনের সপ্তাহে ‘রোববার’ বেরচ্ছে না।

অনিন্দ্য ক্যামেরার সামনে একনিষ্ঠ অভিনেতা, হোটেলে ফিরে ধড়াচুড়ো ছেড়ে দিব্যি ভালমানুষের মতো একগাল হেসে প্যাড-টা বাড়িয়ে দিল,

—ঋতুদা, ‘ফার্স্ট পার্সন’-টা।

উত্তরবঙ্গের এই জঙ্গুলে রাস্তায় একঝাঁক গাড়ি চলেছে শিলিগুড়ি থেকে চালসা। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক গাড়িতেই একটা নতুন গল্প। যাওয়ার পথে একটা। ফেরার পথে আরেকটা। আর আমি এই আবহমান কাহিনিস্রোতের মধ্যে ভেসে যেতে-যেতে ‘রোববার’-এর গল্পসংখ্যার জন্য দু'লাইনের ‘ফার্স্ট পার্সন’ লিখছি।

সুন্দর হোক নতুন বছর।

১৪ এপ্রিল, ২০১৩
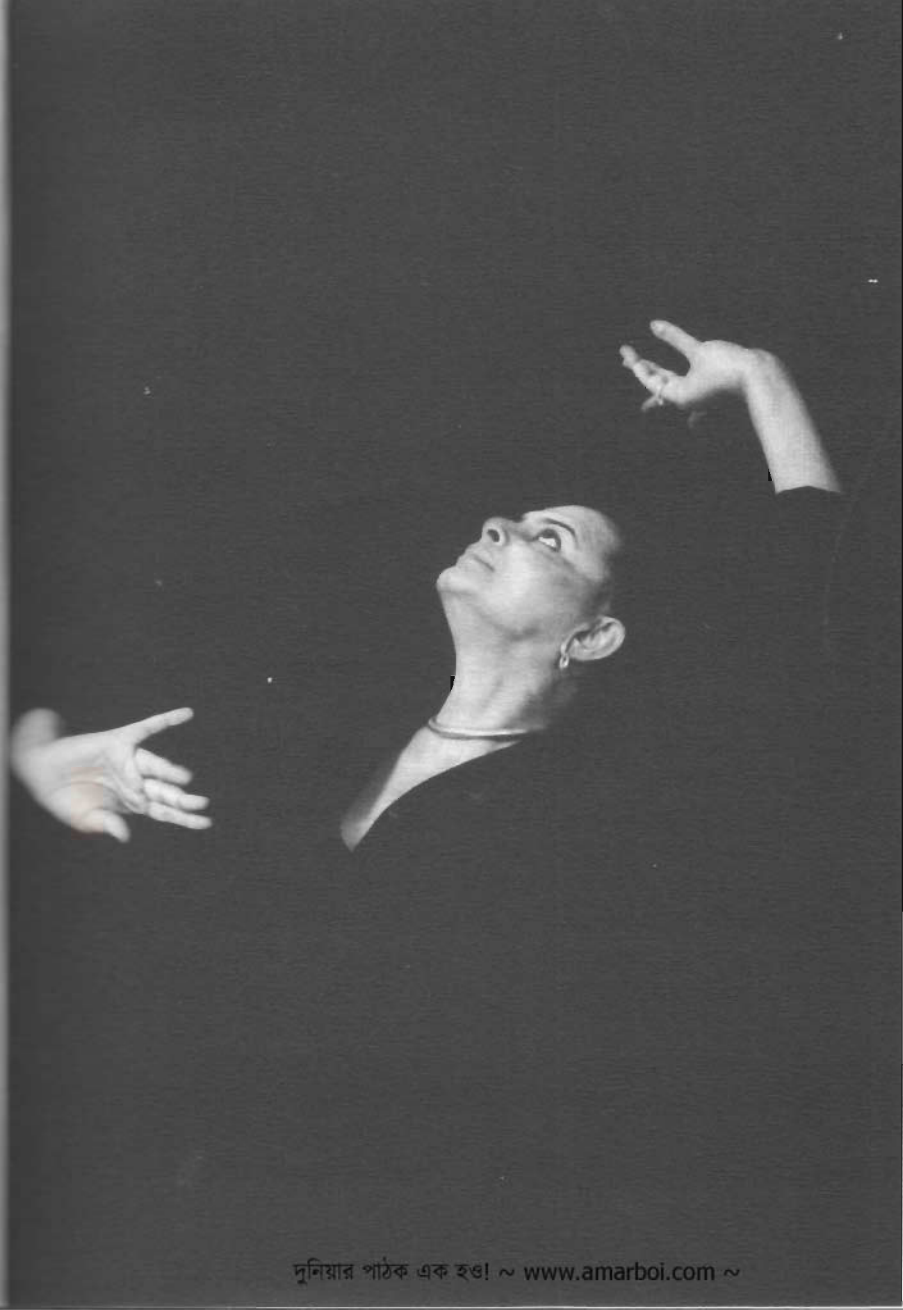
মা খুব কাঁদছিল।

দূর থেকে ভেসে আসছিল সানাইয়ের আওয়াজ। জানলার খড়খড়ির বাইরে বিয়েবাড়ির আলো।

অন্ধকার ঘরের দেওয়ালে ধাপ ধাপ ছোট্ট আলোর সিঁড়ি। তার সামনে বসে কাঁদছিল মা।

আজ পুতুলমাসির বিয়ে। পুতুলমাসি আমাদের পাড়ায় থাকে। সামনের ডানদিকের গলিটার শেষ বাড়িটায়।

পুতুলমাসি স্কুলে পড়ায়। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ হেঁটে স্কুল যায়। তাঁতের শাড়ি, কাঁধে ব্যাগ। ঘাড়ের কাছে খোঁপা। মাথাটা নিচু।

বিকেলে হাতে টানা রিক্সা চেপে স্কুল থেকে ফেরে পুতুলমাসি। কোলে খাতা, সকালবেলার পাটভাঙা শাড়িতে সারাদিনের ক্লান্তি। মাথাটা নিচু।

পুতুলমাসির ডান গালে সাদা ধ্যাবড়া একটা বড় দাগ।

—ওটা কীসের দাগ, মা?

—ছিঃ, বলে না! ওটা একটা অসুখ!

— কী অসুখ?

— স্কিনের একটা অসুখ, ওটাকে শ্বেতী বলে। তুমি আবার বোলো না গিয়ে পুতুলকে।

পুতুলমাসির আজ বিয়ে। মা সাজাতে গেছিল একটু আগেই। এই ফিরেছে বিয়েবাড়ি থেকে। থমথমে মুখ নিয়ে তারপর থেকেই কাঁদছে।

সাজাতে নাকি পাক্কা দু'ঘণ্টা লেগেছে।

এ কনে সাজানোর বড় ঝক্কি। গালের সাদা দাগ আগে মেক আপ করে মিলিয়ে স্বাভাবিক করা। তবে না কনেচন্দন খুলবে মুখে! মা কিনা আর্ট কলেজ পাশ। পুতুলমাসির বাড়ির সবার ভরসা—মা-ই পারবে।

পেরেওছিল মা। বুদ্ধি খাটিয়ে, কৌশল বের করে। তখন তো এতরকম শেড-এর মেক আপ

বেরোয়নি। একটা পোস্টকার্ড মুড়ে সরু করে পাকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তার যে ছাই, সেটা মিশিয়েছিল ল্যাকটো ক্যালামাইন-এর সঙ্গে।

পুতুলমাসির খড়িমাটি গালে রঙের প্রলেপ পড়েছিল। তারপর কপাল গাল জুড়ে বসেছিল চন্দনের আলপনা।

কাঁদছ কেন মা? কী হয়েছে?

বিয়েবাড়িতে সানাইয়ের লং প্লেয়িং পাল্টালো। পূরবী থেকে মূলতান।

সাজগোজ শেষ। এবার শাড়ি গয়না। পুতুলমাসি বলেছিল, আসছি গো!

ব্যথরুমের বন্ধ দরজা খুলেছিল বেশ কিছুক্ষিণ পর। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছিল পুতুলমাসি। আর মাথা নিচু নয়। ল্যাকটো ক্যালামাইন-এর মুখোশ, চন্দনের গয়না ভাসিয়ে দিয়েছে বেসিন-এর জলে। 'আমার বিয়ে যদি হতে হয় এমনিভাবেই হবে, ইরাদি। যে বিয়ে করবে আমায়, সে যেন পষ্ট দেখে নেয়, আমায় কেমন দেখতে। তুমি বাড়ি যাও।'

সানাই ছাপিয়ে এবার শাঁখের আওয়াজ। উলু দিচ্ছে অনেকে মিলে। বর এল বিয়েবাড়িতে.. কাঁদুক মা। তা বলে কি নেমন্তন্নয় যাব না? বিয়ে দেখব না পুতুলমাসির?

ছাদনাতলায় পিঁড়িতে চেপে এল পুতুলমাসি। বেনারসী শাড়ি, লাল চেলি। হাতে কাজললতা। মুখ ঢাকা পানে। মাথাটা নিচু।

এক পাক, দু পাক ... ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছে। তিন পাক, চার পাক ... পানপর্দা সরলেই তো আসল চেহারা, ইস্। পাঁচ পাক, ছ'পাক, সাত ... চোখ ঢাকা পানজোড়া নেমে এল থুতনিতে।

শাঁখের আওয়াজে সানাই আর শোনা যাচ্ছে না। মেয়েরা উলু দিচ্ছে এত তীব্রভাবে? নাকি শিস দিচ্ছে, যেন ফেটে পড়েছে ফুটবল মাঠের গ্যালারি। এক্ষুণি যেন একটা বিরাট গোল করেছে পুতুলমাসি।

চোখ মেলে তাকাল সেই চিরকালের মাথা নিচু মেয়েটা। ডানগালের শ্বেতীচন্দন বলল,—বাঃ!

বিয়েবাড়ির আলো বলল—কী সুন্দর। সানাইয়ের মূলতান বলল—চমৎকার! আর সমবেত উলুর শিস বলল—হিপ হিপ হুররে!

কনেচন্দন কথাটা যতবার শুনি আমার এই গল্পটা মনে পড়ে।

আসলে এরকম কিছু হয়নি। অনেক খেটে সাজিয়েছিল মা পুতুলমাসিকে।

চুপটি করে বসেছিল পুতুলমাসি। তারপর আয়নায় দেখে বলেছিল—'তুমি কী ভাল, ইরাদি! কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে আমায়। অন্তত একটা দিন তো আমায় কেউ বিচ্ছিরি বলবে না, বল।'

মা উত্তর দিতে পারেনি। কোনওরকমে সাজানো শেষ করে বাড়ি ফিরে এসে কেঁদে ফেলেছিল।

পুতুলমাসির বিয়েতে গেছিলাম আমি আর বাবা। বিয়ে দেখলাম, নেমতন্ন খেলাম।

পরদিন ফুল সাজানো গাড়ি চেপে পুতুলমাসি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

আমার কাছে কিন্তু আগের গল্পটাই সত্যি।

১৪ জানুয়ারি, ২০০৭

লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। লাখ ঝামেলা না হলে বিয়েবাড়ি হয় না।

তবে জয়াদি নিজে যখন বলেছিলেন—'না ঋতু, আমরা একেবারে হাতে গোনা লোক ডাকছি, নিতান্ত যারা বাড়ির লোক বলতে পারো' তখন ভাবলাম সত্যিই বোধহয় তাহলে ব্যাপারটা চুপচাপ, নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, শান্তভাবে মিটে যাবে।

বিয়েটা শুনেছিলাম প্রতীক্ষাতেই হবে। প্রতীক্ষা, অমিতদা-জয়াদির প্রথম সংসার পাতার ঘর। শ্বেতা, অভিষেক ওখানে জন্মেছে।

এখনকার নতুন বাড়ি জলসাতে ওরা থাকতে শুরু করার পরও অমিতদার বাবা-মা ডঃ হরবনশ রাই বচ্চন আর তেজী বচ্চন ওবাড়িতেই থেকে গিয়েছিলেন।

তারপর অমিতদার বাবা মারা যাওয়ার পর অমিতদার মা একাই ওবাড়িতে থাকতেন।

জলসা আর প্রতীক্ষা কাছাকাছি। হাঁটাপথে মিনিট পাঁচ থেকে সাত লাগে।

সেবার বম্বেতে যখন হঠাৎ আকাশভাঙা বৃষ্টিতে জল জমে গেল সারা শহরে, অভিষেক কোমরজল (অন্যদের বুক) ডিঙিয়ে মাথায় করে দাদির জন্য খাবার নিয়ে যেত প্রতীক্ষায় রোজ। দু'বেলা।

বিপদ সত্যিই বড় বালাই। সেদিন এই একই রাস্তায় এরকমই অনেক বন্যাদুর্গত মানুষ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যাবতীয় অসুবিধে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অভিষেক বচ্চন পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও তার দিকে তাকানোর সময় ছিল না। উল্লসিত হওয়া তো দূরে থাক।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মাকে একলা প্রতীক্ষায় থাকতে দেননি অমিতদা। কোনওদিন।

এখনও অমিতদা শুটিং না থাকলে সারাটাদিন জলসায় কাটান, সন্ধেবেলাটা ঠিক প্রতীক্ষায় চলে যান। রাত্তিরটা ওখানে থাকেন, আবার সকালবেলা স্নানটান সেরে ওখান থেকেই কাজে বেরন। বা অন্য কোনও মিটিং থাকলে সেখানে যান।

গত দশ মাস হ'ল তেজী বচ্চন, লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ভদ্রমহিলা

অ্যালজাইমারস রোগে গভীরভাবে আক্রান্ত, তাছাড়াও বয়সজনিত নানা ব্যাধিতে অত্যন্ত জীর্ণ, দুর্বল।

অমিতদা বা অভিষেককে শুটিং-এর কারণে বেশিরভাগ সময়টাই বম্বের বাইরে থাকতে হয়। জয়াদির ঘাড়ে দুটো বাড়ির ভার। তাছাড়া, একটি ক্রমশ ক্ষীয়মান জীবনের দায়িত্ব নেওয়ার মতো সত্যিই কেউ নেই। অমিতদার মা লীলাবতীতে অন্তত একটা সুপরিকল্পিত আরোগ্যবিধির মধ্যে দুরারোগ্য অবস্থাতেই কালাতিপাত করছেন।

যেহেতু ভদ্রমহিলার শারীরিক অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটসঙ্কুল, একটা ভয় দুই পরিবারের মধ্যেই প্রবলভাবে কাজ করছিল। যদি এর মধ্যে চরম কিছু হয়ে যায়, বিয়েটার কী হবে? আর কিছু হোক না হোক, ঐশ্বর্যর মাঙ্গলিক প্রভাবেই যে তাঁর প্রাণহানি হল সে কথা মিডিয়া সুনিশ্চিতভাবে তথ্য প্রমাণাদিসহ প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বে।

এতদিন শুনছিলাম, কলা গাছ, অশ্বত্থগাছ, হনুমান মূর্তি ইত্যাদির সঙ্গে ঐশ্বর্যর পূর্ববিবাহ হয়েছে। এই দুর্ঘটনা ঘটলে বোধহয় নেড়ি কুকুর, ভাগলপুরী গরু, বাঁদর—কেউ বোধহয় আর বাদ থাকত না। বেচারা অ্যাশ! ওর জন্য সত্যিই মাঝে মাঝে কষ্ট হয়।

প্রতীক্ষা বাড়িটা প্রায় তিরিশ বছর পুরনো। সে সময় জুহু ভিলে পার্লে ডেভেলপমেন্ট স্কিম-এর দশ নম্বর নর্থ সাউথ রোডে একটা বড় রাস্তা আর গলির কোনার বাড়ি হিসাবে সহজেই প্রতীক্ষাটা চেনা যেত। আমার মনে পড়ে বিজ্ঞাপনের ছবির জন্য যখন প্রথম প্রথম বম্বে যাতায়াত করছি। প্রতীক্ষার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক দঙ্গল দর্শনার্থীর জটলা কখনও অনুপস্থিত দেখিনি। সে প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। তখন অমিতদা-জয়াদি প্রতীক্ষাতেই থাকেন। আর আশির দশকে অমিতাভ বচ্চন একজন অবিসংবাদী সুপারস্টার।

হীরের আংটির সময় মনে আছে। তখন চিলড্রেন ফিল্মস সোসাইটির প্রধান জয়াদি—আমার প্রথম প্রযোজক। জয়াদির সঙ্গে কী একটা কারণে দেখা করতে গেছি বাড়িতে, অর্থাৎ প্রতীক্ষায়। বিকেল তখন চারটে হবে। একটা অটোরিকশায় করে নেমেছি প্রতীক্ষার সামনে। বাইরে যথারীতি একদল মানুষের জটলা, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, একঝলক যদি সেই দীর্ঘ মানুষটির দেখা মেলে।

আমি অটোরিকশা থেকে নামলাম, গেটের কাছে এগোলাম, গেটে যথারীতি সিকিওরিটি আটকালেন, আমি বললাম যে শ্রীমতী বচ্চনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সিকিওরিটিদের কাজই মানুষকে প্রাথমিকভাবে অবিশ্বাস করা। এবং তার অবিশ্বাসটাকে যাচাই করে নেওয়া। ফলে আমার দিকে একটা ছোট ভিজিটরস স্লিপ বাড়িয়ে দেওয়া হল। আমি বাংলায় আমার নাম লিখলাম।

কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে ডাক এল। অবিশ্বাসী প্রহরীরা আপ্যায়নের ভঙ্গিত নত হলেন। আমি অপেক্ষমান জনতার মাঝখান থেকে গেট পার হয়ে ভেতরে চলে গেলাম। দাঁড়িয়ে থাকা বাকি মানুষগুলো বুঝতেও পারলেন না কোন মন্ত্রবলে আমি দুর্গদ্বার ভেদ করলাম। তাঁরা যুগপৎ বিস্মিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন।

প্রতীক্ষার বাগানের লাগোয়া একটা ঘর ছিল। কাচের পাল্লা দেওয়া বিশাল দেওয়াল। সেই ঘরে বসে বহুক্ষণ জয়াদির সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বাইরে সবুজ বাগানে ধীরে ধীরে সন্ধে নামল। আর আমার মনে আছে টেবিলের ওপর ছড়ানো, স্ফটিকের থালায় রাখা ছিল এক গোছা জুঁইয়ের মালা। এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর একজন এসে বাসি জুঁই বদলে টাটকা ফুল রেখে যাচ্ছিলেন। আর রুপোর গেলাসে আমপোড়া শরবৎ খেতে খেতে বাইরের সন্ধে হওয়া দেখছিলাম। আর আমার বারবার মনে হচ্ছিল এই না হলে হরবনশ পুত্র এবং তরুণ ভাদুড়ীর কন্যার সংসার। রুচির স্নিগ্ধতা কেমন চমৎকার করে আড়াল করেছে বৈভবের আস্ফালন।

সন্ধের পর যখন হোটেলে ফিরব বলে বেরিয়েছি, মনে আছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো সবাই এসে আমাকে ঘিরে ধরেছিলেন। ভেতরে কী দেখলাম, জানতে চেয়ে।

তাঁরা বোধহয় বহুদিন এভাবে অপেক্ষা করেছেন এই বাড়ির সামনে, এই প্রথম পায়ে হেঁটে কোনও মানুষ প্রায় তাঁদেরই মধ্যে থেকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে সময় কাটিয়ে বেরিয়েও এল, এবং রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অটোরিকশা করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে—এই আশ্চর্যটা তাঁরা সত্যিই যেন মেনে নিতে পারেননি। আমাকে ঘিরে ধরে বাস্তব অবাস্তব নানা প্রশ্নে পর্যদুস্ত করেছিলেন। সেই আমার জীবনে প্রথম 'মব্‌ড' হওয়া।

দুই

জয়াদি বলেই দিয়েছিলেন—'আমি তোমাকে তো বলেই দিলাম। কার্ডটার্ড আর পাঠাচ্ছি না। তুমি চলে এস। কুরিয়রে কার্ড পাঠাব, কোথায় না কোথায় চলে যাবে—তার থেকে তুমি বম্বে চলে এস। তেমন যদি হয় এখানেই তোমাকে কার্ডটা দিয়ে দেবখন। যদি রাখতে চাও, রেখে দিও।'

তারিখ টারিখগুলো জানতাম, সেই হিসাবেই বম্বে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া ছিল। রওয়ানা দেওয়ার দু'দিন আগে হঠাৎ বৃন্দার (ঐশ্বর্যর মা'র) ফোন। ঋতু, তোমার কার্ড পাঠানো হয়ে গেছে, কাল পেয়ে যাবে। আসছ তো!

সাহারা থেকে কেউ একজন একথলি নেমন্তন্ন কার্ড বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। একথলিই বটে।

দুটো মোটা সোনালি কার্ডবোর্ডের বাক্স, একটা সোনালি জরির ফিতে দিয়ে বাধা। ওপরের

বাক্সটা ষোলোপাতার। দ্বিভাষিক (ইংরেজি ও হিন্দি) নিমন্ত্রণ লিপি। নীচের বাক্সটায় নানারকম ফ্লেভার-এর চমৎকার কুকির সমাহার।

বাক্সদুটোর ওপরে জোড়া 'A' দিয়ে এমব্লেম বানানো। পুরো ব্যাপারটাই বেশ রাজকীয়। কুকিগুলো টিফিনবাক্সে ভরে পরেরদিন 'রোববার' অফিসে নিয়ে গেলাম। অভিষেকের বিয়ের কুকি সবাই মিলে খেল, দুর্গাদা আবার খাওয়ার আগে অনবধানে কপালে ঠেকিয়ে নিল—যেন মহার্ঘ প্রসাদ। (কার্ডের বাক্সদুটো রেখে দিয়েছি। বেশ শক্তপোক্ত। পেন, পেন্সিল, রবার রাখা যাবে।)

নিমন্ত্রণপত্রে লেখা আছে 'Blessings only'। মানে উপহার নিয়ে যাওয়া চলবে না। কিন্তু কিছু তো দিতে ইচ্ছে করে ছেলেমেয়ে দুটোকে। কী দিই? বড়লোকদের উপহার দেওয়া খুব মুশকিল। তাদের সব আছে। আর যেটা দেওয়া যেত, উপহার হিসাবে যেটা আমার বরাবরের বড় প্রিয়—বই, সেটা দিয়ে লাভ নেই। আমি জানি ওরা পড়বে না।

বাকি থাকে আমার ছবির ডিভিডি, তার অনেকগুলো আমি জানি ওদের আছে, আমিই ওদের দিয়েছি বিভিন্ন সময়ে।

এর মধ্যে অ্যাশ-এর (ঐশ্বর্যর) ফোন। কার্ডে নেমন্তন্ন ছিল আঠেরো তারিখ, এবং কুড়ি তারিখের জন্য। আঠেরো তারিখ সঙ্গীত, এবং কুড়ি বিয়ে। অ্যাশ বলল—'উনিশ' তারিখ মেহেন্দি, সেটা সবাইকে বলা হচ্ছে না, যারা নিমন্ত্রিত তাদের ফোনে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বোঝা গেল।

এর মধ্যে আনন্দবাজারের নিবেদিতা (আমার বড় স্নেহের, আমরা বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, ও এবং ওর স্বামী সুমিত 'তিতলি'তে ছোট দুটো পার্টও করে দিয়েছিল) আমাকে বারবার করে ফোন করছে, 'ও ঋতুদা, কী পরে বিয়ে করবে অ্যাশ জেনে দাও না।' যত বলি 'আমি কী করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করি, বল,' নিবেদিতা নাছোড়বান্দা, 'সে আমি জানি না, তুমি জেনে দাও।'

এর মধ্যে আবার বুম্বাটা (প্রসেনজিৎ) পেটের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে উডল্যান্ডস-এ ভর্তি হয়েছে। যাওয়ার আগেরদিন সকালবেলা দেখা করতে গেছি। শুনলাম, দু-একদিনের মধ্যে ওকে ছেড়ে দেবে। অর্পিতার ইচ্ছে হাসপাতাল থেকে বুম্বাকে সোজা বাড়িতে না এনে কোনও একটা নির্জন জায়গায়, লোকজনের ভিড়ের বাইরে কয়েকদিন অন্তত একটু নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাবে। অর্পিতা নিজে বেচারা বাচ্চা ফেলে যেতে পারবে না, ফলে কেউ একজন সঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন। একবার বললাম—তেমন হলে আমিই যাই তোর সঙ্গে। বম্বে যাব না।

বুম্বা হাঁ হাঁ করে উঠল—ধ্যাৎ, পাগল নাকি! ওরা সবাই এক্সপেক্ট করছে। বিয়েটা তো আর বারবার হবে না।

অর্পিতা বলল—অন্তত, সেটাই আশা করা যাক।

আমরা হাসলাম।

কিন্তু বুঝতে পারলাম বুম্বা চাইছে যে কলকাতা থেকে যেহেতু একজনই নিমন্ত্রিত, এই পারিবারিকত্বটুকু যেন কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়।

তিন

বম্বে পৌঁছলাম সতেরো তারিখ বিকেলে। ঐশ্বর্যর সেক্রেটারি শ্রী হরি সিং আমাকে ফোন করলেন যাওয়ার আগে—'কবে আসছেন, দাদা?' —'আজ, একটু পরেই।'

'কখন গাড়ি পাঠাব এয়ারপোর্টে?'

'প্রয়োজন হবে না, ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ঐশ্বর্যর কাছেই আসব।'

ঐশ্বর্যর বাড়ি খুঁজে পাওয়াটা বেশ কঠিন। বান্দ্রার মেহবুব স্টুডিওর কাছে নানারকম অলিগলি বেয়ে তবে ল্য ম্যের বিল্ডিংটায় পৌঁছতে হয়। কোনওবার আমি একবারে বাড়িটা খুঁজে পাই না। প্রত্যেকবার কাছাকাছি এসে ঐশ্বর্যকে বলেছি 'মেহবুব স্টুডিওতে কাউকে পাঠাও। আমি হারিয়ে গেছি।'

বৃন্দা একবার আমার মোবাইলে ওদের বাড়ির নম্বরের পাশে লিখিয়ে দিয়েছিল 'চাঁদিওয়ালা কম্পাউন্ড'—সেটাই নাকি ওই অঞ্চলটার প্রচলিত পরিচয়।

শচীন তেণ্ডুলকর যেহেতু ঐশ্বর্যর অ্যাপার্টমেন্ট প্রতিবেশী সাধারণত গাড়ির চালকদের বলি 'শচীন কা ঘর যানা হ্যায়।' তাতে করে খুব যে ফল হয় তা নয়, তবে আমার কেমন যেন ধারণা বম্বে শহরে ঐশ্বর্যর বাড়ি বলার থেকে শচীনের বাড়ি বললে ড্রাইভাররা অনেক অনায়াসে চিনবে।

আজকে দেখলাম অদ্ভুত। ঐশ্বর্যর বাড়ি বলতেই এককথায় ড্রাইভার বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, ওয়ো লীলাবতী কা পিছে।' মনে পড়ল, বৃন্দা আমাকে একবার লীলাবতী হাসপাতাল ধরে কী একটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। আমি বলে উঠলাম 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বললাম তো বটে, বাকিটা তো জানি না।

ড্রাইভার লীলাবতী হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করতেই তারা একবাক্যে বুঝিয়ে দিলেন। তবে কী সম্প্রতি ঐশ্বর্য বেশ কয়েকবার লীলাবতীতে এসেছে? স্বাভাবিক। হবু দিদিশাশুড়ি এতদিন এখানে বন্দিনী।

ল্য ম্যের-এর সামনে গাড়ি ঢুকতেই দেখি বিরাট একটা জটলা। স্টার-নিউজ, আজ তক ইত্যাদি চ্যানেল লোগো লাগানো বুম নিয়ে প্রচুর ছেলেমেয়ে। স্টিল ক্যামেরাধারীরাও রয়েছেন। অপর্যাপ্ত।

তাদের পাশ দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে, আর তাঁরা আপ্রাণ ঘাড় ঝুঁকিয়ে দেখছেন—গাড়ির ভেতরে নতুন অভ্যাগতটি কে?

এমনিতে ঐশ্বর্যর বারো নম্বর ফ্লোর, অর্থাৎ তেরো তলায় থাকে। আজ আলাদা করে আট নম্বর ফ্লোরে একটা বাড়তি জমায়েত। বৃন্দা, বান্টি (আদিত্য, ঐশ্বর্যর ভাই) সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে।

শেষ মুহূর্তের, নানা প্রশ্ন উত্তর, প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে। আগামী তিনদিনের অনুষ্ঠানসূচি জানা গেল।

ঐশ্বর্য ওপরে। বারো নম্বর ফ্লোরে, ঘুমোচ্ছে। এবার উঠে তৈরি হয়ে বেরোবে। কোথায়? বর কনেকে নিয়ে কোনও একটা বিশেষ ঘরোয়া পুজো আছে 'জলসা'য়—সেখানে যাবে। তাছাড়া আগামিকাল সঙ্গীত, তার জন্য নাচের রিহার্সাল চলছে পুরোদমে।

বৃন্দার সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় নীতা এসে দাঁড়াল। নীতা লুল্লা, ঐশ্বর্যর বসনবিদ। আমার সঙ্গে 'চোখের বালি' 'রেনকোট'-এর সূত্রে আলাপও আছে। নীতার হাতে একটা বড় প্লাস্টিক কেস-এর মধ্যে ঘি রঙা একটা পোশাক। নীতা ওপরে যাচ্ছে, বারো নম্বর ফ্লোরে। এবারে অ্যাশকে ঘুম থেকে তুলে রেডি করতে হবে। বৃন্দার কাছে এসেছিল গয়না চাইতে।

বৃন্দা বেচারা সবে একটু বসেছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে গেল।

নীতার সঙ্গে কথা হল কিছুক্ষণ। ঘি রঙা পোশাকের বিশাল স্বচ্ছ প্লাস্টিক জামা হাতে নীতা দাঁড়িয়ে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম নিবেদিতার গলা—ঋতুদা, বিয়ের দিনের শাড়ির রঙটা অন্তত জেনে দিও।

চার

বৃন্দা এবং অ্যাশ-এর ভাই বান্টির কাছ থেকে জানতে পারলাম পরেরদিন সঙ্গীত অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ রাত ন'টায় বটে, ঘটনাটা এগারোটার আগে আরম্ভই হবে না।

সঙ্গীত উত্তরভারতীয় প্রথা, বিয়ের আগের দিনের সমবেত নাচগান।

করণ (জোহর) নাকি 'সালামে ইশক্-এর নতুন কোরিওগ্রাফি করেছে। সেটা দিয়েই শেষ হবে অনুষ্ঠান। জানা গেল অনুষ্ঠান চলবে ভোররাত অবধি—অন্তত চারটে অবধি তো বটেই। বোঝো!

আমার ভেতো অভ্যেস সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া, 'আমি কি না পারতপক্ষে রাত্রে শুটিং করতে চাই না, আর 'সালামে ইশক' নাচ দেখার জন্য চারটে অবধি জেগে থাকতে পারব না বাপু!

আমি যে কোনওদিন বম্বেতে গিয়ে থাকতে পারব না তার একটা বড় কারণ এই নৈশাচার। বম্বেতে বেলা এগারোটার আগে কেউ ফোন ধরে না। আমি সাধারণত পাঁচটায় উঠি। স্নান, ব্রেকফাস্ট লেখালেখি সব সেরে ফেলেও হাতে অফুরন্ত সময়। কিন্তু কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় নেই। সকাল সাতটা মানে বম্বেতে মাঝরাত্রি। বিশেষ করে ফিল্মজগতে।

দুটো মাত্র মানুষ আমার সময়ে ওঠে। অমিতদা, আর অক্ষয় (কুমার)। অমিতদার সবকিছুই যেহেতু উপমাস্বরূপ প্রায়, ওঁকে ভোরে ওঠা নিয়ে কিছু বলা যায় না। অক্ষয়কে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীরা আড়ালে 'গোয়ালা' বলে ডাকে। ও নাকি আসলে ব্যাংককে থাকার সময় বাড়ি বাড়ি দুধ দিত—তাই ওর এমন সাতসকালে ওঠা অভ্যেস।

আর যত সন্ধে হয়ে আসে, ধীরে ধীরে শরীর মন ক্লান্ত হয়, বম্বে তত জীবন্ত, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পাগল! এই শহরে কেউ গিয়ে থাকে!

সে নয় থাকলাম না, কিন্তু আগামিকাল সঙ্গীতের ফাঁড়াটা পেরব কী করে! বৃন্দাকে অনেককরে বোঝালাম—'দ্যাখো, যদি সারারাত জাগতে হয়, তাহলে পরেরদিন আমার শরীর খারাপ হতে পারে। তারপর মেহেন্দি অনুষ্ঠান আছে। তার পরেরদিন বিয়ে—পুরোটা একেবারে চৌপাট হয়ে যাবে। তার থেকে সঙ্গীতটায় আমি এলাম না, পরেরগুলোয় আসব।' বৃন্দা বেচারা ভাল মানুষ। বলল 'দ্যাখো, কোনটা সুবিধে হয়।'

আমার তো পোয়া বারো। যাক বাবা! রাত জাগতে হবে না। তাড়াতাড়ি জলসায় ফোন করে অমিতদার সেক্রেটারি রোজিকে জানিয়ে দিলাম যে আগামিকাল যেহেতু অনেক রাতে অনুষ্ঠান, এবং আমার শরীরটা তেমন জুত নেই, আমি বরং রাত্রের অনুষ্ঠানে আসছি না। বরং তারপরের অনুষ্ঠানগুলো বিকেল বিকেল চলে আসব। রোজি বেচারা আমার সঙ্গে কথা বলছে, আর অন্যদিকে একসঙ্গে আরও সাতজনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। বুঝলাম বিয়ের এই ক'দিন ওদের একেবারে নাজেহাল অবস্থা।

সতেরো তারিখ রাত্তিরটা শান্তিতে ঘুমোলাম। যাক বাবা! সঙ্গীত টঙ্গীত-এ যেতে হবে না। বরং 'প্রোভোকড' ছবিটা দেখা হয়নি। সন্ধেবেলা দেখে নেব। কার সঙ্গে দেখি, কেউ ফ্রি আছে কি না ভাবছি—আবার খারাপও লাগছে এই ভেবে, যাদের ফোন করব, তাদের কেউই তো নিমন্ত্রিত নয়, অথচ আমি কলকাতা থেকে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি—তাদেরই বা কেমন লাগবে! এমন সময় ফোনটা বাজল। অমিতাভ বচ্চন।

কেমন আছ, অমিতদা?

ভাল, তুমি!

'ভাল অমিতদা। আমি না...'

'জানি, রোজি বলল, তুমি নাকি আসছ না, আজ।'

'হ্যাঁ-মানে... আসলে শুনলাম অনেক রাত্তির অবধি নাচগান হবে, তাই ভাবলাম বরং বিয়ের দিনটাতে...'

'টুডে ইজ দ্য বিগেস্ট ডে, ইউ হ্যাভ টু কাম।'

আচ্ছা!...মানে, ভোর অবধি টানতে পারব না, অমিতদা। জানো তো তুমি আমার রাত জাগাটা ঠিক পোষায় না।

যখন পারবে না, চলে যাবে। আসতে তোমায় হবেই।'

হতেই পারত আদেশ। কেন যেন আমার মনে হল আব্দার। বুড়ো লিয়রের আব্দার। যাক ভাগ্যিস 'প্রোভোকড'-এর টিকিটটা কাটতে দিইনি।

পাঁচ

প্রতীক্ষার সামনে সেই অপেক্ষমান জনতা আবার ফিরে এসেছেন কয়েকদিন ধরে। মধ্যে বহুদিন তাঁরা অন্তর্হিত ছিলেন।

এর মধ্যে যতবার বম্বে গেছি, নর্থ সাউথ রোড দিয়ে যাতায়াতের সময় গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেছি, বা খুঁজেছি সেই নাম না জানা মানুষগুলোকে—দেখতে পাইনি। হয়তো কোনওভাবে তাঁরা জানতে পেরে গেছেন যে সেই লম্বা মানুষটা আর এখানে থাকেন না।

এতদিন পরে বৈশাখ মাসের এই নিদাঘ দুপুরে আবার তাঁদের সাড়ম্বর প্রত্যাবর্তন দেখলাম। কেবল তাঁরা কেন? সঙ্গে অনেক মিডিয়ার মানুষ, নানা টিভি চ্যানেল, ও বি ভ্যান ইত্যাদি।

বুঝলাম যতই জয়াদি ছোট্ট, সামান্য, ঘরোয়া অনুষ্ঠান করতে চান না কেন, যে বর আর কনেকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান তাঁরা নেহাৎ ছোট নন।

আগের দিন ঐশ্বর্যর বাড়ি ল্য ম্যের-এ যখন গিয়েছিলাম তখনই তিনদিনের আলাদা আলাদা এনট্রি পাস (অনেকটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ডেলিগেট কার্ড-এর মতো দেখতে) আর গাড়ির পার্কিং-এর স্টিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইসব সামলেসুমলে নিয়ে প্রতীক্ষার দিকে রওয়ানা দিলাম। সঙ্গীত রাত ন'টায়।

প্রতীক্ষার সামনে অভ্যর্থনা ব্যবস্থা বেশ সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল। গাড়ি থেকে নামা মাত্রই অমিতদার এক বিশেষ দেহরক্ষী রাহুল, তাড়াতাড়ি আমায় দেখে এগিয়ে এলেন। কয়েকদিন আগেই মুশৌরি শুটিং-এও আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। ফলে পরিচিতির রেশটা এখনও বেশ টাটকা। সাদরে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন রাহুল। ভেতরে ঢুকতেই দেখি সবাই চেনা। যেহেতু এ বি কর্প-এর সঙ্গে অন্তরমহল ছবিটা করেছিলাম, ওদের অফিসের সকলের সঙ্গেও আমার প্রায় একটা ব্যক্তিগত স্তরেই পরিচয় আছে। সেই মানুষগুলোই আজ সেজেগুজে অভ্যর্থনা কমিটি।

প্রতীক্ষার সেই ঘাসছাঁটা বাগানটা, যেখানে সন্ধে নামত কালো চাদরের মতো, সেই বাগানটা পুরোটা ঘিরে ফেলা হয়েছে একটা বিশাল ব্যাংকোয়েট হল-এর চেহারায়। প্রথমে একটা কাচের দেওয়াল তার ওপারে নীল আর সবুজ কাপড়ের আস্তরণ। ঘাস ঢেকে গেছে কার্পেটে। ওপর থেকে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠনের আলো এক একটা ডিনার টেবিলের ওপর। টেবিল পিছু আটজন করে বসতে পারেন। ঢুকতেই দেখি অমর সিং এবং সুব্রত রায়। বহুদিন পর সুব্রতদাকে দেখলাম—কথা হল। অমর সিং আমাকে অমিতদার কাছে নিয়ে গেলেন। রুপোলি কাজ করা সাদা শেরওয়ানিতে সেই সাদা ফ্রেঞ্চকাট এবং সিল্কের পাজামায় অমিতদাকে দেখে মনে হচ্ছিল ছবির কস্ট্যুম পরে আছেন।

আমাকে দেখে একগাল হেসে এগিয়ে এলেন। আমার মাথার কালো পাগড়িটা দেখে উদার বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন 'এটা কী...ই?' আমি সাদা-রুপোলি শেরওয়ানিটা দেখিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম 'এটা কী...ই?'

মুশৌরির শুটিং-এর পর এই দেখা। খুব ভাল লাগল অমিতদাকে দেখে।

'জয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

'না।'

'জয়া, জয়া' বলে ডাকতে ডাকতে আমায় নিয়ে এগিয়ে গেলেন অমিতদা।

জয়াদি পিছন ফিরে কথা বলছিলেন কয়েকজন অতিথির সঙ্গে। হাল্কা কমলা গোলাপি আভার একটা সিল্কের কুর্তা, আর শালোয়ার ঘিরে ঘি রঙের দোপাট্টা। আগাগোড়া ভারি রুপোলি কাজ, আবু জানি সন্দীপ খোসলার কীর্তি।

জয়াদি ছোটখাটো মানুষ, অত জবরজং পোশাকে কেমন যেন একটা দেখাচ্ছিল। এমনিতে জয়াদি প্রায় সাজেনই না, আর আমার ঘরকুনো বাঙালি মন হয়তো ছেলের বিয়ের সময় মাকে শাড়িতেই দেখতে চেয়েছিল।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে চেনা অনেকে ছিলেন। শাদ আলির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মুজাফ্‌ফারকে দিয়ে যখন রোববার-এ শালতামামিতে লেখানো হয়, তখন শাদ-ই ওর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গেও কথা হল কিছুটা। শাদ-এর সাম্প্রতিক ছবি ঝুম বরাবর ঝুম শরাবির দুই অভিনেতা, অমিতদা আর প্রীতি হান্টে আমার সঙ্গে কাজ করলেন—ফলে আলোচনাটা বেশ সুবিস্তৃত হচ্ছিল।

অভ্যাগতদের মধ্যে কাপুর পরিবার (শশী কাপুর আর রণবীর কাপুরদের দেখলাম না) অজয়-কাজল, সুনীল-মানা সঞ্জয়-মান্যতা, কিরণ-সিকন্দর খের, যশ-প্যাম চোপড়া, উদয় চোপড়ার সঙ্গে তনিশা (কাজলের বোন) এসেছিল। তাছাড়া অভিষেকের পরিচালক বন্ধুরা—রোহন সিপ্পি অপূর্ব লাখিয়া, গোল্ডি বহেল, রামগোপাল ভর্মা।

কিরণের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হল। সেদিন সকালেই কাগজে পড়ছিলাম কিরণ নাকি সঙ্গীতে করণ জোহরের সঙ্গে কোরিওগ্রাফির দায়িত্বে আছে—কিরণ ঝাড়া অস্বীকার করল। তবে কথাবার্তায় বোঝা গেল যে উদ্দাম এক নৃত্যসভার জন্য সবাই প্রস্তুত।

অনিল আর টিনা আম্বানি প্রায় বরকর্তার ভূমিকায়। আমার সঙ্গে অনিল আম্বানির আগে পরিচয় ছিল না। এবারেই হল। কিছুক্ষণ কথাও হল।

এমন সময় সাদা চিকনের শালোয়ার কামিজে মেহেন্দি রঙিন চুলের বন্যা নিয়ে একজন এসে দাঁড়ালেন—ডিম্পল কাপাডিয়া। টিনা আর ডিম্পলকে এক জায়গায় দেখে আমারই কেমন যেন

একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। সারা দেশশুদ্ধ আমরা সকলে জানি যে একসময় এই দুই নারী এক কিংবদন্তি পুরুষকে ঘিরে এক চরম বৈরিতার দুই প্রান্তে অবস্থান করেছেন। দেখলাম, সত্যিই সময় সব সারিয়ে দেয়। ডিম্পল আর টিনা আজ যে হেসে কথা বলছে, সেটা কেবল সামাজিক ভব্যতার থেকে অনেক বেশি আন্তরিক।

অমিতদার একসময়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী—রাজেশ খান্না অনিমন্ত্রিত হয়েও কেমন সহজে এই সঙ্গীতমণ্ডপে সুগোপনে বিরাজ করছেন—এই কথা ভাবতে ভাবতেই একটা বিরাট কলরব—'বউ এসেছে' 'বউ এসেছে।'

ছয়

আমরা জানি বর কনে বহুদিন পরস্পরকে চেনে। আমরা জানি দুই পরিবার এখন একত্রিত প্রায়। আমরা জানি আজকের দিনে কনে বউ একগলা ঘোমটা টেনে কোণে বসে থাকে না। তবু বোধহয় কনে শব্দটার মধ্যে একটা স্বাভাবিক লজ্জা এবং সংকোচ জড়িয়ে থাকে। সমস্ত গয়নাগাটি বেনারসীর বাইরে সেটাও কনের একটা সাজ। সেই সাজটুকু বাদ দিয়ে আর যাই হোক, বিয়ের কনে হয় কিনা জানি না।

সঙ্গীতমণ্ডপে অভিষেক আর ঐশ্বর্য হাত ধরাধরি করে ঢুকল। যেন এটা সঙ্গীত মণ্ডপ না হয়ে কোনও ফিল্মের পার্টিও হতে পারত।

অভিষেক সাদা এবং রুপোলি আবু-সন্দীপ, ঐশ্বর্য সাদা, সমুদ্রসবুজ এবং রূপোলি আবু-সন্দীপ। অভিষেক শেরওয়ানি, অ্যাশ লেহঙ্গা।

অ্যাশ কথা বলছে, অ্যাশ হাসছে। অ্যাশ অপ্রস্তুত হলেই হাসে—আমি আগেও দেখেছি, জানি। ওকে কী কেউ বলে দেয়নি যে আজ লজ্জা পাওয়ার, সঙ্কুচিত হওয়ার, অপ্রস্তুত হওয়ার দিন—সেটা ঢাকবার প্রয়োজন নেই। এটা বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা নয়। এখানে ওর কোনও ব্যক্তিত্ব স্খলনে নম্বর কাটা যাবে না।

একটা ছবি মনে পড়ে গেল। সাতগাছিয়ার কাছে বাওয়ালি বলে একটা গ্রামে 'চোখের বালি'র শুটিং হচ্ছে। সেখানের সন্ধেবেলা একটা বাড়িতে বিনোদিনীর বিয়ের দৃশ্য। সারাদিন অন্য কাজ ছিল। সন্ধেবেলা এবার অ্যাশকে কনের সাজে তৈরি করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর এক গ্রামের কনে কীভাবে সাজত, আলতা সিঁদুর আর লবঙ্গর চন্দনের বাইরে আর কী ছিল অঙ্গাভরণ সেই ঐতিহাসিক বিশদতায় না গিয়ে আমরা বাঙালি কনের একটা চিরন্তন সাজ ঠিক করে নিয়েছিলাম। মনে আছে, পুরনো একটা বাড়ির যে ঘরটায় অ্যাশ তৈরি হচ্ছিল সেখানে ভোল্টেজ কম, ফলে

আলোগুলো নিস্তেজ। অভীক (চোখের বালির চিত্রগ্রাহক) তাড়াতাড়ি দুটো শুটিং-এর আলো বাসিয়ে দিল মেক আপ টেবিলের কাছটাতে। সেই আলোতে প্রায় পাঁচ মিনিটে—তিলকমাটি গোলা চন্দনের বাটিতে তুলি ডুবিয়ে অ্যাশ-এর কপালজুড়ে চন্দন-আল্পনা এঁকে দিয়েছিলাম।

বৃন্দা ছিল শুটিং-এ। অ্যাশের সঙ্গে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল চন্দন পরানো। অ্যাশ লুকিয়ে লুকিয়ে আয়নায় আড়চোখে দেখছে নিজের মুখ, আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম—'বিয়ের সময় বোলো আমায়, এসে পরিয়ে দেব।'

পরে মনে আছে, চন্দন পরানো হয়ে গেছে, অ্যাশের শাড়ি গয়নাও পরা হয়ে গেছে—শট প্রায় রেডি, ডাকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। বৃন্দা নিজের একটা ছোট ডিজিট্যাল ক্যামেরায় অ্যাশ এর চন্দন পরানো মুখখানার ছবি তুলে রাখছে। আমাকে দেখতে পেয়ে মা-মেয়ের কী লজ্জা! আর সেই লজ্জা যে সেদিন অ্যাশকে সেই নিচু পাওয়ারের আলোর সন্ধেতে কী সুন্দরী করে দিয়েছিল, আমি আজও ভুলিনি।

সঙ্গীতমণ্ডপের সামনে অ্যাশ আর অভিষেককে ঘিরে প্রচুর অভ্যাগতর জটলা। ঐশ্বর্য খুব ভাল করে জানে, কাকে দেখে নমস্কার করবে, কাকে দেখে শুধু হাসবে, কার সামনে কপালের ওপর চুল সরাতে সরাতে হাসবে।

অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে গেলাম। দেখি না, আমার জন্য কী বরাদ্দ! পাগড়িপরা অবস্থায় আমাকে দেখে অ্যাশ প্রথমটায় চমকে উঠেছিল, তারপর হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরল।

বৃন্দা বারবার করে বলে দিয়েছিল 'ওদের আমার শুভেচ্ছা জানাস।' মণি-শ্রীকান্ত (চোখের বালি, রেনকোট-এর প্রযোজকদ্বয়) বলে দিয়েছিল—'ঋতুদা, বলবেন আমরা অনেক শুভেচ্ছা পাঠালাম।' সবকটা কথাই বলতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল অ্যাশ আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে ঠিকই, চোখ এবং হাসি দিয়ে অন্য অনেককে অভিবাদন করে চলেছে।

আমার আর একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করল না।

সাত

সঙ্গীতের সন্ধেবেলাতেই জয়াদি বলেছিলেন 'কাল মেহেন্দি। মেহেন্দিতে এসে কী করবে? তুমি বরং সন্ধেবেলা রাহাত ফতে আলি খান (নুসরত ফতে আলির ভাইপো) গাইবে, শুনতে চলে এসো।'

সকালবেলায় জলসাতে জয়াদির সঙ্গে আমার নিজের কিছু কাজ ছিল। গিয়ে দেখি জলসা ঘিরে গোলাপি আর কমলা রঙের কানাত। আজ মেহেন্দি।

সন্ধেবেলা জে ডাবলু ম্যারিয়টে একটা সেমিনার ছিল, সানডে ইন্ডিয়ান আয়োজন করেছিলেন। ওঁরা চাইছিলেন আমি সেখানে বক্তৃতা দিই। আমি 'যাচ্ছি' 'যাব' করে শেষপর্যন্ত আর গিয়ে উঠতে পারলাম না।

আমি যেখানে ছিলাম তার পাশেই একটা মাল্টিপ্লেক্স থিয়েটারে 'প্রোভোকড' দেখানো হচ্ছিল, টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম 'অ্যাশ 'মেহেন্দিতে কেন এলে না? জিজ্ঞেস করলে বলব 'আমি তো তোমাকেই দেখছিলাম।'

পরের দিন বিয়ে। যেদিন বিয়ের দিন ঠিক হল জানতে পারলাম। জয়াদিকে বলেছিলাম 'ইস'! একটা দিন আগে রাখলি না কেন বিয়েটা, উনিশে এপ্রিল বিয়ে হলে আমার উপহার দেওয়াটা কত সহজ হয়ে যেত।'

অমিতদার কড়া নির্দেশ জলসায় চারটের মধ্যে পৌঁছতে হবে। আজ গাড়ির স্টিকারের রং আলাদা।

সাতটা সাদা বিলাসবাস চেপে বারাতি (বরযাত্রী) আসবেন জলসা থেকে প্রতীক্ষা। সেই বাসে অভিষেক, অমিতদা, জয়াদি, শ্বেতা-নিখিল, অমর সিং, সুব্রত রায়, অজয় দেবগণ, করণ জোহর, যশ চোপড়া, অজিতাভ বচ্চন—সবাই।

আমি বাস মিছিলের পেছনে ছিলাম আমার গাড়িতে। জানি, বাসে উঠলেই 'এটা করো, ওটা কোরো না' বলে অমিতদা ভীষণ বকবে। অমিতদাকে দেখে সত্যিই মনে হচ্ছিল পুজোয় নতুন জামা পরিয়ে দেওয়া একটা বাচ্চা। যার জেদ করার ইচ্ছে আছে, কিন্তু ক্ষমতা নেই—কারণ পুরো তিনশোটা মানুষ তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই।

বাসগুলো সুন্দর দেখতে। সাদা ধবধবে। ঝকঝকে গা। সবার আগে একটা খোলা গাড়িতে এ কে ফর্টি সেভেন হাতে সিকিওরিটি। অভিষেক, যে কী না, পাড়ার ছেলে—সামনে বন্দুকধারী নিয়ে নিজের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে কাতারে কাতারে জনতা। পুলিশের ব্যারিকেড।

আমি ঠিক বাস মিছিলের পেছনে গাড়িতে বসে রেডিও এফএম-এ এই বিবাহ শোভাযাত্রার ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে প্রতীক্ষার দিকে এগোলাম।

ঝাঁ চকচকে বাসগুলো এগিয়ে যাচ্ছে একে একে। কোথাও কোনও ফুলের সাজ নেই। বরের গাড়ি বলে চেনার কোনও উপায় নেই। এক সময় প্রতীক্ষার সামনে বাস দাঁড়াল। অভিষেক এবার বাস থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে প্রতীক্ষায় ঢুকবে।

ফলে অন্য বাসগুলোও সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়ল পেছনে।

তখন বিকেল পাঁচটা। বম্বের আকাশ হলুদ হয়ে গেছে। আর নর্থ সাউথ রোড-এর ফুটপাথের ধারে কোনও একটা রাধাচূড়া গাছ থেকে বৈশাখী বাতাস অবিশ্রান্ত ঝরিয়ে চলেছে হলুদ ফুল—ঢেকে দিচ্ছে এক এক করে সবকটা বাসের ছাদ।

আট

গোধূলি লগ্নে বিয়ে শুরু। গোধূলির বড় ভয়ঙ্কর সুন্দর একটা বর্ণনা আছে রামায়ণে রাত্রি যেভাবে চন্দ্রসূর্যশূন্য সন্ধ্যার দিকে অগ্রসর হন, রাবণ সেভাবে রামলক্ষ্মণ বিরচিতা সীতার দিকে ধাবমান হইলেন।

প্রতীক্ষার বিশাল মণ্ডপ আজ রং পাল্টে কমলা ও সোনালি, বিবাহমণ্ডপের ভেতরটা অন্ধকার। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং বহির্জগতের শব্দবিহীন। কাচ, অ্যাক্রিলিক এবং সিল্কের কাপড়ের আবরণে ঢাকা। সারা জায়গাটা জুড়ে অভ্যাগতদের ভিড়। আলোআঁধারির মধ্যে চোখে পড়ছে অনেকরকম পাগড়ি (শুনেছি উত্তর ভারতে লম্বা ল্যাজওয়ালা পাগড়িকে 'সাফা' বলে)। এঁরা সবাই বরযাত্রী। অভিষেকের সঙ্গে বাসে চেপে প্রতীক্ষা থেকে জলসায় এসে পৌঁছে বড় ক্লান্ত। ডিনার টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পানভোজন চলছে।

বিয়েটা হচ্ছে একটা মণ্ডপে। মাথার ওপর রঙ্গন এবং জুঁইফুলের জালিকাজ। মাঝখানে দুটি নিচু সিংহাসন। বরকনে এসে বসবার অপেক্ষায়। আপাতত মঞ্চের দুপাশে মুখোমুখি, তিনটে করে নিচু আসন পাতা। মঞ্চের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডানদিকের তিনটি আসনে অমিতদা, জয়াদি, অভিষেক আর ঠিক উল্টো দিকে বাঁদিকের সারিতে কৃষ্ণরাজ রাই, বৃন্দা, আর ঐশ্বর্য। মাঝখানে দর্শকের দিকে মুখ করে পুরোহিতরা বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু করেছেন।

অমিতদার পরনে সোনালি কাজ করা সাদা শেরোয়ানি, মাথায় কমলা পাগড়ি, জয়াদি সোনালি কাজের লেহঙ্গা চুনরি, ঘাড়ের কাছে ছোট্ট খোঁপা, কপালে ছোট টিপ, বড় আনকাট ডায়মন্ডের গয়না—অভিষেক সাদা টিস্যু বেনারসীর পাগড়ি, সাদায় সোনায় শেরোয়ানি, কপালজুড়ে হীরে আর পান্নার মুকুট, গলায় হীরে এবং পান্নার হার, গালে দাড়ি, চোখে সুর্মা—কোমরে তলোয়ারটা থাকলেই রাজপুতানার রানা মনে হত।

অন্যদিকে কৃষ্ণরাজ রাই শেরোয়ানি পরেছেন। বৃন্দা গাঢ় মেরুন কাঞ্জিভরম। চোখ ফেরানো যাচ্ছে না ঐশ্বর্যর দিক থেকে। ঘিয়ে সোনা রঙের তাঞ্চোই বেনারসী। কোমরে সোনার বিছেপটি, দু হাতে বাজুবন্ধ। গলা থেকে বুক অবধি হীরে দিয়ে মোড়া, কানে লম্বা হীরের দুল, মাথায় হীরের সিঁথিপাটি। আর কালো লম্বা বেণী জুড়ে মোটা জুঁইয়ের মালা জড়ানো। তার সাথে সাথে সোনার চাকার মতো বেণী শোভা। মুখখানি পরিষ্কার। কেবল নাকের ওপরে চিকচিক করছে হীরকবিন্দু নাকছাবি। প্রায় কনুই অবধি মেহেন্দির অলঙ্কার। তার ওপরে কবজি জুড়ে হীরকবেষ্টনী। সত্যিই যেন মীনাক্ষী মন্দির থেকে নেমে আসা কোনও দক্ষিণী যক্ষিণী।

সারা বিবাহ অনুষ্ঠান জুড়ে নাদেশ্বরম্ আর মৃদঙ্গম বেজে গেল। মাঝে মাঝে মন্দিরের ঘণ্টা।

এতদিন অবধি যে কটি অনুষ্ঠান দেখেছি, মনে হচ্ছিল যেন একেকটি শো, যেখানে নির্মমভাবে নিখুঁত হওয়াটাই ছিল উৎকর্ষের মানদণ্ড। প্রতিটিই দীর্ঘ মহড়াক্রান্ত, সঠিক হওয়ার প্রচেষ্টায়

স্বতঃস্ফূর্ততাহীন। আজ বিয়ের আসরে বসে এই প্রথম বোঝা গেল, জীবনের কিছু লগ্নের জন্য সত্যিই বোধহয় প্রস্তুত হওয়া যায় না।

মালাবদলের সময় উপস্থিত। বচ্চন জামাতা নিখিল নন্দা অভিষেকের হাত ধরে ঐশ্বর্যর কাছে এনে দাঁড় করালেন। ঐশ্বর্যর হাতে ধরা গাছকৌটো চলে গেল ননদিনী শ্বেতার জিম্মায়। অভিষেক বিয়ে করতে এসেছেই মোটা একটা মালা পরে। মালা বদলের সময় হঠাৎ বর কনে দু'জনের হাতে একেকটা মালা ধরিয়ে দেওয়াতে দু'জনেই একটু হিমশিম। গলায় পরা মালাটা খুলতে গিয়ে অভিষেক নাজেহাল। একবার পাগড়িতে আটকে যায়, একবার গলার পিছনে আটকে যায়—ঐশ্বর্য নিপুণ হাতে অভিষেকের গলার মালাটা খুলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিখিলের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর মালাবদল। জয়াদি, অমিতদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি একদৃষ্টে ছেলের দিকে তাকিয়ে। বেচারা অমিতদা! শুটিং-এ ছ'টা প্লাস্টিক চেয়ার একসঙ্গে আটকে যে মানুষটা বসে, সে ঘণ্টা দুই টানা একটা নিচু জলচৌকিতে বসে।

মণ্ডপে হোমের আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই আগুনের সামনে বসে ঐশ্বর্যের সারা মুখমণ্ডলের অভ্রকণার মতো স্বেদবিন্দু হীরকদ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাজীব মেননের মা তখন মাইক্রোফোনে লক্ষ্মীনারায়ণ স্তোত্র গাইছেন। আর মঞ্চের ওপর শ্বেতা, সোনালী বেন্দ্রে, টিনা আম্বানি, সৃষ্টি বহেল, মহেশ গোয়েঙ্কা প্রদীপের আলোয় বরণ করছেন নবদম্পতিকে।

সুখী দাম্পত্যজীবনের চরিত্রে ঐশ্বর্যকে কখনও অভিনয় করতে দেখিনি। তাই মঞ্চের ওপর যে কাঞ্চনবর্ণ মেয়েটা, তার মুখচ্ছবিটাই তার চরম সুখের প্রকাশ বলে ধরে নিলাম।

অভিষেক ঐশ্বর্য যুগ্মহাতে আগুনে খই নিক্ষেপ করছে। পুরোহিত মন্ত্র বলছেন। আর ওরা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করছে 'শ্রী, বুদ্ধি, মেধা, বল, আয়ু, আরোগ্য কামনা, ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় মিলে যাচ্ছে। দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ঐশ্বর্যর মাঙ্গলিক ব্যাধি। অগ্নির অন্তর থেকে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন জীবন।

আর আমার চোখের সামনে ঐশ্বর্যর হীরকসজ্জিতা মুখবয়ব মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে গতকালের দেখা 'প্রোভোকড'-এর কিরণজিৎ আলুওয়ালিয়ার অগ্নিময় প্রতিবাদ—নিজের অসুখী দাম্পত্যের অগ্নি আহুতি।

আর বারবার গুলিয়ে যাচ্ছে—কোনটা তাহলে আসল ভারতবর্ষ?

২৯ এপ্রিল, ২০০৭

অনেক দিন আগের কথা।

মিনিবাসে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন মা। হঠাৎ বড় চেনা, ফর্সা, বড় টিপ পরা সহযাত্রিনীকে দেখে পরিচিতের হাসি হেসেছিলেন।

ফর্সা বড় টিপ মাকে চিনতে পারেননি। তবু সামাজিক স্মিতহাস্যে ভদ্রতা রক্ষা করেছিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে অবধি মা বহুক্ষণ ধন্দে ছিলেন। 'তাহলে কি আমি ভুল দেখলাম? নাঃ! বড় চেনাই তো মনে হল।'

ভুল ভাঙল সন্ধেবেলা, টিভি চলবার পর। দূরদর্শনের পর্দায় ফর্সা বড় টিপকে দেখে। 'ও! তাই বল! টিভিতে রোজ দেখি তো, ঠিক বুঝতে পারিনি। মনে হয়েছে চেনা।

এই হল টেলিভিশন যুগের গোড়ার কথা।

একজন মানুষ যাকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখি—তার গলা শুনি, তার রোগা হওয়া, মোটা হওয়া, চোখ বসা, মুখ ফোলা—সমস্তটাই আমাদের এতটা আয়ত্তে যে তাকে যে চিনি না আদতে, একথাটা মেনে নিই কেমন করে? রোজ সন্ধেবেলা বসবার ঘরে যার নিত্য যাওয়া আসা, সে কি আমার প্রতিবেশী নয়?

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হালের।

বাড়িতে কয়েকদিন ধরেই এক অপরিচিতা মহিলা ফোন করছেন—কী দরকার কাউকে বলবেন না। আমার সঙ্গেই কথা বলবেন।

একদিন এমন সময়ে ফোনটা এল যখন আমি বাড়িতে।

অপরপ্রান্তে সংকুচিত বয়স্ক একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—আপনি ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—না, টিভিতে দেখলাম আপনাকে বড্ড রোগা হয়ে গেছেন। অসুখ টসুখ করেছিল?

—না, এমনিই রোগা হয়েছি।

—ন্যাড়া হয়েছেন দেখলাম। নিশ্চয়ই বাড়িতে একটা বিপর্যয় গেল?

—না, না, বাড়িতে কিছু হয়নি। আমি ন্যাড়া হয়েছি এমনিই।

—কেন?

ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অতর্কিত আশ্চর্যে তীক্ষ্ণ হল

—মানে, এমনিই...

—ইস! এরকমটা কেউ করে। কেমন সুন্দর কোঁচকা কোঁচকা চুল ছিল। মোটেই ভাল লাগছে না আপনাকে ন্যাড়ামাথায়। চুলটা রাখুন।

—আচ্ছা, নিশ্চয়ই রাখব।

ফোনটা নামিয়ে রাখার পর খেয়াল হল যে ভদ্রমহিলার নামটাও জিজ্ঞেস করে নেওয়া হয়নি। ইনি কে আমার? শুভাকাঙ্ক্ষিণী, স্নেহার্থিনী। আমার এক শহরের প্রতিবেশী, না মনের কোনও এক জগতে আমরা একপাড়ায় থাকি।

চাক্ষুষ কেউই হয়তো কাউকে দেখিনি কোনওদিন। তবু আন্তরিকতার কত সহজ দাবি!

মা মারা গেছেন আজ একবছর হল। পাড়া প্রতিবেশীদের নিত্য সুখ-দুঃখের পাঁচালী, সত্যনারায়ণ-উপনয়ন বিয়ে-অন্নপ্রাশনের ছড়ানো পার্বণ আর আমার ক্যানভাসের পর্দা ফেলা জানলার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে না।

যেটুকু এখনও জানতে পারি, সেটা হয়তো বাবার মাধ্যমে। বিকেল বেলা হাঁটতে গিয়ে বাবার কাছে এখনও মাঝে মাঝে জমা হয় আমার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা এই প্রতিবেশের নিত্যকার ইতিকথা।

প্রতিবেশী মানে সমাজ, প্রতিবেশী মানে বহির্বিশ্ব—নিজের আবেগের স্বৈরাচার সামাজিক ভব্যতায় শাসিত।

—'অমুকের বাবা মারা গেছেন। যাও একবার দেখা করে এসো।

—কেন? বয়স হয়েছে, মারা গেছেন। আর তাছাড়া আমি তাঁকে তেমন চিনতামও না।

—এ আবার কী কথা? চিনতে না বলে দুঃসময়ে গিয়ে দাঁড়াবে না? আজ যদি তোমার মা মারা যায়, কেউ এসে তোমার পাশে না দাঁড়ায়?

—তাহলে তো বেঁচে যাই।...'

চিরকাল এই ছিল আমার সঙ্গে মা'র সামাজিকতা নিয়ে বিবাদ।

শেষ অবধি কিছুই আর টিকল না। মা যখন মারা যান আমি তখন প্লেনে। বম্বে থেকে কলকাতা আসছি। দমদমে নেমে খবর পেলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখি কত লোক। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও আমাদের কত প্রতিবেশী। কোথায় যেন একটা জোর পেলাম। প্রতিটি প্রতিবেশীর মুখেই মুখ কেমন যেন নতুন করে সাহস দিল।

সত্যিই তো তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে আমার ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি এখানে এসে পৌঁছোবার সঙ্গী, আমার সঙ্গে আমার মার সম্পর্কের নানা বিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেতু।

আমার যারা যৌথ পরিবার দেখিনি— এই প্রতিবেশীরাই আমাদের পরিবার।

অন্য একটা ঘটনা বলি।

সালটা ঠিক মনে নেই, তারিখটা নিঃসন্দেহে জুলাই মাসের চার তারিখ। সে বছর নর্থ আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলন জর্জিয়ার অ্যাটলান্টা শহরে।

নিউ ইয়র্ক জে এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট-এ টার্মিনাল বদল করে প্লেন ধরব জর্জিয়ার।

নতুন টার্মিনাল-এ এসে দেখি প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে গেছে—অতএব স্বাভাবিকভাবেই সকলে লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে।

নির্বিঘ্নে হয়তো উঠেই পড়তাম প্লেন-এ। হয়তো সারাজীবনের মতো জানাও হত না কোনও না দেখা প্রতিবেশীর কথা।

লাইনে দাঁড়িয়ে দেখি অনতিদূরে মেঝেতে বসে আছেন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ এক আরবদম্পতি। আর সামনে মেঝেথে ছত্রাকার ছড়ানো তাঁদের খোলা সুটকেসের সমস্ত জিনিস তখন সবে ৯/১১ হয়ে গেছে, অতএব মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনও যাত্রীই আমেরিকান পুলিশের কাছে সন্দেহভাজন।

এই বৃদ্ধ দম্পতিও তাদের নৈর্ব্যক্তিক তালিকা থেকে বাদ পড়েননি। অসহায় বৃদ্ধ একটা একটা করে জিনিস কুড়িয়ে স্যুটকেসে ভরছেন। আর মহিলা লজ্জায় গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে আছেন। বোরখার আড়াল আর কোনও আব্রুসঙ্গী নয়।

সামনের মেঝেতে তখনও পড়ে রয়েছে তাঁর কয়েকটি অন্তর্বাস। বৃদ্ধের নকল দাঁতের প্লাস্টিক বাক্স।

পুলিশদের খানা তল্লাশি করা হয়ে গেছে। ফিরে বাক্স দুটি গুছিয়ে দেওয়ার কথা কারুর মনেও নেই। প্রয়োজনও নেই।

আর দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অপমান লজ্জা, গ্লানি সামলে আবার নতুন করে বাক্স গোছানোর মতো মনের অবস্থাতেও নেই।

লাইন ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে একটা একটা করে জিনিস কুড়িয়ে দিচ্ছি। ওঁরা হাত বাড়িয়ে নিচ্ছেনও না। মানবিকতার চূড়ান্ত অপমানের মধ্যে পড়ে গুটিয়ে যাওয়া মানুষের এমন চেহারা বড় একটা দেখিনি। যে অপমানের মার যে কোনও সমবেদনার স্পর্শকেও সন্দেহের থাবা বলে ভুল করাতে পারে। ধীরে ধীরে সন্দেহের কুয়াশা ফিকে হল। একটা একটা করে জিনিস আমার হাত থেকে নিলেন ভদ্রলোক। একটা খালি প্লাস্টিকের প্যাকেট পড়ে ছিল। অন্তর্বাসগুলো কুড়িয়ে তার মধ্যে ভরে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিলাম। বোরখার সংকোচ ভেদ করে শীর্ণ শিরা ওঠা একটা হাত বেরিয়ে এল প্যাকেটটা নিতে। আমেরিকান পুলিশগুলো এতক্ষণে একটু ভ্যাবাচ্যাকা। অ্যানাথ্রাক্স ত্রাসের জন্য প্লাস্টিকের দস্তানা ঢাকা অনেকগুলো হাত ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। সম্মিলিত সাহায্যকল্পে।

একটা কটুকথা মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল 'a very nice way indeed to celebrate your independene day'

বলেই মনে হল না বললেই পারতাম। সামনেই যে মার্কিন পুলিশটি কেমন যেন একটা লজ্জা

পাওয়া মুখে চোখ তুলে তাকাল। তারপর আরও অধোবদন হল স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। সত্যিই তো রাষ্ট্র, শাসনের বাইরের তো অত্যাচারী পুলিশ আর 'নিপীড়িত' মানুষ আদতে এক পৃথিবীরই বাসিন্দা। এবং প্রতিবেশী।

বসুধৈব কুটুম্বকম্।

৩ জুন, ২০০৭

কয়েক মুহূর্তের জন্যও যদি ধরে নেওয়া যায় যে প্যারিস শহরের ল্যুভর জাদুঘরটা হল পুজোর সময়কার কলকাতা শহর, আর এই পৃথিবী বিখ্যাত মিউজিয়মের সবকটি দর্শনীয়ই একেকটি নামজাদা পুজামণ্ডপ—তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বছরের পর বছর প্রথম পুজোর পুরস্কারটা প্রায় চিরাচরিতভাবেই একজনের কপালে বাঁধা।

মোনালিসা।

মিউজিয়ম-এর মধ্যে মোনালিসার দিকে পৌঁছনোর আধঘণ্টা আগে থেকেই নানারকম পথ নির্দেশিকা, সতর্কবাণী।—'মোনালিসা-দশ মিনিট', 'মোনালিসা-পাঁচমিনিট', 'মোনালিসা-তিনমিনিট', 'মোনালিসা- পৌঁছে গেছেন...' ইত্যাদি।

দিনের যে কোনও সময়ে মোনালিসার সামনে বেষ্টনীর বাইরে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে ঠাকুর দেখছেন অন্তত জনা আশি দর্শনার্থী।

কী দেখছেন কে জানে?

কোন রহস্যময় হাসি, কোন অপাঙ্গদৃষ্টির অনঙ্গতাড়নায় পৃথিবীর মানুষ আজও দলে দলে ছুটে আসেন, বহু পূর্বে দেখা অবিকল-অনবিকল অনুকৃতির স্মৃতি অতিক্রম করে এই আপাদমস্তক বসনাচ্ছাদিতাকে একবার চোখের দেখা দেখবেন বলে—তা সত্যিই পরমাশ্চর্য!

চিত্রকরের একান্ত নিভৃতমনের মানসী আজ ভুবনব্যাপী কল্পনাকামিনী।

সেই অবিচল ভঙ্গি, অপলক নেত্র রহস্যভার ধীরে ধীরে এক সময় দর্শকের কল্পনার নিঃসীম যাত্রাকে স্থবির নিশ্চল করেছে, হৃদয় ছেড়ে রহস্য এসে আশ্রয় করেছে মস্তিষ্কে।

প্রায় পৃথিবীরও অজান্তে, সুদূরের কবির রহস্যনারী মোনালিসা ধীরে ধীরে নানা রহস্য রোমাঞ্চকাহিনির অদৃশ্য নায়িকা হয়ে উঠেছেন প্রবল ঘনঘটায়।

বাঙালির মোনালিসা নিঃসন্দেহে বনলতা সেন।

কোন যামিনী-ললনা নয়, দুর্গেশনন্দিনী নয়, লাবণ্য নয়, কমললতা নয়—বনলতা সেন।

কোনও পুরুষ আবৃত্তিকার আজও যখন বনলতা সেন পড়েন তাঁর কণ্ঠস্বরের আশ্লেষ অন্তত

একবারের জন্যও বনলতার বিদিশাবিষণ্ণ চুলে মুখ ডোবায়, শ্রাবস্তী-অধরে ওষ্ঠস্থাপন করে।

মহিলা আবৃত্তিকার যখন বনলতা সেন পড়েন, কখনও না কখনও তাঁর কণ্ঠশরীর ঘনপক্ষ্ম পাখির-নীড় চোখ হয়ে উঠতে চায়—এমনই এই রহস্যময়ীর মায়া।

আজকাল বহু বাংলা কবিতাই সুরারোপে গান হয়ে উঠছে। বনলতা সেন আমার কাছে বাংলা কবিতার আদি গান।

কবিতাটির ছন্দ গানের মতোই আমাদের মনের ভিতর গ্রথিত হয়ে গেছে এমনইভাবে, যে সবসময়ে সবকটা পংক্তি নির্ভুলভাবে বা সঠিক পারস্পরিকতায় মনে না পড়লেও বনলতার সঙ্গে আমাদের মলিন প্রথম আলাপের ইতিহাসে আখ্যান কখনও মলিন হয়না।

মনে পড়ে গেল, কবে কোথায় যেন পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম মনে নেই—বনলতা সেন আসলে নাকি নাটোর শহরের এক দেহোপজীবিনী।

কোনও রহস্যময়ীর উৎসসন্ধানে এই তথ্যসূত্র অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর। ফলেই হয়তো বা, কথাটা মাথায় ঢোকার পর থেকে কবিতাটা আর অন্য কোনওভাবে কোনওদিনও পড়তে পারিনি।

বনলতা সেন যেহেতু তার রহস্য আবরণ ভেদ করে কখনও প্রণয়িনীর নৈকট্যটুকু অনুমোদন করেনি, তাকে বহুভোগ্যা বারবনিতার নির্বাসনে ঠেলে দিতে কোনও পুরুষমনের অধিকারবোধ তেমনভাবে আহত হয়েছে কিনা জানি না! অন্তত এই ভেবে হয়তো আমরা স্বস্তিশ্বাস ফেলেছি, যে—যাক! এতদিনে এই অজ্ঞাতকুলশীলার কোনও একটা পরিচয় পাওয়া গেল।

আরেকটি স্মৃতি মনে আছে।

ছেলেবেলায়, তখন বাড়িতে সিনেমাচর্চা নিষিদ্ধ—আমাদের বাড়ির একতলায় আমার এক অসমবয়সী বন্ধু দুপুরবেলা খড়খড়িবন্ধ মেজানাইন ফ্লোরের ছোট্ট ঘরে আমাকে পুরনো উল্টোরথের পাতায় বেগুনি রঙে ছাপা সুচিত্রা সেনের একটা ছবি দেখিয়েছিল। ছবির তলায় লেখা ছিল

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে

টালিগঞ্জের সুচিত্রা সেন

এখন বুঝতে পারি, আমার কাছে যেটা ছিল গ্ল্যামারাস নায়িকার ছবি, আমার বন্ধুর কাছে সেটা প্রথম যৌবনের সদ্য আবিষ্কৃত রহস্যের সুড়ঙ্গপথ।

মোনালিসা, বনলতা—এরা কেউ তথাকথিত প্রাতঃস্মরণীয় পুরাণকন্যা নয়।

তবু এরা অমর, কারণ এদের স্রষ্টারা এদের এক অনন্ত যৌবনের অভিশাপ দিয়েছেন।

যৌবনের রহস্য যেহেতু পাল্টায়, মানুষ থেকে মানুষে, যুগে যুগান্তরে—এই দুই কাঙ্ক্ষিতা তাদের স্রষ্টার এই আলোকিত অভিসম্পাত নিয়ে হয়তো প্যারডিপীড়িত হতে হতেও ক্রমে সংস্কৃতির ইতিহাসের করুণ আইকন হয়েই বেঁচে থাকবেন চিরদিন।

ঠিক যেমন মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর শ্মশানপ্রায় কুরুক্ষেত্রেভূমি পিছনে ফেলে বান্ধবহীন হস্তিনাকে পরিত্যাগ করে মহাপ্রস্থানপথে পা ফেলেছিলেন নগ্নপদ প্রবীণা পাঞ্চালী, তেমন করেই যেন বনলতা

সেনও পার হয়ে যাবে মানবসভ্যতার বন্ধুর উপত্যকা।

প্রতিটি সন্ধ্যায় সব পাখিরা যতদিন ঘরে ফিরবে, বহতা থাকবে পৃথিবীর সব নদী, সন্ধ্যা নামার আগে বনলতাও আঁচড়ে নেবে আদিম অন্ধকার কেশরাশি।

তখনও, হয়তো একজন, প্রতিদিন এসে বসবে সেই পাখিনীড় চোখের সামনে।

জানবে যে এই নির্বান্ধব পৃথিবীতে কেউ একজন অন্তত এখনও পরম নির্ভরশীল আশ্রয়দাত্রীর মতো জানতে চাইবে—এতদিন কোথায় ছিলেন?

১৯ আগস্ট, ২০০৭

একগলা কাজের মধ্যে ডুবে আছি বম্বেতে।

'দ্য লাস্ট লিয়র' শেষ হয়ে আসছে—

সামনেই টরোন্টোতে প্রিমিয়ার। মানে, এই লেখা যেদিন ছেপে বেরোবে, সেদিন।

তারই মধ্যে ফার্স্ট পার্সন লেখার তাগাদা আসছে ঘনঘন।

এবারের সংখ্যা—বন্দিনী।

শব্দটা শুনলেই মনে পড়ে রানিপিসির কথা।

রানিপিসি—বাবার তিন ছোটবোনের মধ্যে মেজো। ছোটবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল। সেইসময়ে দেশভাগ। ভিটেমাটি উপড়ে আমার উথালপাথাল। হয়তো, চিকিৎসা হয়নি ঠিকমতো। তারপর থেকেই মানসিক রোগী।

সোদপুরের বাড়ির দালানের একপাশে দরমার বেড়ার আড়ালে ছিল রানিপিসির ঘর।

মাঝে মাঝে দরমার চিলতেখানেক ফাঁক হলে দেখতে পেতাম মেঝেতে উবু হয়ে বসে কানা উঁচু থালা থেকে দুধমুড়ি খাচ্ছে রানিপিসি। ছাঁটা চুল, ঝলমলে সেমিজ।

রানিপিসি মারা গেল, আমি তখন বেশ ছোট। দরমার ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হয়ে গেল সোদপুরের বাড়িতে।

আমার জীবনের আরেক বন্দিনী—অশোকবনে সীতা।

অমনি যেন দেখতে পাই মোটা মোটা চেড়িদের মাঝখানে বসে আছে ফুটফুটে একটা মেয়ে।

আহা রে রাজকুমারী! কোথায় চান করে, কোথায় কাপড় ছাড়ে, কে বেঁধে দেয় চুল?

মাঝে মাঝে দুপুরের রোদে ঘুমে চোখ লেগে আসে। মাথা ঢলে পড়ে অশোকগাছের গায়ে—অশোকের ডাল যেন চামর হয়ে রুজুরুজু বাতাস করে রাজকুমারীর মুখে, আগলে রাখে ঝামরে আসা রোদ। কিংবা শিশিরভেজা ভোরে, গাছের বেদীতে ঘুমিয়ে পড়ে রাঘবপ্রিয়া— বেদির

কোণে ছড়িয়ে পড়ে চাঁচর চুলের বিছানা, আর সেই বিছানায় টুপটুপ করে ঝরে পড়ে অশোকের মঞ্জরী। বিকেলের রোদ যখন কোমল হয়ে আসে, সোনার পাত ভাঁজ হয়ে হয়ে যায় সিংহল সমুদ্র বুকে, তখন হয়তো বা গান।

ঠিক যেমনটি গেয়েছিল জেলের ভিতর জাঁতা পিষতে পিষতে বিমল রায়ের 'বন্দিনী' ছবির মেয়েটি।

এতসব সাতপাঁচ ভাবছি বসে বম্বের রাস্তায়। মিক্সিং স্টুডিও যাওয়ার পথে। গাড়িতে বসে। ট্রাফিক জ্যামে আটকে।

বাইরে সারসার গাড়ি। অটোরিকশার ভিড়। ট্র্যাফিক সিগনালে প্রচুর ফেরিওয়ালা।

সকালের কাগজ, দুপুরের কাগজ, টিস্যু কাগজের বাক্স, গাড়ির ঝাড়ন।

সবাই বাচ্চা। দশ-এগারো হবে।

কোমল গাল রোদে শীতে ফুটিফাটা। নাকের নিচে সর্দির নোলক।

তাদেরই মধ্যে একজন বড়। বাচ্চাদের সরিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে গাড়ির জানলায়।

অমনি শশব্যস্ত জানলার কাচ উঠে যায়। তাড়াতাড়ি অটোরিকশার সিটগুলো সিঁটিয়ে যায় ভয়ে।

এদিকে আসবে না তো!

কেউ জানে না সে কোনদিকে যাবে। সেও জানে না সে কোনদিকে যাবে।

দীর্ঘদেহী, বৃষস্কন্ধ, কঠিন আননে কমনীয়তার বিদ্রূপ। দাঁড়িয়ে আছে ট্রাফিক সিগনালে। ত্রাসের মানবমূর্তি।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

সিঁটিয়ে যাওয়া হাঁটুরা স্বস্তিতে সটান হয়। দমবন্ধ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নেমে আসে গাড়ির কাচ। এক এক করে এগিয়ে যাওয়া গাড়িরা পিছন ফিরে দেখে ট্র্যাফিক সিগনালে একপাল শিশুরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘদেহী, কৃষ্ণবর্ণ মানুষ।

রোদের হাওয়ায় উড়ছে তার গোলাপি নাইলন আঁচল। হাতের তালু আড়াল করেছে তীক্ষ্ণ ভুরুর নিচে কাজল-আঁকা চোখ।

হাইওয়েতে, খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে চিরবন্দিনী।

বম্বের বৃহন্নলা।

৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

ঠিক একটা কুড়ি নাগাদ ঝড়টা এল।

আকাশ কালো, শোঁ শোঁ হাওয়া, তারপরেই তুমুল বৃষ্টি। একেবারে অঝোর ধারে। খড়খড়ি বন্ধ জানলার বাইরে বৃষ্টির ধূসর পর্দা। পথঘাট ভাল করে ঠাহর হয় না।

হাতের কাজ শেষ হয়েই এসেছিল পার্বতীর। বউদির বাপের বাড়ির আত্মীয়রা এসেছিল ভাগলপুর থেকে। সবে গতকাল ফেরত গেছে—বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে —অনেক কাচাকুচি জমা হয়েছিল গত ক'দিন ধরে। সেসব করতেই বেলা হয়ে গেল আজ।

ক'দিন হল বাড়িতে ছেলেটার জ্বর।

আজ সকাল থেকে একটু বেড়েছে।

আজ কোথায় একটু সকাল সকাল বেরোতে পারলে ভাল হত, দিন বুঝেই কাচাকাচিগুলো এসে জুটল।

ওপরে কোথায় একটা জানলার পাল্লা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। চানঘর থেকে বউদির গলা এল

—পার্বতী, সিঁড়ির জানলাটা খোলা কিনা দেখো তো!

সাবানের ফেনা মাখা হাত কাপড় মুছতে মুছতে সিঁড়ির মুখটাতে দৌড়োলো পার্বতী।

ছিটকিনি ভাঙা জানলাটা পড়ছে ঠাস ঠাসকরে। আর বৃষ্টির ছাঁটে সিঁড়ির ধাপগুলো যেন সিমেন্টের ঝর্না।

এতকিছু আসছে বাড়িতে, এত খরচা হচ্ছে রোজ! সিঁড়ির জানলার ভাঙা ছিটকিনিটা বদলাবে না কেউ।

আর বন্ধ করার বেলায় অমনি পার্বতী।

জানলার বাইরে শোঁ শোঁ হাওয়া—যেন পরপুরুষের হাত ধরে টানা। কোনওরকমে সেই হাতছানি বাঁচিয়ে যতক্ষণে সিঁড়ির জানলাটা বন্ধ হল, পার্বতী ভিজে একশা।

ভিজে সিঁড়ি বাঁচিয়ে বারান্দার কোণে কাপড় কাচার জায়গায় সবে এসে উবু হয়ে বসেছে, বউদি এসে দাঁড়াল চান সেরে।

—আজ ছেড়ে দাও পার্বতী। এমনিতেই শুকোবে না, এমন বৃষ্টি! বরং সাবানে ভিজিয়ে রাখো, কালকে এসো না হয় ...!

আগে বললেই হত। জোরো ছেলেটাকে ফেলে শুধু শুধু বেলা দেড়টা বেজে গেল।

জ্বরটা বাড়ল না কমল? জ্বর গায়ে ঘুমিয়ে পড়লেই তো হয়েছে, এখন ঘুম থেকে তুলে বার্লি জ্বাল দিয়ে খাওয়াতে গেলেই ঘ্যানঘ্যান করবে।

বাইরে বৃষ্টি ধরার কোনও নামই নেই। তেড়ে এল আবার।

—আসি বউদি।

সদর দরজার ছিটকিনিতে হাত রাখল পার্বতী।

বেরোচ্ছ! একটু দাঁড়িয়ে গেলে পারতে, এই বৃষ্টিতে আবার...

থাক বউদি, চলে যাব যাব'খন।

ছাতাটা যে দিয়ে দেব, তিনটের সময় তো বাবাইয়ের স্কুল-বাস আসবে। তখনও যদি বৃষ্টি না থামে ...

ঠিক আছে, বউদি, আমি পারব।

পাড়ার পথ জনমনিষ্যিহীন। বাদলা হাওয়া ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে যাচ্ছে, পারলে ল্যাম্পপোস্ট গাছ উপড়ে নেয়।

তারই মধ্যে একলা পথ চলে পার্বতী। সামান্য ঘোমটা কি আর পারে এমন বৃষ্টি আটাকাতে? হাওয়ায় মাথার ওপর গোল হয়ে থাকে, যেন চালচিত্তির।

পাশের বাড়ির ভাদুড়ীমশাই খাওয়ার পর দাত খুঁটতে খুঁটতে জানলার বন্ধ খড়খড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সাধারণত মধ্যাহ্নভোজনের পর এইটুকুই তার আয়েসের অবসর। খাবার পর দাঁত খোঁটা, আর পাড়ার টিউকলে ঠিকে ঝি-গুলোর ভিজে গায়ের চান্টুকু।

উথালপাথাল বৃষ্টির মধ্যে চোখ পড়ল দিশেহারা পায়ে ছুটে যাচ্ছে পার্বতী। আপাদমস্তক ভেজা।

সবে তো শ্রাবণের মাঝামাঝি, আশ্বিন এখনও ঢের দেরি। তবু কেন যেন অবান্তর একটা প্রশ্ন মনে এল ভাদুড়ীমশাইয়ের।

মা এবার আসছেন কিসে, নৌকোয় না দোলায়?

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

'একটা কবিতা বলো তো, বাবা!'

ঘরে যেন পিন পড়ল।

এতক্ষণ ধরে যে চৌখশ বাচ্চাটা নানারকম কায়দাকানুন দেখিয়ে, কখনও হৃতিক রোশন, কখনও গোবিন্দা, কখনও বা উগি'র প্রতিযোগী সেজে তার প্রতিভার বর্ণময় নিরন্তর ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছিল গত আধঘণ্টা ধরে, আর ক্রমশ উজ্জ্বল উল্লাসে প্রজ্বলিত হয়ে উঠছিল তার পাশে বসা জননীর গর্বিতা মুখ—সবাই যেন কেমন নিস্তেজ নিষ্প্রভ হয়ে গেল আমার নিরীহ একটা

আব্দারের সামনে।

—যে কবিতা জানো, সেটাই বলো!

ঈষৎ উশখুশ। স্মার্ট পারফর্মার পুত্র দৃষ্টি বিনিময় করে মায়ের সঙ্গে।

—ওগুলো ও আবার ঠিক জানে না...

মায়ের একটা ইতস্তত উত্তর

—না, না যেটা জানে। 'কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি' বা 'হেড অফিসের বড়বাবু'...

—জানিস বাবু?

মায়ের দ্বিধাসংকুল প্রশ্ন পুত্রকে।

সবেগে ঘাড় নাড়ল ক্ষুদ্র হৃতিক রোশন।

এতক্ষণ বুঝতে পারলাম দু'জনকেই বিপদে ফেলেছি আমি। বেচারা এসেছিল অভিনয় করে রাতারাতি 'স্টার' হয়ে যেতে, তাকে যদি এখন 'হেড অফিসের বড়বাবু' বলতে বলি...

'সুকুমার রায়ের নাম শুনেছ?'

নিরুত্তর নঞর্থক ঘাড় নাড়া।

আমি চেষ্টা করি, দেখি না, ওর সঙ্গে ভাব হয় কিনা!

—মানে ফেলুদা যিনি শুনেছেন, সত্যজিৎ রায়, তাঁর বাবা...

একটু পরে বুঝলাম আমার নিজেরও সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ওরও।

—স্কুল যাওয়া, আর টিভি দেখা ছাড়া আর কী কর তুমি?

—সুইমিং, কম্পিউটার।

মা বললেন না পুত্র, নাকি দ্বৈতকণ্ঠে গুলিয়ে গেল!

—আচ্ছা, এসো। আমি খবর দেব'খন।

আমার মা মারা যাওয়ার পর ঋতু বাড়িতে দেখা করতে এল। ঋতু, মানে আমাদের ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সঙ্গে ওর ছোট্ট ছেলেটা।

মার সঙ্গে প্রথম এসেছে একজন অপরিচিতের বাড়িতে।

ঋতু আমার মাকে চিনত, বাড়িতে এসেছে, বহুবার দেখাও হয়েছে দু'জনের।

সে সব দিনের কথাই বলছি আমরা দু'জনে আর ঋতুর ছেলে আমাদের বসবার ঘরটা মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

এক কোণে একটা মার্বেলের পা, কোনও একটা গ্যালারি থেকে কেনা ভাস্কর্যখণ্ড। থাইল্যান্ড থেকে অন্য কয়েকটি কাঠের বুদ্ধ হস্ত। সিমা আর্ট গ্যালারি থেকে একবার কিনেছিলাম প্লাস্টার অফ

প্যারিসের দুখানি হাত। আঙুলগুলো ছড়ানো—বন্ধুরা অনেক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার আগে আমোদ করে সেই দুহাতে, চার আনা পয়সা ভিক্ষে দিয়ে যায়।

কথা বলছিলাম আমি আর ঋতু।

—শোনো

হঠাৎ শিশুকণ্ঠের ডাকে ফিরে তাকালাম।

—তুমি কি ...?

ভয়ে গলা শুকনো হয়ে গিয়েছে বেচারার।

—তুমি কি বাড়িতে লোক এলে তাদের হাত পা কেটে কেটে রেখে দাও?

আহারে বেচারা! ভাবছে কার খপ্পরে এসে পড়ল। সে তো জানে রূপকথার দত্যিদানোরা এমন করেই জব্দ করে ফুলের মতো রাজকুমারকে।

ঋতু বোধহয় একটু লজ্জা পেল। আর আমি হো হো করে হাসলাম।

আর চোখের সামনে নিষ্ঠুর অঙ্গুলিমালের অট্টহাসি দেখে ভয়ের চোটে বাচ্চাটা বলল,

—মা, বাড়ি চলো।

ওরা চলে গেল।

আমি ফিরে এলাম বসবার ঘরে। আলো নেভালাম, পাখা বন্ধ করলাম।

আর স্পষ্ট শুনলাম কুমোরপাড়ার সব কটা গরুর গাড়ির চাকার শব্দ।

যে গরুর গাড়িগুলো হাট শেষে ঘরে ফিরছে।

যাদের কলসি হাড়িতে এখনও টলটল করছে শৈশবের সারল্যের কিছুটা অবশিষ্ট তলানি।

জয় হোক চিরজীবিতের।

১১ নভেম্বর, ২০০৭

মঙ্গলগ্রহে নৃতত্ত্ববিদ!

মজার না কথাটা?

আসলে এই নামের একটা ইংরেজি বই আমার খুব প্রিয়।

An Anthropologist in Mars Oliver Sacks আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক।

ভেতরের যে গল্পটি থেকে বইটি অমন চমৎকার নাম পেয়েছে সেটি অনেকটি এইরকম।

এক মহিলা, তিনি একটা কসাইখানায়, ইংরেজিতে Slaughter house-এ কাজ করেন। ফলে

গরুদের ভাষা নাকি প্রায় তাঁর রপ্ত। সামাজিক মানুষ হিসেবে কেবল একটা জায়গায় তার খামতি—তাঁর কোনও সম্পর্কবোধ নেই।

মানে, কে বাবা, কে মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী—ইত্যাদি স্বাভাবিক মানবসম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণাই নেই।

সেটাই, ধরা যাক, তাঁর ব্যাধি বা বৈশিষ্ট্য।

লেখক যখন তাঁর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান এবং পরিচয় দিয়ে বলেন যে,—আমি মানুষের মনের বিভিন্ন বিচিত্র খামতি, বা অসুবিধের জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করি, তখন ভদ্রমহিলা নাকি লেখককে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাহলে আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? আমার কাছ মানুষের মন বুঝতে আসা, মঙ্গলগ্রহে মানবসভ্যতার সূত্রসন্ধানের মতোই অলীক বা আজগুবি।

সেখান থেকে বইটির নাম An Anthropologist in Mars।

খেলাধুলো সম্পর্কে আমাকে কথা বলতে বললেই আমি এই বইটার, এই মহিলার উদাহরণ দিই।

ক্রিকেট সম্পর্কে আমি একটা কথাই জানি। যে, এগারোজন মিলে ক্রিকেট খেলেন।

না, ভুল বললাম, আরেকটা কথাও জানি। সৌরভের কথা। ওকে চিনি বলে বেশ একটা অহঙ্কারও হয়।

একবার দিল্লিতে শর্মিলা ঠাকুরের বাড়িতে ছিলাম কয়েকদিন। একদিন বিকেলে রিঙ্কুদি জিম-এ গেলেন বেশ ঘণ্টা দুয়েক-এর জন্য। বাড়িতে ছিলাম আমি আর টাইগার, মানে আপনাদের পতৌদি।

ওই দু'ঘণ্টার মতো বিভীষিকায় আমি কোনওদিন কাটাইনি। টাইগার ফিল্ম সম্পর্কে কিচ্ছু জানেন না, জানতে চানও না।

আর আমি ক্রিকেট সম্পর্কে তথৈবচ।

তার কয়েকদিন আগেই করণ থাপারের শো-তে এসে কপিলদেব কেঁদে ফেলেছিলেন।

টেনেটুনে তাঁর মানবিকতা-অমানবিকতা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। ব্যস!

দু'জনে মিলে গোমড়ামুখে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল দেখতে লাগলাম।

রিঙ্কুদি ফিরে এসে বললেন—কী ব্যাপার! তোমরা ঝগড়া করেছ, নাকি?

তাই খেলা নিয়ে কিছু বলতে হলে আমি ওই একটা কথাই বলি—An Anthropologist in Mars।

অবশ্য মানবসম্পর্কবোধহীনতা নিয়ে এমন একটা অভূতপূর্ব বই আর লেখা যাবে কিনা জানি না।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ।

বিশেষ করে নন্দীগ্রামের পর।

২ ডিসেম্বর, ২০০৭

টালা পার্কের কাছে একটা পুরনো জীর্ণ বাড়ি। তার ছাদের ঘরে একটি ছেলে থাকে। বাপ মা মরা। চাল চুলো নেই। ছেলে পড়িয়ে রোজগার। বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়ে ওঠে না সময়মতো।

শিক দেওয়া জানলায় ময়লাটে ফোকরওয়ালা হাফ পর্দা। বিছানায় বইয়ের স্তূপ। তোশকে কালির দাগ। অনবধানের চিহ্ন।

বইয়ের ভেতর শুকিয়ে যাওয়া ফার্ন-এর পাতা। মনের ভেতর জমা হয় অক্ষর, বাক্য, রচনা—কোনও এক উপন্যাসের সম্ভাবনা।

পাশেই রেল লাইন। ভসভস ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেন যায়। ছাদের আকাশ কালো হয়ে ওঠে ধোঁয়ায়। রেল লাইনে মানিয়ে গুছিয়ে বাস করে রাস্তায় শূকর পরিবার। রেল লাইনের বাস্তুজীর্ণ।

কখনও সখনও ট্রেন এসে চাপা দিয়ে যায় অসাবধানী শূকরীকে, একটা তীক্ষ্ণ তীব্র আওয়াজ ওঠে। আবার থেমে যায়।

নিজের নিয়মে, নিজের ছন্দে ট্রেনের আওয়াজে ঘুম ভাঙে, দিন বাড়ে, রাত নামে সেই জীর্ণ বাড়ির বাসিন্দাদের ওপর।

আর, মাঝে মাঝে ছাদের ঘর থেকে ভেসে আসে বাঁশির আওয়াজ। পাশের বাড়ির মেয়েটিকে উন্মনা করে দেয়। সে জানে, জানলায় এসে দাঁড়াতে নেই, তবু সে দাঁড়ায়। জানলার গরাদের পাশে এসে দাঁড়ায় সেই চিরবন্দিনী—যেন এই বাঁশিই মুক্তি দেবে তাকে।

হায় রে বাঁশি! তার সত্যিই যদি অত ক্ষমতা থাকত।

ভীরু বাঁশিওয়ালা সাবধানে লুকিয়ে ভেজিয়ে দেয় জানলার পাল্লা।

তারপর বাঁশি আর বাঁশিওয়ালার কথা শোনে না। সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় গলির, পাড়ার, রেল লাইনের সমস্ত গ্লানি।

বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে যায় এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

এই বুঝি প্রথম সত্যজিতের ছবিতে ধরা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'অপুর সংসার'-এর অপুর

কলকাতার পাড়াটুকু কেমন করে যেন হয়ে উঠল কিনু গোয়ালার গলি।

বাংলা ছবিতে পা রাখলেন এক নতুন তরুণ যুবা। বাঙালির মনে নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে নতুন কনে—শর্মিলা ঠাকুর।

উত্তর কলকাতার সেই ছোট্ট গলিটায় যে ঘোড়ার গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন—বড় করুণ, বড় দীন বৈভবের মধ্যে দিয়ে বরণ করেছিল এই যুগল প্রতিমাকে, সে যেন আজও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বাঙালি মনে।

সেদিনের সেই জুটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ। পুরনো সেই ঘোড়ার গাড়িটা কখন যে রাজরথ হয়ে গিয়েছিল, কখন ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে গিয়েছিল এই অনিন্দ্য বৈকুণ্ঠ যাত্রায়—কে জানে?

অনুমান করতে পারি, কোথাও থেকে দু'হাত মেলে আশীর্বাদ করছিলেন বিভূতিভূষণ, হয়তো বা রবীন্দ্রনাথও।

অপু অপর্ণার সেই অনাড়ম্বর বধূবরণে নহবৎ বসিয়েছিলেন রবিশংকর।

আর বরের মনকেমন করা বাঁশিটিতে ফুঁ দিয়েছিলেন অলোকনাথ দে।

আজ এই সব ক'টা কথাই হয়তো বা বাঙালির ইতিহাস। কিংবা পুরাণ।

যে পুরাণ 'অপুর সংসার'-এর প্রথমার্ধ জুড়ে, আজন্মের প্রেমের দেবতা বৃন্দাবনের রাখালরাজার আদলে অপুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বাঁশি। বুঝি সদ্য বিয়ের পিঁড়েতে পা দিতে যাওয়া রূপসী রাজনন্দিনীকে টেনে এনে কলকাতার এই জীর্ণ গলির ছাতের ঘরের অধিষ্ঠাত্রী করে দেবে বলে।

আর দ্বিতীয় ভাগে অপর্ণাবিরহিতা অপু যখন পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এক উন্মাদ বিহ্বলতায়, তখন যেন কোথায়, কোনও অবচেতনে তার সঙ্গে ছায়ার মতো চলেন সতীবিরহিতা ভোলা মহেশ্বর।

'অপরাজিত'য় কালপুরুষের ছায়া দেখে বড় অভিভূত হয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক।

ভারতীয় কৃষ্টি উদ্ভূত ইমেজ সৃষ্টির অনন্যতায়।

'অপুর সংসার'—এর বাঁশি আমার কাছে তেমনই এক অপ্রতিম ঐশ্বর্য। যে সুরে, কিংবা নীরবতার, আঙুলের ফাঁকে কিংবা অবহেলার নির্বাসনে—তৈরি করে নবপ্রতিমা। গড়ে নতুন নতুন দেবতা, যারা প্রিয় হয়ে থাকেন সারাজীবনের মতো।

কখন বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয়-ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়

সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

ম্যাটিনি শো-এ রাজেশ খান্নার বই।
রাজেশ খান্না, সেই যে, স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুর—তার বই বলে কথা।

দু'বোন সাজতে বসল দুপুর থেকে। কোন শাড়িটায় চাপা রং চিকন দেখায়। কেমন করে চুল বাঁধলে শাড়ি কিংবা সালোয়ার কামিজ—দু'টোই পরা চলে।

সাজগোজ শেষ। এবার বেরতে হবে, ছোট ভাই রিকশা ডেকে আনে।
বাবা বসেছিলেন বারান্দায়,
বাসি খবরের কাগজটার যদি কোনও পাতা বাকি পড়ে থাকে।
নজর পড়ল মেয়েদের দিকে—
—কোথায় চললি রে তোরা?
—সিনেমায়। বললাম তো তোমায় সকালে।
—হ্যাঁ বললি বটে। কী রাজেশ খান্নার বই!
—তবে? জানো তো।
—তা, এত সাজলি কেন রে মা।
—ওমা! সিনেমা যাব সাজব না।
—সিনেমা হলে তো অন্ধকার হয়ে যাবে।
অন্ধকারে রাজেশ খান্না দেখতে পাবে তো।

আবার সেই সাজঘর। আবার ড্রেসিং টেবিল। মা বেরচ্ছে। বাবার সঙ্গে এসপ্ল্যানেড এ দেখা হবে। সেখান থেকে দোকানবাজার করে বাড়ি ফিরতে রাত্তির।

ছোট্ট ছেলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে একমনে মায়ের সাজ দ্যাখে।
—ওটা কী করছ মা?
—পাউডার মাখছি। কেন বাবা?
—পাউডার মাখছ কেন?

—সুন্দর দেখাবে বলে?

—আর ওটা কী?

—আইব্রো পেন্সিল। ভুরু আঁকছি বাবা।

—কেন মা?

—সুন্দর দেখাবে বলে?

—আর এটা?

—লিপস্টিক! লাগালে ঠোঁটটা লাল হয়।

—ঠোঁট লাল হলে কী হয়?

—সুন্দর দেখায়।

মা'র সাজগোজ শেষ। এবার দরজা জানলা বন্ধ করে বেরনোর পালা।

—লক্ষ্মী হয়ে থাকবে কিন্তু। দুষ্টুমি করবে না।

—তোমার হয়ে গিয়েছে মা?

—কী হয়ে গিয়েছে?

—সাজগোজ।

—হ্যাঁ।

—কই, সুন্দর তো দেখাল না!

কয়েকদিন ধরেই কানে আসছিল গুজবটা। আজ হাতেনাতে ধরা পড়েছেন কত্তা। তাই বলি, অফিসে অত আঠা কীসের? আর মেয়েটার-ই বা কী আক্কেল। বাড়িতে বর আছে, বাচ্চা আছে, বেছে বেছে আমার মানুষটাকেই ধরলি।

সন্ধেবেলা থেকে শুরু হয়েছিল। ঠারেঠোরে কথা। রাতে খাবার পর তুমুল হয়ে গেল একচোট।

মাঝরাতে বালিশ হাতে বসার ঘরের মেঝেতে এসে শয্যা। ঘুম আসে না। কিলবিল করে যত দুঃস্বপ্নের মতো কুচিন্তা। বাপের বাড়ি? কে বা আছে? নারী সমিতি—ক'দিনই বা দেখবে? তবে!

অন্ধকারের মধ্যে খুসখাস শব্দ, প্রায় নিঃশব্দ পায়ের আওয়াজ। কে রে?

—আমি মা।

ছোট্ট বালিশটা নিয়ে টলোমলো পায়ে ছেলে এসে বিছানা পাতে মায়ের পাশে। বসার ঘরের মেঝেতে।

—তুই কী করছিস?

—একা একা ঘুমোতে তোমার ভয় করবে মা। চলো, আমরা দু'জনে ঘুমোই।

নায়িকা কি কেবল সিনেমায় জন্মায়?

না, বইয়ের পাতায়।

চারপাশ থেকে ভাবতে শুরু করলে অষ্টনায়িকা কেন, আটশোজন এসে আছড়ে পড়বে কলমের ডগায়

—কই! বললে না তো আমাদের কথা?

বলতে বলতে তো রাত কাবার হয়ে যাবে।

নতুন করে লেখা যাবে মহাকাব্য! আমাদের চটি বই তো কোন ছার!

৯ মার্চ, ২০০৮

হঠাৎ দপ্তরে কয়েকটি ক্রুদ্ধ চিঠি এসে পৌঁছেছে। আমি আমার একটি সাম্প্রতিক 'ফার্স্ট পার্সন'এ 'বাড় খেয়ে ক্ষুদিরাম' কথাটা কেন ব্যবহার করেছি, তাতে উষ্মা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন পাঠক।

তাঁদের মত—এতে ক্ষুদিরাম বসু'র মতো প্রাতঃস্মরণীয় একজন স্বদেশপ্রেমীকে অপমান করা হয়েছে।

হয়তো একটা কপট ক্ষমা চেয়ে নিলে ব্যাপারটা মৃদু ও মার্জনাযোগ্য হয়ে যেত।

আমি ইচ্ছে করেই তার মধ্যে যাচ্ছি না।

আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বনির্বাচিত বাচনভঙ্গি যদি আমার পাঠকদের অপছন্দের, অননুমোদনের হয়ে থাকে; তাহলে তাঁদের সঙ্গে আমার অন্তত সরাসরি কথা বলার একটা জায়গা তৈরি হওয়া উচিত।

পূর্বেও রোববার দপ্তরে আপত্তিসূচক মন্তব্য এসে পৌঁছয়নি, তা নয়।

রোববার অত্যন্ত গণতান্ত্রিক সম্মানের সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেছে যে কোনও রুষ্ট সমালোচনাকে 'লেটার বক্স'-এর অন্তর্গত করতে। সমালোচনাও যে আমাদের কাছে অত্যন্ত স্বাগত, তার আদর যে নিছক প্রশংসার থেকে কোনও অংশে কম নয়—এ কথা 'রোববার'-এ আমরা সবাই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

মনে পড়ছে বনলতা সেন সংখ্যায় যখন চিত্রশিল্পীর দেখা নগ্নিকা অবয়ব ছাপা হয়েছিল, কয়েকজন পাঠক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

রোববার দপ্তরে বেশ কয়েকটি আক্রমণাত্মক চিঠি এসেছিল। 'রোববার' চিঠিগুলোকে সযত্নে প্রকাশ করেছিল মাত্র। কোনও প্রত্যুত্তর দেয়নি।

এই নীরবতা অগ্রাহ্য করার অহঙ্কার নয়। বিপরীত অভিমতকে সম্ভ্রমে গ্রহণ করার নম্রতা।

রোববার-এর এই নিজস্ব সৌজন্য হয়তো বা ভুল সংকেত পাঠিয়েছে কয়েকজন পাঠকের মনে। হয়তো বা তাঁরা ভেবেছেন—তাঁদের এই সমালোচনাগুলো এতই সঠিক ও অভ্রান্ত যে, রোববার স্বাভাবিক নিরুপায় মৌনতায় তার নিজস্ব অনবধানের ভ্রান্তি বা স্বেচ্ছাকৃত রুচিহীন অশ্লীল চর্চাকে অনুতপ্তচিত্তে স্বীকার করে নিচ্ছে।

সঙ্গোপনের ভাষা যখন সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না, তখন কোথাও বোধহয় সম্পাদককে একটা দায়িত্ব নিতে হয়। মুখর হওয়ার।

'বাড় খেয়ে ক্ষুদিরাম' বাক্যাংশটি প্রয়োগ করার সময় আমি ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হইনি যে ক্ষুদিরাম বসু একজন শ্রদ্ধেয় অগ্রজ দেশপ্রেমী।

আদরের জনকে নিয়েই নির্মল ঠাট্টা করা যায়, আপনার জনকেই 'ডাকনাম' দিতে পারে মানুষ। আজ যদি ভালবেসে কাউকে 'দূর পাগল'! ...বলি, আর তাবৎ পাঠক হা হা করে ওঠেন—যে এতে করে দুনিয়ার সমস্ত মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে অপমান করা হল, সে তাঁদের দুর্ভাগ্য।

আমরা রবীন্দ্রনাথকে আদর করে 'দাড়িবুড়ো' বলি, ঋত্বিক ঘটক প্রায় প্রকাশ্যে সত্যজিৎকে 'ঢ্যাঙা' বলে ডাকতেন। আমরা যখন উৎকর্ষের অসাম্য বোঝাতে গিয়ে অত্যন্ত অবলীলায় বলি—'কোথায় নেতাজি, আর কোথায় পিঁয়াজি!'—তখন আমরা যেমন সুভাষচন্দ্র বসু নামক এক বীর বঙ্গসন্তানকে বিদ্রূপ করি না, তেমন পিঁয়াজি নামক তৈলাক্ত সুস্বাদু বৈকালিক আহার্যটিকেও ব্রাত্য বলে নগণ্য করি না।

এটা বাগধারা। পাতি কথায়, 'কথার সবজ।'

পাতি শব্দটি ইচ্ছে করে ব্যবহার করলাম—যাঁর চিঠি লিখতে হয় লিখবেন, আমরা ছাপব। কিন্তু বিনীতভাবে এটাও জানিয়ে দেব যে বাংলাভাষা কেবলমাত্র তৎসম শব্দের সমাহার নয়। সেখানে 'ঘ্যাম' (উৎকৃষ্ট) এবং 'পাতি' (commonplace)—সব বাকভঙ্গিরই সমান সমাদর আছে।

আমরা অধিকাংশ সময়ই কোনও একটা নামের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের দ্যোতনা খুঁজে না পেলে সে নামকে যথেষ্ট কুলীন মনে করি না। ফলে 'লাল্টু' বা 'পল্টু' নাম তেমনভাবে কারুর বৈধ সামাজিক পরিচয় হিসেবে মেনে নিতে পারি না, যেমন হয়তো বা পারি 'ঋতুপর্ণ' বা 'অনিন্দ্য' ইত্যাদি নামগুলিকে। কিছু অপ'প্রচলিত বাক্যাংশকে অসম্মানজনক মনে করাও যেন তেমনই এক উন্নাসিক কৌলীন্যবাতিক।

বাংলাভাষা তার নিজস্ব বেগবতী প্রবাহের মধ্যে বহু শব্দ, বাক্য, উপমাকে সংগ্রহ করে এসেছে নিরন্তর।

সেই সব নিত্যসংযোজন যদি বাঙালির জিহ্বাকে অতিক্রম করে লেখনীতে নেমে আসার সুযোগ না পায় কোনওদিন, তাহলে বাংলাভাষাকে তার বিশুষ্ক, অসার সাংস্কৃতিক অচলায়তনের জাড্য থেকে মুক্ত করে কার সাধ্য!

মনে আছে প্রসেনজিৎকে নিয়ে লেখা আমার কোনও একটা ফার্স্ট পার্সনে আমি একবার উল্লেখ করেছিলাম যে বুম্বা আমাকে 'খিস্তি' সহকারে প্রীতি সম্ভাষণ করে।

একজন পাঠক চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন যে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যদি তাঁর পুত্রসন্তান তাঁকে খিস্তি সহকারে পিতৃসম্বোধন করে, উনি সেটা আটকাবেন কী করে?

আমরা চিঠিটা ছেপেছিলাম মাত্র। কিছু বলিনি। আজ বলছি—যে আমার একটি সপ্তাহান্তের বাক্যাংশের দৃষ্টান্তক্ষমতা যদি তাঁর এত বছরের সন্তানশিক্ষার থেকেও বেশি শক্তিশালী হয়, তবে এই অপারগতার দায়টা তাঁর—রোববার-এর নয়।

আমরা, রোববার-এর কর্মীরা রোববারকে শিল্পসম্মত এবং রুচিকরভাবে পরিবেশন করতে চাই। অবশ্যই আমাদের নিজস্ব রুচি ও বোধ অনুসারে।

'শিল্পসম্মত' কথাটি আলাদা করে ব্যবহার করছি এই জন্য, যে শিল্পীর সামাজিক হওয়ার দায় হয়তো বা কিছু থাকে, কিন্তু politically correct হওয়ার কোনও দায় তার নেই।

যাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন বাক্যবন্ধে 'পাতি', 'খিস্তি', 'বাড় খেয়ে...' প্রতিনিয়ত ব্যবহার করেন, তাঁরাও নিঃসন্দেহে আমাদের আর পাঁচজন শীলিত, মার্জিত, সুভদ্র, মানুষের মতোই সমান সামাজিক।

'আমরা' 'ওরা' করে কী হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে, তা তো স্বচক্ষে দেখলাম সকলে।

মনে মনে হয়তো আশা করেছিলাম—বিগত বঙ্গাব্দের সমস্ত গ্লানি এবং লজ্জার সঙ্গে এই কৌলীন্যের উন্নাসিকতাও আমরা ত্যাগ করতে পারব এই নতুন বছরে। একসঙ্গে সবাই মিলে নিশ্বাস নেব এক উন্মুক্ত পৃথিবীতে।

আমরা যেন ভুলে না যাই, কেবল নন্দীগ্রামের সুখ-দুঃখকে অপাংক্তেয় করে দেওয়াটাই ঔদ্ধত্য নয়। নিত্যদিনের পথেঘাটের বহমান সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যেও একধরনের উচ্চবর্ণজাত ফ্যাসিজিম আছে।

নতুন বছরের প্রথম রোববারে সে কথা একবার সবাই মিলে ভেবে দেখি না কেন!

দেখবেন আপনার ১৪১৫ কেমন সুন্দর, সুসমঞ্জস হয়।

থুড়ি, 'ফাটাফাটি' হয়!

শুভ নববর্ষ।

২০ এপ্রিল, ২০০৮

কে বিখ্যাত করল আষাঢ়কে?
কালিদাস? 'ঢ'য় শূন্য ঢ়? না, ডাকব্যাক?

শহরে বসে আমরা টেরই পাই না আষাঢ় মাসের আনাগোনা।

আমাদের এখানে সে Monsoon। তার official arrival date ক্রমে ক্রমে পিছচ্ছে।

আগে যখন স্কুলে পড়তাম, তখনও ছিল দিনভর তুমুল বৃষ্টি। মাগনায় পাওয়া 'রেইনি ডে'র ছুটি।

খিচুড়ি, বেগুনি, মাছভাজা—আর ভূতের গল্প। বৃষ্টির আশায় হাপিত্যেশ বসে থাকলে বছরকার ভূতের গল্প শোনার গা ছমছমটাও হয়তো কখন পার হয়ে যাবে, জানতেই পারব না। তাই, আজ রোববার-এ, ভূতের গল্পের আসর।

বাংলাভাষার কত যে সোনার দোয়াত কলম কত ভূতকে অমর করেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

তারই ঐতিহ্য বেয়ে আজকের যুগের নবীন, প্রবীণরা ভূতের গল্প লিখলেন আমাদের 'আষাঢ়ে' সংখ্যায়।

দেখা যাক। ছেলেবেলার সেই 'রেইনি ডে'র স্মৃতি ফের ফিরে আসে কি না!

'বাইরে কেবল জলের শব্দ, ঝুপ ঝুপ ঝুপ
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদেয় এল বান।'

৬ জুলাই, ২০০৮

সুদর্শনা তার রাজাকে দেখেছিল নানা বেশে।

নববর্ষের দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, সে ভেবেছিল তার রাজার রূপটি বুঝি সেই রকম।

আবার, শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন তার রাজা শেফালিবনের পথ দিয়ে চলে, গলায় কুন্দফুলের মালা, বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, মাথায় হাল্কা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ...।

না দেখা রাজাকে মনে মনে দেখার অনেক চেহারা আছে।

কেবল সুদর্শনার নয়, সকলেরই।

ছোটবেলায় যখন প্রথম 'রাজা' কথাটা লিখতে শিখি, তখনই যেন বর্গীয়-জ ল্যাজের মতো করে

রাজার ইয়া বড় পাঁকানো গোঁফটা মনের মধ্যে কেমন যেন গা ছমছমে ভাব ধরায়।

রাজবেশ কথাটা আরেকটু বড় হয়ে শুনেছি। কাশীতে। বিশ্বনাথের মন্দিরে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথের আরতির আগে লিঙ্গমূর্তিকে সাজানো হয় প্রায় আধঘণ্টা ধরে। সেটাকে ওরা বলে রাজবেশ। মূর্তির গা থেকে খুলে নেওয়া হয় রুপোর পাকানো সাপ। তারপর চন্দনের প্রলেপ পড়ে মূর্তির গায়ে। ফুলে ফুলে কেমন চমৎকার করে সাজানো হয় বিশ্বনাথ মূর্তি। মনেই হয় না, এটা কর্দমপিচ্ছিল এই মন্দিরের কয়েকশো বছরের অনুশাসন। ভাবলেও যেন দোষ হয় না যে, বুঝিবা রবীন্দ্রনাথ কোনওকালে এই মন্দিরে এসে ঠিক করে দিয়েছিলেন বিশ্বনাথের সন্ধেবেলার সাজ। তাঁর রাজবেশ।

তারপর, মন্দিরের সব আলো নিভিয়ে দেয়। কেবল মশাল আর কয়েক ডজন বিশাল পঞ্চপ্রদীপের আলোয় যখন 'শিবঃ, শঙ্করঃ' বলে একসাথে গাইতে থাকে সহস্র গলা, তখন যেন মনে হয় উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' দেখছি। বা বালাসরস্বতীর নাচ। কিংবা কুমার গন্ধর্বর আসরে বসে আছি। এত চমৎকার পারফরমেন্স জীবনে দুটো একটা মাত্র দেখবারই সুযোগ মেলে সৌভাগ্যে।

ছোটবেলায় রাজবেশ বলতে বুঝতাম এয়ার ইন্ডিয়ার মহারাজার চেহারা।

লাল পোশাক, মাথায় বিরাট পাগড়ি, পাকানো গোঁফ।

তারপর আরেকটু বড় হতে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' দেখার পর মনের মধ্যে একটা গূঢ় সন্দেহ হয়েছিল যে, পাগড়ির তলায় হয়তো বা মহারাজা'র মাথায় বিশাল একটা টাক—শুণ্ডী রাজার মতো।

এক সত্যিকারের মহারাজার পোশাক দেখেছি অনেক বড়বেলায়।

'চোখের বালি'র শুটিং করতে গিয়ে। সেই কাশীতেই।

রামনগরের রাজবাড়ির ঘাটে আমাদের শুটিং হয়েছিল।

রাজা, বছর পঁয়তাল্লিশের এক মধ্যবয়সি ছোটখাটো মানুষ, ভোরবেলা আমাদের ঘাট দেখাতে নিয়ে গেলেন নিজে।

কুয়াশার চাদরে ঢাকা ভোরের গঙ্গা। ঠান্ডা হাওয়া বইছে শনশন।

আর ছাইরঙা একটা সোয়েটার, টেরিকটের প্যান্ট, আর কানে মাথায় মাফলার জড়িয়ে আমাদের আগে আগে চলেছেন কাশীনরেশ। না জানলে তাঁকে 'নতুনদা' বলেও ভুল হতে পারে।

রাজার নতুন জামার গল্প তো আমরা সবাই পড়েছি। এখন আবার রোজ নতুন করে পড়ি। খবরের কাগজ খুললেই।

দেশসুদ্ধ সবাই বলে 'রাজা, তুমি ন্যাংটো।' তবুও, রাজার চৈতন্য হয় না।

আর আরেক রাজা থাকেন, আমাদের পাড়ায়। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড-এ। রাজা নন। সুলতান। টিপু সুলতানের বংশধর। সাইকেল রিকশা চালিয়ে রোজগার করেন।

ছেড়া লুঙ্গি, কালচিটে গেঞ্জি।

একবার দিদাইর সেলাই মেশিন নিয়ে এসেছিলাম গল্‌ফ ক্লাব রোড থেকে তাঁর রিকশায়।

বাড়িতে এসে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,

—বাবু, একটু বকশিস দেবেন না?

তারপর চলে গিয়েছিলেন ক্লান্ত পায়ে প্যাডেল করতে করতে আমাদের পাড়ার মোড় ছাড়িয়ে।

আর, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর পুরো চলে যাওয়াটা দেখেছিলাম।

সত্যি! কাকে বলে রাজদর্শন!

২৭ জুলাই, ২০০৮

এবারের বিষয়—সাপ।

অনিন্দ্য স্বভাবসিদ্ধ পান-পারদর্শিতায় নাম রাখল সাপ্তা সাপান্ত।

শ্রাবণ মাসের শেষে মনসা পুজো। কলকাতায় বসে আমরা সে আর টের পাই কোথায়? তাই ভাবলাম—শহরের জন্য মনসা পুজোর ভারটা এবছর নয় রোববারই নিল।

মনসামঙ্গল নিয়ে আমার ছবি করার ইচ্ছে বহুদিনের।

এখন আরও যেন চারপাশে মনসামঙ্গলের নতুন নতুন আখ্যান রোজ ঘটতে দেখি। ছবি করিয়ের আষাঢ়ে মন তো, বাস্তব চরিত্ররা দোষ নেবেন না।

মনসা বললেই ইদানীং আমার মনে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। উচ্চবর্গ কংগ্রেস একদিন যখন তৃণমূল মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন নতুন এক লৌকিক আইকন।

কালীঘাটের অত্যন্ত সাধারণ পরিবেশ থেকে সাধারণ মানুষদের প্রতিনিধি করে তুলে এনেছিলেন এক সাধারণ মেয়েকে।

ঠিক যেমন কোনও একদিন এক অলৌকিক পন্থায় বুঝিবা কোনও বেদের মেয়ে পদ্মা, নাকি মনসা, ঠাঁই করে নিয়েছিলেন হিন্দু দেবমণ্ডলীতে।

অনার্য দেবতা শিবের উপাসক চাঁদ সদাগর মেনে নেননি এই নতুন অন্ত্যজ দেবীকে। যিনি আসলে অনার্যদেরই প্রতীক হতে পারতেন।

বিরোধটা কি তবে ছিল সমতার? অনার্য দেবতার সঙ্গে নিম্নবর্গ দেবীর?

ক্ষমতার ত্রিশক্তিতে বসে অনার্য শিব আর্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উপাসক চাঁদ সদাগরের দম্ভ ছিল পৌরুষের, বৈভবের। সে উচ্চবর্গের অহঙ্কার। সে অহঙ্কার মেনে নেয়নি এক অন্ত্যজাকে।

ঠিক যেমন আজকের দিনের সওদাগররা, তাঁরাই যদি ধরি শিল্পপতি, এক সাধারণের প্রতিভূকে বড়লোকের ভগবান করতে চলেছেন—মেনে নিতে পারেন না এই সাধারণের শক্তিকে।

মনসাকে চাঁদ ডাকতেন 'কানি' বলে। কোনও এক অঙ্গহানির চিহ্নই তাঁর পরিচয়। মমতাকে যেমন আমরা মনে রেখেছি তাঁর মাথার ফেট্টির বিজ্ঞাপনের জন্য।

আর বিশদ করে তুলনা করছি না।

কে জানে, বাংলার শ্রাবণ হয়তো আরও ঘোলাটে হয়ে উঠবে।

১৭ আগস্ট, ২০০৮

ঘাটের অর্ধেকটা অবধি জল এসে ছলাৎ ছলাৎ করে লাগছে, ডুবে গেছে চবুতরা, দরমার ছাতা, সিঁড়ির উঁচুনীচু গোলকধাঁধা, গঙ্গা এসে নিজের খেয়ালে চুরি করে নিয়েছে সবকটা ঘাট।

আমাদের বেনারসের স্থানীয় সঞ্চালক রবিশংকর ত্রিপাঠী কলকাতাতেই সাবধান করেছিলেন আমায়, যে এখন আসবেন বলছেন বেনারসে, ঘাট তো সব পানির মধ্যে চলে গেছে।

তবু অন্যান্য সকলের কাজের যা অবস্থা, ডেটের যা টানাটানি, তাতে করে মনে হ'ল এটাই বাঞ্ছনীয়। এই সময়টাই ঘুরে আসি বেনারসে।

শ্রাবণ মাসের বেনারস সত্যিই অন্যরকম। আমি আগে কখনও এই সময় বেনারস যাইনি—ফলে কোনও ধারণাই ছিল না। একে তো শ্রাবণ মাস মানে শিবঠাকুরের জন্মমাস, ফলে কী তারকেশ্বরে বা কী কাশীতে বাঁক নিয়ে ভক্তরা সমস্বরে 'হর হর ব্যোম ব্যোম' করে চলেছে।

এখন যেমন তারকেশ্বরে যাওয়ার ইউনিফর্ম হয়েছে গেরুয়া স্যান্ডো গেঞ্জি এবং হাফপ্যান্ট, বেনারসেও দেখলাম ঠিক তাই। জানি না এই গৈরিক তরঙ্গ উত্তরপ্রদেশের এই শহরটা থেকে আমাদের বাংলার শ্রাবণ মাসের তীর্থপ্রবাহকে কখন গিয়ে ভাসিয়ে দিল কি না! সেই চলা, সেই উচ্চকিত কোরাস, কেবল 'ভোলে বাবা পার করেগা'র জায়গায় 'হর হর ব্যোম ব্যোম', এতদিন ভেবেও দেখিনি, আজ কাশীতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হ'ল এতদিন ধরে বাংলার বুকে শ্রাবণ মাসের তীর্থযাত্রীর দল, যারা কলকাতা থেকেই হোক, আর শ্যাওড়াফুলি, হিন্দিতে 'ভোলে বাবা পার করেগা' বলে বাঁকে করে জল ঢালতে যায় কেন? সমতুল্য একটা বাংলা কথা কি খুঁজে পাওয়া যায়নি?

এবং সেটা ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল এই যে চিরাচরিত ভাবে পুজোর সময় কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনার সময়ই হোক আর বিসর্জনের দিনই হোক, লরিতে প্রতিমা তোলবার এবং

নামাবার যে সমবেত আকুতি 'বলো দুর্গা মাঈকি', আমাদের সেই চিরাচরিত শারদপ্রতিমা বঙ্গজননী কলকাতার বুকে আজীবন ধরে পুজো প্যান্ডেলে 'দুর্গামাঈ' বলে সম্বোধিত হয়ে এসেছেন, আর আমরা তার কোনও প্রতিকার-পরিবর্তন 'কিছু' করার কথাই ভাবিনি।

আমার ছেলেবেলায় বিশ্বকর্মা পুজোর সময় একবার বাড়ির কাছের একটা ছোট্ট গ্যারাজে ঠাকুর আনা হচ্ছে। সবাই মিলে টেম্পো থেকে ঠাকুর নামাতে নামাতে চেঁচাচ্ছে— 'বলো, বলো, বিশ্বকর্মা মাঈকি জয়'।

আর, মা বারান্দায় বসে হেসে কুটিপাটি খাচ্ছে। আমি সরস কৌতূহলে মাকে জিজ্ঞেস করলাম— হাসছ কেন মা?

মা কেবল বলল ওটা মাঈ নয়। জি হবে।

আর ছোট্ট আমি ভাবলাম হয়তো বা এটা দেবদেবীদের সম্বোধন করবার কোনও আনুষ্ঠানিক রীতি। সংস্কৃত ভাষার মতোই।

অনুমান করতে পারি, বাবু সংস্কৃতির সময় বিসর্জনের দিন দেউড়ির হিন্দুস্থানি কাহার বা বেহারাদের কাঁধে চেপে ভাসান যেতেন জগজ্জননী, আর তারা তাদের নিজেদের ভাষাতেই জয়ধ্বনি দিতে দিতে গঙ্গায় বিদায় দিয়ে আসত বৎসরান্তের দেবীকে। হয়তো বা, সেই থেকেই প্রতিমাকে ঠাঁইনাড়া করবার উদ্দাম সংলাপে তাদের ভাষাটুকুই থেকে গিয়েছে।

'ভোলে বাবা পার করেগা'র রহস্যটা অধরাই রয়ে গেল। সেদিন সকালটা কাজ কম। দুপুর থেকে জেঁকে বসবে নানারকম ছোটাছুটি, ব্যস্ততা।

সবাই মিলে সারনাথ রওনা দিলাম। ধেমুক স্তূপ, মূলগন্ধকুটি বিহার আর জাদুঘরটা দেখে আসব বলে।

মূলগন্ধকুটি বিহারে বিশাল স্বর্ণকায় বুদ্ধমূর্তি। নিঃশব্দে মন্দির দেখছেন পর্যটকরা। আমরা ছাড়া দেশি মানুষ নেই বললেই চলে। বেশিরভাগই সিংহলি বা জাপানি।

একদিকে একটা ছোট্ট শ্বেতাঙ্গ দল, গাইডের ভাষা শুনে বুঝলাম তাঁরা ফরাসি। দেওয়ালচিত্রে বুদ্ধের জীবনী। রানির শ্বেতহস্তী স্বপ্নদর্শন থেকে মহানির্বাণ অবধি—নানা ছবি।

হঠাৎ চোখ পড়ল সামনের ফলকের সাবধানবাণীর ওপর।

'অনুগ্রহপূর্বক বিনা অনুমতিতে দেয়ালগাত্র স্পর্শ করিবেন না।'

কালো-কাঠের ফলকের ওপর স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লেখা।

তাড়াতাড়ি বাকি ফলকগুলো পড়লাম। কুল্লে, বেশি নেই ওই টুকু মন্দির চত্বর জুড়ে। ন'টার মতন। তার মধ্যে তিনটে ইংরিজি ভাষায়। তিনটে হিন্দিতে, আর তিনটে বাংলায়।

উত্তরপ্রদেশের এক বৌদ্ধ-তীর্থস্থানে ফরাসি, জাপানি, সিংহলি তীর্থযাত্রীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতীয় আর সব ভাষাকে পেছনে ফেলে, এমনকী রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে প্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বঙ্গসন্তান হওয়ার আনন্দটা আঞ্চলিক শোনালেও বড্ড নির্মল ঠেকল।

আমরা জানি, কাশীতে বাঙালি সমাগম বেশি ছিল চিরকালই। সেটাই কি কারণ? থাক না অনুমান অবধিই। সব সময়ে ইতিহাসকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন আছে? সারনাথের মন্দিরের কাষ্ঠফলকে সেই প্রাচীন বাংলায় লেখা সাবধানবাণীর সামনে কোনও দক্ষিণ ভারতীয় বালকের কৌতূহলী অনুধাবন আর ছোটবেলার বিশ্বকর্মাকে পাড়ার ছেলের 'মাঈকি' বলবার অনাবিল অপরাধ কেমন যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেল।

বাইরে তখন গম্ভীর প্রার্থনা ঘণ্টা। আর শ্রাবণ মাসের মেঘলা আকাশের গায়ে নিথর দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন হাজার বছর আগের মাটির ইটের গড়া সেই অবিনশ্বর স্থাপত্য।

যার সামনে শক-হুণ-দল-পাঠান-মোগল, ফরাসি, তিব্বতি, জাপানি, সিংহলি, প্রাচীন বাংলা আর হিন্দুস্থানি ভোজপুরি বর্ষার মেঘের মতোই ক্ষণস্থায়ী ও চিরন্তন।

২৪ আগস্ট, ২০০৮

বিরহ শব্দটাও অভিমান কথাটার মতো ক্রমে ক্রমে কেমন করে যেন মেয়েদের একচেটিয়া হয়ে গিয়েছে।

কেবলমাত্র নবআষাঢ়ের জলভারাক্রান্ত মেঘ দেখে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত সেই বিরহী যক্ষ ছাড়া চট করে অন্য কোনওপুরুষের কথা যেন আমাদের মনেই পড়ে না, বিরহ যাঁকে এসে প্রায় দার্জিলিংয়ের মেঘের মতো চারপাশ থেকে যখন তখন ঘিরে ফেলতে পারে।

ছিলেন বটে এক রামচন্দ্র। তবে জানকীর বিরহ তাঁর কাছে যতটা না প্রণয়ীর বিচ্ছেদবেদনা, তার থেকে বোধকরি অনেক বেশি ক্ষাত্রবীর্যের অপমান! কী, আমি থাকতে কিনা আমার বউ'কে রাবণব্যাটা তুলে নিয়ে গেল। ব্যাটাচ্ছেলের আস্পর্দা দ্যাখো। ব্যাস্, শুরু হয়ে গেল লঙ্কাকাণ্ড।

বিরহ সত্যিই নারী পুরুষে পক্ষপাত করে না। তবে, বিরহের আধার বললেই আমরা যে এককথায় নারী বুঝি, বোধহয় তার অন্য কতগুলো সামাজিক কারণ আছে।

পুরুষ তার সব কষ্ট আত্মস্থ করে নেয়, সে প্রকাশ্যে অশ্রুমোচন করে না, এবং সর্বোপরি নারী তাকে পরিত্যাগ করে গেলে তার জন্য শোকানুতাপ পুরুষের মানায় না, তাতে নারীর একচেটিয়া অধিকার। আর পুরুষকবিরা নারীর জন্য বিরহের ঋতু বাছেন, বিরহের পোশাক নির্বাচন করে দেন, এমনকী জানালার পাশে বিরহিণী কেমনটি করে বসবেন—হাঁটুতে চিবুক, না জানালার গরাদ ছুঁয়ে যাবে তার অন্যমনস্ক অঙ্গুলিস্পর্শ, সমস্তটাই যেন কোনওচিত্রকরের ঠিক করে দেওয়া ভঙ্গি, যাতে দৃশ্যত বিরহের একটা চিত্র ধরা পড়ে এবং বন্দি হয়ে থাকে মানুষের মনে।

পার্বতীবিরহিতা শিব এবং পার্বতীবিরহিতা দেবদাস—দু'জনেই বিরহযন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছেন নেশার সাহচর্যে। তাই আজও সুরাসক্তিই যেন 'হাফসোল' খাওয়া বাঙালি বা ভারতীয় পুরুষের সাময়িক রোল মডেল।

তারই মধ্যে কোথায় যেন ভেসে এসেছিল নদীবক্ষের বাতাস, শরতের রৌদ্রে ঝলমল করে উঠেছিল চারপাশের প্রকৃতি, আর তারই মধ্যে একাকী বজরায় বসেছিলেন এক জমিদারনন্দন। না, আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি না। বলছি, তাঁর 'ঘরে বাইরের' এক চাজিক নায়িকার কথা।

নিখিলেশ আমার কাছে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ট্র্যাজিক নায়িকা। রবীন্দ্রপরবর্তী এবং পরবর্তী যুগেও চিরকাল নারীরা অপেক্ষা করেছেন অনন্ত অধৈর্য প্রতীক্ষায়। কখন তাঁর দয়িত অন্য প্রণয়িনীকে ভুলে ক্ষণেকের জন্যও ফিরে আসবেন তাঁর বিরহিণীর কাছে, এসে দাঁড়াবেন সেই প্রতীক্ষার দোরগোড়ায়।

তাঁর প্রেমিক বা স্বামী তাঁর কাছে থাকবেন, না তাঁকে ত্যাগ করে যাবেন অন্য কোনও প্রণয়াস্পদের কাছে—সে ব্যাপারে তাঁদের কোনওইচ্ছে, অনিচ্ছে, মতামতের বিন্দুমাত্র ভূমিকা ছিল না। অনন্ত নিখিলের মাঝে তাঁর স্ত্রী'কে স্থাপন করে, সেখান থেকে তাঁর নিজের নিখিলেশ'কে খুঁজে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নিখিলেশ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

তার দু'টোই ফল হতে পারত। স্বয়ং বরের বরমাল্য অথবা অনন্ত বিরহ। এবং এই দু'টোর মধ্যে যদি বেছে নিতে হয়, আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ পরেরটাই বেছে নেবেন।

কারণ বহুদিন ধরে, বহু যতন করে, ঘর ধুয়ে, মুছে, পবিত্র করে রাখা, সেই শুভক্ষণের জন্য 'যদি আমায় পড়ে তাহার মনে'—এই বিরহ তো কেবলমাত্র বিচ্ছেদযাতনা নয়, এ এক তপশ্চরণও বটে।

এই অবধি লিখে যখন বড় আত্মপ্রসাদ হল, ভাবলুম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র না হয়েও বেশ কেমন তত্ত্ব খাড়া করে ফেললুম, হঠাৎ শুনি সিঁড়িতে ঠুকঠুক আওয়াজ।

রোজদিনকার সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাবা বাড়ি ফিরছেন, সাবধানে, সিঁড়িতে লাঠি ঠুকে ঠুকে। আমার ঘরের বাইরে একটা ছোট করিডোর। সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে সিঁড়ির মাথায় একটু হাঁপাল বাবা।

দরজার ফাঁক দিয়ে আমার ঘরের ভেতরটায় তাকাল, আমি ডাকলাম,

—আসবে?

—না, থাক।

বলে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে আস্তে আস্তে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। যেখানে ঘরে

ঢকে সুইচবোর্ডে আঙুল রেখে আলো জ্বালালেই মা'র ছবিগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আর সেই উজ্জ্বলতার মধ্যে মা আর বাবা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে হয়তো বা হিসেব করবে কার বিরহ বেশি?

বাবা'কে ছেড়ে মা'র? না, মা'কে ছেড়ে বাবার?

৩১ আগস্ট, ২০০৮

এবারের মলাট কাহিনির সঙ্গে আমার 'ফার্স্ট পার্সন'-এর কোনও যোগ নেই।

যোগ বলতে আমি সম্পর্ক বলছি না। কভার স্টোরি'র সঙ্গে অসম্পৃক্ত 'ফার্স্ট পার্সন' আমি বহু লিখেছি, রোববার-এর মনোযোগী পাঠকের নিশ্চয় মনেও আছে।

কিন্তু এবারের মলাট কাহিনির বিষয়টাই আমার কাছে ধোঁয়াশা।

আমি নিশ্চিত যে, অনেক পাঠকও সহমত হবেন।

EQ মানে আসলে কী? 'Emotion'কে কোন Quotient দিয়ে কীভাবে মাপব? ঠিক যেমন করে IQ মাপি, তেমন করেই কিনা? এই নবীনতম বিজ্ঞানটির বিবর্তন বা বিকাশ কোনওটাই আমার জানার মধ্যে পড়ে না, এমনকী কৌতূহলের মধ্যেও নয়।

মানুষের মনের আবেগ কেমন করেই বা মাপা যায়, আর কী-বা লাভ হয় তা মেপে—সত্যিই তা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই।

আমার সহকর্মী ভাস্কর এবারের একটা কভার স্টোরি লিখেছে। আমাকে ওর মতো করে বিষয়টা বোঝাল।

ওর যুক্তি হল, যখন বুদ্ধির বিকল্প হিসেবে আবেগকে কাজে লাগিয়ে কোনও আকাঙিক্ষত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব, সেটাই 'ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স'।

পরিষ্কার হল না আমার কাছে।

আবেগকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজে না লাগিয়ে সত্যিই কি কোনও মানুষের কিছুমাত্র করা সম্ভব? কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে?

তবে 'ই কিউ' শব্দটার কি সৃষ্টি হল কেবলমাত্র 'আই কিউ'-এর সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য?

'How They Brought Her Worrior Dead' কবিতাটা ছোটবেলা থেকে আমার বড় প্রিয়। সেই যে যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে বীরের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় বাড়িতে, এবং সেই শবদেহের

সামনে পাষাণস্থবির বসে থাকেন তাঁর তরুণী স্ত্রী। কাঁদেন না, চিৎকার করেন না, মূর্ছিতা হন না। শেষ পর্যন্ত কী যেন ভেবে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা তাঁর শিশুসন্তানকে নিয়ে এসে নামিয়ে দেন তাঁর কোলে। অমনি শ্রাবণের ধারার মতো হু হু করে নেমে আসে সদ্যবিধবা মাতার উদ্‌গত অশ্রু।

জানি না, জীবনকে আদর করে, ভালবেসে যাঁরা বড় হয়েছেন, সুখ-দুঃখ-হাসিকান্না, টুকরো টুকরো পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের কাছে জীবনের এই সম্মানের জায়গাটা বড় জরুরি। সেখানে বুদ্ধি বা আবেগের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। দু'টোই আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে আমাদের নিত্যজীবনকে।

আমার কাছে এখনও পরিষ্কার হল না 'ই কিউ' তবে কী?

মনে হল, আমি যেভাবে দেখতে চাইতে পারতাম, তা হয়তো এই যে—আমাদের স্বাভাবিক আবেগকে বুদ্ধি দিয়ে চালিত করে তা থেকে আমাদের জীবনকে যদি শুভ করা যেত, তাই হয়তো হত 'ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স'।

কারণ, আমাদের আবেগ অনেক সময় অজানিতভাবে অন্যকে দুঃখ দেয়। মাঝে মাঝে, সেই সঙ্গে অসম্মানও করে। বুদ্ধি দুঃখ দেওয়াটা আমরা সবসময় আটকাতে পারি না। কিন্তু বা বিবেচনা যদি সেই আবেগকে অসম্মানের পথ থেকে একটু সরিয়ে আনতে পারে—তা হলে বোধহয় মানুষের Dignity'র জায়গাটা অম্লান থাকে।

একটা কাল্পনিক সংলাপ ভাবা যাক। আসন্ন বিচ্ছেদ-সম্পন্ন দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে। প্রেমিকার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে অন্য জায়গায়। বাবা-মা'র পীড়াপীড়িতে, অপছন্দের পাত্রের সঙ্গে।

প্রেমিকা—সত্যি দ্যাখো, আমি তো এতদিন অপেক্ষা করলাম। এবার আর পারছি না। ওরা বড্ড জোর করছেন।

প্রেমিক— পারছ না মানে? ওঁদের বলো, বুঝিয়ে বলো।

প্রেমিকা—কী বলব? তুমি যদি এর মধ্যে একটু চেষ্টা করতে রোজগার-টোজগার করার, একটু দাঁড়াতে...

প্রেমিক—তার জন্য তো সময় পালিয়ে যায়নি। আর চেষ্টা করিনি কে বলল তোমায়?

প্রেমিকা—সত্যিকারের চেষ্টা করলে তিন বছরেও একটা চাকরি জোটানো যায় না, আমি বিশ্বাস করি না।

প্রেমিক—তুমি না বলতে সম্বন্ধ করা বিয়েতে তুমি বিশ্বাস করো না?

প্রেমিকা—করি না তো?

প্রেমিক—তা হলে?

প্রেমিকা—ধরে নাও ও হবে আমার স্বামী, যেমন হতে হয়। আর তুমি আমার কাছে যেমন

ছিলে, তেমনই থাকবে।

কথোপকথনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

মেয়েটি জানিয়ে দিল যে, তার প্রেমিকের জায়গাটা তার স্বামী এসে নিয়ে নেবে না। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু একবারও মেয়েটি জানতে চাইল না যে তার প্রেমিক সেটা চায় কি না।

একসময় একসঙ্গে একটা জীবন পরিকল্পনা করেছিল দু'জনে। মেয়েটি সেই পরিকল্পনাটা বদল করল কিছুটা। ফলে ছেলেটিরও অধিকার আছে এর প্রেক্ষিতে নিজের পরিকল্পনা বদল করার নিজের আবেগটুকু প্রকাশের সময় সেই সম্মানটুকু দেওয়া হল না এতদিনের প্রেমিককে।

প্রেমিকাটির শেষ সংলাপ কি এমনও হতে পারত? প্রেমিকা—আমার স্বামী আমার স্বামী থাকবে। তাকে আমি তোমার মতো করে ভালবাসতে পারব না কোনওদিন। তুমি যদি চাও, তুমি যা ছিলে তাই থাকবে আমার কাছে। কিন্তু সেটা কি তুমি চাও?

তবে হয়তো আরেকটু যত্ন নেওয়া হত অন্য মানুষটির আবেগের, আরেকটু দায়িত্ব নেওয়া যেত নিজের এতদিনের সম্পর্কের।

এবার তা হলে প্রশ্ন ওঠে—হবু স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির কথোপকথন কী হতে পারে?

এর সত্যিই বোধহয় কোনও শেষ নেই। আর তাই বুদ্ধি আবেগকে না আবেগ বুদ্ধিকে, কে কাকে চালিত করবে—আমার কাছে পরিষ্কার হতে চায় না কিছুতেই।

যাঁরা কিছুটা অন্তত পরিষ্কার করে বুঝেছেন তাঁরাই এবারের প্রচ্ছদ কাহিনির রচয়িতা। আপনাদের মতো আমিও সমান আগ্রহ এবং যাবতীয় সংশয় ও প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের লেখা পড়ব।

HOME THEY BROUGHT HER WARRIOR DEAD

Home they brought her warrior dead:
 She nor swooned, nor uttered cry:
All her maidens, watching, said,
 'She must weep or she will die.'
Then they praised him, soft and low,
 Called him worthy to be loved,
Truest friend and noblest foe;
 Yet she neither spoke nor moved.

Stole a maiden from her place,
 Lightly to the warrior stept,
Took the face-cloth from the face;
 Yet she neither moved nor wept.
Rose a nurse of ninety years,
 Set his child upon her knee-
Like summer tempest came her tears-
 'Sweet my child, I live for thee.'

- Alfred, Lord Tennyson

২ নভেম্বর, ২০০৮

গোড়ার দিকে যখন ছবি করতে শুরু করেছি, গম্ভীর রাত্রের দৃশ্য এলেই আবহে একটা শব্দ বার বার করে ফিরে আসত।

হয় দূরে কোনও একটা গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ, বা উপায়ন্তর না থাকলে রাস্তার কুকুরের ভেউ ভেউ, আর ঝিঁঝির ডাক।

'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'তে মনে আছে সঞ্জীবকুমার এবং শাবানা আজমির একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে দূরে ট্রেনের আওয়াজ, রেবা মুহুরির ঠুংরির টুকরো আর দূরবর্তী পথকুকুরে চিৎকার। পরে জেনেছিলাম, তখন সবে উত্তর ভারতে রেললাইন পাতা হয়েছে এবং ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে, যতদূর মনে আছে কানপুর আর এলাহাবাদের মধ্যে।

সত্যজিতের কাছ থেকে অজান্তে যে অমোঘ শিক্ষাগুলি গ্রহণ করেছি আজীবন এবং একটা সময়ের পর যেগুলো অন্যধারার বাংলা সিনেমায় প্রায় ফর্মুলার মতো অবধারিত হয়ে গিয়েছে— তার মধ্যে নিঃসন্দেহে রাতের রাস্তার কুকুরের ডাকও একটি বিশিষ্ট উপাদান।

মনে আছে 'উনিশে এপ্রিল' যখন তৈরি হচ্ছে, ছবির দ্বিতীয়ার্ধে, যেখানে বহুক্ষণ জুড়ে চলে মা-মেয়ের বোঝাপড়ার এক দীর্ঘরাত্রি, কোনও একটি বিশেষ আবেগঘন নাটকীয় মুহূর্তের জন্য একটি চমৎকার আবহসংগীতের টুকরো রচনা করেছিলেন জ্যোতিষ্ক দাশগুপ্ত, ছবির সংগীত পরিচালক। আর আমি প্রায় অবলীলায় এসে সেই music piece বাতিল সেখানে জুড়ে দিলাম নিঃশব্দ রাতের বুক চিরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ।

বলাই বাহুল্য, জ্যোতিষ্ক তাতে খুব খুশি হয়নি। কেবল ঠাট্টার ছলে বলেছিল

—বাবা! music-এর বদলে কুকুরের ডাক?

আসলে পাড়ার কুকুর। সে তার নাম ভুলুই হোক আর কালুই হোক, তারা যে আসলে আমার একজন পরম প্রতিবেশী—রাত্তিরের অন্ধকার ফুঁড়ে যার গলার আওয়াজ পেলে যে কী গভীর স্বস্তিবোধ, কী অসীম নিরাপত্তার মধ্যে প্রবেশ করি আমি—যেটা মায়ের কাছে মেয়ের, বা, মেয়ের কাছে মায়ের ফিরে আসার থেকে কিছু কম গভীর নয়, এ কথা হয়তো বিশদ করে জ্যোতিষ্ককে বোঝাতে পারিনি আমি।

ছবিটা যখন তৈরি হল, তখন দেখলাম দৃশ্যটা এল এবং চলে গেল, পেছনে দূরে কোথাও সেই প্রতিবেশীর রাতের ডাক ভেসে এল—আবেগ, নাটক বা সঙ্গীতময়তার কোথাও কোনও অভাব হল না।

আসলে আমরা যারা মধ্যবিত্ত পাড়ায়, বহুতল বাড়ির বাইরে বড় হয়েছি, আমরা সবাই জানি যে পাড়ার কুকুর কী।

পাড়ার কুকুর রাত জেগে পাহারা দিয়েছে গোটা নিঝুম পাড়াটাকে। তাদের সমস্বর ডাক শুনলে মাঝরাতেও অনেক খড়খড়ি ফাঁক হয়েছে দুশ্চিন্তায়। পাড়ার কোনও মানুষ রাত করে বাড়ি ফিরলে তারা সমস্বরে কৈফিয়ৎ-এর ঘেউ ঘেউ জানিয়েছে। আবার অচেনা মানুষ অসময়ে পাড়ায় ঢুকলে তারা অননুমোদনের সমবেত স্বরে সজাগ করেছে পাড়াকে। পাড়ার যে কোনও বিয়ে বাড়ির ডাঁই করা খাবারের ওপর প্রথম অধিকার ছিল ওদের। এমনকী বিকেল চারটের রোদে বাড়ির রোয়াকে বসে খবরের কাগজের অসমাপ্ত শব্দজব্দ শেষ করতেন যে বয়স্ক দাদু-দিদারা, তাঁদের বিকেলের চায়ের কাপের পাশে প্লেটের বিস্কুটের আধখানার ভাগীদার ছিল ওই কালু-ভুলুই।

বর্ষাশেষের বিকেলে পাড়ার কুকুরের প্রকাশ্য সঙ্গম কখন যেন আমাদের অজান্তে একদিন শিখিয়ে দিল যে, এটা নিয়ে মাকে প্রশ্ন করতে নেই, মা বিব্রত হয়।

তারপর একদিন অনেকগুলো সদ্যোজাত কুকুরশাবকে ভরে গেছে পাড়া। সবক'টা কোনওদিনই অবশিষ্ট থাকেনি শেষ অবধি।

অনবধানে ট্যাক্সি চাপা পড়লে তাই নিয়ে বিক্ষোভ করেছে পাড়াশুদ্ধু লোক। আর তারপর সন্ধে থেকেই মা-কুকুরের টানা কান্না শুনে ধীরে ধীরে তীব্র বেদনায় জানলা বন্ধ করে দিয়েছেন বাড়ির মহিলারা।

এখন যখন ছবি বানাই দেখি নিয়মগুলো বদলে গিয়েছে।

সকাল মানেই পাখি এবং সন্ধে মানেই ঝিঁঝিঁ আর নাকি শহুরে ছবিতে খাটে না।

পথ-কুকুর আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে শহর জুড়ে। আর যে সব ছেলেমেয়েরা বহুতল পাড়ায় থাকে, তারা নাকি জানেই না রাস্তার কুকুরের ডাকের মানে কী!

বুঝতে পারি, আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। যৌবন যদি অচেনার আনন্দ হয়, বিগত যৌবন তা হলে বুঝি চেনাকে আঁকড়ে বাঁচা।

সেই চেনাগুলো না হয় বেঁচে রইল আমাদের মধ্যেই। নবনীতাদির পাড়ার লালিকে নিয়ে লেখাই হোক, আর আমার ছবির রাতের শব্দর মধ্যেই হোক।

২৩ নভেম্বর, ২০০৮

শুটিং-এর মধ্যে ঘন ঘন আমাদের সম্পাদক মশাইয়ের তাগাদা আসছে।

অনিন্দ্যর এসএমএস—

ঋতুদা, কালকের মধ্যে এডিট না এলে কিন্তু রোববার-এর নৌকোডুবি হবে।

এবারের সংখ্যা ‘ঝলমল’।

রঞ্জনদা একদিন এসে বললেন,

—এই যে এত বড় বড় ঝাঁ চকচকে শপিং মল, এখানে ঢুকলে কেমন একা লাগে না?

আমি অমনি বললাম,

—লিখবে রঞ্জনদা, এটা নিয়ে? লেখো না।

ব্যস্। অমনি এই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনি তৈরি হয়ে গেল।

অনিন্দ্য এসে গুঁইগাঁই করতে লাগল।

—শুধু শপিং মল-ই দেবে? দার্জিলিং-এর মল?

—চমৎকার! দেখা যাক কে লিখতে পারে।

ততক্ষণে আমার মাথায় ভাবনাতরঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগর।

—কেন! তা হলে আমাদের রোজকার ‘মল’-ই বা বাদ যায় কেন?

অনিন্দ্য একটু ইতস্তত করল।

—মল? মানে ‘হাগু’? পড়বে ঋতুদা!

আমার অব্যর্থ উত্তর,

—কেন! পড়বে না কেন? কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে লিখলে পড়ে না? হামলে পড়ে। আর বাঙালির চিরকাল একটা পটি-অবসেশন আছে। ঠিক পড়বে।

বেশ কথা! তিনটে লেখা দিয়ে এবারের মলাট তৈরি।

নামকরণের ব্যাপারে তো অনিন্দ্য অদ্বিতীয়। 'ঝলমল' নামটা যেন টুপ করে দৈববাণীর মতো এসে পড়ল।

লেখা এসে গেল। পাতা তৈরির কাজ চলছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল—আরেকটা মল-ও তো ছিল। তার কথা কি আমরা ভুলেই গেলাম?

নাকি নতুন-নতুন শপিং মল এসে বাঙালির জীবন থেকে সেই মলটাকে তুলে টুপ করে ফেলে দিয়েছে?

এখন মেয়েদের আর পায়ের গয়না পরার সময় কই?

'নুপূর' আর কেউ বলে না, বলে 'পায়েল'।

ভাল! বহতা সময়ের সঙ্গে অলীক লড়াইয়ে আমরা সবাই যেন সারভেনটিস এর ডন কিহোতে।

যাক! পাতা চলে গেছে, আফসোস করে লাভ নেই।

পরের বার সাউথ সিটি মল-এযখন যাব, একটু খেয়াল করে দেখতে হবে।

ওই যে যাঁরা ভিড় করে আসেন, মলের দৈত্যাকার টিভি'তে খেলা দেখেন, একটু ভীতু মা'দের এসকালেটরে শাড়ি সামলে চড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে সালোয়ার কামিজ কন্যা—খুঁজলে হয়তো তাঁদের মধ্যেই দেখতে পাব। বড় বড় গয়নার দোকানের কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে শশী মালিনীর মেয়ে সুধা।

তার ঝমঝম আওয়াজ নেই, তাই চিনতে পারছি না।

১৪ ডিসেম্বর, ২০০৮

কথাটা হল আমাদের এই উৎসব সংখ্যা নিয়ে। কেন উৎসব? কীসের উৎসব? কার উৎসব?

ধরা যাক এখন পৌষমেলা চলছে শান্তিনিকেতনে। নিশ্চয়ই বাঙালির শীতকালীন উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই সময় বোলপুরের ট্রেনে বেজায় ভিড়। থাকার জায়গা অকুলান।

তবু, যারা নিয়ম করে ভালবেসে এই মেলার টানে ছুটে গিয়েছেন বারবার, তাঁরা অনেকেই হয়তো আজ মেনে নেবেন যে, ধীরে ধীরে পৌষমেলা একটা হুজুগে পরিণত হচ্ছে অধিকাংশ বাঙালির কাছেই। প্রায় শান্তিনিকেতনে জমি কিনে বাড়ি করার মতোই।

তা যাক! এখন পৌষমাস। পৌষমাস ফসল কাটার মাস। কৃষকের উৎসবের মাস। পিঠে-পুলির মাস।

তা সেই পিঠে-পুলি তো এখন লুপ্ত হতে হতে শৌখিন এথনিক রেস্তোরাঁর মেনুর তালিকায় আগুনঝরা দামে নিয়মিত ছ্যাঁকা মারছে বাঙালির জিভে।

আর কৃষকের উৎসব কথাটা আজকের পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় না বলাই ভাল—যদি না আমরা বছরশেষের একটা কমিক রিলিফ চাই।

আর তা হলে পড়ে রইল ইংরেজি বছরশেষের আলোঝলমল নৈশ পার্টি।

দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কি না জানি না, ঘটনাটা হল এই যে—এই পার্টির সময়কাল এখন আর আগের মতো ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ'র পার্ক স্ট্রিটটুকু নয়—সারা বছর কলকাতা শহরের নানা ছোট বড় হোটেলের ডিসকো থেক জুড়ে পার্টি চলছে, চলবে বছরশেষের খানাপিনা, আনন্দ ফুর্তি—কেবল অন্য একটা পার্টি। তবে উৎসবটা কীসের?

আর এই হানাহানির সময়ে মুম্বইয়ের নিধনযজ্ঞের ভয়ালতার পর এখনও কী উৎসব নিয়ে বিশেষ সংখ্যা হতে পারে! তারপরও 'রোববার' সাপ্তাহিকটাকে রসিক পাঠক যথেষ্ট সংবেদনশীল ভাববেন তো?

এ কথা বললে তো আর চলবে না যে আমাদের বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে, তখনও মুম্বইতে এসব কিছু হয়নি। সেটা দপ্তরি অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয়।

তা হলে?

অন্ধকার যদি হয় আলোর বিপরীত আর আলোই যদি হয় উৎসবের অন্য মানে—তবে কেন উৎসবের দিনের থেকে অধিকাংশ সময়ই উৎসবরাত্রি এত প্রিয় আমাদের?

সে কি চারপাশের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারকে আমরা আমাদের আলো দিয়ে হারিয়ে দিই বলে?

কে জানে!

ছোটবেলায় মনে আছে প্রথম যখন লোডশেডিং শুরু হল কলকাতা শহরে, সেটাই ছিল আমাদের সবথেকে বড় গোপন উৎসব।

আলো নিভে যাওয়ামাত্র সারা পাড়া অন্ধকার, ছোটবেলা থেকে মোটা কাচের চশমা বলে লণ্ঠন বা ল্যাম্পের আলোতে পড়তে বসার তাগাদা ছিল না—অতএব একটা পড়ে পাওয়া সান্ধ্যছুটি।

আমাদের দক্ষিণমুখো গোল বারান্দায় এসে বসতাম বাড়ির সবাই। সামনের পুকুরটা থেকে হাওয়া আসত হু হু করে। আর সারা পাড়ার এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ভেসে আসত নানা বেসুরো গলার স্বতঃস্ফূর্ত গান। বুঝতেও পারতাম না কে গাইছে!

কেবলমাত্র বাথরুমের কলের আওয়াজ চাপা দিয়ে যারা গলা ছেড়ে এসেছে এতদিন, হঠাৎ আসা অন্ধকার কেমন করে যেন তাদের সব সংশয়, লজ্জা হরণ করে নিত, সেই কৃষ্ণ 'অরূপতা'র

সামনে সুরেলা বা বেসুরো সবাই কিশোরকুমার সবাই লতা মঙ্গেশকর।

উৎসব কথাটা বললে আজও আমার সেই অন্ধকারের উৎসবটা প্রথম মনে পড়ে। যে উৎসব কত মানুষকে মুক্তি দিয়েছে তাদের দৈনন্দিনতার গ্লানি থেকে, তাদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বিনোদন সৃষ্টি করার ক্ষমতা।

আরেকটা ঘটনা বলি।

আমাদের সামনের পুকুরটায় ডুবে আত্মহত্যা করেছিল একটি মেয়ে।

খবরটা ছড়ানোমাত্র আশেপাশের পাড়া থেকে কেমন দলে দলে মানুষজন আসতে লাগল কখন তার মৃতশরীর ভেসে উঠবে, সেটা দেখবে বলে। পরদিন বিকেলবেলা, ইস্কুল থেকে ফিরেছি, দেখি পুকুরধারে থিকথিক করছে লোক। আশেপাশের পাড়ার নানা মানুষ। তার মধ্যে দোকানে বাজারে কোনও আবছা দেখা মাসিমাও আছেন—বিকেলবেলা তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে পিঠে পাউডার টাউডার মেখে, মুখে পানটি গুঁজে তারা ভাল জায়গা দেখে পুকুরধারে ঠায় বসে গিয়েছেন সেই দুপুর তিনটে দেখে—যেন টেস্ট ম্যাচের ফাইনাল খেলা। চা-ওয়ালা জুটে গিয়েছে কোত্থেকে একটা, লজেন্সওয়ালা লজেন্স বেচছে। পুরোটাই সেই উৎসবপ্রাঙ্গণকে ঘিরে।

আমার অবশ্য 'ঠাকুর' দেখা হল না। মা ভীষণ বকেঝকে তড়িঘড়ি ভেতরে পাঠিয়ে দিল, বারান্দাতেও দাঁড়াতে দিল না। ধমক দিয়ে বলল,

—এটা দেখার কী আছে?

শুনলে হয়তো এখন একটু নিষ্ঠুর শোনাবে, কিন্তু আজ বুঝতে পারি সেদিনের সেই শহরপ্রান্তের মধ্যবিত্ত পাড়ায়, প্রাক্-টেলিভিশন যুগে, ডেইলি সোপ বিবর্জিত গৃহস্থ জীবনে হয়তো কোনও একটা চাঞ্চল্যকর খবরই ছিল সবথেকে বড় বিনোদন। উৎসবের পাদানি।

উৎসব মানুষের বেঁচে থাকা। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নিত্যদিনের চোখ মেলা। ঠিক যেন 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' 'অপুর সংসার'-এর অপু। এক একটা মৃত শরীর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে খুঁজে নিচ্ছে নিজের পথ।

সেই যে মহাভারতের স্ত্রী পর্ব-এ পড়েছিলাম সেই মানুষটির কথা, যে গভীর অরণ্যে পত্রাবৃত কূপের মধ্যে হঠাৎ ফসকে পড়ে গিয়ে গুল্মজালে আটকে গিয়েছিল। নীচে কূপের ভেতর ফণা তুলেছে বিষধর সর্প, ওপরে উন্মত্ত হস্তী পা দাপাচ্ছে, আর একটা ইঁদুর ধীরে ধীরে দাঁত দিয়ে গুল্মজাল কাটছে, এমন সময় হঠাৎ কোনও একটা গাছের মৌচাক থেকে টুপ টুপ করে মধু ঝরতে লাগল। আর, সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোলে পাঁজাকোলা করা অবস্থায় সেই মানুষটি জিভটা বাড়িয়ে দিল সেই ঝরে পড়া মধুর দিকে।

হ্যাঁ ভাল কথা, আমি 'উৎসব' বলে একটা ছবি করেছিলাম, অনিন্দ্য তার চিত্রনাট্যটা ছাপিয়ে দিলেই পারত।

আমাকে আর আমার অহর্নিশি শুটিং-এর মধ্যে থেকে সময় বার করে 'ফার্স্ট পার্সন' লিখতে হত না।

ভাল থাকবেন। আনন্দেও।

২১ ডিসেম্বর, ২০০৮

বর্ণপরিচয় : এক

আমার প্রথম ছবি 'হীরের আংটি'র প্রযোজক ছিল সরকারি একটি সংস্থা—দ্য চিলড্রেনস ফিল্মস্ সোসাইটি।

মুম্বই থেকে মুকেশ আগরওয়াল এলেন কলকাতায়। ছবির কার্যনির্বাহী প্রযোজক হিসেবে। আমার সঙ্গে দশঘরা যাবেন। সেখানকার একটি বাড়িতে আমাদের শুটিং করার কথা।

দশঘরা তারকেশ্বরের কাছে। আর আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর আগে রাস্তাঘাট এত ভালও ছিল না।

ভাড়া করা একটা ধ্যাড়ধেড়ে অ্যাম্বাসাডারে চেপে (তখনকার দিনে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সেগুলোই ভাড়া খাটত—এবং তাতে চেপেই শিল্পী থেকে কলাকুশলী সবাই সোনামুখ করে যাতায়াত করত) সকাল সকাল আমি আর মুকেশ রওয়ানা দিলাম দশঘরার উদ্দেশে। সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা তো কম করে লাগবেই। সঙ্গে গল্পের বই নিয়েছিলাম। তারপর মনে হল পাশে একজন সবে পরিচিত মানুষকে বসিয়ে রেখে সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকাটা ঠিক হবে না।

তখনও আমি বহাল তবিয়তে বিজ্ঞাপনে চাকরি করি। ফলে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রির ভেতরকার গল্প আমার সব অজানা। মুকেশের সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন—তাঁর বিপুল উৎসাহ কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কে কেমন টাকা পায়, তাই নিয়ে। অবশ্য কয়েক বছর আগে অবধি আমি অনেক সিনেমা জগতের বাইরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি যে, তাঁদের দু'টো জিনিসই জানবার—১. নায়িকারা সত্যি সত্যিই সুন্দরী কি না, আর ২. নায়করা কে কত টাকা পান। সেই বয়সে প্রথম ছবি করতে আসার আগের বুক ধুকপুক সময়টায় এই আলোচনাটা শুরু হলে আমার শুনতে খুব খারাপ লাগত বলছি না, তবে কি না এই আলোচনাটায় যেহেতু আমার ভূমিকা বড় সীমিত তাই মনে হল এমন কিছু একটা বিষয় নিয়ে কথা হোক, যেখানে আমারও কিছু বলার থাকতে পারে। তা হলে আমাকে আর গোমড়া মুখ করে বইয়ের আড়ালে মুখ গুঁজে সময় কাটিয়ে দিতে হয় না। আর বম্বে থেকে আসা নতুন অভ্যাগতদের হাই তোলার ফাঁকে ফাঁকে বিরস মুখ

করে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে হয় না।

বাস্তবিক, জানলার বাইরে তাকিয়েই মাথায় বুদ্ধিটা খুলে গেল। হাইওয়ে পার হয়ে মাঝে মাঝেই জনবসতি। বাজার, হাট, দোকান। দোকানের সাইনবোর্ড, দেওয়াল লিখন ইত্যাদি। সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

মুকেশের দিকে তাকিয়ে বললাম,

—মুকেশ, বাংলা শিখবে?'

মুকেশ তো হতবাক।

জানলার বাইরে ছুটে চলে যাচ্ছে বর্ণমালা। নানা বর্ণের, নানা আকারের, নানা আয়তনের।

সে দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম,

একবার ট্রাই করে দেখ না। খুব শক্ত নয় কিন্তু।

মুকেশ আদতে উত্তর ভারতের লোক। দেবনাগরী হরফের সঙ্গে বেশ ভালরকম পরিচয় আছে। ফলে বাংলা হরফগুলো চিনতে বেশি সময় লাগল না।

'চ' বর্গটাতেই আমি দেখেছি হিন্দিভাষীরা একটু থমকায়। মুকেশেরও তাই হল।

এবং পরের ঘণ্টা দেড়েক বেশ মজা করেই কেটে গেল পথপ্রান্তের আদর্শলিপি পড়তে পড়তে। মুকেশ দেখলাম বেশ তাড়াতাড়িই শিখল। আমি তো চমৎকৃত।

শুধু একটা জিনিসই করিনি। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মাইলস্টোন পড়ে ইংরেজি সংখ্যা শেখার গল্পটা মুকেশকে আর বলিনি।

মুকেশ এবার মৌলিক বর্ণ ছেড়ে যুক্তাক্ষরে ঢুকে পড়েছে—অবলীলায় না হলেও একটু আধটু কষ্ট করে চালিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ মুকেশের একটা প্রশ্নে একটু থমকালাম,

—ইয়ে দুসরি নম্বর গলি-কা মতলব ক্যায়া?

আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। মুকেশ জানলা দিয়ে অসহায়ভাবে সবক'টা সাইনবোর্ড দেখাচ্ছে। আর আমি শশব্যস্ত হয়ে দু-নম্বর গলি খুঁজছি।

হঠাৎ চোখে পড়ল পার হয়ে যাওয়া দোকানের সাইনবোর্ড।

দোকানের নাম, জায়গার নাম। এবং তার তলায় জেলার নাম—হুগলি।

হ-য় 'হ্রস্ব উ'টাকে মুকেশ অবলীলায় দেবনাগরী হরফের দুই ধরে নিয়ে 'দুসরি নম্বর গলি' খুঁজছে।

অনেকগুলো হাসি থাকে যেটা সেই মুহূর্তে কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না

পরিস্থিতিক্রমে, আবার একা একা হাসতেও বড় কষ্ট হয়।

ফলে মুম্বই থেকে আসা আমার কার্যনির্বাহী প্রযোজক এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা দেখল হাসতে হাসতে বিষম খাচ্ছে তাদের হবু পরিচালক এবং তারা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে 'পানি, পানি' বলে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করছে।

বর্ণপরিচয় : দুই

পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে চিঙ্কুর আলাপ হয়েছিল ইউল-এর সঙ্গে।

ইউল জার্মান একটি ছেলে—পারিবারিক নামটা এখন আর মনে নেই।

রোগা, তেঢেঙ্গা লম্বা, সোনালি চুল, কোটরাগত চোখমুখ নিয়ে ইউল এসে পৌঁছল আমাদের ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়িতে।

চিঙ্কু এক একবার পাহাড়ে যেত, আর অনিবার্যভাবে সঙ্গে নিয়ে ফিরত নানা জাতির নানা সঙ্গী।

ইউল এমনিতে শান্ত, দিব্যি ভাল ছেলের মতো চানটান করে খাবার টেবিলে বসে ডাল-ভাত-শুক্তো খেত। নিজের মনে কলকাতা ঘুরে বেড়াত। ছবি তুলত প্রাণভরে। আর দিনের শেষে চিঙ্কু আর ইউল ঘরের দরজা ভেজিয়ে বসলে মনে হত ঘরের ভেতরে উনুন ধরানো হয়েছে। কীসের ধোঁয়া? সিগারেট না অন্য কিছু—না বলাই ভাল।

এহেন ইউলের একদিন সাধ হল বাংলা শিখবে। কেবল কথা কওয়া বাংলা নয়, বাংলা লেখা রীতিমতো। আমি অমনি চিরতরের ভাঙাকুলো—ইউলের বাংলা মাস্টার হয়ে গেলাম রাতারাতি।

মা'র তো আবার ঘরছাড়া ছেলে দেখলেই মায়া।

গোড়ায় একটু আপত্তি করেছিলাম, এমন ধমক খেলাম,

—একটু বাংলাই তো শিখতে চেয়েছে ছেলেটা। টাকা তো ধার চায়নি। কী মহাভারত অশুদ্ধটা হবে একটু সময় দিলে?

অতএব ইউল খাতাকলম নিয়ে বাংলা লেখা শুরু করল। আমি তাকে বোঝালাম 'শাক'। শাক মানে

—ওই যে, সবুজ সবুজ সেদিন খেলে, ওটা হল শাক। কী করে শাক লেখে? তালব্য শ-য়ে আকার। ক।

ইউল বোধহয় ছবি আঁকতে পারত। বাংলা হরফ শিখতে ওর সময় লাগল না। বাংলা হরফগুলো ওর কেঠো জার্মান আঙুলে পড়ে এতটুকু লাবণ্যও হারাল না।

ইউল দিনেদুপুরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মা পইপই করে বলে দিল,

—ওকে 'দই' লিখতে শিখিয়ে দে তো। দরকার হলে, রাস্তাঘাটে খিদে পেলে, হাবিজাবি কিছু

খাওয়ার দরকার নেই। দই কিনে খাবে তখন।

দই লেখা শেখানো হল। দই এনে চাখানোও হল। অপূর্ব যোগাযোগ। ইউল এখন 'দই' লিখতে পারে। দুপুরে খিদে পেলে নিতান্ত ছাপোষা মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়েও 'দই' কথাটা লিখে দিলে মালিক এক খুরি এগিয়ে দেন।

সেই ইউল হঠাৎ একদিন লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল,

—তুমি আমায় 'দই'-এর অন্য নাম শেখাওনি কেন?

আমি অবাক হলাম,

—অন্য নাম আবার কী?

—আছে। দই-এর আরও নাম আছে।

—কি 'দধি'?

ইউল মাথা নাড়ল। সর্বনাশ! তবে কি ও 'জলযোগের পয়োধি' খেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাবাক্যটা পড়ে এল নাকি? ভয়ে ভয়ে বললাম,

—পয়োধি?

ধ্যুৎ।

—তবে?

সবজান্তার একটা হাসি মুখের কোটর ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ল। ইউল বলল,

—ওইদ।

আমি বললাম,

—মানে?

ইউল বলল,

—এসো লিখে দেখাই। দোকানের সাইনবোর্ডে সন্দেশের পাশে লেখা ছিল। আমি কী জিগ্যেস করতে একটা ভাঁড় এনে দিল।

—'হ্যাঁ তো কী! কী লেখা ছিল সাইনবোর্ডে?

—ওইদ। ওই যে 'ৈ' লিখতে শিখিয়েছিলে মনে আছে? আগে একটা 'ৈ' লেখা, তারপর 'দ', ওইদ হল না!

আমি জোরে হাঁক দিলাম,

—মা, তোমার ধলো ছেলের কাণ্ড শুনে যাও।

ইউল যখন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল জার্মানিতে, তখন আমি অফিসের কাজে বম্বেতে। ফিরে

এসে দেখলাম ইউল নেই। আমার জন্য একটা চিরকুট রেখে গেছে।

দু'টো শব্দ—টা টা।

দু'টো ট-এর টিকি এঁকেছে দু'দিকে।

ফলে কোন 'ট'টা যে কোন অন্য 'ট'টাকে ছেড়ে যাচ্ছে, স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই।

ইউল চলে গেল।

দু'দিকে দু'টো টিকি-আঁটা 'ট'য় টা টা লিখে।

খুঁজলে হয়তো চিরকুটটা পাব আজও কোথাও। ওই যে বাঙালি মধ্যবিত্ত দোষ, একটা কুটো কাগজও সাধারণত বুকে ধরে ফেলে দিতে পারি না।

খুঁজে পেলে ইউলের মুখটা ঝাপসা মনে পড়বে হয়তো।

কিন্তু স্পষ্ট করে দেখতে যাকে পাব সে বাংলা ভাষা।

সে আসছে, না যাচ্ছে—জানি না।

একুশে ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা।

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

এক

মরুপথ বেয়ে সুদূর গান্ধার থেকে হস্তিনায় এসেছিলেন সুবল রাজকুমারী।

হস্তিনা স্বয়ংবরে অংশগ্রহণ করতেন না সচরাচর। কেবল পৃথা আর দ্রৌপদী আলাদা। আর অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকার জন্য যাননি কোনও বরমাল্যপ্রার্থী, ভীষ্ম গিয়ে তাঁদের হরণ করে এনেছিলেন ভ্রাতৃবধূ করবেন বলে।

সেই সুদূর কান্দাহার পার হয়ে তপ্ত, দগ্ধ, দুর্লঙ্ঘ্য মরুপথ বেয়ে শ্বশুরবাড়ি আসছেন গান্ধারী। কে জানে সেই অসহ্য খরতাপ থেকে নিজের বিশালাক্ষী দু'টি বাঁচাবেন বলে বেঁধে গিয়েছিলেন কি না কোনও আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড! নাকি মরুপথের দিবাকর অনবরত অকরুণ কৃপাবর্ষণ করে গিয়েছিলেন এই নববধূর দু'টি চোখে?

হস্তিনাতে এসে পৌঁছলেন রাজকুমারী। শুনলেন কৌরবকুমার জন্মান্ধ। মহাভারতকার বলেন, পাতিব্রত্যের দারুণ অভিমানে দু'টি চোখ আজন্মের মতো বেঁধে ফেলেছিলেন গান্ধারী। অন্ধ স্বামীর অন্ধসম স্ত্রী।

তারপর হস্তিনার অন্তঃপুরে সেই রাজদম্পতির অন্ধকার মিলন কেমন হয়েছিল, আমরা জানি না। পরে, রবীন্দ্রনাথ পড়ে অনুমান করতে পারি, অনেকটা কি রাজা আর সুদর্শনার মতো?'

যাক, সে কথা।

যুধিষ্ঠিরের জন্ম দুর্যোধনের আগে।

আর কৌরব অন্তঃপুরে রাজমাতার অধিকার নিয়ে অদৃশ্য লড়াই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল গান্ধারীর পট্টিবাঁধা চোখের সামনে।

সুদূর গান্ধার থেকে হস্তিনায় আসা সেই তাম্রাঙ্গী নৃপকন্যা ধীরে ধীরে কৌরবরাজ অন্তঃপুরের অন্তরালবাসিনী হয়ে গেলেন।

এক

পুজোর সময় পাড়ায় আমাদের অনেক দিদিরা থাকত। পাড়ার দিদিরা। তাদের নানা নাম, নানা গড়ন। নানা রঙের শাড়ি।

পুজোর দিন সকালবেলা মণ্ডপ জুড়ে যেন রঙিন প্রজাপতির মতো তাদের মেলা। কেউ ফল কুটছে, কেউ ফুল বাছছে, কেউ চন্দন বাটছে।

সদ্য স্নান করা খোলা চুলে নানারকম শ্যাম্পুর সুবাস। মনে হত, পুরুতমশাই না এলেও হয়তো পুজো হবে, এই পাড়ার দিদিদের ছাড়া—দুর্গাপুজো অসম্ভব।

তারপর সন্ধেবেলা পাড়ার ফাংশনে সামনের দিকের চেয়ারগুলো সেই দিদিদের দখলে। সন্ধেবেলা তাদের পরনে রঙবেরঙের রেশম শাড়ি। কারুর বা আবার জরিপাড়। মাথায় বাহারি ফিতে, চোখে কাজল।

তারপর আরেকটা দুগ্গাপজো আসত, বা আরেকটা।

রঙিন প্রজাপতির মতো পাড়ার দিদিদের বিয়ের বয়সগুলো দশ হাতের মুঠোয় করে চলে যেতেন মা দুগ্গা।

আর, সেই দিদিরা সকালবেলার শ্যাম্পু করা চুল খুলে, পাটভাঙা শাড়ি পরে আর মায়ের পায়ের কাছে বসে ফল কুটত না। সেখানে তখন জুটত অন্য মেয়েরা।

সন্ধেবেলা পাড়ার পুজোর ফাংশনে কোনও কণ্ঠীগায়িকা যখন 'তখন তোমার একুশ বছর বোধহয়' গাইছে স্টেজে দাঁড়িয়ে, অকস্মাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছি, হয়তো পিছনের সারির কোনও চেয়ারে, বা দূরে নিজের বাড়ির বারান্দার অন্ধকার অন্তরালে দাঁড়িয়ে, দূর থেকে গায়ে উৎসবের

আলোটুকু মেখে নিচ্ছে সেই প্রজাপতিগুলো। শরতের ক্ষণিকের লাবণ্য ধীরে ধীরে যাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুয়াশামাখা হেমন্তের চষা মাঠের অন্ধকারের দিকে।

আলোর উৎসব দুর্গাপুজো কেমন করে যেন অন্তরালের উৎসব হয়ে গেছে।

৫ এপ্রিল, ২০০৯

এক

সাউথ পয়েন্ট স্কুল আমার আজীবনের শিক্ষায়তন হলে কী হবে, সেখানকার অনেক রথী-মহারথী শিক্ষককেই আমি তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করিনি।

কমলকুমার মজুমদার বহুদিন অবধি আমাদের 'ক্র্যাফটস স্যর' ছিলেন। উদয়শংকর তাঁর অন্তিম দিনগুলোয় আমাদের বালিগঞ্জ প্রেসের স্কুলবাড়িতে বসে বসে ছন্দনৃত্য শিখিয়েছেন।

উৎপল, দত্ত রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়ের কিংবদন্তি আমরা শুনে এসেছি কেবল—চাক্ষুষ দেখিনি।

আমরা দেখেছি গীতা আন্টিকে। গীতা ঘটক—আমার পরমপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী। তখন সেই শিশুবেলায় জানতাম না তাঁর পরিচয়।

কেবল জাঁদরেল একজন শিক্ষিকা বলে একটু সমীহ করতাম তাঁকে।

গীতা আন্টির একটা অদ্ভুত সরল লাবণ্য ছিল। ইস্কুল ছুটির পর দেখতাম, টকটকে কমলা লিপস্টিক আঁকা ঠোঁট দিয়ে গোল করে আইসক্রিম খাচ্ছেন—আর আইসক্রিমের জমাট ক্রিম গলে গলে মিশে যাচ্ছে কমলা ঠোঁটরং-এ।

পরে সদ্য বড় হওয়া কিশোরীদের ঠোঁটের রং বাঁচিয়ে যখন এক-আধটা আইসক্রিম খেতে দেখেছি পুজোর প্যান্ডেলে, আমার তক্ষুনি গীতা আন্টির মুখখানা মনে পড়ে গিয়েছে।

গীতা আন্টির সঙ্গে আমাদের নিয়মিত দেখা হত ইস্কুলের প্রার্থনাসভায়। সাউথ পয়েন্ট চিরকালই গোরুর গোয়াল বলে বিখ্যাত। ফলে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে আসার পর খুব যে একটা সমবেত স্কুল প্রেয়ার হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অত ছেলেমেয়ে একসঙ্গে দাঁড়াবার জায়গাই ছিল না।

ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স-এর বাড়িটা তখনও এমন ঝাঁ চকচকে ইস্কুল বিল্ডিং হয়ে ওঠেনি। একতলা, ছড়ানো একটা বাংলো বাড়ির আদলে তৈরি একটা ইস্কুলবাড়ি। ঢালু ছাদের অফিসঘর, আর বাগান ঘিরে চারপাশটায় অ্যাসবেস্টস ছাদ দেওয়া ক্লাসরুম।

ফ্যান চলত ঘটঘট করে, ঘুঘু ডাকত আশপাশের গাছ থেকে—গরমে যে খুব কষ্ট হত মনে পড়ে না। কেবল বৃষ্টিতে মাঝের মাঠটুকু জুড়ে বিরাট জল জমত। আর, আমরা ইস্কুল অফিসঘরে বইখাতা, ব্যাগ জুতো জমা রেখে বৃষ্টির জমা জলের অস্থায়ী চৌবাচ্চায় হুটোপুটি করতাম।

ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স-এর বাড়িতে আমি বেশিদিন পড়িনি। ততদিনে আমাদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি তৈরি হতে শুরু করেছে।

কয়েকদিনের ওই স্বল্পাবাসই আমার মনে বেশ একটা মধুর স্মৃতিছায়ার মতো পার হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

সকালবেলা স্কুলের বড় মাঠে সবাইকে দাঁড়াতে হত প্রার্থনা-গানের জন্য। ছোট-বড়, উঁচু-নিচুর হিসেব ছিল একটা—সেটা ক্লাস মনিটররা জানত। তারাই এসে দেখত জামা ঠিক আছে কি না, বেল্ট নিপুণভাবে লাগানো কি না, পকেট ছিঁড়ে গিয়েছে কি না আগের দিনের দস্যিপনায়, আর ছিঁড়ে ফেললেও সেটা নিখুঁতভাবে সেলাই হয়েছে কি না, প্যান্টে কোনও ধুলোময়লার দাগ নেই তো। মোটামুটি নতুন দিনের জন্য ছিমছাম, ফিটফাট তৈরি তো আমরা?

তারপরে শুরু হত গান। গীতা আন্টিই শুরু করতেন—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

কমলা রঙের ঠোঁট দু'টো জুড়ত, ফাঁক হত নানা ভঙ্গিতে আর তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসত তানপুরার স্বরের মতো কতগুলো শব্দ—

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—

গান শেষ হয়ে যেত। স্কুলের মনিটররা যে যার ছাত্রছাত্রীদের আরেকবার খুঁটিয়ে দেখে নিত মালিন্য পর্যবেক্ষণ করে, সাফসুতরো করে রওনা করে দিত দিনের যাত্রায়।

দুই

বহু বছর পর। তখন রেসপন্স-এ কাজ করি। শিবেনদা (দত্ত), আমাদের বহুদিনের প্রিয় অগ্রজ সহকর্মী, চলে গিয়েছেন।

তাঁর দেহ রাখা রয়েছে বালিগঞ্জের বাড়িতে। আর আমরা, সদ্য শোকবিমূঢ় সবাই, নিশ্চুপে জমায়েত হয়েছি সেখানে।

শিবেনদা ছোটখাটো মানুষটা—মেঝেতে শোয়ানো রয়েছে শরীর। চোখ দু'টো পরম প্রশান্তিতে বোজা।

কারা ছিলেন চারপাশে মনে নেই। রওনা করাবার আগে একবার সমবেত গান শুরু হল—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম অদৃশ্য গীতা আন্টির কমলা ঠোঁট চুঁইয়ে নেমে আসছে আইসক্রিম-এর অমৃতধারা।

আর অদৃশ্য সব ক্লাস মনিটর শিবেনদাকে মুখ মুছিয়ে, মাছি তাড়িয়ে, জামার ভাঁজ সোজা করে দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছে আরেক নতুন দিন, নতুন যাত্রার জন্য।

১০ মে, ২০০৯

কলেজে পা রাখা জীবনে, একটা চাপা দুঃখু-দুঃখু ভাব ঘিরে না থাকলে নিজেকে যখন কেমন অসম্পূর্ণ মনে হয়, সেটা এমনই একটা সময় যখন 'আত্মহত্যা' শব্দটা প্রায় কবিতার মতোই রোম্যান্টিক।

তাকে তার বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে, পূর্বাপর থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা না করে কেবল এক সুতীব্র দুঃখের সুড়ঙ্গপথ কল্পনা যা কখনওই খুলবে না কোনও আলোর ফোকরে, এই বিষাদ ভাবনার প্রায় যেন একটা সংক্রামক তীব্রতা আছে।

সব মানুষই বোধহয় কোনও না কোনও সময়, কোনও সুতীক্ষ্ণ বেদনাবোধ থেকে আত্মহননের এক সম্ভাব্য উদ্ধারের কথা ভাবেন। আমি যে কতবার ভেবেছি, তার কোনও ইয়ত্তা নেই, বেশিরভাগ ঘটনাগুলো এখন আর মনেও পড়ে না। যেগুলো অনেক কষ্ট করলে মনে আসে, সেগুলো দিয়ে চমৎকার কমেডি সিন হয়।

তা, এহেন আমি, কলেজ পাশ করে চাকরি করতে করতে, চারপাশের কাল্পনিক গাছে থোকা থোকা প্রণয়জ সম্পর্কের আঙুরগুচ্ছকে 'টক, টক' বলে গালাগাল দিতে দিতে 'উনিশে এপ্রিল'-এর চিত্রনাট্যটা তো লিখে ফেললাম।

প্রণয়ের জীবনে আমার যাবতীয় হতাশা উজাড় করে দিচ্ছি অদিতি, আমার নায়িকার মধ্যে, দেবশ্রী যে পার্টটা করেছিল, সেই আমার প্রথম ক্যাথারসিস হয়তো বা—ফলে জীবনের নানা ভীরু আত্মহননের প্রয়াসের একটি অন্তত দিয়ে জিতিয়ে দিচ্ছি আমার নায়িকাকে, যে অন্তিম সাহস আমি কখনও পাইনি—সে অন্তত পাক। কেবল তার মা প্লেন মিস করে সময়মতো ফিরে আসার কি যে দরকার ছিল!

যাক গে। লেখাটেখা তো হল। স্ক্রিপ্ট পড়ার সময় ইচ্ছে করে ওই অংশগুলোয় একটা ভারী

বিষণ্ণতা আনতাম। তখন তো আনাড়ি পরিচালক, ভাবছি এমন করেই বুঝি 'মুড' তৈরি হয়।

এইবার শুটিং-এর পালা। লিখেছি তো নিজের মনে। সত্যি একটা মানুষ আত্মহত্যার জন্য কী করে নিজেকে তৈরি করে, সে কি কারও জানা। চিরকাল আমরা জানি যে একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রায়, যিশুর অন্তিম বাণীর মতো একটা চিরকুট আবিষ্কৃত হয় 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' নিশ্চয়ই ডাহা মিথ্যে কথা। কেউ বা কিছু তো দায়ী বটেই। এ যেন জীবনের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ক্ষমার এক সিংহদ্বার খুলে দেওয়া হঠাৎ। বা হয়তো চিরাচরিত ভাবে, এটাই লিখে আসা হয় বলে। সেই মুহূর্তে ওই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মানসপটে নতুন কোনও লিপি আর সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

এইবার সেই রচনাটুকু অবধি পৌঁছনোরও তো কতগুলো স্তর আছে। কি করে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে আমি নিখুঁত পরম্পরায় সেই স্তরগুলো বোঝাব আমার অভিনেত্রীকে! এ তো নিছক হাসিকান্নার মতো রোজকার অনুভূতি নয়।

মনে আছে, জলে পড়ে সাঁতার শেখার মতো ওই আমার প্রথম অভিনয়ে হাতেখড়ি, বলা চলে মন্টুদা (অভিনেতা সুমন্ত মুখোপাধ্যায়) ছবিতে আমার পরিচালনা সহকর্মী ছিলেন। মন্টুদাকে দাঁড় করিয়ে বললাম

—দ্যাখো তো, আমি একবার আমার মতো করে করি পুরো জিনিসটা। বিশ্বাসযোগ্য দেখায় কি না!

কয়েকটা মহলা মতো হল। তারপর মনে হল বোধহয় এবার পৌঁছে গিয়েছি। একটাই জিনিস ওই টেবিলে বসে তক্ষুণি মনে হয়েছিল আমার। যে আত্মহননের আগের মুহূর্তে নিজের Pain threshold টা জেনে নেওয়া দরকার—তাই কম্পমান মোমবাতির শিখায় আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সইয়ে নিতে হবে সব যন্ত্রণা পুড়ে খাক হয়ে যাওয়ার আক্রমণ।

আমার নিজের মহলা শেষ হল, এবার চুমকির (দেবশ্রী রায়) সঙ্গে একচোট রিহার্সাল হল।

অনেকে আজও মনে করেন ওই ছবিতে ওই দীর্ঘ নীরব দৃশ্যে ওটি দেবশ্রীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

বলাবাহুল্য তার কৃতিত্বটুকু অন্তত সত্তরভাগ অভিনেত্রীর নিজের। পরিচালক কৌশল বাতলে দিতে পারেন, কিন্তু হৃদয় খুঁড়ে কোনও বেদনা জাগাতে হলে, সেখানে তো পরিচালকও দর্শকমাত্র।

দুই

'উনিশে এপ্রিল'-এর প্রসঙ্গে একটা অন্য কথা মনে পড়ল।

রঞ্জা, মানে রঞ্জাবতী সরকার, আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর অবদান এই ছবিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রঞ্জার কাছ থেকে নাচের গয়না, পোশাক অনেক কিছু নিয়ে এসেছিলাম বীণাদির পোশাকের অঙ্গ হিসেবে।

রঞ্জার সঙ্গে আলাপ আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই। ও ইংরেজি পড়ত, আমি অর্থনীতি। চোখধাঁধানো রূপসী ছিল, সে রূপের খ্যাতি মুহূর্তের মধ্যে সারা ক্যাম্পাসে ছড়িয়েও পড়েছিল হয়তো বা কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়ে।

রঞ্জার সঙ্গে আমার চালু একটা ঠাট্টা ছিল। আমি বলতাম

—কেন যে ছেলেগুলো তোকে এত তোল্লাই দেয়? আমাকে এনি ডে তোর থেকে বেটার দেখতে।

রঞ্জা হাসত, আর মেনে নিত।

একদিন সকালবেলা, সবে ইউনিভার্সিটি গেটের সামনে বাস থেকে নেমেছি, কলেজে ঢুকব— দেখলাম গোটা আর্টস ফ্যাকাল্টির লবি একেবারে নিশ্চুপ। একটা বড় হাতে লেখা পোস্টারের সামনে থিকথিক করছে সারাটা কলেজ, কারও মুখে একটা কথা নেই।

ভীরু পায়ে গেট পার হয়ে পোস্টারটার সামনে দাঁড়ালাম।

তাতে কালো দিয়ে লেখা আছে—

আমাদের প্রিয় রণজয় কার্লেকারের অকালমৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ।

মানে তোতোদা, আমাদের সর্বজনপ্রিয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক, চলে গেলেন।

কিন্তু আমি সেই পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ঝাপসা দেখলাম, সাদা কাগজে কালো অক্ষরগুলো জড়িয়ে যেতে লাগল ক্রমশ।

আমি যেন পড়ছি

—আমাদের প্রিয় রঞ্জাবতী সরকারের অকালমৃত্যুতে...

আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখে ভাল দেখছি না।

কিছুক্ষণ পর লবির এক কোণে দেখলাম চুপটি করে, হাতে একটা সিগারেট নিয়ে রঞ্জা বসে।

সেদিনের মতো সুন্দরী রঞ্জাকে আমার আর কখনও লাগেনি। এ যেন নবজাতকের সৌন্দর্য। যেন আমার চেতনায়, আমার বেদনায় আবার নতুন করে জন্মাল রঞ্জা।

রঞ্জাকে সত্যি সত্যি জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার দু'চোখে জল। কেবল বলেছিলাম

—যাক! তোর আয়ু বেড়ে গেল।

তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে। সে সময়টা আমি মুম্বইতে। 'বাড়িওয়ালি'র পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। একটা গেস্ট হাউসে থাকতাম আমরা। হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা, কী কারণে যেন কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, ফলে ফিরে এসেছি তাড়াতাড়ি। টিভি চালিয়ে খবর দেখছি। দেখলাম একটা স্ক্রোল চলছে—রঞ্জাবতী সরকার আত্মহত্যা করেছেন।

সেদিনের সকালের যাদবপুরের ক্যাম্পাসের আলো ঝলমলে বিষাদ কেমন করে যেন গেস্ট হাউসের সবক'টা নিওন লাইটকে আচ্ছন্ন করে দিল।

কেবল মনে হল, এই দৈববাণীর জন্য কি আমায় প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছিল অত বছর আগে? মাধ্যমিকে পাশ না করতে পেরে যে সব কিশোর কিশোরীর আত্মহননের খবর বেরত কাগজে, তাদের সম্পর্কে মা'র একটা চালু অভিসম্পাত ছিল

—এদের জ্যান্ত করে চাবকানো উচিত। স্বার্থপরের ঝাড়।

সেই মুহূর্তে রঞ্জা সম্পর্কে আমার আর কোনও কথা মনে হয়নি।

জানি, রঞ্জা জানে আমি ওকে এই বলেই মনে মনে বকে এসেছি সেদিন থেকে আজও।

আর ও হাসিমুখে মেনেও নিচ্ছে আমার সেই নীরব বকুনি। কোনও তর্ক করছে না।

৭ জুন, ২০০৯

মানুষের কোন ভয়টা বেশি আদিম, জানি না। অন্ধকারের না আগুনের?

বিজলি বাতি চলে যাওয়ার সেই যে প্রথম যুগ, সেটা যুদ্ধের ব্ল্যাকআউট নয়, কেবল যেন সান্ধ্যকালীন পড়তে বসার সময় এক সর্বগ্রাসী কৃষ্ণ-অরূপতার নিয়মিত আতিথ্য।

অতিথি এলে তাঁর সম্বর্ধনা হয় বইকী, আশেপাশের পাড়াসুদ্ধু নানা বাড়িতে একটা সমবেত শোরগোল উঠত কেবল—তিনি এলেন।

ফিজিক্স-এ যে পড়েছি আলো শব্দের থেকে দ্রুততম, ধীরে ধীরে সেটা কেমন যেন ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিল। আলো নিবু নিবু হওয়ার আগে চিৎকার, না পরে—এটা আর ভাল করে হদিশ করা যেত না।

আমরা, প্রাক্-বিদ্যুৎ, প্রাক্-স্বাধীনতা প্রজন্ম যারা, ছোটবেলা থেকে নিওন লাইটে ক্যাডবেরির লোগো দেখেছি রাস্তায়, পুজোয় দেখেছি টুনি বাল্‌ব, আশৈশব রেফ্রিজারেটর দেখেছি বাড়িতে—হঠাৎ করে আলো-পাখা বিবর্জিত সন্ধেগুলো যে কীরকম অন্যরকম হয়ে উঠতে পারে, তার সঙ্গে আদতে যে বাবার মুখে অল্প শোনা ঢাকার নারায়ণগঞ্জের বিদ্যুৎবিহীন বাড়ি আর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কচুপাতা-ঢাকা বিলের গল্পের কোনও মিল নেই—সেটাও বুঝতে শিখেছি আস্তে আস্তে। এ ও শিখেছি যে, প্রত্যেক ক'টা মানুষের বেড়ে ওঠাই আদতে আলাদা—তা সে আমি আর বাবা যতই এক পদবি ব্যবহার করি না কেন, আর এক ঠিকানা লিখি না কেন। পরে, মনে হয়েছে, এই আলাদা আলাদা গল্পগুলোকেই বুঝি ইতিহাস বলে?

'বেলোয়াড়ি ঝাড়' কথাটা তখন যেমন কেবলমাত্র 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'-তে মান্না দে গাইবেন বলেই তৈরি হয়েছিল, 'লণ্ঠন' কথাটাতেও আমাদের সেই শৈশবে কেবলমাত্র রানার-এর কপিরাইট। লণ্ঠন বেঁচেই ছিল আমাদের মনে, কেবল তার সঙ্গে 'ঠনঠন' Rhyme করে বলে—তখনও তো আমরা 'বঙ্কিম বঙ্কিম'-এর সঙ্গে 'থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ'-কে মেলাতে শিখিনি।

সেই 'লণ্ঠন' সলিল চৌধুরীর গান থেকে নেমে এল বাড়ির মিটসেফ-এর তাকে। বিকেলবেলা তার চিমনি পরিষ্কার হত—হ্যারিকেন, কুপি সব তৈরি হত সন্ধের জন্য।

'হ্যারিকেন' শব্দটা ঝড় থেকে, না, বিশ্বযুদ্ধ থেকে—এ নিয়ে অনেক গল্পকথা শুনতাম, আর ভাবতাম সত্যিই বাবা আর আমার ইতিহাস যতই আলাদা হোক না কেন, কোনও একটা দিন বোধহয় আসে যখন পৃথিবীর অন্য কোনওখানের, অন্য কোনও মানুষের ইতিহাস অজান্তেই আছড়ে পড়ে আমার ওপর।

রানারের রাত্রিপথের আলো বা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নাবিকের সুরক্ষিত আলোকবাক্স কখন যে বাড়ির আলো হয়ে গেল, ভাল করে বুঝতেও পারলাম না।

লোডশেডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন জিনিস শিখলাম আমরা—বাড়ির ছোটরা। দেশলাই জ্বালানো। এতদিন পর্যন্ত দেশলাইয়ের ধারে কাছে গেলেও আঁতকে উঠত মা, পিসিমণি। এবার যেন সন্ধে হলে মোমবাতি জ্বালানোর কাজটা আর বড়দের রইল না। বাজারের সঙ্গে মোমবাতি আসত নিয়মিত, বড় বড় প্যাকেটে। কোনও দিন আমাদের মনে করিয়ে দিতে হত না।

লোডশেডিং এসে অনেকগুলো রূপকথাকে দৈনন্দিন করে দিল।

লণ্ঠন থেকে শুরু করে মোমবাতি।

এতদিন জেনে এসেছি মোমবাতি কেবল কালীপুজোর নিজস্ব রোশনাই। এই প্রথম দেখলাম—চোখের সামনে কালীপুজোর মোমবাতিগুলো কেমন যেন আর তিথি-পার্বণ না-মেনে রোজকার হয়ে গেল বাড়ির এ-কোণে, ও-কোণে।

দুই

সম্প্রতি লোডশেডিং নিয়ে একটা মজার গল্প শুনলাম। ঠিক লোডশেডিং নিয়ে নয়, সংক্রান্ত ভাবে প্রযোজ্য একটা গল্প।

দিলীপদা (দিলীপ সমাজপতি) আমাদের এক অগ্রজ বন্ধু, এবং প্রধানত বৈদ্যুতিক গোলযোগ সম্পর্কে কোনও সমস্যা হলে গত দু'বছর কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন-এর তরফ থেকে যিনি আমার সাম্প্রতিক রক্ষাকর্তা শ্রীমধুসূদন, তিনি বললেন গল্পটা।

সম্প্রতি দুর্বিষহ গরম, 'আয়লা'-র প্রকোপ এবং তার পরেও কয়েকটি বৈদ্যুতিক কেন্দ্র অচল হওয়ার পর থেকেই একটা অসম্ভব টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা।

একদিন টানা দু'ঘণ্টা পাওয়ার কাট। দিলীপদাকে ফোন করলাম,

—কি গো, আজ কী অবস্থা তোমাদের?

—বেশ খারাপ অবস্থা ঋতু, কালও থাকবে। সেই হিসেবে কাজ রেখো।

বুঝলাম. পরের দিন দুপুরবেলাও ঘণ্টা দেড়েক আলো রইল না। ভাবলাম, যাক সন্ধেবেলার ফাঁড়াটা কাটল বোধহয়। দিলীপদাকে বিকেল নাগাদ আবার একটা কুণ্ঠিত ফোন। দু'বার ঢোক গিলে,

—দিলীপদা...দুপুরবেলা তো অনেকক্ষণই ছিল না, তাহলেও কি আবার সন্ধেবেলা?

দিলীপদার চির-অভয়প্রদায়ী কণ্ঠ অতটা নিশ্চিন্ত শোনাল না,

—না ঋতু। সন্ধে না হলেও রাত আটটা নাগাদ যাবে মনে হচ্ছে—ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য।

আটটার সময় কোথাও কোনও ভাল ছবি হচ্ছে কি না, তন্ন তন্ন করে কাগজ খোঁজা হয়ে গেল—মনমতো কিছু পেলাম না।

কী আর করা! বাড়ি বসে প্রতীক্ষা। আটটা বাজল। সাড়ে আটটা বাজল। তবে কি আরও রাতে যাবে? ঘুম ভাঙিয়ে? আবার ফোন দিলীপদাকে,

—কি গো, সাড়ে আটটা তো বেজে গেল!

ওপারে সেই চিরদুঃখহারী শ্রীনারায়ণ-কণ্ঠ,

—ভয় নেই আজ আর যাবে না।

—ও! যাক, বাঁচালে।

দিলীপদাই বললেন গল্পটা।

—এ তো সেই দ্বিতীয় পাটি জুতোর গল্পটা হয়ে গেল। একজন বয়স্ক মহিলা পেয়িংগেস্ট রেখেছেন একজন অল্পবয়সী ছেলেকে। ছেলেটি রোজ রাতে বাড়ি ফেরে দেরি করে। জামা ছাড়ে, ব্যাগ রাখে, এটা ওটা নাড়ে, ভারী জুতোজোড়া খুলে ছোঁড়ে এদিক-ওদিক।

একদিন বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলা ডেকে খুব ধমকেছেন,

—ব্যাপারটা কী! রোজ এত রাতে বাড়ি ফেরো..., তারপর আস্তে আস্তে নিজের কাজ করতে পারো না। আমি কিনা অনিদ্রা রুগি—ঘুম ভেঙে যায়।

পরের দিন ছেলেটি বাড়ি ফিরল সাবধানে, জামা ছাড়ল সাবধানে। জুতোজোড়া জোরে ছোঁড়া অভ্যেস, প্রথমটা বেরিয়ে গেল হাত থেকে, তারপর প্রায় নিঃশব্দে খুলল দ্বিতীয়টা। শান্তি!

কীসের শান্তি?

পরের দিন সকালেই মহিলার আবার হানা

—কী ব্যাপার! ঘুমোতেও দেবে না তুমি?

ছেলেটি আমতা-আমতা

—আমি তো...

—দ্বিতীয় জুতোটা কখন খুলবে? এই খুলবে এই খুলবে এই খুলবে করে আমার সারা রাত জেগে কেটে গেল!

আলো না অন্ধকার—কোনটাকে আমরা বেশি বিশ্বাস করি, জানি না। যেটা আছে, সেটা আসলে নেই—কথাটা তাত্ত্বিক বটে কিন্তু আলো-আঁধারের ক্ষেত্রে বড় সত্যি।

আর লোডশেডিং-এর ক্ষেত্রে তো বটেই।

১৪ জুন, ২০০৯

রোববারের দপ্তর

—হ্যালো, হ্যালো, ঋতুদা...

—হ্যালো...হ্যালো...

—ঋতুদা, আমি অনিন্দ্য বলছি।

—হ্যালো...হ্যালো...

—ঋতুদা, আমি অনিন্দ্য, শুনতে পাচ্ছ না?

—হ্যালো-ও-ও...

—ধ্যুৎ! ঋতুদা, আমি...কি শুনতে পাচ্ছে না, না কি? আমি তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি গলা—হ্যালো, হ্যালো বলছে।

—আরেকবার করে দ্যাখ। আজকাল আদ্ধেক ফোনে কিচ্ছু শোনা যায় না।

(নাম্বার আবার ডায়াল করার পর)

—ও মা! এবার বলছে unreachable.

—তা হলে নিশ্চয়ই কোনও খারাপ নেটওয়ার্ক এরিয়া-য় আছে। তাই শুনতে পাচ্ছিল না।

—আজ শনিবার, এখনও এডিট লিখেছে কি না, কে জানে? আবার বম্বে-টম্বে চলে গেল না তো!

—বম্বেতে নেটওয়ার্ক খারাপ হবে কেন খামোকা? কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে পারে।

—লালগড়?

—না, না। ঋতুদা এই রোদ্দুরে ন্যাড়ামাথা ফাটিয়ে লালগড় টালগড় যাবে না। Maximum হলে location দেখতে যেতে পারে কাছাকাছি কোথাও। হয়তো কলকাতার বাইরে গেছে,

নেটওয়ার্ক একটু খারাপ...

—না ধরা গেলে তো মুশকিল। ফার্স্ট পার্সন-টা...

—একটু পরে আবার দ্যাখ।

দৃশ্য দুই

(ঋতুপর্ণ ঘোষের বাড়ি। স্টাডি।)

—কী রে! কার ফোন ছিল—হ্যালো, হ্যালো করে ছেড়ে দিলি?

—অনিন্দ্য, আবার কে? ফার্স্ট পার্সন, ফার্স্ট পার্সন করে মাথা খাবে এক্ষুনি...

—তা, তুই লিখিসনি না কি?

—আচ্ছা বল, কমিউনিফেকিং—শুনেছিস কখনও আগে?

—Communicating—হ্যাঁ শুনব না কেন?

—আহ্! Communifaking. Faking as in ঢপিং।

—না, এটা শুনিনি, এটা কি নতুন?

—আবার কি। ছাতা নেই, মাথা নেই—এই অনিন্দ্য আর চন্দ্রিল মিলে কাদের সঙ্গে সব মেশে, উদ্ভট উদ্ভট সব জিনিস শুনবে—আর সেগুলো সব নাকি কভার স্টোরি মেটিরিয়াল।

—তা, তোর যদি আপত্তি থাকে, বারণ করলি না কেন?

—আহা! বারণ করলে কত শুনছে। কে এসে একটা লেখা দিয়ে গিয়েছে, Communifaking নিয়ে। সেটা পড়ে বোধহয় মানিকজোড়ের ভাল লেগেছে। অমনি ওটা কভার স্টোরি হবে—ঋতুদা তুমি এটার ওপর ফার্স্ট পার্সন লেখো। আমি মরতে বলেছিলাম—এটা script form-এ লিখলে বোধহয় better হয়। অমনি দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঋতুদা, সেটাই best।' চন্দ্রিল তো আবার filmmaker-cum-journalist, বুঝিয়ে দিল 'ভাবো, dialogue form-এ লিখলে তোমায় কত কম লিখতে হবে, চট করে পাতা ভরে যাবে।'

—তা লিখে ফ্যাল। কতক্ষণ আর লাগবে?

—তুই চন্দ্রিলের মতো করিস না তো, দেবু। চন্দ্রিলও তাই বলল—তোমার তো লিখতে রিয়েল টাইম লাগবে। মানে যতক্ষণের সংলাপ, যদি পাঁচ বা দশ মিনিটের হয়, আমি নাকি ওই পাঁচ-দশ মিনিটেই লিখে ফেলব।

—বুঝেছিস বিষয়টা? একবার Google-এ গিয়ে দ্যাখ না!

—না বোঝার কী আছে? দু'টো মানুষ Communicate করছে, তার মধ্যে একজন Communication-টাতে উৎসাহী নয়।

—পাতি কথায় কাটাতে চাইছে?

—Exactly। এই কাটানোর, বা Communication avoid করার একটা body of language আছে।

—বুঝলাম, সেদিন বাসে করে ফিরছি টেলিফোন বিল জমা দিয়ে—দমদম থেকে নাগেরবাজার। হঠাৎ একটা মোবাইল বাজল। একটা লোক সোজা মোবাইলটা তুলে বলতে লাগল—'না, আমি তো এখন দিল্লিতে, কবে ফিরব ঠিক নেই।'...ভাব, straight দিল্লি আবার। আর ফিসফিস করে নয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে—আমি ভাবলাম লোকটার কি লজ্জাশরমও নেই? সারা বাসের লোক তো শুনছে—যে ও ঢপ মারছে।

—মা'র কাছে গল্প শুনেছিলাম, মা'র ছোটবেলায় মা'দের বাড়িতে আমার দাদুর গুরুদেব আসতেন। সারাদিন নিজের ঘরে বসে থাকতেন, আর যাকে পেতেন পাকড়ে ধরে ধর্মকথা শোনাতেন। ন্যাচারালি মা-রা তখন ছোট, বেশিক্ষণ ধর্মকথা ভাল্লাগছে না, ভান করত যেন কেউ ডাকছে। গুরুদেব ভাল কানে শুনতেন না। মা-রা নাকি গলাটা একটু তুলে—'হ্যাঁ, আসছি-ই-ই' বলে অমনি কেটে পড়ত। এই রে আবার ফোন করছে...

—তা, বলে দে ফোন করে যে, লেখা হয়নি তোর। ছেলেগুলো ভাবছে তো!

—আমি ভাবছি অন্য কিছু নিয়ে লিখব ফার্স্ট পার্সন। কী নিয়ে লেখা যায় বল তো? Global Warming?

—এ কী! কেটে দিলি কেন?

—কেটে দিলে তো আজকাল কেটে দেওয়া বোঝা যায় না। ফোন থেকে তো recorded voice বলে–Number is busy। কারণ, মোবাইল কোম্পানিরাও জেনে গিয়েছে—এখন তারাও চায় তাদের Customer-রা একটু রয়ে সয়ে Communifaking করুক। মুখের ওপর কেটে দিলে খারাপ লাগবে, তাই একটু রেখে-ঢেকে বলা হল—Number busy। যার বোঝার সে বুঝল, কিন্তু আমি impolite হলাম না।

দৃশ্য তিন

রোববার দপ্তর

—এই দ্যাখ অনিন্দ্য, Message পাঠিয়েছে Sorry, in a meeting. Will call later। তার মানে বোধহয় meeting-এ আছে।

—তা হলে কি wait করবি, হয়তো শেষ হলে ফোন করবে?

—একে বলে গাঁইয়া। ওটার মানে আসলে ফোন কেটে দেওয়া। তুই কাটলি না, তার মধ্যে messageটা পাঠিয়ে দিলি। ফোনই তোকে option দেবে, Answer না Send message। তুই Answer করতে ইচ্ছে না করলে Send message কর।

—মোবাইল যেন রত্নাকরের বউয়ের সতীন। সে বলেছিল না—তোমার পুণ্যের ভাগ আমি নিলাম, তোমার পাপে আমার কোনও ভাগ নেই। এ যেন ঠিক উল্টো—না গো, তুমি জালি করে যাও, আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব।

—তা হলে 'বাবা বলছেন, বাবা বাড়ি নেই'-টা কী? Communifaking?

—ব্যর্থ Communifaking। উজবুকদের দিয়ে তো আর faking হয় না।

—আরেকবার ফোন করে দেখি বল। এবার যদি ধরে। এই রে, Number busy।

দৃশ্য চার

ঋতুপর্ণ ঘোষের বাড়ি। স্টাডি।

—হ্যালো। হ্যাঁ সমরেশদা বলো!

—শোনো, তোমায় একটা ভাল খবর দেব বলে ফোন করেছি।

—হ্যাঁ, বলো।

—'কলকাতায় নবকুমার', যে উপন্যাসটা তুমি ছেপেছিলে রোববার-এ, সেটা এবার বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছে।

—তাই! বাব্বা, এ তো ফাটিয়ে দিয়েছ।

—আমি ভাবলাম, এই লেখাটার পেছনে তো তোমার একটা বড় ভূমিকা আছে, তাই তোমায় জানাই।

—আমার আবার ভূমিকা কী সমরেশদা? তুমি তখন একটা অচেনা কাগজকে ভরসা করে লেখাটা দিয়েছিলে, আমরা ছেপেছি।

—না, তারপর ওটা যখন বই হয়ে বেরিয়েছে, তুমি ওটা উদ্বোধন করেছ।

—সেটা তো তুমি আমায় ডেকেছ বলে। যাক, কোনও না কোনওভাবে তো আমি involved। আমার সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে।

—আমি আজ বিদেশ যাচ্ছি, ফিরে এসে কথা হবে, ভাল থেকো।

—তুমিও ভাল থেকো, সমরেশদা,

(ফোন বন্ধ হল)

—এটাও কি Communifaking?

—কোনটা?

—এই যে বিনয়ের অবতার ভাবটা, যে আমি তো নিমিত্তমাত্র।

—দ্যাখ, Communifaking কি না জানি না। কিছুটা faking তো বটেই। সত্যিই তো আর

আমি অত বিনয়ী নই।

—তা হলে?

—তা হলে আবার কী! 'পেটে এক, মুখে এক' ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছিস। আজ যদি সেটার নতুন নাম হয়।

—তার মানে একটা শুধু faking?

—পুরোটা নয়। সত্যিই আমার আনন্দ হয়েছে। মানুষটার কি দরকার ছিল বল, আমায় ফোন করে খবরটা দেওয়ার? দাঁড়া অনিন্দ্যকে একটা ফোন করি। ফার্স্ট পার্সন-এর বিষয় পেয়ে গিয়েছি।

৫ জুলাই, ২০০৯

'কী রে! তোর তো পোয়া বারো! একাদশে বৃহস্পতি! সমকামিতা আদালতে স্বীকৃতি পেয়ে গেল...শা-আ-লা...। তোদেরই দিন। তোদেরই জিত।'

অসংখ্য শুভেচ্ছার মেসেজ-এর মধ্যে একটা অচেনা নাম্বার থেকে এই Text message-টা এসে পৌঁছল আমার ফোনে। প্রেরক আমার অচেনা, নাম্বারটা হল : 9804695492। একবার নয়, বার চারেক। আমার মোবাইলে সব ক'টাই প্রায় স্টোর করা আছে।

এই ধরনের মেসেজ যে পূর্বে কখনও পাইনি, তা মোটেই নয়। নানা তরুণ অভিনেতা, বেশিরভাগই অজ্ঞাতনামা, যাঁরা চিরকাল ভেবে এসেছেন আমার 'পুরুষপ্রীতি'-র সুযোগ নিয়ে তাঁরা আমার ছবিতে কাজ পাবেন, দিনের পর দিন ফোন বা এসএমএস পাঠিয়েও তাঁরা যখন কোনও ফল পাননি শেষ পর্যন্ত, তখন তাঁদের নানারকম বিষোদ্‌গার দেখেছি—তার বেশিরভাগই শুরু হয়েছে, 'শালা হোমো...' বলে।

৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে দিল্লি হাই কোর্ট-এর রায় হঠাৎ কেমন একটা সাড়া ফেলল চারদিকে। যেন সত্যিকারের ঐতিহাসিক একটা মুহূর্ত তৈরি হয়েছে সারা দেশ জুড়ে।

বিধবা-বিবাহ, সতীদাহ রোধের বিল পাশ হওয়ার পর বিরুদ্ধাচারণের চেহারাটা কেমন হয়েছিল, আমি জানি না।

তবে অসুস্থ অশক্ত বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে দিয়ে খোল করতাল বাজিয়ে খেউড় গাইতে গাইতে গিয়েছিল একদল—বলে শোনা যায়—ভুগে মর বিদ্যেসাগর। চিররুগি হয়ে।

যে কোনও চিরাচরিততা, তা সে ঠিকই হোক, বা ভুল—তাকে হঠাৎ সামাজিক নিগড়মুক্ত করা হলে কিছু বিরুদ্ধাচারণ তো হতেই হবে।

যে মানুষগুলো আজ এক ধারামুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলছেন, নিপীড়িতের কষ্ট বুঝছেন না বলে তাঁরা আজ অনেকের কাছেই অসংবেদনশীল খলনায়ক, আমরা অধৈর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, আমাদের কাছে যেটা এত সহজ সত্য—অন্যরা সেটা মেনে নিতে পারছেন না কেন?

এই মেনে নিতে না পারার সামনে এসে দাঁড়ানো মূর্তিগুলোই তো প্লেটো, গ্যালিলিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মার্টিন লুথার, নেলসন ম্যান্ডেলা।

জানি না আমার মধ্যে সেইরকম কোনও মহামানব লুকিয়ে আছেন কি না! সত্যিই যদি দিল্লি হাই কোর্টের এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক হয়, তা হলে ইতিহাসকে যে পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, তা তো প্রায় ঐতিহাসিকভাবেই বন্ধুর।

লিখতে লিখতে আবার দু'বার মেসেজটা এল। একই নাম্বার থেকে।

এবার একটু বিরক্ত লাগছে, ভাবছি পুলিশে ডায়রি করব।

এবং করতে গিয়ে এই প্রথম অনুভব করলাম, এই অভিযোগে এতদিন আমি 'অপরাধী' ছিলাম। তাই হয়তো আমার মতো অনেকেই আরও নিষ্ঠুর বিদ্রূপের সামনে দাঁড়িয়েও ঢোঁক গিলে হজম করেছেন।

আজ অন্তত সেই মানুষগুলো তাঁদের বিরুদ্ধে জমা হয়ে থাকা অপরাধের বিশাল বিন্ধ্যপর্বতের সামনে এনে দাঁড় করাতে পারবেন আইনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের।

তারপর, সেই বিন্ধ্যপর্বত পার হওয়ার পালা তো শুরু হল।

সেই দীর্ঘ কঠিন সংকল্পের যাত্রাকে সকলের হয়ে শুভেচ্ছা।

১২ জুলাই, ২০০৯

বর্ষার সঙ্গে বিরহী আর বিদেহীর সমান যোগ যেন।

'ভরা বাদর, মাহ ভাদর'-এর শূন্যতার পাশাপাশিই ইলিশ মাছ-খিচুড়ি, নিদেনপক্ষে মুড়ি তেলেভাজা সহযোগে ভূতের গপ্পো।

কে জানে কেন—গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত কোনওটাই তেমনভাবে ভূতদের ঋতু নয়।

বর্ষা নামেই যেন আষাঢ়ে-র ঝুলি নিয়ে।

এবার সংখ্যা 'প্ল্যানচেট'।

পারলৌকিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে এক অদ্ভুত গা ছমছম করা সংস্কৃতি একসময়ে চালু হয়েছিল খুব, সেই বিষয়ে।

রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় ইত্যাদি নানা নাম শুনি যাঁরা যুক্ত ছিলেন এই অদ্ভুত সূক্ষ্ম আত্মার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টায়।

সৌমিত্রদার মুখে শুনেছিলাম, সত্যজিৎ রায় একবার ওঁকে বলেছিলেন যে তাঁর শান্তিনিকেতন-এ ভর্তি হওয়ার পিছনেও কিন্তু এই প্ল্যানচেট।

তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সিতে পড়া সত্যজিতের শান্তিনিকেতনের তথাকথিত 'পেলব' পরিবেশ সম্পর্কে একটা অনীহা-ই ছিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রায় নাছোড়বান্দার মতো সত্যজিৎ-জননী সুপ্রভাকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন একান্তভাবে।

শেষে জানা যায় যে প্ল্যানচেট-এ ডাকা সুকুমারের আত্মা নাকি কবির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন পুত্রের শিক্ষা ভার নেওয়ার। বেশ, মজার ঘটনা—তাই না!

একটা কথাই আমি বুঝতে পারি না। যে রবীন্দ্রনাথ সীমা-অসীম, জীবন-মৃত্যু, নশ্বর-চিরন্তনকে একাকার করে দিয়েছেন তাঁর কলমে, যাঁর লেখা পড়ে বুঝি সত্যিই জীবন মানে শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয়, তাঁর কেন আলাদা করে প্ল্যানচেট করার প্রয়োজন হয়েছিল, কেবল শখ করে?

আমি যেমন কাজল পরি!

২৬ জুলাই, ২০০৯

সপ্তাহদুয়েক আগে গোয়া গিয়েছিলাম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে।

গোয়া এর আগে যাইনি, তা নয়, এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এর কারণেই গেছি, তবে, তখন দু-একদিন থেকে চলে এসেছি। এবারে কেবল 'সব চরিত্র কাল্পনিক' দেখানো ছাড়াও আরও একটু কাজ ছিল। ফলে, থাকতে হল পাঁচ ছ'দিন।

একটা সময় 'সব চরিত্র কাল্পনিক' দেখানো, তার প্রেস কনফারেন্স, সব শেষ হয়ে গেল।

আমার সঙ্গে গিয়েছিল যীশু (অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত) আর ছবির চিত্রগ্রাহক সৌমিক হালদার। ওরা যে যার মতো ফিরে এল কাজে। যীশু কলকাতায়, সৌমিক বম্বেতে। আমি একেবারে একা বসে রইলাম বাকি তিন-চারদিন।

গোয়াতে আমাদের যে হোটেলটায় রাখা হয়েছিল সেটার নাম সিডাডে দে গোয়া। যীশু, সৌমিক ছিল একই হোটেলে অন্য একটা উইং-এ। আমার ঘরটা সম্পূর্ণ উল্টোদিকে—লবি, সিঁড়ি, করিডর পার করে প্রায় আধ কিলোমিটারের সমতল-অসমতল যাত্রা। আমার ঘরটা ছিল বড় চমৎকার। মাঝারি আয়তন, তেমন বড় নয়। একজন থাকার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত ও আরামদায়ক।

এবং সর্বোপরি, আমার জন্য বড় শান্তির কথা যে, ঘরে সিলিং ফ্যান আছে। এই সব কেতার হোটেলে ঘরে কোনও ফ্যান থাকে না, পুরোটাই এয়ার কন্ডিশন নির্ভর। আমার আবার এসি র সঙ্গে ফ্যানও লাগে—শীত গ্রীষ্ম বসন্ত নির্বিশেষে। ফলে বিদেশের ফেস্টিভ্যালে গেলে মিথ্যে করে বলি

—আমি হাই প্রেসারের রুগি। আমার ঘরে ফ্যান থাকাটা খুব জরুরি। নইলে যে কোনও সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।

তাঁরা বিদেশি অতিথিদের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না। ফলে প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই ঠিক একটা ফ্যান এসে পৌঁছে যায়।

আমার ঘরটা ছিল পশ্চিমমুখো। পর্দাটানা বড় বড় কাচের পাল্লার দরজা—ঠেলে খুললেই একচিলতে একটা বারান্দা। তাতে কালো চামড়ার গদি দেওয়া একটা দোলনা আর সিমেন্টের রোয়াক। দু'পা সিঁড়ি নেমে গেলেই সমুদ্রতট। পাথুরে একটা বালিয়াড়িতে আরব সাগর এসে ফেনিল ঘাগরার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

মনে আছে, যেদিন পৌঁছলাম সেদিন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিকেল সাড়ে চারটে। সাড়ে পাঁচটায় আমার শো। কোনওরকমে তাড়াহুড়ো করে তৈরি হচ্ছি। পাঁচটার মধ্যে বেরতে হবে। যীশু আর সৌমিক এসেছে আমাকে তাগাদা দিতে

—দেরি হয়ে যাবে ঋতুদা, তাড়াতাড়ি করো। আর সেজো না।

ঘরে ঢুকেই দু'জনে থমকে তাকিয়ে রইল বারান্দাটার দিকে

—কী সুন্দর ঘরটা তোমার, ঋতুদা।

চুলোয় গেল তাগাদা দেওয়া। অমন বারান্দায় বসে অন্তত এক কাপ কফি না খেলে কি চলে! ততক্ষণে আমি তৈরি। আর আমার সহকর্মী দুই মক্কেল নিজের মনে রুম সার্ভিস ডেকে, কফি অর্ডার করে, একজন দোলনায়, অন্যজন রোয়াকে।

পরের দিনই যীশু ফিরে এল, ওর চাকদায় শো। আর সৌমিক মুম্বই গেল তিন দিনের মাথায়, 'আরেকটা প্রেমের গল্প'র কাজে।

আমি একা। সেই সুন্দর ঘরটায়। আর ছোট্ট বারান্দায় বসে বই পড়ি, লিখি। সঙ্গে ডিভিডি প্লেয়ার নিয়ে গেছিলাম— ছবি দেখতে আর ইচ্ছে করল না। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম।

বিকেল হত, আকাশে জলে লাগত কমলার ছোঁয়া। তারপর সময় গড়িয়ে বেগুনি—ধীরে ধীরে অন্ধকার। বিচের অন্য দিকে তখন অনেক আলোর মালা এক এক করে জ্বলে উঠছে। ফেস্টিভ্যালের তরফ থেকে রোজই একটানা নৈশভোজের আমন্ত্রণ থাকত, বুঝতে পারতাম তারই আয়োজন চলছে।

এমনই একদিন বিকেলবেলা কফিটা নিয়ে বসেছি দোলনায়। কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার ছিল। তাদের sms করে রেখেছি, যাতে অবসর মতো ফোন করতে পারেন।

দোলনায় আমি, পাশে চামড়ার গদিতে কফির কাপ। হঠাৎ হাত ফসকে মোবাইলটা পড়ল মাটিতে। এমন আমার অনেকবার হয়েছে, ফলে বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে মোবাইলটা মেঝে থেকে তুললাম।

LCD স্ক্রিনটাতে কোনও কিছু নেই। কতগুলো বিজবিজ করা বিন্দুতে ভরে গেছে স্ক্রিন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেমালুম সাদা।

এমতাবস্থায় যা করি তাই করলাম, ব্যাটারিটা খুলে আবার লাগালাম, সিম কার্ড ঘষে পরিষ্কার করে জায়গা মতো ঢুকিয়ে দিলাম। মোবাইল চালু হল, চালু হওয়ার টুংটাং শব্দটা এল—কিন্তু পর্দা গাঢ় গভীর অস্বচ্ছ সাদা। একটা অক্ষরও নেই সেখানে।

এবার চিন্তা হল। মোবাইল সেট ঝাঁকালাম। আবার ব্যাটারি খোলা, আবার নতুন করে লাগানো—কোনও প্রতিকার নেই। বুঝলাম ফোনটা গেছে।

সেই সঙ্গে বেগুনি আকাশ আর সমুদ্রবক্ষ থেকে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক বিশালকায় ঢেউয়ের মতো এসে ভিজিয়ে দিল আমার বারান্দা। আমার তো কারও কোনও নম্বর মনে নেই—যা আছে সবই এই ফোনের মস্তিষ্কে। এবং এই মুহূর্তে তা সম্পূর্ণ লিপিহীন, শূন্য।

বাবার নম্বরটা কেবল জানি। অন্যদের নম্বর এত বদল হয়েছে যে মনে থাকে না। আর ফোনবুক থেকে সোজা বোতাম টিপলেই যেহেতু ডায়াল করা যায়, নম্বর ধরে ধরে ডায়াল করা তো উঠে গেছে—অতএব সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট আমি চাইলেও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না।

সেদিন আবার রোববার। গোয়া যতই ট্যুরিস্ট-নগরী হোক, এমনিতে বেশ অলস শহর। দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ দোকানপাট বন্ধ, রোববার তো কথাই নেই।

হোটেল হেল্প ডেস্ক-এ ফোন করে একটা দোকানের নম্বর পাওয়া গেল, কিন্তু সে আগামিকাল সাড়ে দশটার আগে খুলবে না।

এর মধ্যে কোনটা বেজে উঠল। একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ফোন তুললাম

—হ্যালো!

অচেনা গলা বলল

—হ্যালো! এটা কি ঋতুপর্ণ ঘোষের নম্বর?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আমি হাওড়া থেকে অমলেশ বিশ্বাস বলছি। আমি অভিনয়-টভিনয় করি...

বুঝলাম পার্ট পাওয়ার ফোন। এইজন্যই আমি অচেনা নম্বরের ফোন ধরি না। কিন্তু এখন উপায় কী!

পর্দায় চেনা-অচেনা সব তো ঢেকে দিয়েছে এক শ্বেতাভ আচ্ছাদন। তাকে ভেদ করার তো কোনও উপায় নেই। মনে হল আমার মস্তিষ্কের একটা অংশ আর কাজ করছে না। একটা নম্বরও মনে পড়ছে না। ইতিমধ্যে মেসেজ আসার শব্দ পাচ্ছি, পড়তে পাচ্ছি না।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলছি

—হে সমুদ্রদেব, আমার স্মৃতি ফিরিয়ে দাও।

আর নিজেকে অভিসম্পাত করছি স্বেচ্ছায় একটা যন্ত্রের দাস হয়ে যাওয়ার জন্য।

পুরাণের সমুদ্রদেব রুষ্ট হলে শাস্তি দেন, প্রসন্ন হলে বরদান করেন। আমার সামনে বিশাল জলধি ছলছল করে যেন আমার সঙ্গে পরিহাস করে চলল।

হেল্প ডেস্ক থেকে ফোন এল। ওরা দোকানের কাউকে যোগাযোগ করেছে। কাল সাড়ে দশটায় ইঞ্জিনিয়ার আসবেন দোকানে—তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন।

এ যেন অতিকষ্টে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া। ততক্ষণে কোনওরকমে ঠেকা দেওয়া। সামনের সমুদ্র অন্ধকার হল। ধীরে ধীরে কাচের দরজা টেনে, পর্দা টেনে ঘুমোতে গেলাম। ঘুম হল না ভাল। আবার ভোরের বারান্দা। ইস্পাতি রং আকাশ আর জল।

একটু বেলায় গাড়িচালকের ফোন

—সাব, কিতনে বাজে নিকলনা হ্যায়?

গোয়ায় সুরেশ বলে যে গাড়ির চালকটি আমার সঙ্গে ছিল তার নম্বরও তো ওই ফোনের গহ্বরে। ভাগ্যিস ফোন করেছে ছেলেটা।

প্রথমেই বললাম

—তোমার ফোন নম্বরটা বলো

সে তো অবাক

—আপ কা পাস তো হ্যায় স্যর।

—তোমায় বলছি, বলো।

হাতে লিখে নেওয়া ফোন নম্বরের চিরকুটটা যেন আমার হাসপাতালের অ্যাডমিশন কার্ড। বললাম

—অমুক দোকান চেনো?

—হাঁ মালুম হ্যায় স্যর। আপকো যানা হ্যায়?

সাড়ে দশটার সময় দোকানে পৌঁছে দেখি তখনও কারিগর আসেননি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন। তাঁর কাজ করার ঘর দোতলায়। আমি নীচে বসে রইলাম। উনি আমার ফোন নিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

ঘড়ি দেখছি। দশ মিনিট। পনেরো মিনিট। যেন অপারেশন থিয়েটারের বাইরে অপেক্ষা—ভেতরে কোনও প্রিয় আত্মীয়। মিনিট কুড়ির মাথায় আমার সুস্থ ফোন আমার হাতে ফিরে এল।

আবার সব নম্বর যে যার জায়গায়। এতক্ষণ অবধি আঠেরোটা মেসেজ এসেছে।

তাই খাম চিহ্ন পর্দায়। সব আবার আগের মতো।

আমার হারানো মস্তিষ্ক ফিরে এসেছে।

তিনদিন পর বাড়ি ফিরলাম। কলকাতা। এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত আটটা হল।

বাবার সঙ্গে দেখা করি যেমন, গেলাম বাবার কাছে।

—কেমন আছ?

—ভাল। তুমি কি অফিস গেছিলে?

—আমি তো গোয়া গেছিলাম, বাবা। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। তোমায় বলে গেলাম যে।

—ও! কেমন হল? ভাল?

একমনে তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। অস্বচ্ছ, লিপিহীন, স্মৃতিহীন একটা বিষণ্ণ মুখ।

ভেবেছিলাম সমুদ্রদেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার হারানো স্মৃতি।

তার বিনিময়ে যে কেড়ে নিয়েছেন আমার বাবার সমগ্র অতীতটুকু, সেটা জানতে দেননি আমাকে।

১৩ ডিসেম্বর, ২০০৯

'জোকার' শব্দটার মানে কী? ঠাকুমা তো ওপার বাংলা থেকে এসেছেন—চিরকাল 'উলু' দেওয়ার মতো ব্যাপার হলেই বলতেন, 'জোকার দাও, জোকার দাও।'

তার থেকে জোকার শব্দটা আমার মাথায় অনেকগুলো মানে, শব্দ, ছবি নিয়ে ঘোরে।

একটু যখন বড় হলাম, তাস চিনতে শিখছি—একটা তাস থাকতই যার মধ্যে সার্কাসের

জোকারের ছবি আঁকা। জোকার ছাড়া আর বাকি যা সব ছবি ছিল—রাজা, রানি—তারা যেন কেমন অন্যরকম—কেবল জোকারটাই যেমন দেখেছি, যেমন চিনি।

মাথায় লম্বা টুপি। ঢলা রঙিন পোশাক। টুপির মাথায় আর নাকের ওপর একটা ডিম্বাকৃতি গোলাকার বস্তু। এবারের প্রচ্ছদকাহিনি যেহেতু 'জোকার', লিখতে বসে একবার মনে হল dictionary-টা দেখি। 'জোকার' আর 'ক্লাউন' শব্দ দু'টোর পার্থক্য কী? Joker-এ গিয়ে দেখলাম

1. A person who is fond of joking> a foolish or inept person

2. A playing card with the figure of a jester...

তা হলে তো এটা আমাদের 'জোকার'-এর সঙ্গে ততটা কাছাকাছি হল না।

ফলে Clown-এ গিয়ে খুঁজলাম। লিখছে—

1. A comic entertainer, especially one in a circus, wearing a traditional costume or an exaggerated make up

2. A playful extrovert person.

বুঝলাম আমরা যা খুঁজছি, সেটা আদতে ক্লাউন, জোকার নয়।

ভাবছি Oxford University Press-কে একটা চিঠি লিখব কি না যে নতুন edition এ Joker এর তৃতীয় মানেটা যদি ওঁরা যোগ করে দেন—

3. Bengali synonym for clown.

যাক, আভিধানিক বিতণ্ডা ছেড়ে আপাতত বিষয়ে আসি।

আমার এবং আমার বন্ধুদের সকলেরই ধারণা, সার্কাসের বাইরে কলকাতা শহরের সবথেকে বড় 'জোকার'-টা হলাম আমি। যখনই একটু অন্যরকম সেজে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে হয় আমার, ভাই এবং বন্ধুরা অমনি বলে,

—জোকারপনা করতে গেলে তুমি একা যাও, আমরা যাব না তোমার সঙ্গে।

আর অমনি আমার জেদ চেপে যায়, আরও বেশি করে উল্টোপাল্টা সাজি। হাজার হলেও, ঠাকুমা যে উলুকে জোকার বলতেন—তিনি বাঙাল বলেই বলতেন, আর আমি তাঁর নাতি তো বটে—জেদটা কি পুরো পদ্মায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি?

যদ্দুর ধারণা রাজ কাপুরের ছবিটা, আমি 'মেরা নাম জোকার'-এর কথাই বলছি, বোধহয় আমাদের প্রজন্মের মনে ক্লাউন কথাটাকে চিরতরে জোকার করে দিল। আরেকটা জিনিসও করে দিল বোধহয়। তাতে অবশ্য চ্যাপলিন-এর 'লাইমলাইট'-এরও একটা বড় ভূমিকা আছে, যে,

কৌতুকের নায়ক থেকে জোকার ধীরে ধীরে এক গোপন বিষাদপ্রতিমা হয়ে গেল। 'জোকার' বলতে আমরা আর অবিমিশ্র কৌতুক বুঝি না। সার্কাসের বাইরের নানা মাধ্যম আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে যে জোকার মানে হর্ষ-বিষাদের এক অদ্ভুত বিপরীত সমাহার। তার রং-মাখা হাসির আড়ালে আসলে লুকিয়ে আছে অনেক কান্নার ইতিহাস।

তারপর হাসির অনুষঙ্গটা মুছে গিয়ে কেন যেন দ্বিতীয় স্তরটাই প্রবল হয়ে উঠেছে বলে জোকার যেন একটা ট্র্যাজিক সিম্বল।

তাই বলে ভাববেন না, এগুলো আমি আমার কথা বললাম। আমার সাজ যদি উদ্ভট লাগে, সে দোষ আমার রুচির।

আমি ভাল আছি।

২০ ডিসেম্বর, ২০০৯

যুদ্ধের প্রতি আমার যেমন কোনও আকর্ষণ নেই, ক্রিকেটের প্রতিও নেই।

ফুটবল খেলাটা তবু একটা উন্নত ধরনের হাডুডু-র মতো খেলা খেলা মনে হয়। তাতে হুটোপুটি ধাক্কাধাক্কি সব আছে, তবু সব বিকেলের খেলাই যেমন সন্ধে গড়িয়ে এলে শেষ, হয়। ছেলেপুলে বাড়ি ফিরে হাত পা ধুয়ে পড়তে বসবে বলে, ফুটবল ম্যাচও যেন অস্তমিত সূর্যের ইঙ্গিতেই পাট চুকিয়ে ফেলে—এতক্ষণ যে ক'জন ধুলোকাদা মাখা শরীর এত দাপাদাপি করছিল মাঠ জুড়ে, তারা যেন বাড়ির ছেলে হয়ে যায় আবার। মা বকবে বলে ঘেমো গেঞ্জি ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে খোঁচা খোঁচা চুল আঁচড়ে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ক্রিকেট খেলাটা যেন সত্যিই যুদ্ধ। সাজে পোশাকে, প্যাড হেলমেট-এ আদ্যোপান্ত যোদ্ধাবেশ। বিভিন্ন ব্যূহ রচিত হচ্ছে যুদ্ধপ্রাঙ্গন ঘিরে, মাঝখানে দুই প্রবীণ যোদ্ধা মুখোমুখি যুযুধান। সেনাপতি বা দলনেতা দু'পক্ষেই আছেন, তাঁরা সময়ে সময়ে দৃশ্যমান বা অন্তরালে। মহাভারতের কালে শঙ্খ বাজিয়ে যুদ্ধ শুরু হত নির্দিষ্ট মুহূর্তে, শেষ হত শঙ্খধ্বনিতে। ক্রিকেটের রণাঙ্গনও সেই দুই প্রারম্ভিক ও অন্তিম ঘোষণায় চালিত। ব্যাসদেব বা হোমারের কালে গ্যালারিতে বসে যুদ্ধ দেখবার নিয়ম ছিল কি না জানি না, কিন্তু এখানে আছে—এবং সেইসব দর্শকরা প্রত্যেকেই আসলে কেউ কোনও পক্ষের। প্রত্যেকের মনেই একজন নির্দিষ্ট নায়ক বা প্রতিনায়ক আছেন।

আছেন বিভিন্ন বিশেষ স্থানে উপবিষ্ট ধারাবিবরণকারী জানা সঞ্জয়, এক্ষেত্রে তাঁরা সমস্ত চক্ষুহীন (পড়ুন অনুপস্থিত) দর্শকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খে বর্ণনা করে

চলেছেন প্রতিটি বীরকীর্তি। যুদ্ধশেষে কেউ বা বিজয়ী, কেউ বা পরাজিত। দর্শককুলও সেই জয় পরাজয়ে সমানে বিভক্ত— ফলত হর্ষিত বা বিষণ্ণ।

তবু ক্রিকেট খেলা যুদ্ধের মতো হলেও যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের প্রায় একটা নিখুত অভিনয় মাত্র। শৌর্য, বীর্য, ক্রোধ, অসূয়া এই ভয়ঙ্কর রসায়ন কেবলমাত্র সেই নির্দিষ্ট জুটি প্রারম্ভিক ও অন্তিম ঘণ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারপর নায়করাও মানুষ, প্রতিনায়করাও অতি সদাশয়।

যাঁরা ক্রিকেট ভালবাসেন তাঁরা কেউ বুঝিয়ে বলতে পারেননি আমায়—কি তাঁরা আলাদা করে ভালবাসেন। প্রিয় দলের প্রতি আনুগত্য, রণকৌশলের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, নাকি যুদ্ধের উত্তেজনা।

যদি আমি ক্রিকেটকে একটুও ভালবাসি, তা বোধহয়—রোজকার এই যুদ্ধটা আপাতশান্তিতে শেষ হয় বলে। আজকাল অবশ্য তা-ও খুব একটা হয় না।

মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল এক ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধর্মের গতি সত্যিই 'অতীব সূক্ষ্ম'। কিন্তু সে-ধর্ম কোনও অন্ধ বিশ্বাস নয়। ক্রিকেটের মধ্যে যে ধর্মের অনুপ্রবেশ দেখি সে অন্য ধর্ম · মাঠের বাইরে এসেই যে ধর্ম কোনও বিশ্ববিস্ফোরক রূপ নিতে পারে।

তখন আমার বড় ভয় করে।

১০ জানুয়ারি, ২০১০

মনে পড়ছে না সঠিক। তবে আবছা যতটুকু মনে করতে পারছি, আমার জীবনে শোনা প্রথম ছদ্মনাম বোধহয় 'স্বপনবুড়ো'। ছোট ছেলেপুলের গল্প-বলা বন্ধু। সেই বয়সে, যে বয়সে সান্তাক্লজ সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি, জাদুকর ম্যানড্রেক সত্যি—'স্বপনবুড়ো' নামের আড়ালে যে অন্য কোনও মানুষ আছেন; সে সন্দেহও হয়নি ক্ষণেকের জন্য।

তারপর, বয়স বাড়ল। জরাসন্ধ, কালকূট, নীললোহিত, রূপদর্শী-রা সার দিয়ে এসে জমা হলেন বইয়ের তাকে। ততদিনে নামগুলোর পিছনের মানুষগুলোকে চিনি। এমনকী, 'স্বপনবুড়ো'-ও যে আদতে অখিল নিয়োগী, তা-ও জেনে গিয়েছি।

'কালকূট' নামটার একটা বাৎসরিক পুনরাবৃত্তি ছিল, প্রায় রেডিও-র 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র মতোই। সেটা বছরে-বছরে শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত নতুন-নতুন উপন্যাসের জন্য নয়। প্রধানত জানুয়ারির গোড়ার দিকে যখন হিমেল হাওয়া দিত, খবরের কাগজে কুম্ভমেলার প্রস্তুতির, সাধু সমাগমের ছবি ছাপা হত বড় বড় করে, আমাদের মতো, জানি না অনেক বাঙালি বাড়িতেই বোধহয়, ফিরে-ফিরে আসত সেই অমোঘ নামটা—'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'।

উপন্যাসটার আখ্যানাংশ যে সবার মনে সদাজাগরুক হয়ে ছিল এমন নয়, কিন্তু নামটার মধ্যে এমন একটা ছন্দঝংকার নিহিত ছিল, যেটা উচ্চারণকরলেই যেন কুম্ভ-দর্শনের পুণ্য অর্জন করতেন অনেক বাঙালি পাঠক।

কালকূট-এর 'কোথায় পাব তারে'-ও বড় চমৎকার নাম। উপন্যাসটার কথা ছেড়েই দিচ্ছি।

তা সত্ত্বেও কেমন করে যেন বাঙালির পুণ্যপ্রীতি, আর সাহিত্যপ্রেমের মাঝখানে পড়ে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' বইটা একটা পবিত্র-বই হয়ে গেল বাঙালি জীবনে।

পৌষ সংক্রান্তির সঙ্গে আমরা সাধারণভাবে অনেক চেনা জিনিস খুঁজে পাই—পিঠেপুলি, গঙ্গাসাগর, জমিয়ে শীত... ইত্যাদি অনেক কিছু।

কিন্তু অবচেতনের ভিতর থেকে যে শব্দবন্ধ আজও এসে পৌষ সংক্রান্তিকে কাব্যময় করে দেয় বাঙালির জীবনে তা বোধকরি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'।

আজ তাই পৌষ-শেষের এই 'রোববার' আমরা নামাঙ্কিত করলাম সেই অমোঘ স্রষ্টার নামে—যিনি কালকূট, এবং সেই অমৃতগ্রন্থের রচয়িতা।

সমরেশ বসু-র কথাও নিশ্চয় পরে একদিন ভাবব।

শুভেচ্ছান্তে

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

বিচ্ছেদ ছাড়া কোনও প্রেম পূর্ণতা পায় না—তাই তো শুনে এসেছি চিরকাল।

পরিণয় যদি প্রেমের গন্তব্য হয়, তবে বিচ্ছেদ হয়তো বা এক অদৃশ্য ভবিতব্য। প্রেম কবে পরিণয়ের পূর্ণতা পাবে—সেই স্বপ্ন দিয়ে যেমন শুরু হয় যে কোনও প্রণয়যাত্রা; বিচ্ছেদও যে অদৃশ্যে এক গোপন আততায়ীর মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রেমের সেই জটিল সরণির কোনও এক বাঁকে—এই দুঃস্বপ্ন ছাড়াই বা কোন প্রেম কবে এগিয়েছে এক পা?

যেদিন থেকে প্রণয় শুরু হয়, শুরু হয় এক চূড়ান্ত চিরকালীন মিলনের স্বপ্ন দিয়ে, পাশাপাশি বিচ্ছেদ এসে কবে কীভাবে চুরমার করবে সেই কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী, এও যেন প্রেমের পথ চলার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মিলনের চেহারা অনেকটা প্রত্যাশিত। বিচ্ছেদ কখন কীভাবে কবে এসে দাঁড়াবে দুই প্রণয়ীর মাঝখানে—তা নিয়ে সারাজীবনের নানা গোপন জল্পনা-কল্পনা। এই একটা জায়গায় হয়তো

প্রণয়ীযুগলও ভিন্নমত। দু'জনেই বিচ্ছেদকে হয়তো দেখেন দু'টো বিপরীত সম্ভাবনার ছায়ায় দাঁড়িয়ে। কোথাও কোথাও সেই সদাকম্পমান অতিকায় ছায়া আঙুলে আঙুল মেলায় কোথাও থাকে আলাদা।

'ডিভোর্স' কথাটা আমাদের ছোটবেলায় একটা অসামাজিক শব্দ ছিল। কারণ আজন্মবিচ্ছিন্ন দম্পতিরাও সামাজিক চিরসহবাস করে প্রমাণ করে দিতেন যে সঙ্গে থাকাটাই আসল সত্য।

আজ সেই 'ডিভোর্স' শব্দটারই অন্য একটা মানে স্বাধীনতা। অদৃশ্য বিচ্ছেদের গ্লানি থেকে দৃশ্যমান মুক্তির এক প্রসারিত সংজ্ঞা।

আগে আমরা জানতাম কোনও সম্পর্কের অস্তিমতা যে কোনও একজনের আয়ুষ্কাল দিয়ে নির্ধারিত। আজ আমরা জানি, এবং প্রায় সবসময় সচেতনভাবে মনেও রাখি যে, সব সম্পর্কেরই একটা expiry date আছে। সেটা কে ঠিক করবে—প্রাণহীনতা না প্রেমহীনতা, আমরা জানি না।

এখন ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে'-র সময়। প্রেমকে বিভূষিত করার বসন্তসমাগম। কিন্তু যে প্রেম অবধারিতভাবে এগিয়ে যাবেই মিলনকে পার করে কোনও একদিন কোনও বিচ্ছেদ বৈতরণীর পারে—প্রণয়ের সেই জটিল অবাঞ্ছিত অবশ্যম্ভাবিতাই আমাদের এই সংখ্যার বিষয়।

মিলনকে বিচ্ছেদ দিয়ে, বা বিচ্ছেদকে আরও বড় কোনও যোগাযোগ ভেবে যাঁরা নিজেদের সম্পর্কের হাত ধরে এগিয়ে চলেছেন সেই সব প্রণয়ীর জন্য ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে'-র শুভেচ্ছা রইল।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

দু'সপ্তাহ আগেই গেল পৃথিবী জুড়ে মদনোৎসব—ভ্যালেন্টাইন'স ডে।

আর তার পিছু ঘেঁষেই এসে আমাদের ভারতজোড়া বসন্তোৎসব। মদনের উৎসব। বর্ণের উৎসব।

তাই এবার আমাদের সংখ্যা রং নিয়ে। রংবাজি। রং কথাটা কেমন যেন মন ভাল করে দেওয়া কথা।

লাল, নীল, হলুদ, সবুজের আনন্দ যেন বর্ণহীন জীবনকে সুন্দর করার জন্যই সৃজিত।

একমাত্র কালো রং-ই অন্ধকারের রং। আর সাদা তার সমস্ত পবিত্রতা নিয়েও মাঝে-মাঝে শূন্যতার কথা মনে করায়।

তা ছাড়া, রং মানেই সাধারণত আনন্দ-অনুষঙ্গ। কিন্তু ছোট পানসিতে করে যে মানুষগুলো মাছ ধরতে যায় মাঝসমুদ্রে, আর দিগন্ত জুড়ে যখন আকাশের রং গাঢ় থেকে গাঢ়তম হতে থাকে,

বাতাসের জোরে টলমল করে পানসি—তখন কি সত্যিই চোখে পড়ে ওই গভীর আকাশের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কত বেগুনি, গাঢ় নীল, গভীর ধূসরের শুরু।

কিংবা যখন গভীর রাতে ধড়মড় করে ঘুমভাঙা-চোখে জেগে ওঠে গ্রামশুদ্ধু লোক হঠাৎ লাগা আগুনের চাপে, তখন আঁধার আকাশের গায়ে জ্বলন্ত কমলা রঙের ফুলকির দিকে তাকিয়ে দেখে ক'জন। বা যখন আমেরিকার নানা এয়ারপোর্টে দেখেছি সিকিওরিটি-র আগে আলাদা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলো মানুষকে। যার মধ্যে হয়তো আমিও আছি—আর কিছুতেই পরস্পরের গায়ের রঙের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না-কোনও কালিমার চিহ্ন যেটা সহজেই চোখে পড়ছে আমেরিকার পুলিশদের।

নাঃ! রং নিয়ে বড্ড শক্ত-শক্ত কথা হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা এসে যখন বলে,

—ফাটাফাটি একটা মেয়েকে দেখলাম। পার্টি-টার্টি দে না একটা। আলাপ করা যাবে।

তারপর তারা বর্ণনা করতে বসে। জিগ্যেস করি,

—কী পরেছিল রে?

কাঁচুমাচু মুখে বলে

—কী জানি, শাড়ি নয়।

—ও! কী রঙের?

—দেখিনি তো।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

কী দিয়ে বুঝি পুরুষ বা নারী? আকৃতিতে? না আত্মায়? না কি নাম দিয়ে? আ-কারান্ত, ই-কারান্ত শব্দরা নাকি স্ত্রীলিঙ্গ। তেমনই তো পড়েছিলাম ছোটবেলায়।

সেই থেকেই তো নদী নারী। সমুদ্র পুরুষ। আবার কখনও কখনও কোনও নদীর নারী হতে লজ্জা করে। তখন তারা আত্মপরিচয় দেয় পুরুষ বলে—যেমন অজয় বা ব্রহ্মপুত্র।

কেবল ইচ্ছে দিয়েই কি নারী হওয়া যায়, কিংবা পুরুষ?

মহাভারত তো বলে—যায়। সেখানে অম্বা হয়েছিল শিখণ্ডী, বালকবেশী চিত্রাঙ্গদা হয়েছিল পূর্ণ যুবতী। মহাভারত অবশ্য 'ইচ্ছে' বলেনি। বলেছে 'তপস্যা'। মহাদেবের বর। অনঙ্গের বরাভয়।

সেই মদন, সেই শিব কি উঠে এসেছিলেন ওদের অন্তরের গভীরতম ইচ্ছের রূপ ধরে—তাদের নতুন জীবন দিতে?

কেবল জীববিজ্ঞানীর ভাগ-করা পুরুষ আর নারীর বাইরে আর কোথায় কী করে হয় লিঙ্গ নির্ধারণ?

অনেক সময়ই তো দেখি—কবি বা শিল্পী পুরনো ভাগ করাকে মেনে নিলেন না। নতুন করে নারীকে পুরুষ করলেন, কিংবা পুরুষকে নারী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্প লিখলেন—'মহানগর'। সত্যজিৎ ছবিতেও অপরিবর্তিত রাখলেন সেই নাম।

অথচ, আদতে ছবির মূল যাত্রা কিন্তু এক নারীর হাত ধরে।

তার ব্যক্তিত্বের বিভাতেও তো মহানগর হয়ে উঠল না—মহানগরী।

অথচ সে হল। মহানগরী-ই হল। দৈনিক সংবাদপত্রে টিভি হেডলাইনে—বারবার, রোজ রোজ মহানগরী হয়ে উঠল আমার শহর কলকাতা।

কেন? সেটা কেবল আ-কারান্ত-শব্দ বলে?

জানি না। কে-ই বা জানতে চায়?

সত্যিই যদি প্রিয় নারী বলে কাউকে ভালবাসি? বারবার ফিরতে ইচ্ছে করে যাঁর কাছে? যিনি সেই কবির মানসীর মতো, যে-কবি কোনও একদিন কবিতার পঞ্চশরে বর দিয়েছিলেন আমার শহরকে—কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।

বাঙালির কাছে গ্ল্যামারের থেকেও লাবণ্যের কদর বেশি ছিল একদিন। আজ হয়তো কতকটা বদলেছে। আমার প্রিয় নারী সেই লাবণ্যভঙ্গির সুষমার মধ্যেই জুড়ে নিয়েছে নতুন গ্ল্যামারের অলংকার। বিশাল আঁকাশছোয়া হালফিলের শপিং মলের পিছনেও শ্রাবণ আকাশের কালো মেঘ, যেন গলার গয়নাটি ছাড়িয়ে একটু ওপরে তাকালেই কালো ঘন চুল।

কোনও হলুদ-ভোরে, বা কনে-দেখা বিকেলে আমার শহরের সব ঝিলমিল যখন নিভে যাবে বা জ্বলে উঠবে, গয়না পরার বা খোলার সেই মুহূর্তটায় বড় করুণ সুন্দরী আমার কলকাতা।

আমার মহানগরী। আমার মহাগর্ভধারিণী। আমার কল্লোলিনী তিলোত্তমা।

৭ মার্চ, ২০১০

নতুন ছবি শুরু করার সময় হয়ে এল। শরদিন্দু-'সত্যান্বেষী' ব্যোমকেশ অবলম্বনে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ইতিমধ্যে হয়তো আপনাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, আমার ছবিতে ব্যোমকেশ-এর ভূমিকায় সুজয় ঘোষ—সাম্প্রতিক কালে 'কহানি' ছবিটি পরিচালনা করে যাঁর প্রভূত খ্যাতি হয়েছে ভারতজুড়ে।

ব্যোমকেশ-সহকারী অজিতের ভূমিকায় আছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, আমাদের 'রোববার'-এর অনিন্দ্য, চন্দ্রবিন্দু-র অনিন্দ্য, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গীতিকার অনিন্দ্য আর আমার 'শুভ মহরত'-এর অনিন্দ্য।

আমার নতুন চিত্রনাট্যে অজিত ব্যোমকেশের সহকারী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তেমনটি নন। তিনি মেধা, মনীষা ও বুদ্ধিতে প্রায় ব্যোমকেশের সমকক্ষ। অর্থাৎ যথার্থ সহকর্মী।

আমার সেই সম্পাদক-সহকর্মীর হাতে আপাতত কাগজের দায়িত্ব ফেলে আমি চললাম উত্তরবঙ্গে। শুটিং লোকেশন দেখতে। জানি না, সেখানে থাকার ব্যবস্থা কীরকম হবে।

তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় হলে একটা ডাকবাংলো নিশ্চয়ই পেয়ে যেতাম। অতএব, দুধের স্বাদ ঘোলে।

ডাকবাংলো 'রোববার'-এর পাতাতেই ছুটির নিমন্ত্রণ জানাক।

১০ মার্চ, ২০১০

'যাত্রা' কথাটা সত্যিই কি travelling troup থেকে? মনে তো হয় তাই। পণ্ডিতরা নিশ্চিত জানবেন।

কিন্তু সত্যিই, আজ এখানে—কাল ওখানে। এইভাবে এক যাযাবরী বিনোদন পালা যে বাংলার একটা বিশেষ ধরনের আনন্দোৎসব হয়ে উঠতে পারে—এটা কেবলমাত্র প্রাদেশিকভাবে বিশিষ্ট না-হলেও এর নিঃসন্দেহে একটা অন্য আকর্ষণ আছে।

যদিও আমরা যখন বড় হচ্ছি, তখন ধীরে ধীরে প্রায় অপস্রিয়মাণ যাত্রাপাড়ারও একটা নব-অভ্যুত্থান ঘটছে, খবরের কাগজে সিনেমার পাতাজুড়ে যাত্রার বড়-বড় বিজ্ঞাপন, রাতে রেডিও-র 'বিবিধ ভারতী'-র নানা পালার টুকরো-টুকরো অনুষ্ঠান— নানান যাত্রাপালা মাঝে মাঝেই মহাজাতি সদন মঞ্চে উদ্বোধন-সন্ধ্যা পরিবেশন করত—তবু কেন জানি, যাত্রা সেভাবে কলকাতা শহরের নাগরিক বিনোদন হয়ে উঠতে পারল না। যাত্রা আমাদের সংস্কৃতির মূল। আমাদের লৌকিক বিনোদনের গোড়ার কথা—এত সব বড়-বড় কথা বলেও যাত্রা যেন 'ছৌ' নাচ বা কবিগানের

মতোই ব্রাত্য অথচ বিশেষ হয়ে রইল শৌখিন নাগরিক রসিকসমাজের কাছে?

আমরা যাত্রার মহিমা বুঝলাম সিনেমা দেখে। উত্তমকুমারের 'বিভাস' বা 'মঞ্জরী অপেরা'-র ছাঁকনি দিয়ে যাত্রা বাঙালি নাগরিক-দর্শকের জীবনে ফিরল।

বাংলার বিনোদন শিল্পে যাত্রা সত্যিই একটা myth। সেখানে দুর্জয়কণ্ঠ শিল্পীরা থাকেন। বিবেকের গান প্রায় গ্রিক কোরাসের মতো নিয়মিত তাড়া করে মঞ্চ-দুষ্কৃতীকে, আবার মোহভঙ্গের চূড়ান্ত উদাহরণও এই যাত্রার সাজঘর, যেখানে সীতাকে বিড়ি খেতে দেখার মতো প্রবাদপ্রতিম দৃশ্য দেখা যায়।

জীবন-অতিক্রমী অভিনয়ের ধারা না কি যাত্রা দিয়েই শুরু। সিনেমার মার্জিত অভিনয়ের পাশে আজ সেই 'অতিকায়' অভিনয়শৈলী অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছে। ফলে, যে-বৈশিষ্ট্য দিয়ে অভিনেতা এই অভিনয়টুকু করতেন সেটা আজ সত্যিই অনুধাবনযোগ্য নয়। এবং, সেইভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে সেই শিল্পীদের অতুলনীয় শিল্পবৈভব। আসলে আমরা হয়তো ভুলে যাই যে পৃথিবীর সব প্রদর্শন- শিল্পই সিনেমা বা টেলিভিশনের পর্দায় বন্দি হওয়ার জন্য জন্মায়নি।

সম্প্রতি, আমি একটি ছবিতে অভিনয় করলাম। খবরের কাগজের বিবিধ সংবাদ ও ছবির কল্যাণে তথ্যটা আর আপনাদের কাছে অপরিচিত নয়।

কৌশিক গাঙ্গুলী পরিচালিত 'আরেকটি প্রেমের গল্প'। সেখানে আমার সঙ্গে অভিনয় করলেন প্রবীণ যাত্রাশিল্পী চপল ভাদুড়ি, একসময়ে মহিলা চরিত্রের রূপকার হিসেবে যিনি 'চপলরানি' বলে বিখ্যাত ছিলেন।

ছবিতে একটি দৃশ্যে শীতলাদেবীর ভূমিকায় তাঁর একটি অভিনয়াংশ আছে।

দৃশ্যটি ডাব করতে গিয়ে দেখা গেল চপলদার নিজের কণ্ঠই নিজেকে অনুসরণ করতে পারছে না। ফলে শুটিং-এর মৌলিক অভিনয়টি অন্যান্য শব্দমুক্ত করে রেখে দেওয়া হল ছবিতে। এবং, আমরা, সিনেমা-কর্মীরা, যারা ভাবি প্রযুক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জিতে নেব যে কোনও শিল্পমাধ্যম কেমন যেন পরাজিত, লজ্জিত, চুপ করে মেনে নিলাম নিজেদের অক্ষমতা।

ব্রাত্যজনের অভিনয়ের কাছে আধুনিক, মার্জিত প্রযুক্তি ক্ষণেকের তরে নতশির হল।

আমরা আবার না বুঝতে চেয়েও জোর করে বুঝলাম যে, দেশ-কালের আগল ভেঙে কোনও না কোনও সত্য স্পর্শাতীত ভাবে থেকে যায়—যার নামই বোধহয় শিল্প।

২১ মার্চ, ২০১০

একটা মজার ঘটনা ঘটল কয়েক দিন আগে। এই যে দ্বিতীয় ছবিটিতে অভিনয় করলাম, তার জন্য আমায় কান ফুটো করতে হল—চরিত্রের প্রয়োজনে।

এমনিতে আপনারা আমাকে এতদিন এতরকম গয়না পরে দেখেছেন, কানে দুলটা দেখতে পাননি।

কারণ শরীর ফুটিয়ে গয়না পরার বিরুদ্ধে আমার একটা ভিতর থেকে নালিশ ছিল—আমার কেমন যেন বর্বরোচিত লাগত।

শেষমেশ এই নতুন চরিত্রটা আমার সব বিদ্রোহ ভেঙে আমায় কর্ণভেদ্য সূচীবন্দুকের সামনে নিঃসংকোচে দাঁড় করাল।

আমার ব্যথাও লাগল না, অসুবিধেও হল না। দিব্যি কানে দুল পরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। যেন আজীবন পরে এসেছি।

ডা. পিয়ালী চ্যাটার্জি, যাকে আমি কোনওদিন ডাক্তার বলে আমি পাত্তাই দিই না, এবং সে-ও আমাকে কোনও কেউকেটা বলে রেয়াত করে না—ছোটবোনের ভালবাসা দিয়েই ধমকায়, আমায় বোঝাল যে, ছ'সপ্তাহ টানা দুল না-পরে থাকলে কানের ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে।

পিয়ালীর ধমকের কাছে আমি নিতান্তই বাধ্য বালক। একবারের জন্যও দুল খুললাম না।

প্রথম প্রথম ঘুমোনোর সময় পাশ ফিরলে কানে ফুটত, তারপর অভ্যেস হয়ে গেল।

সমস্যাটা হল ক'দিন পর। থেকে থেকে কানে তালা লেগে যায়—বিশেষ করে বাঁ কানে। আমি মোবাইল ফোন ডান কানে রেখেই কথা বলি, আমার চিরাচরিত অভ্যেসে। বাঁ কানটার ওপর এমনিই আমার ভরসা কম। কিন্তু তাই বলে এতটা দুর্বল তো ছিল না আমার বাঁ কানটা।

শুটিং-এর সময় দেখলাম নিজের গলাটাও কেমন যেন একটা ঘুরে-ঘুরে আসছে নিজের কানে। অভিনয় করব কি?

আর মনে হচ্ছে কানের ভিতর ভীষণ ময়লা, বারবার ইয়ার বাড্ দিয়ে পরিষ্কার করেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না।

ভাবলাম, কে জানে এ সব হয়তো বুড়ো বয়সে কান ফোটানোর দুর্গতি। আবার স্বাভাবিক বুদ্ধি বলছে তা হলে এক কানে কেন, ফুটিয়েছি তো দু'টো কানই।

শুটিং শেষ হতেই বন্ধু-ডাক্তার রাজীব শীলের শরণাপন্ন হলাম। বললাম—আমার কানটা গিয়েছে। একটা গতি করো।

রাজীব বেচারা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ডা. জ্ঞানব্রত রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েনমেন্ট করিয়ে দিয়ে, নিজে থেকে পুরো ব্যাপারটা বুঝবে বলে সতেরোটা কাজের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে এসে, হাঁফাতে-হাঁফাতে আমাকে জ্ঞানব্রতবাবুর চেম্বার অবধি পাকড়াও করে নিয়ে গেল।

ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে আমার ভোগান্তির গল্প শুনলেন।

আমি কান ফোটানোর ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেলাম। এমনকী রাজীবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম যখন ডাক্তার-চেম্বারের বাইরে গাড়িতে, দুল দু'টো খুলে ব্যাগের মধ্যে ভরেও ফেলেছি।

পুরোটা শুনে, এবং কানের ভিতর তালা লাগা ভাব, প্রায়ই কান বন্ধ শুনে—আমায় বসিয়ে ডানকানটা মন দিয়ে দেখলেন। বললেন—না তো, কান তো পরিষ্কার।

—আহা! আমার সমস্যাটা তো বাঁ কানে।

ভদ্রলোকের ডাক্তারি টর্চ, যন্ত্রপাতি পাশ ফিরল।

মন দিয়ে বাঁ কানটা দেখতে দেখতে বললেন

—আপনার কি অস্বস্তি হয়?

—কানে ময়লা জমে আছে মনে হয়।

—তখন আপনি কি করেন?

—ইয়ার বাড দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি।

—আর করবেন না প্লিজ।

বলে ডাঃ রায়চৌধুরী চিমটে দিয়ে কানের ভিতর থেকে তিনটে ইয়ার বাড-এর তুলো বের করে আনলেন। যেগুলো বিভিন্ন সময় কানের ভিতর থেকে গিয়েছে।

আর আমি মনের মতো করে কান পরিষ্কার করে অন্যমনস্কভাবে সেগুলো ফেলে দিয়েছি, তাকিয়েও দেখিনি যে কাঠিতে তুলোটা নেই।

তুলো তিনটে বের করে ভদ্রলোক সস্নেহে বললেন,

—কি এবার আরাম লাগছে? Better শুনছেন?

বললাম,

—কি আশ্চর্য! চোখের সামনে দেখলাম তিন-তিনটে তুলো বেরল—তাতে তো স্বাভাবিক ভাবেই আশ্বস্ত হওয়ার কথা!

ভদ্রলোক আর কী কথা বাড়াবেন। আমি উল্লসিত ভাবে বললাম,

—আমার কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে। রাজীব এবং জ্ঞানব্রতবাবু যুগপৎ বিস্মিত। আমি আনন্দিত মুখে বলে গেলাম,

—দেখুন, আমার এটা ভেবে ভাল লাগছে, যে, আমার self perception কি Strong. সত্যি আমার কানে একটা জেনুইন অস্বস্তি ছিল। এটা আমি imagine করিনি।

আমার এই সদ্যাবিষ্কৃত আত্মগরিমায় ভেবেছিলাম দু'জনেই বেশ সপ্রশংস হবেন।

ডা. রায়চৌধুরী ভীষণ নির্লিপ্ত মুখে জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন কণ্ঠে বললেন,

—এতটুকু self perception-ও যদি না থাকত, তা হলে আপনার ছবিগুলো আমরা মন দিয়ে দেখতাম না মিঃ ঘোষ।

২৫ এপ্রিল, ২০১০

'পাচার'। আমাদের এবারের সংখ্যা।

পাচার কথাটার মধ্যে একটা অবধারিত কলঙ্ক আছে।

'চালান' কথাটা হয়তো তেমন সাত্ত্বিক নয়; কিন্তু পাচার শব্দটির মতো পাপবিদ্ধও নয় বোধহয় অতটা।

পাচার করে দুষ্কৃতীরা।

নানা ধরনের পাচার।

বিদেশি অননুমোদিত জিনিস, সোনা, মাদকদ্রব্য, নারী ইত্যাদি।

আমাদের এবারের সংখ্যায় নিশ্চয়ই এই কুকীর্তির মননশীল বিশ্লেষণ থাকবে।

আমাকে যখন প্রচ্ছদ-কাহিনিটা ঘটা করে জানানো হল দপ্তর থেকে আমি তো আতান্তরে—

পাচার নিয়ে কী লিখব আমি। এই সমস্যা নিয়ে কাজ করে চলেছেন অনেক মানুষ, প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থার বাইরেও। এমন নয় যে তাঁদের কাউকে আমি চিনি না, কোনও পরিচয় নেই, তবু শেষ মুহূর্তে কী পাচার, কারা করছে, কে জানছে, পুরোটা একটা ধাঁধার মতো হয়ে গেল।

আকাশপাতাল অনেক ভাবলাম। তারপরেই হঠাৎ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আমার অতিপ্রিয় এক পাচার-ভাবনা।

কথাটা অত্যন্ত অদ্ভুত নিঃসন্দেহে। পাচার কারও প্রিয় কি করেই বা হতে পারে? কিন্তু আমার কাছে সেটা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই—ওই যে বললাম, জলের মতো পরিষ্কার।

যদিও সে-জল তেমন পরিষ্কার ছিল না। হাজা-মজা, স্থির, পানার আস্তরণে ঢাকা জল। যে-জলের মধ্যে মৃতা দিদির চুরি করা হারটাকে চিরকালের মতো পাচার করে দিয়েছিল এক গ্রাম্য বালক।

হ্যাঁ। আমরা 'পথের পাঁচালী'-র সেই বিখ্যাত দৃশ্যের কথাই বলছি।

সেখানে অকালমৃতা দিদির সামান্য কলঙ্কের ভার ঘন হয়ে চেপে বসে অপুর ছোট্ট দু'টো কাঁধে।

নারকোলের মালার ভিতর থেকে গড়িয়ে পড়া হারের গায়ে মাকড়সার পিচ্ছিল স্পর্শ তখনও জ্যান্ত।

এই এতগুলো কলুষকে একসঙ্গে সামলাতে পারে না যেন সেই নিষ্পাপ বালক-মন। পারে না জীবনের প্রথম দেখা পাপের সামনে দাঁড়াতে। তারপরেই সেই মজা পুকুরের ধার। সেখানে দাঁড়িয়ে সেই সদ্য পাপস্নাত বালক।

ছোট দু'টো হাতের সমস্ত জোর দিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দেয় সেই লুকোনো হার—দিদির অজানা এক কলঙ্ক।

গ্রামের মজা পুকুর আরও অনেক অপরাধের মতো গ্রাস করে সেই বালকের পাপাঞ্জলি। স্মৃতির কলঙ্ক, না কি কলঙ্কের স্মৃতি—পাচার হয়ে যায় চিরদিনের মতো।

এই বোধহয় প্রথম। পাচারকারীই আমাদের সব সমবেদনা কেড়ে নেয়। এবং এই পাপস্খলনের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন মায়ার বন্ধনে আমাদের জড়িয়ে ফেলে, 'পাচার' কথাটার অপরাধবোধের ওপর যেন নেমে আসে এক অদ্ভুত অস্বচ্ছ কুয়াশা। ঠিক যেমনটি নেমে আসবে শীতের বিকেলে নিশ্চিন্দিপুরের ওই মজা পুকুর ঘিরে।

২৭ জুন, ২০১০

আষাঢ় মাসের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক কিছুই ঢুকে পড়ে আমাদের জীবনে।

কেবল আষাঢ় মাসটাই যেন আসে না সময়মতো। দূরপাল্লার ট্রেন যেমন বহু দূর-দূর দেশ পেরিয়ে ঠিক লিলুয়া পেরিয়েই কেমন যেন ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে বিশ্রাম নেয়, যে কারণে ঠাট্টা করে হাওড়া-লিলুয়ার মধ্যবর্তী জায়গাটার নামই হয়ে গেল 'হালুয়া', আর যাত্রীদের স্টেশনে নিতে এসেছেন যাঁরা তাঁরা অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন, আর বারবার ভাবেন ট্রেন কত লেট—আমাদের এখন সেই অবস্থা।

ক্যালেন্ডারে জ্যৈষ্ঠ ছাড়িয়ে আষাঢ় মাস পড়ে গেল। কিন্তু বর্ষার তেমন কোনও নামগন্ধ নেই।

বর্ষাগমের সংখ্যা আমাদের 'খিচুড়ি'।

কিন্তু সত্যিই তো কোথায় বর্ষা! ফলে কোথায় খিচুড়ি?

বর্ষা এলেও শহরে বসে কয়েকদিন মাত্র তার প্রবল দাপট বুঝতে পারি। রাস্তায় জল জমা, ঝড়ে গাছ পড়া, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা—মাত্র কয়েকদিন। তারপর আবার যে কে সেই।

বর্ষা যেন ঋতুচক্রে ভাইরাল ফিভার-এর মতো। কয়েক দিনের জন্য বেশ জ্বর। একটু কাবু-কাবু। আবার যে কে সেই।

আর সেই জ্বরের পথ্যি খিচুড়ি।

বাংলার বাইরে অনেক জায়গায় সত্যিই খিচুড়ি হল গিয়ে রোগীর পথ্য—আপনারা জানতেন? আমি অনেক পরে জেনেছি।

আর সে-কথা জেনে খিচুড়ির রোমাঞ্চও কেমন যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে আমার কাছে।

তারপরেও আমি জানি। একসময়ে হালুয়ায় আবার সচল হবে ট্রেনের কামরা। মালপত্র গোছানোর হইচই শুরু হবে।

ঠিক যেমন মেঘাড়ম্বরে ভরে যায় আকাশ। আর মাটির সোঁদা গন্ধ নিয়ে বৃষ্টি নামে। হোক না ক্ষণস্থায়ী, তাকে নিয়ে কয়েকদিনের উৎসবে মাতি না কেন? আর খিচুড়ি ইলিশমাছ ভাজা ছাড়া কবে কোন বাঙালির বর্ষামঙ্গল সম্পূর্ণ হয়েছে?

৪ জুলাই, ২০১০

স্টেশন কথাটা অনেক সময় পাঞ্জাবি উচ্চারণে হয়ে দাঁড়ায় 'স্‌টেশন'।

আমরা বাঙালিরা সেটা নিয়ে প্রভূত হাসাহাসি করি।

আর, আমরা যখন স্টেশন, স্কুল ইত্যাদি শব্দগুলোকে ইস্টিশন, ইশ্‌কুল বলি, তখন যেন তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভরপুর লাবণ্য।

'ইস্টিশন' শব্দটা আমাদের একটা বড় প্রিয় জায়গাকে বর্ণনা করে। স্টেশন বললেই তার সেই মাধুর্যটা কোথায় যেন ভিড়ে হারিয়ে যায়।

'ইস্টিশন' মানেই রেললাইনের ধারে একটা নিরালা, নির্জন বাঁধানো জায়গা যেখানে কেবল যেন আকাশজোড়া কালো ধোঁয়ার কয়লা-ট্রেনেরই এসে দাঁড়ানোর অধিকার আছে। যার কামরাগুলো ইট রঙের, যার জানলার আড়াআড়ি শিকের ওপারে এক ভ্রাম্যমাণ পৃথিবী, আর এপারে কাঠের বেঞ্চিতে অপেক্ষারত যাত্রী, বা বিদায়ী আত্মীয়বন্ধু।

আজকালকার ইলেকট্রিক ট্রেন কেবল স্টেশনেই এসে দাঁড়াতে পারে। তার সমস্ত গতিকে দ্রুত স্টেশনময় ছড়িয়ে দিয়ে।

ইস্টিশন যুগ-যুগ ধরে অপেক্ষা করতে পারে—ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে, নিঝুম রাতে, বা পাখি-ডাকা সবে-ফরসা আকাশের তলায়।

আজকাল ট্রেনে চড়া কমে গিয়েছে। আর চড়লেও এয়ারকন্ডিশন কামরায়, যেখান থেকে বাইরের স্টেশনগুলো সব ক'টাই যেন এক, কোনওটা কোনওটার থেকে আলাদা নয়।

ছোটবেলায় মনে আছে আমরা সবাই—বাবা, মা, ভাই, আমি যখন পুজোর ছুটিতে বেড়াতে

যেতাম, আর একেকটা স্টেশন এলেই বাবা একবার অন্তত নামত, হয় জলের বোতলে জল ভরার জন্য, নয় আঞ্চলিক খাবারের বৈশিষ্ট্য দেখার জন্য, আর মা কেবল হাঁকপাঁক করত—কী দরকার, কখন ট্রেন ছেড়ে দেবে, তখন কোনওদিন বাবার সেই ফাঁকি দিয়ে স্টেশনে নামার কারণ বুঝতে পারিনি। মায়ের পক্ষ নিয়ে রাগই হত বাবার ওপর, শুধু শুধু মা'কে কেন ভাবাচ্ছে!

আজ যখন প্লেনে করে ঘুরে বেড়াই, যেখানে পথে কোনও স্টেশন পড়ে না—মাঝে মাঝে মনে হয়, যাত্রাশুরু আর গন্তব্যের মাঝখানের ক্ষণিক বিশ্রামগুলোর নামই ইস্টিশন—যারা একরকমভাবে অপরূপ হয়েও আলাদা।

অনেক বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন সবে 'হীরের আংটি' শেষ হয়েছে। আমি আর আমার আলোকচিত্রী গিরিশ পাধিয়ার মাদ্রাজ থেকে প্রিন্ট নিয়ে কলকাতা ফিরছি। যত দূর মনে পড়ে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে।

ঠা-ঠা দুপুর। সারা ট্রেনই ঝিমোচ্ছে। গিরিশদা ওপরের বাঙ্কে উঠে গিয়েছে একচোট দিবানিদ্রার জন্য। আর আমি নীচের সিটে জানলার ধারে গল্পের বই হাতে।

হঠাৎ ট্রেনের দুলুনি কমল, থামল, জানলার বাইরে চোখ মেলে দেখি একটা স্টেশন। হলদে, সাইনপোস্টের গায়ে দক্ষিণী কোনও আঞ্চলিক অক্ষরে স্টেশনের নাম লেখা—আমার পড়ে বোঝার জো নেই, ফলে আমার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা।

খালি স্টেশনে একটা গাছের তলায় বাঁধানো সিমেন্টের বেদিতে বসে আছে এক সদ্যবিবাহিত দম্পতি—বিয়ের সাজে, সঙ্গে কিছু নতুন তোরঙ্গ ইত্যাদি। না জানি কোন ভবিষ্যৎ সংসারগামী ট্রেনের অপেক্ষায়।

ছোট স্টেশন, অতক্ষণ দাঁড়ানোর কথাই নয় ট্রেনটার। তবু যেন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

আমার গল্পের বই বন্ধ। জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই অচেনা অক্ষর লেখা হলুদ সাইনপোস্টটা কেমন যেন নিশির ডাকের মতো হাতছানি দিতে লাগল।

ক্ষণেকের জন্য মনে হল স্টেশনটা যেন আমায় ডাকছে। কী হবে যদি নেমে যাই? পড়ে থাকবে মালপত্র, পড়ে থাকবে আমার প্রথম ছবির প্রিন্ট, অকাতরে ঘুমিয়ে থাকবে গিরিশদা। আর আমি, হাওয়াই চটি পায়ে নেমে গিয়ে দাঁড়াব এক অচেনা-ভূমিতে। তারপর একসময় ট্রেনটা চলে যাবে। এই নতুন জায়গাটায় নতুন করে খুঁজে নেব একটা নতুন জীবন।

বলা বাহুল্য, নামিনি। নইলে আজ বসে 'ফার্স্ট পার্সন' লিখতাম না।

কেবল আজও মাঝে-মাঝে ভোরের দিকে ঘুমটা পাতলা হতে হতে ভাঙে এক মৃদু দুলুনির সমাপ্তিতে। স্বপ্নের মধ্যে থেকে জেগে উঠতে উঠতে আর ঠাহর করতে পারি না, কোথায় যেন

যাচ্ছিলাম। কেবল আধাচোখ মেলার মুহূর্তটুকুতে পর্দার ফাঁক দিয়ে আধা ভোরের আলো বলে—সত্যি, যদি আবার একেবারে নতুন করে শুরু করা যেত!

২৫ জুলাই, ২০১০

'প্লেব্যাক' কথাটার উল্টো হল লিপ দেওয়া।

সেরকমটাই জানতাম ছোটবেলা থেকে। আসলে প্লেব্যাক শব্দটার সঙ্গে তখনও পরিচিত হইনি। সাধারণ সিনেমাপ্রেমী দর্শকরা তখনও সিনেমা দেখে এসে উচ্ছ্বসিত হন,

—উত্তমকুমার যা লিপ দিয়েছে না?

আর যাতে লিপ দিলেন উত্তমকুমার, সেটা কেবলমাত্র গান। সেটার যে একটা টেকনিকাল নাম আছে, 'প্লেব্যাক', জানতাম না। তাতে অবশ্য রসগ্রহণের কোনও ঘাটতি হয়নি কোনওদিন।

ভিন্নধর্মী বাস্তবাশ্রয়ী সিনেমা ছাড়া যে-ধরনের ছবি আমরা বাল্যকালে দেখেছি তাতে গানের একটা বড় ভূমিকা থাকত। সে 'জয়জয়ন্তী'-র আন্টির গান-ই হোক, আর 'ধন্যি মেয়ে'-তে 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল'-ই হোক। এগুলো যে গান, সংলাপ নয়, সেটা বুঝতাম—আবার এটাও জানতাম যে এই গানের কথাগুলো দিয়েই তৈরি হবে নাটক, গল্প এগোবে এই সাঙ্গীতিক কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করে। ফলে নায়ক-নায়িকা যখন গান গাইতেন, তখন তাঁদের উচ্চারণে আমরা পেতাম কোনও গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠ, তাঁদের নয়।

সত্যি যদি ধরে নিই সিনেমার বেশিরভাগ প্লেব্যাক গানই কোনও না কোনও সাঙ্গীতিক সংলাপ, অভিনেতা সেখানে সেই সাঙ্গীতিক সংলাপচারণে অপারগ বলে অবলীলায় ঢুকে পড়তে পারে কোনও গায়ক বা গায়িকা-কণ্ঠ, তা হলে আজ যখন আমায় ডাবিং নিয়ে এত কথা শুনতে হয়, কেন আমার অমুক অভিনেতার গলায় তমুকের কণ্ঠ, তখন মনে হয়—কই—গান নিয়ে তো এই অভিযোগ ওঠে না। বরং সেক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকারা সগর্বে বলেন যে তাঁর গলায় কতবার কিশোরকুমার বা মান্না দে, লতা-আশা বা সন্ধ্যা-আরতি গেয়েছেন।

হলিউডে, যত দূর জানি, নায়ক-নায়িকার চরিত্রে যদি কোনও সঙ্গীতাংশ থাকে, সেটা অভিনেতার নিজের কণ্ঠে হতে হয়—নইলে অস্কার পুরস্কার সেটাকে বিবেচনাযোগ্য মনে করে না। আর আমাদের দেশের জাতীয় পুরস্কারের নিয়ম সেখানে কণ্ঠাভিনয়ের কৃতিত্ব ভাগে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। শিল্পীর পূর্ণাঙ্গতা যদি তাঁর সমগ্র শারীরিক এবং বাচিক অভিব্যক্তি নিয়ে সম্পূর্ণ হয়, তা হলে অধিকাংশ সময়েই গান সেখানে তাঁর চরিত্র নির্মাণের একটা প্রধান অস্ত্র। সেখানে অন্য কোনও

সুরেলা কণ্ঠ ধার করতে ভারতীয় অভিনেতার কোনও সংকোচ হয়েছে বলে শুনিনি। তাঁরা কেউ কখনও বলেননি যে আমার চরিত্রের গলায় গান থাকলে সেটা হয় আমি নিজে গাইব, কারণ বাকি ছবিটা জুড়ে গল্পটা আমার, নচেৎ আমি গান গাইতে পারি না, আমার গলায় গান রেখো না।

একটা প্লেব্যাকের কথা মনে পড়ছে। সেটা গানের প্লেব্যাক নয়। সপ্তপদী-র ওথেলো ডেসডিমোনা-র মঞ্চাভিনয় দৃশ্য। যেখানে ওথেলো-বেশী উত্তমকুমারের কণ্ঠে সংলাপ প্লেব্যাক (মনে রাখবেন, ডাব নয়) করেছিলেন উৎপল দত্ত। আর ডেসডিমোনা সুচিত্রা সেন কথা বলেছিলেন জেনিফার কেন্ডেল-এর (পরে কাপুর) গলায়।

সেখানে কণ্ঠবিচ্যুতি ডাবিং ইত্যাদি প্রশ্নই ওঠেনি, শেক্সপিয়রীয় ইংরেজিতে অভিনেতা অভিনেত্রীর অস্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে ঢেকে দিয়েছেন দুই শেক্সপীয়র-দক্ষ অভিনেতা।

এবং আজও 'এই পথ যদি না শেষ হয়' বাদ দিলে সপ্তপদী সিনেমাটির অন্যতম আলোচ্য আকর্ষণ ওই বিশেষ দৃশ্যটি। সেখানে অন্য অভিনেতাদের কণ্ঠাভিনয় কোনওভাবেই উত্তম-সুচিত্রার মহিমা হরণ করেনি। বরং গৌরবান্বিত করেছে।

একটি বিশেষ অবয়বের সঙ্গে অন্য একটি কণ্ঠের সাযুজ্যে তৃতীয় মাত্রা তৈরি করাই যদি প্লেব্যাক গানের বহুস্বীকৃত এবং বহুপ্রশংসিত রীতি হয়, তা হলে বেচারা ঋতুপর্ণ ঘোষ আজন্ম একজন শিল্পীকে অন্য আরেকজনকে দিয়ে ডাব করানোর দায়ে সংকুচিত হয়ে রইল কেন?

২৯ আগস্ট, ২০১০

হাতের লেখা ব্যাপারটাই অনেকটা স্বভাবের মত। কাউকে না কাউকে অনুকরণ করবেই। ছোটবেলায় নকল করতাম বাবার হাতের লেখাকে। বাবা ফাউন্টেন পেন-এ লিখত। আমার আমি তখন ডট পেন-এর যুগে। ফলে পুরোটা কোনওদিনই নকল করে উঠতে পারিনি।

তারপর, কখন যে সত্যজিৎ রায়ের আর অন্যান্য অনেক কিছুর মত, ওঁর হাতের লেখাটাকেও নকল করতে শুরু করেছি-জানি না। সেটাত আমি ভাবতাম-দিব্যি হল। অন্যরা বলত-কিচ্ছু হয়নি। এখন, আমি সাধারণত জেল পেন-এ লিখি। কাঁড়ি কাঁড়ি রিফিল শেষ হয়ে কয়েকদিনে।

'ফার্স্ট পার্সন'ই তো কেবল নয়। 'গানের ওপারে'র তাড়াতাড়া চিত্রনাট্য। সকালবেলা, ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা যখন লিখতে বসি রোজ, ওটাকে বলি আমার হাতের লেখা প্র্যাকটিশ করার সময়। শুনেছি হস্তলিপি বিশারদ বা যাঁদের আমরা ইংরিজিতে graphologist বলি। তাঁরা হাতের লেখা পড়ে মানুষের চরিত্রের খুঁটিনাটি বলে দিতে পারেন।

যদি, তাঁরা কেউ আজকের ফার্স্ট পার্সন প'ড়ে আমার হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে কোনও ফেরারী আসামী, চোর, বা আতঙ্কবাদীর সন্ধান পান, দয়া করে পুলিশে খবর দেবেন না।

শুভেচ্ছান্তে,

—ঋতুপর্ণ ঘোষ

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০

স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছে আমার মা। প্রথম সন্তান—সাধ্যমতো, পছন্দমতো স্কুলে পড়াবে—স্বাভাবিক ইচ্ছে। সেন্ট লরেন্স, সাউথ পয়েন্ট, পাঠভবন। খুব বেশি সাহেবি স্কুলে পড়ানোর ইচ্ছে বাবা-মা কারওই ছিল না।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে সদ্য আমার নামবদল হয়েছে। বাবা নিজে সুনীল বলে, দুই ছেলের নাম রেখেছিল সৌরনীল আর ইন্দ্রনীল। আমি ছোটবেলায় মহাভারতের গল্প শুনে অক্ষবিশারদ ঋতুপর্ণ-র নামটা মনে-মনে নিজের জন্য ঠিক করে ফেললাম। তারপর আমার প্রবল বায়নাক্কায় আমার পিতৃদত্ত নামটি পাল্টে নিজের পছন্দসই নামটা পাওয়া গেল।

মাঝে মাঝে ভাবি, আমি কত ভাগ্যবান। নিজের নাম নিজে রাখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

যাক, গল্পটা সেটা নয়।

মা কোনও একটা স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছে আমায়। ভর্তি করাতে না অ্যাডমিশন ফর্ম আনতে, মনে নেই। অন্য মা'দের মতো আমার সঙ্গে মা-ও অপেক্ষা করছে, বসে আছে স্কুলের বাইরের বেঞ্চিতে। আবেদনকারীর নাম ডেকে-ডেকে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে পালা করে। আর, অন্যান্য অনেক মা'র মতো আমার মা-ও উশখুশ করছে কখন আমার নাম ডাকা হবে।

এক সময়ে সবার নাম ডাকা হয়ে গেল। এক-এক করে সব মা তাঁদের সন্তানের জন্য নির্ধারিত ফর্ম নিয়ে ফিরে গেলেন। মা একা বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর অফিস-ঘরে গিয়ে খোঁজ করল আমি বাদ পড়ে গেলাম কেন?

উত্তরটা শুনলে আপনারা খুব হাসবেন। আমার নাম নাকি বহুবার ডাকা হয়েছে, এবং মা প্রবল মনোযোগ দিয়েও আমার ডাকনামের বাইরে অন্য কোনও নাম, আমার নাম বলে চিনতে পারেনি। মা-র কাছে আমার ডাকনাম, মানে মা নিজে যে-নামে আমাকে ডাকে, সেটাই আমার নাম। আর আমার পোশাকি নামটা হচ্ছে আমার কোনও ছদ্মনাম। সত্যি, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে রোজ কত ছদ্মনাম নিয়ে বেঁচে থাকি!

বুম্বা-কে আমার সামনে কেউ প্রসেনজিৎ বলে ডাকলে আমার মনে হয় যেন একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করা হল। বা রীণাদি যে নামে জগদ্বিখ্যাত, সে-নামটা আমার কাছে কেবল একটা পর্দার চরিত্রলিপি।

গত ১০ অগাস্ট, বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, যখন সুনীলকুমার ঘোষের নামে নানা মন্ত্রপাঠ, দানধ্যান হচ্ছিল—আমার একবার যেন মনে হল, আমার কাছে যে-লোকটার একটাই নাম, 'বাবা', তাকে হঠাৎ সুনীলকুমার ঘোষ বলা হচ্ছে কেন!

এ তা হলে ছদ্মনামধারী কোনও পরলোকগত ব্যক্তি। বাবা বাড়িতেই আছে—ফিরে গেলে দেখতে পাব।

৩ অক্টোবর, ২০১০

ছোটবেলায় সব বাচ্চার মতোই দেয়ালে বা মেঝেতে ক্রেয়ন দিয়ে ছবি এঁকেছি। ড্রইং খাতা, স্লেট অবশ্যই একটা ছিল, কিন্তু দেয়াল, বা ভূমির বিস্তারের একটা অন্য আকর্ষণ ছিল বোধকরি। বোধহয় আমাদের সভ্যতার আদি চিত্রকর সেই প্রাচীন গুহাচিত্রশিল্পী, যিনি আমাদের মধ্যে এখনও রেখে গিয়েছেন পারিপার্শ্বিককে ক্যানভাস হিসেবে দেখতে পাওয়ার দুর্নিবার ইচ্ছে।

চক-পেনসিল দিয়ে স্লেটে লেখার পাট চুকিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর দেখলাম, আমরা লিখি খাতায়, আর মাস্টারমশাইরা আঁক কাটেন সামনে একটা স্লেটের দেওয়ালে। ভাবতাম, বড়দের জন্য বড় স্লেট হওয়াটাই নিয়ম বুঝি। পরে জানলাম, ওটার নাম ব্ল্যাকবোর্ড। ততদিনে, মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটার 'নোংরা' অভ্যেস চলে গিয়েছে মা-র নিয়মিত বকুনি খেতে-খেতে।

সেই 'নোংরা' অভ্যেসটাই পবিত্র হয়ে গেল হঠাৎ এক সরস্বতী পুজোর দিন। এমনিতে আমাদের বাড়িতে পুজোপাটের কোনও চল ছিল না। আমরা কোনও বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজো, বা সত্যনারায়ণ দেখিইনি।

সে-বছর এক অদ্ভুত হুজুগে পুজো শুরু হল। হুজুগটা কী? না, বাবা ঠাকুর গড়বে। আমাদের একান্ত পীড়াপীড়িতে রাজি হল বাবা। নানারকম চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বই দেখা হল। কোনও একটা গান্ধার সরস্বতী মূর্তির ছবি দেখে আমরা সবাই একমত হলাম—যে—এই মূর্তিটাই হোক প্রতিমার ব্লু প্রিন্ট।

ঠাকুর গড়া হল। শনি-রবিবার প্রায় সারাটা দিন ছাদে। বাবা খড় বাঁধছে। মাটি লাগাচ্ছে। আমি লেখাপড়া, খেলতে যাওয়া ভুলে পাশটিতে। সপ্তাহ শুরু হলে অফিসের দিনগুলোর সময় পেত না বাবা। তবু খুচরো ছুটির দিনগুলো ধীরে-ধীরে কেমন করে মাটির তালের উঁচু-নিচু হয়ে ওই মূর্তির মধ্যে ঢুকে গেল।

মনে আছে, পুজোর দিন প্রথম আলপনা দিল ঠাকুমা। সেই পূর্ববঙ্গের সহজাত জলের ঢেউ আর পদ্মের থালা। সেটা রইল মাঝখানে। তারপর মা। সেই থালার চারপাশটায় কেমন করে অন্য জ্যামিতিক চিহ্ন দিয়ে আরেকরকম নকশা। তখনও বুঝিনি যে, মা-র আর্ট কলেজের উডকাট করা হাত এতদিন পর কথা বলছে। সবশেষে, সব থেকে বড় বৃত্তটার সামনে বসিয়ে দেওয়া হল আমাকে। আলপনা শেষ করতে। ঠাকুমা দিয়েছে চালবাটার আলপনা, মা খড়িমাটির নকশা কেটেছে তাকে ঘিরে, বাবা বোধহয় জানত আমি এর কোনওটাই সামলাতে পারব না। আমার জন্য জিঙ্ক অক্সাইড গোলা হল। আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল তুলি। হলে কী হবে? আলপনা তো দিচ্ছি, কিছুতেই ডানদিকটা বাঁদিকের সঙ্গে হুবহু মেলে না। বাবা তবু ছাড়ার নয়—না মিললে কিচ্ছু হবে না, তুমি করো।

আমার তো মনে হচ্ছে সান্ত্বনাবাক্য। যত আলপনা দেখেছি, ডানদিক-বাঁদিক অসাযুজ্য তো দেখিনি কখনও!

বাবা সেদিন একটা কথা বলেছিল। তখন মানে বুঝিনি। আজ বোধহয় কিছুটা পারি,

—সারা জীবনেই একদিকটা অন্যদিকের মতো নয়। তুমি আয়নায় যে তোমাকে দ্যাখো, সেও তোমার মতন অনেকটা, তুমি নও। হুবহু বলে কিছু হয় না। তাই জন্যই পৃথিবীটা সুন্দর। বিচিত্র।

তারপর আর তর্ক করিনি। মেঝের ওপর বৃত্ত ঘিরে আপন মনে এঁকে গিয়েছি 'ইচ্ছে লতা'। সমান-অসমান নিয়ে আর ভাবিনি।

ভবিষ্যতেও যতবার আলপনা দিয়েছি ওই শঙ্কাটা পথ আটকায়নি আর কোনওদিন—যে-দু'টো দিকে সমান হতে হবে।

আসলে বিশাল ভূমি পরিসরের কাছে তুলি হাতে বসলেই মনে হয়েছে—আমি তো অঙ্ক করছি না। আলপনা দিচ্ছি। আলপনার আরেক নামই তো কল্পনা।

২৪ অক্টোবর, ২০১০

'ফেসবুক' ব্যাপারটা যে কী, আমি ছাই জানতাম-ই না। জানতাম না বলছি কেন? এখনও যে তেমনটা জানি—মোটেই নয়।

ধরে নেওয়া যাক, আমাকে শিক্ষিত করার জন্যই এবারের সংখ্যা।

আমি ফেসবুক-এ আছি। আমার কোনও ছবি নেই বলে অনেকেই সন্দেহ করেন এটা আমার

জাল প্রোফাইল কি না?

আমি কেন যে 'ফেসবুক'-এ ঢুকেছিলাম, এখন ভাল করে মনেও নেই। কোনও একদিন কোনও অকাজের বেলায় কম্পিউটর ঘাঁটাঘাটি করতে-করতে কীসের খেয়ালে কে জানে, ফেসবুক এ লগ ইন করে তার সদস্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমি চিরকালের ঘরকুনো। সাধারণত কোনও পার্টিতে যাই না। আর গেলেও নিজের চেনাজানা মানুষদের দল জুটিয়ে একটা কোণ খুঁজতে থাকি, কারণ অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে অকারণ সদালাপ আমি কেন যেন করে উঠতে পারি না। ফেসবুক এও ঠিক তেমনটাই হল। চেনাজানা নামগুলো দেখে তাদের সঙ্গেই নতুন করে কম্পিউটারে বন্ধুত্ব পাতালাম। কেন যে পাতালাম কে জানে—তাদের সঙ্গে আমি দিব্যি এসএমএস করে বা ফোন করে গল্প করতে পারি ইচ্ছে হলে। এবার তারা আমায় ফেসবুক-এ মেসেজ পাঠায় আর আমি এসএমএস করে উত্তর দিই। এ যেন এক মজার খেলা। প্রকাশ্য, অভ্যস্তকে হঠাৎ করে একটা প্রচ্ছন্নতার ঘোমটা পড়ানো।

তারপর শুরু হল অজস্র বন্ধুত্বের অনুরোধ। বোতাম টিপেও যে বন্ধুত্ব হয়, আগে জানতাম না। একটা মানুষ, তাকে চিনি না, জানি না, কেবল তার ছবি দেখে বা তার নিজের জীবনী-সারাংশ পড়ে কেনই বা তাকে বন্ধুত্বে বরণ করব? এবার অনুরোধগুলো আবদারে পরিণত হতে লাগল। প্রথমটা সন্দেহ—আমি সত্যিই ছবি করিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষ কি না? তা হলে তো আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে। একবার ইচ্ছে করেছিল বলে দেখতে যে, না, আমি সেই ঋতুপর্ণ ঘোষ নই। জানতে ইচ্ছে করে তারপরও এতগুলো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসত কি না?

একটা ঘটনা বলি। সাউথ সিটি মল তখন সবে হয়েছে। আমি কিছু একটা কেনাকাটা করতে গিয়েছি, আমার সঙ্গে আমার দুই বন্ধু। ওরা দোকানের বাইরে, আমি দোকানের ভিতর জিনিস দেখছি।

বেরিয়ে আসতেই মুখোমুখি হলাম এক বাঙালি দম্পতির সঙ্গে, কয়েক লহমা লাগল তাঁদের আমাকে চিনতে। তারপর কাছে এসে হঠাৎ ইংরেজিতে জিগ্যেস করলেন—

—Excuse me, are you the Famous Rituparno Ghosh?

'ফেমাস' কথাটা শুনেই হঠাৎ যেন কেমন একটা অসহিষ্ণুতা হল। বলতেই পারতাম 'হ্যাঁ', অথচ তা না-বলে বললাম,

—Yes, Sometimes.

আমার দুই বন্ধু যেন আমায় চেনে না, মুখ ফিরিয়ে নানাবিধ জিনিস দেখতে লাগল হঠাৎ করে। এবং আমি আর কথোপকথন না-বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম পরের দোকানের দিকে।

ফেসবুক-এ এখনও যখন কেউ জানতে চান যে, আমিই সেই 'ফেমাস' ঋতুপর্ণ ঘোষ কি না—আমার এই উত্তরটাই দিতে ইচ্ছে করে,

—Yes, Sometimes.

আচ্ছা, আপনারাই বলুন তো, খ্যাতিটা কি কারও পরিচয় হতে পারে?

২৮ নভেম্বর, ২০১০

ফেরিওয়ালার ডাক আজকাল আর শুনতে পাই না তেমন। হয়তো তারা এমন সময় আসে আমি বাড়ি থাকি না। বা আমার কাচ বন্ধ, চিক ফেলা শোওয়ার ঘরে তাদের আওয়াজ পৌঁছয় না।

ইদানীং আমি মা-বাবার ঘরটায় বসি। লাগোয়া টানা বারান্দাটা। তার নীচেই রাস্তা। কই, কোনও ফেরিওয়ালার ডাক আর শুনতে পাই না তো!

একজন সেই অনাদি কৈশোরের মানুষ, এখনও আছেন—যিনি আমাদের খবরের কাগজ দেন। তাঁর সাইকেলের বেল-এর টুং শব্দটা শুনলে এখনও কেন যেন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, কেবল তাঁর অব্যর্থ হাতের টিপ দেখব বলে—কেমন করে তিনটে খবরের কাগজ সুতলি বেঁধে ছুড়ে দেন আমাদের বারান্দার মেঝেতে। কোনও-কোনওদিন দেওয়ালে ধাক্কা খায় বটে, তবে বেশিরভাগ সময়ই সেফ ল্যান্ডিং।

মহাভারত-এ পড়েছি বয়সকালে অর্জুনের অশক্ত বাহু গাণ্ডীব তোলার ক্ষমতা হারিয়েছিল। এই মানুষটার কালো চুল সাদা হওয়ার পুরো পর্যায়টা জুড়েই তাঁর লক্ষ্যভেদের কোনও বিচ্যুতি দেখিনি।

দুপুরবেলার 'শিল্‌হ-কাটাও'-রা এখন কেবল বাংলা সিনেমার দ্বিপ্রাহরিক দৃশ্যের শব্দ আবহ। ঝালাইওয়ালা, ছুরি-কাঁচি শান দেওয়া, এমনকী শাড়ির বদলে স্টেন্‌লেস স্টিল বাসন—যারা আমাদের কৈশোরকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তাদের আর দেখতে পাই না।

বিকেল হলেই পাড়ায়-পাড়ায় ফুচকাওয়ালা আর কাঠি আইসক্রিমের যে নিয়মিত লোভনীয় আনাগোনা ছিল, তারা কোথায়? ফুচকা খেতে গেলে এখন ঢাকুরিয়া লেক অঞ্চল অবধি যেতেই হবে।

ডোমিনো-র পিৎজা যত দ্রুতগতিতে কুড়ি মিনিটের পর মূল্য নাকচ করতে শুরু করেছে, আমাদের আশৈশব হোম ডেলিভারি-র ফুচকা, ঝালমুড়িরা বাসা বেঁধেছে কোনও এক পার্কের

কাছে, বা উৎসবের সময় পুজো প্যান্ডেলে। এখন সব ফিরিওয়ালা টেলিভিশনের পর্দায়, কমার্শিয়াল ব্রেক-এ। গুঁড়ো মশলা, রেফ্রিজারেটর, রোগা হওয়ার বেল্ট—সবাই।

পর্দার বাইরে বোধহয় কয়েকজন পড়ে আছি আমরা—যারা লেখা কিংবা চিত্রনাট্য নিয়ে আজও প্রকাশক বা প্রযোজকের দ্বারে বুক দুরুদুরু ফেরিওয়ালা।

৫ ডিসেম্বর, ২০১০

ঘুমের ঠিক কোন জায়গাটা থেকে স্বপ্ন শুরু হতে পারে, জানি না।
বা আদৌ কোনও ঘুম স্বপ্নের বাহন হবে কি না, তাও তো জানি না আগে থেকে।

আগে আমার স্বপ্ন খুব মনে থাকত। এখন আর থাকে না। রাখতে চাইলেও থাকে না।

জানি না, কোনও অপূর্ণতা থেকে স্বপ্নের জন্ম হয় কি না।

বৈজ্ঞানিক বা মনস্তাত্ত্বিকরা হয়তো বলতে পারবেন।

সত্যি কথা বলতে, আমার আর জানতেও ইচ্ছে করে না।

একবার, মা-র প্রথম সেরিব্রাল অ্যাটাকের পর, সিটি স্ক্যান প্লেটটা নিয়ে ডাক্তার বোঝাচ্ছিলেন যে কেন কেউ কোমায় পড়ে, আসলে মস্তিষ্কের ঠিক কোন জায়গাটায় 'মন' থাকে। আমার জানতে ইচ্ছে করেনি।

এটাও অনেকটা তেমনই।

যৌবনে প্রণয়ঘটিত বিচ্ছেদের পর, অনেক প্রণয়ী ফিরে এসেছে স্বপ্নে। অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে, সহৃদয় হয়ে। সত্যি-জীবনে তাদের কখনও এতটা ভাল লাগার মনে হয়নি।

এক সময় কোনও পছন্দের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে বাথরুম যেতে হলে জোর করে চেষ্টা করতাম স্বপ্নটাকে মনে-মনে 'pause mode'-এ রেখে দিতে, যাতে ফিরে এসে ঘুমোলেই আবার সেই স্বপ্নটা চালু হয়ে যায়। অনেক সময় কাছাকাছি একটা স্বপ্ন আসত। হুবহু সেটার বাকিটুকু কোনওদিন ফিরে পাইনি।

মা চলে যাওয়ার পর আজ অবধি একটা স্বপ্নও দেখিনি, যেখানে মা নেই। তবে বেশির ভাগটাই আগের মা—সুস্থ, প্রাণবন্ত। রোগাক্রান্ত নয়।

আবার অনেক স্বপ্ন দেখেছি যে, মা-র মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কাজ ফেলে ছুটে আসছি আমি। ঘুম ভেঙে মনে হয়েছে—যাক! এই স্বপ্নটা আর আমায় ভয় দেখাতে পারবে না।

বাবা চলে যাওয়ার পর-পরই স্বপ্ন দেখতাম, আমি আর বাবা বসে মা-র শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-তালিকা করছি।

বাবা-মা একসঙ্গে স্বপ্নে আসে না। ওরা নিজেদের মতো করে পালা ভাগ করে নিয়েছে।

কোনও মহাপুরুষকে স্বপ্নে তেমন দেখিনি। একবার দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে, মোড়ায় বসে আছেন, আর ওঁকে বিরক্ত করে মেঝে মোছা হচ্ছে।

হালে একদিন স্বপ্ন দেখলাম সত্যজিৎ রায়কে। আবার ফেলুদা করছেন। আগের মতো।

সেই সৌমিত্রদা। গলায় মাফলার, পরনে জ্যাকেট। সন্তোষ দত্ত লালমোহনবাবু যথারীতি। কেবল তোপসেটা বদলে গিয়েছে।

সেটা আমি।

২৬ ডিসেম্বর, ২০১০

পৃথিবী জুড়ে নতুন বছর শুরু হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে আমরা পা দিলাম এই শতকের নতুন দশকে।

শীতের এই বছর-শুরুর দিনগুলো এখন যেন কেমন অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডা পড়তেও পারে, না পড়তেও পারে। বর্ষান্তরের সময়টুকু লেপ তো আবশ্যিক। এখন আর ক'জন লাল শালুর লেপ গায়ে দেন কে জানে, অন্তত বারান্দায় শুকোতে তো দেখি না শীতের দুপুরে।

নানারকম রজাই এসে তার জায়গা নিয়েছে। শীতের জামা সব আলমারি থেকে বের করে বারান্দা বা ছাতের রোদে মাদুরে মেলে দেওয়ার চল আছে কি আর এখনও? সেই যে শীতের রোদের গায়ে যখন পশম আর ন্যাপথালিনের গন্ধ মেখে যায়, ছড়িয়ে যায় সারা বারান্দায়—এখানকার পোশাকে আর সেই বাড়ির গন্ধ পাই না, দোকানের গন্ধ পাই।

শীতকালের দিনগুলোকে নানা ছুটিতে কেন যেন ভরিয়ে দিত ক্যালেন্ডার। আজকের খেয়োখেয়ির ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে নেতাজির অবদান প্রায় যেন শুধু এইটুকুই মনে হয় যে, তিনি তেইশে জানুয়ারি জন্মেছিলেন—বেশ আদুরে এক শীতের দিনে। তাই এখনও সেটা বাঙালির শীতকালীন বিনোদনের দিন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের একটা চালু নাম ছিল বোধহয় পিকনিক দিবস। সারাটা শীতের রোববার জুড়েই, বিশেষ করে তেইশ আর ছাব্বিশ জানুয়ারি, লরি-ভর্তি ছেলেমেয়ে, পাড়ার কর্তা-গিন্নিরা ছানাপোনা-সহ নানা রঙের শাল-শোয়েটারে সেজে হইহই করতে করতে পিকনিকে যেত। আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের সেই চলমান উল্লাসধ্বনি এক ঝলকের জন্য শীতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত। আবার কিছুক্ষণ পর আরেকটা লরি। আবার খুশির কোরাস।

আজকাল কি সত্যিই চড়ুইভাতিটা বদলে গিয়ে তিনদিন, দু'রাতের ব্যাংকক ভ্রমণের প্যাকেজে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? জানি না।

এই তো কেমন বুড়োটে-বুড়োটে শোনাচ্ছে। সেই 'আমাদের সময়'...! ছিঃ! আমরা না নতুন বছরে পা দিয়েছি।

ও হ্যাঁ, ভাল কথা, নতুন বছরে আপনাদের সক্কলকে আমাদের মতো করে পিকনিকে আমন্ত্রণ জানাই! 'রোববার'-এর মেনুতে এবার সংযোজিত হল নতুন কয়েকটি কলাম। এই সংখ্যা থেকেই কলাম লিখেত শুরু করলেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী এবং অমিতাভ মালাকার। থেকে গেলেন সমরেশদা, কিন্তু পাল্টে গেল তাঁর কলাম। আর, ভাল চিঠি জমলে সময়ে সময়ে আমরা 'লেটার বক্স'-ও ছাপব।

একটা দারুণ সুখবর দিয়ে শেষ করি। বাণীদি (বাণী বসু) ক'দিন আগেই পেলেন একটা মস্ত পুরস্কার : সাহিত্য অকাদেমি। তাঁকে অসংখ্য অভিনন্দন। রোববার-পরিবার গর্বিত, আনন্দিত।

শুভ দু'হাজার এগারো।

২ জানুয়ারি, ২০১১

'লাইব্রেরি' বলতে বহুদিন ধরে কেন যেন বুঝতাম যে একটা বইয়ের শিরদাঁড়ায় অক্ষর নম্বর মেশানো একটা গোলচে চাকতি। মাসিমণি দক্ষিণী-তে গান শিখতে যেত। আর ফেরার পথে নানা বাংলা গল্প-উপন্যাসের বই নিয়ে আসত। মাসিমণির পড়া হয়ে গেলে সেটা আবার আসত মায়ের কাছে। মাসিমণি ও মা—দুই বোন মিলেমিশে বইটা শেষ করত।

সেই থেকে লাইব্রেরি বস্তুটা আমার কাছে একটা টিকিট-আঁটা বইয়ের ঘর।

লাইব্রেরি যে ব্যক্তি-গতও হতে পারে, এই বোধ বা চেতনা আমার অনেক পরে হয়েছে। ভুল বললাম, ব্যক্তি-গত পুস্তক-সংগ্রহকে যে কারও নিজস্ব লাইব্রেরি বলা যায়, সেটা হজম করতে অনেক সময় লেগেছে।

ওখানে টিকিট-আঁটা বই নেই, বেশির ভাগ সময় গোছানোও নেই, কিন্তু কী অদৃশ্য জাদুবলে গৃহকর্তা বইয়ের অসমঞ্জস পাঁজা থেকে নিমেষে কাঙ্ক্ষিত বইটি বার করে আনেন—তা আশ্চর্য লাগত প্রথম-প্রথম। যত দুর মনে পড়ে, শমীকদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাড়িতেই এই বইয়ের গোলকধাঁধাটা প্রথম প্রত্যক্ষ করি।

তখন সদ্য স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢুকেছি। শমীকদার একবাড়ি বই দেখে কীরকম আশ্চর্য লাগত।

তারপর একসময় অভ্যেস হয়ে গেল। শমীকদার বাড়িতে এখন আর খুব নিয়মিত যাওয়া হয় না। মাঝে-মাঝে শঙ্খদার (ঘোষ) বাড়ি গেলে, ওই পুস্তক-পরিবৃতির ওমটা পাই।

বইয়ের গাদা বা পাঁজা যে দেখতে কত সুন্দর, সত্যিই এই দু'টো বাড়িতে না-গেলে বুঝতে পারতাম না।

সেই সঙ্গে চিত্র-পরিচালক হিসেবে এটাও শেখা হত না, যে, তেমন পরিবার হলে বইয়ের থেকে সুন্দর আর কিছুকে মানায় না, একটা পরিবেশের অন্তরঙ্গতা আর সংস্কৃতির যুগ্ম-অভিঘাত সৃষ্টি করতে।

দুই

আর পাঁচটা বাঙালি মধ্যবিত্তর বাড়িতে যেমন রবীন্দ্র-শরৎ-বঙ্কিম রচনাবলি থাকে, আমাদের বাড়িতেও তেমন ছিল। বাঁধানো 'দেশ' বাবার সংগ্রহ, ঠাকুর্দার কাছ থেকে কতকগুলো বাঁধানো 'প্রবাসী' এসে ঠাঁই পেয়েছিল।

চিত্রকলার কিছু বই ছিল। আর মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে বাবার বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে অনেক সেরকম বই ছিল। ছিল মিউজিয়াম ক্যাটালগ-ও। নিয়মিত বই কেনার সংগতি বাবার একার চাকরিতে কুলিয়ে ওঠেনি। তবুও বইমেলার একটা নিয়মিত পাড়ি প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে কতকগুলো নতুন বই আমদানি করত প্রতি বছর আমাদের বাড়ির বুককেস-এ।

একটু উপার্জন করতে শুরু করার পর আমি বই কিনতে আরম্ভ করি। কোনও বিশেষ আগ্রহ থেকে নয়, কোনও বিশেষ বিষয়প্রীতি থেকে নয়। শুরু হয়েছিল বিশ্ব-সিনেমা সংক্রান্ত বই দিয়ে। এখন সেটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে কত বিষয়কে টেনে এনেছে হাতের নাগালে, জানি না।

একটা সাধারণ প্রশ্নের সম্মুখীন হই প্রায়ই :

—এত বই তোমার? পড়েছ?

অবলীলায় বলি,

—না। আংশিক পড়েছি। কিছু বই উল্টে দেখেছি। অনেকগুলো বহুবার পড়েছি। কিন্তু কবে কোন বইটা পড়তে ইচ্ছে করবে, জানি না।

বাবা-মা দু'জনেই চলে যাওয়ার পর যখন সত্যিই নিঃসঙ্গ হলাম, কোথা থেকে যেন প্লাইউডের বুককেসগুলো আশ্বাসবাণী পাঠাতে লাগল দলে দলে।

তারপর, একদিন দেখলাম—যাক, এরা অন্তত আমাকে কখনও নিঃসঙ্গ করে যাবে না।

৩০ জানুয়ারি, ২০১১

সেই ১৯১১ তে একবার রাজধানী বদল হয়েছিল বুঝি!
রাজধানী তো প্রায়ই বদল হয়।

যখন কালিদাস খুলে বসি, তখন কেন যেন সব রাজধানী উজ্জয়িনী-র মতো দেখায়। আবার, ইতিহাসের পাতা ওল্টালে কখনও মগধ, কখনও পাটলিপুত্র, এমনকী কখনও কান্যকুব্জ।

চিরকাল রূপকথায় পড়ে এসেছি রাজধানীতে ঢুকতে হয় তোরণ পার করে। বিশাল সিংহদরজা খুলে।

ছোটবেলায়, মনে আছে, প্রথম যখন দিল্লি গেলাম—আর পাঁচটা স্টেশনের মতো আরেকটা স্টেশনেই ট্রেনটা এসে দাঁড়াল। লাল পোশাকে একদল মালবাহক হইহই করে ট্রেনে উঠে পড়ল। আর বাবা বলল,

—দিল্লি এসে গিয়েছে। দিল্লি কি জানো তো? ভারতের রাজধানী। আমি মনে-মনে ভাবলাম, রাজধানীর এই বুঝি অভ্যর্থনা!

তারপর 'রামায়ণ'-'মহাভারত' পড়তে গিয়ে কত নতুন-নতুন রাজধানী পেয়েছি; অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, পাঞ্চাল, মিথিলা—কত কী! 'রামায়ণ'-এর কনকলঙ্কা, সে তো বৈভবের চূড়ান্ত।

তবু কেন যেন মনে হয়, অযোধ্যায় যুবরাজের শ্রেষ্ঠ রাজধানীটি পঞ্চবটীর সেই পর্ণকুটির। যেখানে লোক-লস্কর, মন্ত্রী-অমাত্য, সেপাই-শাস্ত্রী নেই—কেবল দশ বছর বিবাহিতা স্ত্রী-র সঙ্গে এক নিরবচ্ছিন্ন মধুচন্দ্রিমা। প্রহরায় অনুগত আরেক রাজকুমার।

রবীন্দ্রনাথ যখন পড়ি, তখন মনে হয় পুরো বাংলা ভাষাটাই তাঁর রাজধানী। কেবল তাঁর সিংহাসনটা খুঁজে পাই না—সে কি কবিতায়, না প্রবন্ধে, না চিঠিতে, না গল্পে—কে জানে?

আর আমাদের সময়ের একজন কবি কেমন নিদারুণভাবে বুঝিয়ে গিয়েছেন রাজ-পরিত্যক্ত রাজধানী আযোধ্যার থেকেও অনেক বেদনার জায়গা নিজের মনটা।

'সে কি জানিত না, যত বড় রাজধানী তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর'।

রাজধানী রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার।

আমরা না হয় হৃদয়পুরটুকু নিয়েই থাকি।

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

কফিহাউস কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা অনিবার্য 'নস্টালজিয়া' আছে। সেটা বোধহয় মান্না দে-র গানটা থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের মনে।

নইলে দিব্যি জলজ্যান্ত দু'টো কফিহাউস থাকতেও (বেশিও থাকতে পারে, আমি কেবল এ দু'টোর কথাই জানি) হঠাৎ 'কফিহাউস' শব্দটা কেমন যেন স্মৃতি-ভারাক্রান্ত সেকেলে হয়ে গেল। আর, ছোঁ মেরে তার জায়গাটা নিয়ে নিল 'ক্যাফে কফি ডে', (সেটাকে আবার 'সিসিডি' বলাটাই নাকি দস্তুর) বা বারিস্তা।

কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউস নিয়ে অনেক কাহিনি আছে। কলেজ-জীবনে সেগুলো আমাদের মুগ্ধ করে এসেছে। বিশেষ করে অর্থনীতি পড়তাম এবং অবধারিত ভাবে মার্কস পড়তে হত বলে কেউ তাজ বেঙ্গল-এর কফি শপে যাচ্ছে শুনলে তাকে শ্রেণিশত্রু ভাবাটাই রাজনৈতিক ভাবে সঠিক মনে হত, তেমনই কেউ কফিহাউসে বসে আড্ডা মারছে—এটা ছিল চরম সুসংবাদ।

কেন যে ভাবতাম কফি শপে যাওয়া মানুষগুলো গণ্ডমুখ্যু, কেবল পয়সা আছে—জানি না; আর কফিহাউসে যাওয়া যে কোনও মানুষের ব্যাগ হাতড়ালেই যেন খুঁজে পাওয়া যাবে কোনও এক অমূল্য কবিতার টুকরো। সব মিলিয়ে কলেজ স্ট্রিটের কফিহাউস এমন একটা বৈদগ্ধ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, আমরা, যারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি, তারা অনেকেই এইট বি বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকের দোতলার কফিহাউসটাকে তেমন গৌরবময় মনে করিনি।

সেখানে কখনও যাইনি তা নয়। সেই আড্ডা-তর্কের সশব্দ পরিবেশ, 'ইনফিউশন' শব্দটা তো প্রথম শিখলাম ওখানে-ই, তবে আমার যেহেতু চা বা কফি, কোনওটাতেই তেমন টান ছিল না বা হয়তো সত্যিই কোনও মনের মতো আড্ডাসঙ্গী খুঁজে পাইনি—তাই কয়েকদিন পর সব উৎসাহ নিভে গেল।

দুই

আপাতত আমার বাড়িতে সকালবেলা একটা কফিহাউস বসে। আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়, যেখানে বাবা বসে সকালের চা-টা খেতেন। সকাল শুরু হয় এককাপ কালো কফি আর বিস্কুট দিয়ে। এতদিন শোওয়ার ঘরে ভোরে উঠে এফএম-এ 'সকালের রবি' শুনতে শুনতে আমার কফি খাওয়ার পাট সাঙ্গ হত।

এখন আমি ভোরবেলা বারান্দাটায় বসি। কফি আর বিস্কুট নিয়ে। প্রথম যেদিন বসলাম, কোথা থেকে যেন এক ঝাঁক কাক এসে আমাকে প্রায় ঘিরে ফেলল। প্রথমটায় একটু অবাক হলাম। আমাকে এতটা নিরাপদ ভাবার কারণ কী হতে পারে, যে, এতটা কাছাকাছি দল বেঁধেছে ওরা।

প্রায় তক্ষুনি মনে পড়ল, বাবা সকালবেলা বসে চা খেত, আর বিস্কুট ভাগ করে দিত কাক-বন্ধুদের।

ওরা কি মানুষের প্রতিকৃতি চেনে না? আমাকেই বাবা বলে ভুল করেছে, ভেবেছে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ওদের বিস্কুট-বন্ধু আবার হাজির।

বিস্কুট ভেঙে ভেঙে এগিয়ে দিলাম। প্রায় আমার হাত থেকে তুলে খাবার মতো করে যে যার ভাগ নিয়ে উড়ে গেল। কেউ কেউ বারান্দার রেলিং-এর ওপর, কেউ সামনের ল্যাম্পপোস্টের তারে। আবার গ্রাস শেষ হলেই ফিরে আসা এক-এক করে।

এখন আমার ভোরবেলার কফিহাউসের অনেক সদস্য। কেবল তাদের ভাষা বুঝি না। বুঝলে হয়তো সত্যি খুঁজে পেতাম মানুষ সম্পর্কে তাদের মনের অনেক গভীর ভাবনা। অনেক অমূল্য কবিতা।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

অনুবাদ সম্পর্কে একটা মজার উক্তি আছে, প্রবলভাবে sexist হলেও কোথাও একটা কৌতুক উদ্রেক করে। অতএব পাঠকদের কাছে অগ্রিম মার্জনা চেয়ে লিখছি—Translations are like women. They are either beautiful or faithful. নারী-তুলনার অনুষঙ্গটা বাদ দিলে, অনুবাদ সম্পর্কে এত মোক্ষম বর্ণনা খুব কমই শুনেছি।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব চলছে আমার। এবং বেশিরভাগ সময়ই ভাবলে কষ্ট হচ্ছে যে, সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথকে চিনেছেন প্রধানত তাঁর প্রবন্ধ এবং বক্তৃতামালা দিয়ে। যেগুলো কবির নিজের মৌলিক ইংরেজি রচনা। 'গীতাঞ্জলি' যখন বাংলায় পড়ি, আর কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদগুলো পড়ি পাশাপাশি, তখন মনে হয় নোবেল পুরস্কার কমিটি কতটা দুর্ভাগা—তাঁরা এই কবিতার মূলভাষার দ্যোতনার স্বাদ পেলেন না! আবার, তখনই মনে হয়, আমরাই বা দুর্ভাগা কম কীসে? 'ইলিয়াড', 'ওডিসি' থেকে শুরু করে প্রাচীন গ্রিক নাট্যমালা, এবং পরবর্তী কালের ইউরোপীয় সাহিত্য—সবই তো আমরা পড়েছি ইংরেজি অনুবাদে।

যে তলস্তয়ের কাছে প্রতিনিয়ত নিজেকে ঋণী মনে হয়, তাঁর মৌলিক রচনার স্বাদ আর জানলাম কোথায়?

তারপরেও তো আমার প্রিয় গ্রন্থাবলির মধ্যে 'আনা কারেনিনা' সহজেই বাস করে। মহৎ সাহিত্যের বোধহয় এটাই গুণ, যা অনুবাদোত্তীর্ণ হয়েও হৃদয়-আধারে চিরপ্রিয়গৃহ বানিয়ে ফ্যালে।

আমি সাহিত্যের ছাত্র নই, বিশেষজ্ঞ তো দূরস্থান, কেবল ভালবাসি বলে বই পড়ি। এই সংখ্যায় সাহিত্য-অনুবাদ নিয়ে কিছু মূল্যমান প্রতিবেদন রয়েছে।

আমি সেই প্রবাদপ্রতিম ঢেঁকি, যার ঘুরে-ফিরে একটাই ঠিকানা—সিনেমা।

দুই

সিনেমার অনুবাদ—কথাটা প্রথম চোটে একটু আশ্চর্য লাগে—তাই তো! কিন্তু সত্যিই তো অর্ধেক সিনেমা আমরা অনুবাদেই দেখি। গোদার-এর 'Far from Vietnam'-এর মৌলিক ফরাসি নাম আমরা ক'জন জানি? সত্যজিৎ-এর 'জলসাঘর' সারা পৃথিবীতে 'The Music Room' বলেই বিখ্যাত। কিংবা ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর যে ইংরেজি নামগুলো অতটা কাব্যিক শোনায়, ধরা যাক 'Cries and Whispers, 'Winter Light' প্রভৃতি—তাদের আসল সুইডিশ নামগুলো তো আমরা জানিই না।

সেদিক থেকে কুরোসাওয়া অনেক বেশি ভাগ্যবান। 'রশোমন', 'কাগেমুশা', 'ইকিঞ্জ', 'রান', 'ডোডেনকাদেন', 'মাদোদায়ো'— এতগুলো ছবি আমরা জাপানি নামেই মনে রাখি। 'Seven samurai' আর 'Throne of Blood'-টা আবার কোত্থেকে যেন ইংরেজি নামেই বিখ্যাত।

নামকরণ তো গেল কেবল একটা দিক, এবার আসছি সংলাপের অনুবাদে। Subtitle বলে অধুনা আমরা সবাই যেটাকে সম্বল করে বিশ্ব-সিনেমার দরজায় কড়া নাড়ি।

আসলে International আর Global?এর মধ্যে যে তফাত—আন্তর্জাতিকতা বিভিন্ন-বিচিত্র স্থান, কাল, পাত্র, ভাষা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণমর্যাদা দিয়ে বৈচিত্রের মধ্যে এক চিরন্তন ঐক্যকে খোঁজে, আর বিশ্বায়িত মানদণ্ডে সব কিছু একটাই সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোয় নির্ধারিত—অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এটাও নিঃসন্দেহে মার্কিন, মানে হলিউড।

কিন্তু ইংরেজি-ভাষী হলিউড সিনেমার বাইরে, যে বিপুল বিশ্ব-সিনেমার ভাণ্ডার, সেখানে পৌঁছনোর একটাই পথ আমাদের অবলম্বন—সেটা Subtitle। এবং আমরা তো সত্যিই জানি না যে কেবলমাত্র সংলাপ নয়, তার উচ্চারণ, আনুষঙ্গিক অভিব্যক্তি—কোনওটাই কি সম্পূর্ণভাবে পৌঁছয় আমাদের কাছে Subtitle?এর মাধ্যমে!

ভারতীয় সিনেমার আবার অন্যরকম সমস্যা। 'নমস্কার' বা 'মিঠাই' এরকম কতগুলো শব্দ অবিকৃত রেখে সর্বভারতীয় অনুষঙ্গ সৃজন করা কঠিন নয়। আমি যেহেতু মূলত বাংলা সিনেমার মানুষ, নিজের ছবির Subtitle করতে গিয়ে কি হিমশিম খেতে হয়েছে, তা আমিই জানি।

আমার নিজের একটা ছবির কথা বলি—'উৎসব'। যেখানে পুজোর সময়, একটা ভেঙে-যাওয়া যৌথ-পরিবার একত্রিত হয় উৎসবের দিনগুলোতে। সেই যৌথপরিবারে কে পিসি, কে জ্যাঠা, কে মাসি, কে কাকিমা—এই আপাতসহজ সম্পর্কগুলো Subtitle?এর কলমের সামনে কী যে কঠিন হয়ে ওঠে! যেখানে মাসি এবং কাকি দু'জনেই Aunt, জ্যাঠা-কাকা-মামা সবাই Uncle—সেখানে

সম্পর্কভিত্তিক সূক্ষ্মজাল কীভাবে সৃষ্টি করব, বিদেশি-দর্শকের জন্য, ভেবে ওঠাই দুষ্কর।

আমাদের আদরের 'সোনা'-সম্বোধন ইংরেজিতে 'dear' বা 'darling' হয়েও তার মাধুর্য হারায়, আর আমরা, আপশোস করি—হায় রে, কিছুই তো বোঝাতে পারলাম না!

'অপুর সংসার'-এ কাজলের সেই অমোঘ প্রশ্ন—'বাবার বুঝি টিকি থাকে' বা 'চারুলতা'-য় অমল-চারু'র 'ব' এর অনুপ্রাস নিয়ে সংলাপের ছন্দ ইংরেজিতে গিয়ে একরকম ভাবে দাঁড়ায় বটে, তবে পুরোটা কি সত্যিই পাওয়া যায়? চারু যখন নতুন শেখা 'থ্যাঙ্ক ইউ'-এর মধ্যে 'বঙ্কিম'-এর 'ঙ্-ক্'-র ছন্দটা পেয়ে যায় এবং 'বঙ্কিম বঙ্কিম'-এর সুরেই 'Thank you Thank you' গুনগুন করে—শুনে বাঙালি-দর্শকের প্রতিটি রোমকূপ যেভাবে সাড়া দেয়—তখন নিজেদেরই অসহায় লাগে, বাংলার বাইরে সিনেমাপ্রেমী বন্ধুদের এই অপূর্ব দ্যোতনাটুকু পৌঁছে দেব কেমন করে?

অবশ্য তারপরেও, যেমন সব অনুবাদকে ছাড়িয়ে তলস্তয় আমাদের ঘরের লোক হয়ে যান, তেমনই 'চারুলতা' ইংরেজিতে তার সমস্ত Nuance বর্জিত হয়েও বিশ্ববন্দিত হয়ে ওঠে—সেখানেই শিল্পের মাহাত্ম্য। এবং এই সর্বজনীনতা আছে বলেই আমরা বিশ্বের নাগরিক, কোনও Subtitle আমাদের দোভাষীর কাজ না-করলেও শিল্প আপনিই সঞ্চারিত হয় হৃদয়কক্ষে।

Faithful আর Beautiful?এর বিতর্ক অজান্তেই বিলীন হয়ে যায়—সৌন্দর্য এসে বিশ্বস্ততাকে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে।

২৬ জুন, ২০১১

লন্ডনের রোদ-বৃষ্টি সারাদিনভর নিজেদের মধ্যে চু-কিতকিত খেলছে।

ফলে সকালবেলা প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও বেরতে হত ছাতা নিয়ে আর ব্যাগে রাখতে হত একটা হাল্কা জ্যাকেট গোছের কিছু।

আমি তো প্রাণপণে ছাতাটা আঁকাড়ে ধরে থাকতাম, প্রথাগতভাবে ক্লোক-এও রাখতাম না—যদি ভুলে ফেলে আসি—এই ভয়ে। গিয়ে পৌঁছনোর পরের পরের দিনই রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত হবে গর্ডন স্কোয়ারে—প্রধানত Tagore Centre?এর উদ্যোগে। উন্মোচন করবেন যুবরাজ চার্লস—সেটা শুনে প্রথমে একটু বিরক্ত লাগল। কেন, আর কাউকে পাওয়া গেল না?

বন্ধু সঙ্গীতা (দত্ত) আমার জন্য প্রবেশপত্র জোগাড় করে রেখেছিল—পরে বুঝলাম বাঙালি-ভর্তি গর্ডন স্কোয়ারে হয়তো এমনিতেই আমাকে কেউ আটকাতেন না।

গর্ডন স্কোয়ারের সবুজ মাঠ, গাছ-গাছালি, রোদ-ছায়ার ফাঁকে বেশ একটা বাংলার আমেজে

ভরপুর। বিশেষ করে যখন ওখানকার প্রবাসী বাঙালি মেয়েরা শান্তিনিকেতনী নাচের সাজে, হাতে মণিপুরি মন্দিরা নিয়ে, 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে' নাচছিল, তখন একটা বড় গাছের পিছন থেকে একরাশ সাদা পায়রা উড়ে চলে গেল—যেন কবির প্রিয় বকের পাঁতি।

যুবরাজ চার্লস—আমার সাম্প্রতিক অকারণ বীতরাগ নিমেষে অন্তর্হিত হল ওঁর বক্তৃতা শুনে। লন্ডনে এসে অবধি এমন অ্যাক্সেন্ট-দুষ্ট ইংরেজি শুনছিলাম সারাক্ষণ, চার্লস কথা বলামাত্র মনে হল এই ইংরেজি বাংলার মতোই সহজ আর মধুর। Queen's English কথাটা চিরকাল বইয়েই পড়ে এসেছি। সেদিন সেখানে মেঘ ও রৌদ্রের মাঝখানে বৃক্ষছায়ার ঘন সবুজে প্রথম বুঝলাম তার সরল সৌন্দর্য। মনে হল, ভাষার এবং সভ্যতার এইরকম বিশ্বজনীনতাই হয়তো কবি চেয়েছিলেন।

সবশেষে মূর্তি উন্মোচনের পালা। ব্রোঞ্জে গড়া কালো একটা চওড়া মুখ, গাছের গুঁড়ির মতো কণ্ঠদেশ, কোটরাগত চক্ষু—এ মূর্তির সঙ্গে রবি ঠাকুরের থেকে কার্ল মার্কস-এর মিল বেশি।

একটা চাপা গুঞ্জন উঠল চারদিকে। কিছুকাল সমালোচনা।

বড় অপ্রসন্ন মন নিয়ে ফিরে আসছি গর্ডন স্কোয়ার থেকে। একবার পিছন ফিরে তাকালাম।

যুবরাজ তখনও নাচের দলের প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে মগ্ন।

আর আমি যেন দেখতে পেলাম সেই গাছের পিছনে দুই নারীমূর্তি লুকিয়ে দেখছেন এই অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্রনাথ আর চার্লস—দু'জনের স্মৃতিবিজড়িত দুই ভাগ্যবিড়ম্বিতা—কাদম্বরী আর ডায়ানা।

২৪ জুলাই, ২০১১

দেশ কাকে বলে আমি জানি না।

ছোটবেলা থেকে বাবা আর ঠাকুমা বলে এসেছে আমাদের দেশ ঢাকা, বিক্রমপুর। আমি বাংলাদেশে গিয়েছি। কিন্তু ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে।

প্রত্যেকবার বিদেশযাত্রার সময় যে কোনও দেশে নেমেই আমায় কড়া সরেজমিনে জরিপ করা হয়েছে—আমার মতলবটা কী? ভেবেছি একবার নিজের দেশে ফিরে গেলে এ অপমান আর থাকবে না।

তারপর যখন কোনও মধ্যরাত্রে বিদেশের বিমান দিল্লি বা মুম্বইতে নামিয়ে দিয়েছে আমায়, তখন দেশে ফেরার আনন্দটুকু চুরমার হয়ে গিয়েছে যখন কাস্টমস—অফিসাররা আমার স্যুটকেস আঁতিপাতি করে ঘেঁটেছেন। কোনও অবৈধ প্রমাণ খুঁজতে। আমার দেশ ও আমাকে একজন

চোরাচালানকারী বা আতঙ্কবাদী মনে করেই কোনওরকমে প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

আমাদের বাড়ির ছবি, যে প্রায় আমার বয়সি, গত পঁয়ত্রিশ বছর আমাদের বাড়িতেই আছে তার বিয়ে, তার মাতৃত্ব, তার মেয়ে কাজলের বড় হওয়া পুরোটাই এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সে যখন এসে বলে,

—আমি দেশে যাব...

ও কি তীর্থযাত্রীর মতো মেদিনীপুরের একটা গ্রামে গিয়ে বাবা ও মা বিহীন খাঁ খাঁ বাড়িটায় কেবল একটা প্রণাম ঠুকে আসে?

দেশ মানে কি একটা সাহিত্য পত্রিকা? যেটা বাবা সংখ্যার পর সংখ্যা যত্ন করে বাঁধাতেন। সত্যজিৎ রায় যার লোগো ডিজাইন করেছিলেন।

একসময়ে পূর্ব কৈশোরের দুপুরে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ধারাবাহিক 'শজারুর কাঁটা' পড়তাম?

এবার লন্ডনে গিয়ে মনে হল এখানকার কোনও একটা বিশ্ববিদালয়ে বছর কয়েক পড়াশোনা করি—কী হবে আর ছবি বানিয়ে? একবারও তো মনে হল না, যে আমার একটা দেশ আছে। মাঝে ও মাঝে যদি তার জন্য আমার মন কেমন করে? বরং উল্টোটা মনে হল—আমার দেশের কি কখনও আমার জন্য মন কেমন করবে?

তবুও, প্রতিবার যখন 'জনগণমন' গাওয়া হয়, দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে চোখে জল আসে কেন অবধারিতভাবে?

একি কোনও আবেগের অভ্যেস, না অনুভূতির? যেমন ছুঁচ ফোটালে ব্যথা লাগে, আর ঘুমের ওষুধ খেলে ঘুম পায়?

১৪ আগস্ট, ২০১১

কলকাতা শহরের অনেকগুলো গলির মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার একটা ছোট্ট গলিতে আমার বাস। আমি বরাবর কাউকে আমার বাড়ি চেনাতে হলে পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য বলেছি—প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পাঁচিলের গা ঘেঁষে একটা গলি ঢুকে গিয়েছে...

কিন্তু বাস করতে করতে গলির পরিচয়টা কখন যে আমার পাড়া হয়ে গিয়েছে—জানিও না। বাইরের লোকের জন্য যেটা গলি, আমার এত বছরের জীবনে সেটা আমার পাড়া।

গলি বলতে আমরা চিরকাল একটা অন্ধকার সরু পথ বুঝি, যার আড়ালে ভয় বা পাপ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাতে। আর দিনের বেলা সেটাই একটা অনির্দিষ্ট খোলা সুড়ঙ্গ।

এখন যখন আমার বাড়ি একটা সরু গলি বলে নতুন কোনও আগন্তুককে বোঝাই, তাঁরা নির্দ্বিধায় মেনে নেন। আরও আগে, যখন আমি এখনকার মতো কুখ্যাত হইনি, অনেকেই ফিরে প্রশ্ন করেছেন,

—গাড়ি ঢুকবে তো?

তাঁদের কাউকে বিন্দুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না। কারণ গলি বলতে আমরা অপরিসরতার কথাই বুঝে এসেছি সারাজীবন।

এই ফাঁকে একবার অভিধানটা দেখে নিই। এই বদঅভ্যেসটি বাবা করিয়ে দিয়েছে ছোটবেলা থেকে—হাতের কাছে ডিকসনারি আছে কী করতে?

যাতে নিজের শব্দজ্ঞানের চেনা গলিতে অযথা ঘুরপাক না খেয়ে শব্দের এক বড় রাজপথের সামনে দাঁড়াতে পারি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন—

১। গৃহশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ

২। অঙ্গুলিদ্বয়ের মূলের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থান

৩। নৌকার সম্মুখ স্থান, গলই

নিজে কেবল একটা মানেই জানতাম এতদিন। দ্বিতীয় মানের জায়গা থেকে এতদিন ধরে আপনাদের ফার্স্ট পার্সন লিখছি, সেটা শিখলাম।

আর তৃতীয় মানেটা, এই মুহূর্তে বন্যপ্লাবিত আমার প্রদেশে কিনারা দেখানোর একমাত্র আশা।

বর্ষা তার মনোহর রূপ ছেড়ে, সর্বনাশার দিকে চলেছে ক্রমশ।

এখানেই তার যাত্রা আপাতত স্থগিত থাকুক অন্তত কয়েকদিনের জন্য।

২১ আগস্ট ২০১১

আমাদের পাড়ার পুজোয় কখনও কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আসত না। আসত কাছাকাছি কোনও প্রতিমা-শিল্পীর কারখানা থেকে। পঞ্চমীর দিন সকালবেলা ঠাকুর আসত লরি চেপে, পুত্রকন্যা-সহ।

আমাদের সেই ঠাকুরই বেশ লাগত। দেখে-দেখে আর আশ মিটত না। কেমন বড়-বড় চোখ, কেমন ঢলোঢলো মুখ, কেমন সোনার মতো রং—আমার ছোটবেলার মন নিঃশর্তে কখন যে তাকে বিশ্বসুন্দরীর আখ্যা দিয়ে ফেলত, আমি নিজেও জানি না।

তারপর ষষ্ঠীর সন্ধে থেকে যখন আশপাশের পাড়ায় ঠাকুর দেখতে বেরোতাম, নানা ধরনের জাঁকজমক দেখেও আমাদের ছোট্ট পাড়ার এক অনামা মৃৎশিল্পীর গড়া স্নিগ্ধ দুগ্গাঠাকুরের প্রতি বালক-মনের সমস্ত লয়ালিটি একত্রিত করে. অন্যদের যে কোনও উৎকর্ষ প্রাণপণে অগ্রাহ্য করতাম।

তারই মাঝে কোনও-কোনও ঠাকুরের তলায় বড়-বড় করে প্রতিমা-শিল্পীর নাম লেখা থাকত। এবং তাঁর কৌলীন্যের পরিচয় হিসেবে জ্বলজ্বল করত কুমোরটুলি কথাটা।

তখনও থিম-পুজোর যুগ শুরু হয়নি। পাড়ায়-পাড়ায় পুজোর প্রতিযোগিতা প্যান্ডেলের কাঁচের কাজে, বিস্তৃত আলোকসজ্জায়, বা কখনওসখনও মণ্ডপের মাঝখানে বড় ঝাড়বাতি ঝুলানোয়। তার মধ্যে কুমোরটুলি-র প্রতিমারা বিশাল ব্র্যান্ডনেম-এর ঐতিহ্যে গৌরবশালিনী হয়ে বিরাজ করতেন, আর আমরা অবাক হয়ে ভাবার চেষ্টা করতাম—এই 'কুমোরটুলি' নামটার মাহাত্ম্যটা কোথায়? ঠাকুর মানেই তো সুন্দর। সেখানে আবার মূর্তিকারের স্থান-বৈশিষ্ট্য আছে নাকি কোনও?

আরও কিছুটা বড় হওয়ার পর বাবা নিয়ে গিয়েছিল কুমোরটুলি-তে। তখন ঠাকুর গড়া চলছে। সদ্য বৃষ্টিস্নাত কুমোরটুলি-র প্যাচপ্যাচে মাটি। বাবা শক্ত করে আমার হাতটা ধরে আছে, আমি তো চিরকালের বিশ্বক্যাবলা—শুকনো ডাঙায় আছাড় খাই।

ভিতরে প্রতিমাদের ছড়াছড়ি। বেশির ভাগই মেটে রঙের। তখনও তাঁদের ওপর বর্ণপ্রলেপ চাপেনি। কেউ-কেউ রঙের প্রথম আস্তরণে সাদা হয়ে ঝলমল করছেন। পুরোটাই সিনেমার ভাষায় 'গ্রে স্কেল'-এ। মণ্ডপের ঝলমলে প্রতিমার একরকম দ্যুতি, আর নিরাভরণ মৃত্তিকা প্রতিমার অন্য এক শ্রী। বাবাকে জিগ্যেস করেছিলাম,

—বাবা, এইভাবেই তো পুজো হতে পারে।

—কীভাবে?

—এই যে না-রং-করা মূর্তিগুলো, মিউজিয়ামে তুমি তো এইরকম একরঙা কত মূর্তি দেখিয়েছ!

সাধারণত বাবা আমার অত্যন্ত আজগুবি কৌতূহলের কোনও না কোনও একটা যুক্তিসংগত উত্তর দিয়ে এসেছে। এই প্রশ্নটার উত্তর বোধহয় বাবারও জানা ছিল না। কিন্তু বাবাকে ভাবিয়েছিল ঠিকই, মনে হয়। কিছুক্ষণের জন্য বাবা চুপ করে গেল।

সমস্ত প্রতিমা নিরাভরণ, নিরস্ত্র। কিন্তু আমার কল্পনা করে নিতে কোনও বাধা নেই যে, দেবী তাঁর অস্ত্রগুলো যথাযথ ধারণ করে আছেন। কারণ বছরের পর বছর, মহালয়া-প্রাতে শ্রীবাণীকুমার আর শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আমাকে পাখিপড়া করে শিখিয়েছেন দেবীর আয়ুধবর্ণনা।

হিমালয় দিয়েছেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিয়েছেন চক্র, পিনাকপাণি শঙ্কর দিয়েছেন শূল, যম দিয়েছেন কালদণ্ড, কালদেব দিয়েছেন সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, সূর্য দিয়েছেন ধনুর্বাণ, বিশ্বকর্মা অভেদবর্ম, ব্রহ্মা দিয়েছেন অক্ষমালা, কমণ্ডলু, কুবের দিয়েছেন রত্নহার, আর চন্দ্র দিয়েছেন অষ্টচন্দ্রশোভা।

আমি জানি প্যান্ডেলে এই 'পরমা রূপবতী শ্রীমূর্তি' এসে যখন দাঁড়াবেন, তখন তাঁর হাতে থাকবে নানারকম টিনের অস্ত্রশস্ত্র। আমরা দেখতে পাব না তাঁর 'তাম্রভ করতলদ্বয়', সেটা টুকটুকে লাল হয়ে যাবে ততদিনে। আর কোথায় হারিয়ে যাবে ব্রহ্মার কল্যাণ উপহার—অক্ষমালা, কমণ্ডলু। আর কোনওদিন আমাদের চোখে পড়বে না চন্দ্রের সেই মহার্ঘ প্রলেপ—অষ্টচন্দ্রশোভার কিরণচ্ছটা।

সেই শরতের ভেজা সকালে চিলতে-চিলতে রোদের আলোয় মনে হল যেন নোংরা ধুতি-গামছা পরিহিত অনেক মর্ত্যদেবতা তাঁদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে নির্মাণ করছেন এই ভুবনমোহিনী তেজপুঞ্জ।

কেন যে বাবা অত ছোটবেলায় আমায় কুমোরটুলি-তে নিয়ে গিয়েছিল জানি না। তারপর কোনও প্যান্ডেল-এর কোনও প্রতিমাকেই আমার আর শক্তিরূপিনী মনে হয়নি।

সেই থেকে আজ অবধি আমার কাছে সবথেকে বড় শারদতীর্থ সেই কুমোরটুলি—যেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন মৃন্ময়ীরা, যাঁরা আমরা মতো নানা মানুষের নানা কল্পনায় চিন্ময়ী হয়ে উঠবেন। কোনওদিন।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১

প্রথমে আগুন। তারপর জল। তারপর অন্ধকার। এভাবেই তো যে কোনও জন্ম-প্রক্রিয়া শুরু। যে কোনও সভ্যতার পত্তন। এমনকী যে কোনও ধ্বংসের পর নতুনের প্রস্তুতি। ঠিক সেভাবেই, আগুন লাগল। ফায়ার ব্রিগেড এল। বিদ্যুৎ নিভিয়ে দেওয়া হল। তারপর, ইতিহাসের ইন্দ্রজাল মেনে, অন্ধকার থেকে আস্তে-আস্তে আলো ফোটে। অক্ষর জন্মায়। বাক্য। জ্ঞান। একটা প্রলয়ের পর, আরও প্রতিজ্ঞায়, আরও নিষ্ঠায়, আরও শিক্ষা নিয়ে উঠে দাঁড়ানো। একটা দিনও কর্তব্য থেকে অব্যাহতি নয়। ২০ নভেম্বর আগুন লাগল, দপ্তর অনেকটাই পুড়ে ছারখার, তবু ২১ সকালে পাঠকের কাছে যথারীতি পৌঁছে গেল 'সংবাদ প্রতিদিন', তার উজ্জ্বল ভাবনা ও সদর্থক মনন নিয়ে। সংবাদপত্র ইতিহাসের শরিক। সময়কে সে নিরন্তর নথিবদ্ধ করতে করতে, পর্যবেক্ষণ করতে করতে, বিশ্লেষণ করতে করতে চলে। সময়ের অন্তর্গত হয়েও সেরুসময়ের ধারাভাষ্যকার। তাই তার ছায়া লম্বা হয়ে পড়তেই হবে সময়ের বিস্তৃত মানচিত্রে। সমসময়কে প্রভাবিত করতে হবে তার চরিত্রের, মেরুদণ্ডের, নেতৃত্বের দার্ঢ্য দিয়ে। এই সংবাদপত্র চিরকালই তা করেছে, সংকটমুহূর্তে যেন আরও ঐকান্তিক ভাবে সে উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করল। যাতে একদিন মানুষ বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাকিয়ে বলতে পারে, বারে বারে ধ্বংসের ছাই থেকে আরও আরও প্রাণ নিয়ে পুনর্জন্মময় পৌরাণিক পাখি ফিনিক্স-এর বাংলা হল 'সংবাদ প্রতিদিন'।

২৭ নভেম্বর, ২০১১

'শৈশব' শব্দটার মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুরণন আছে না?
প্রায় যেন মনে হয়, 'সহজ পাঠ' থেকে উঠেআসা একটা শব্দ, হয়তো রবীন্দ্রনাথ এই পরিচ্ছেদেই 'ঐ-কার' সমৃদ্ধ শব্দ দিয়ে রচনা করে ফেলবেন একটি ছোট্ট গদ্যরচনা বা পদ্যবন্ধ। আর, ঐ-কারের ব্যাপারটা পোক্ত করা জন্যই হয়তো কবি কোথাও একটা জুড়ে দেবেন 'ঐ সব'।

সত্যিই, 'শৈশব'-এর দিনগুলো এখন 'ঐ সব' স্মৃতিকথা, যেগুলো রোজ সত্যি না-হলে দুঃখও হয়, আবার এমন অদেখা হয়ে গেলেও কষ্ট হয়, যখন বুঝি যে সত্যিই ঐ-সব দিনগুলো ফিরে বোধহয় আর আসবে না।

শৈশব বলতেই আমরা একটা সময়ের কথা ভাবি, একটা যুগকে মনে করি। এ কথা সবসময় সাহস করে ভাবি না, সেই-সেই যুগের-কালের শ্রেষ্ঠতম সঞ্চয়টুকু আমরা নিজেদের সঙ্গে নিয়েই বেড়াচ্ছি আজীবন।

সম্প্রতি টাকি গিয়েছিলাম ছবির লোকেশন দেখতে। ইছামতী নদীর দু'পার জুড়ে গ্রাম। এখনও সুবিস্তৃত মাঠের মাঝে আলের পাঁচিলের ভেতর জল টলটল করছে। ইটভাটার চিমনিগুলো শৈশবের ছবির মতো কি না, জানি না। তবে ছোটবেলায় সবাই মিলে কোনও একবার শহর ছাড়িয়ে চড়ুইভাতি করতে গিয়েই ইটভাটার চিমনির সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার। তারপর 'অশনি সংকেত' এ দেখেছি। তখনও তো বারো বছর বয়স—নিজেকে শৈশব-অতিক্রান্ত বলি কী করে?

আদ্যোপান্ত শহরে বড় হওয়া জীবনে যখন নীল আকাশ, সোনা রোদ, নদীর ধারে পায়েচলার পথ, পথের দু'পারে সদ্য পীতাভ সর্ষেখেত জড়িয়ে ধরে হঠাৎ—তখন কই, তাদের অচেনা লাগে না তো! কবে কি শৈশবের 'সহজ পাঠ'-ই এই অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীর ছন্দ-উপক্রণিকা রচনা করেছে মনে-মনে? আমি ধরলাম—সঙ্গে সঙ্গে—ইউনিটের সবাই নিজেদের মতো করে শুরু করল।

—চল ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তারপর ধানখেত। তারপর তিসিখেত, তারপর দিঘি।

বুঝতে পারছি বাক্যক্রম উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। যার যেভাবে মনে আছে—সেইভাবে।

কিন্তু বলতে বড় আনন্দ হচ্ছে। সে-আনন্দ স্মৃতিশক্তির গৌরবের, না শৈশবের শব্দগুলোর কাছে ফিরে যাওয়ার—বলতে পারব না।

আশ্চর্য এই, যে, গান তেমন কেউ গাইল না। অথচ গানের অধীশ্বরের কাজে আমরা চলেছি, আমাদের ইউনিটে একাধিক জন রবীন্দ্রনাথের গান অবলীলায় একটার পর আরেকটা গেয়ে যায়।

আমাদের যেন শিশুর মতো শব্দ খুঁড়ে এনে সেটাকে বলতে পারাতেই আনন্দ।

ফেরার পথে আবার চোখে পড়ল হোর্ডিংটা। একটি জনপ্রিয় বাংলা সিরিয়ালের। ছোট একটি মেয়ে—আর তার পাশে বড়বড় করে লেখা,

—আজও তোমায় ছাড়া ঘুম আসে না মা।

কী যে হল জানি না। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম গলাটা ধরে আসছে, চোখটা জ্বালা-জ্বালা করছে। গাল বেয়ে চোখের জল টপকে নামার আগেই বড় সানগ্লাসটা বের করলাম, বুঝলাম, এবার আমি বড় হয়ে গিয়েছি।

২৫ ডিসেম্বর, ২০১১

জীবনের কোন ভাগটুকু তরুণের আর কতটুকুও বা অধিকার করে থাকে যৌবন, নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না হয়তো সবসময়।

তবে মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরকে ঘিরে যদি আলোচনা করা যায়, তা হলে এই দুইটি পরস্পর সংলগ্ন অধ্যায় সম্পর্কে যে আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কৌতূহল সর্বাধিক; সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই আর।

যে-বয়স জীবনের সম্ভাবনায় টলটল করছে, অথচ তার সম্পূর্ণ পরিণতির চূড়ান্ত দেখা পায়নি, সেই বয়সের সঙ্গে মিশে থাকে এক নিয়ত পরিবর্তনশীল মন, এবং জীবনের সবথেকে কান্তিময় ও স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত লাবণ্য। সেই বয়সের সামনে বারবার নতজানু হই আমরা। বাঙালি পাঠকের কাছে প্রাক্-সত্যজিৎ যুগে বেশির ভাগ গোয়েন্দারাই ছিলেন মধ্য যুবা বা যৌবনান্তের মানুষ।

সেই ফাদার লং, শালর্ক হোম্স, এরিক্যুল পোয়েরো, মিস মার্পেল, এমনকী ব্যোমকেশ বক্সী স্বয়ং।

শার্লক হোম্স বুড়ো না হলেও বুড়োটে। পোয়েরো প্রৌঢ়। এবং মার্পেল বৃদ্ধা। ব্যোমকেশ বক্সীর জীবনালেখ্য ধরা পড়ে নিতান্তই তরুণ বয়স থেকে। এমনকী, সত্যসন্ধান করতে গিয়ে তিনি যথার্থই সত্যবিদ্ধ হন। ক্রাইম সল্ভ করতে গিয়ে একজন সাসপেক্ট-এর সঙ্গে গোয়েন্দার বিয়ে এমন নজির গোয়েন্দা সাহিত্যে দুর্লভ।

খুন, জখম, হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে এই মধুর প্রণয়ানীতি রচনা করেও শরদিন্দু কোথায় যেন পিছিয়ে পড়েন ব্যোমকেশকে যৌবনের, তাঞ্ণ্যের প্রতীক করতে।

তার কারণ ব্যোমকেশ কাহিনির সংস্কৃত সাহিত্য নির্ভরতা হতে পারে; বা সেই সময়ের একটা বিশুদ্ধ জীবনের মূল্যবোধ হতে পারে। আমি জানি না।

কিন্তু ফেলুদার আবির্ভাব মাত্রেই বাঙালির মনে তারুণ্যের উদ্দীপনা যেন নতুন করে মানে খুঁজে পায়।

নিখিলেশের ঠাকুরদালানে যেদিন বারো জন গেরুয়াধারী ছেলে একটি চৌকিতে করে সন্দীপকে নিয়ে প্রবেশ করেছিল বন্যার জলের মতো—প্রায় যেন সেই বাধাহীন যৌবনের উচ্ছ্বাস চিক-বন্দিনী বিমলাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল; পাশে সন্দীপের সমবয়সি তার স্বামীকে কেমন যেন বুড়োটে ঠেকল—এও যেন অনেকটা তাই।

ফেলুদা জিন্‌স পরে, জ্যাকেট পরে, চারমিনার খায়, প্রয়োজনে ইংরেজি বলে। ফলে ফেলুদা র প্রদোষ মিত্র নামটা কোথাও যেন আড়াল হয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত সাধারণের মধ্যে এক গগনচুম্বী অপ্রত্যাশিতের প্রত্যাশায়।

ফেলুদাকে 'সাবাশ' বলি আমরা সর্বক্ষণ। ঠিক যেন খেলার মাঠের গ্যালারি থেকে একজন নিপুণ খেলোয়াড়কে দেখছি, এবং উত্তেজনায় চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলছি। সেখানে চূড়ান্ত ইনভলভ্‌মেন্ট আছে, কিন্তু কেতাবি সমীহ নেই। এ কোনও প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে বসে নিঃশব্দে মঞ্চের কোনও কুশীলবের অনন্যসাধারণ পারফরমেন্স-কে নিঃশব্দে সাধুবাদে জানানো নয়।

সাধারণ অর্থে তারুণ্য বা যৌবন সোচ্চার। এবং এই বহিঃপ্রকাশেই তার মজা, আর আমাদের আনন্দ।

তবে সেখানেই যদি শেষ হয়ে যেত জীবনের গতি, তা হলে পূর্ণবৃক্ষের জ্ঞান, শান্তি প্রগতি ও নীরব প্রসন্নতার স্থান হারিয়ে যেন মানবসভ্যতায়।

প্রচলিত ধারণায় তারুণ্য বাঁধভাঙা জলের মতোই ভাসিয়ে দিতে পারে যে কোনও জাড্য। কিন্তু, তরুণ মানেই প্রগতিশীল নন, বা অনেক সময় তার উল্টোটা। এমনটা ভেবে দেখি না আমরা চট করে।

তবে সেই স্খলনটুকুর জন্য, সেই অভাবটুকুর কারণেই বোধহয় তারুণ্য এত মধুর। কারণ শেষের সন্ধান সে পায়নি।

পেতে-পেতে অনেক বেলা। আর তখনই মানবমনের আর্তি ঝনঝন করে উঠছে।

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হ'ল শেষ—

৮ জানুয়ারি, ২০১২

হঠাৎ দপ্তর থেকে সম্পাদক অনিন্দ্যবাবুর নির্দেশ এসেছে যে এবারের বইমেলা সংখ্যার জন্য আলাদা করে 'ফার্স্ট পার্সন' লিখতে হবে।

অতএব, আপাতত রবীন্দ্রনাথের ছবির গন্ধ মুলতবি থাক। পরের সংখ্যা থেকে আবার ভেবে দেখা যাবে।

প্রচ্ছদের বিষয় মিলিয়ে 'ফার্স্ট পার্সন' লিখতে আমার সবসময় ভাল লাগে না। আমার কাছে 'ফার্স্ট পার্সন'-এর পাতাটা ব্যক্তিগত আড্ডার পাতা। তবু, সম্পাদকের হুকুম বলে কথা!

শুটিং-এ বসে 'ফার্স্ট পার্সন' লিখছি। আমার ফোন সাধারণত শুটিং-এর সময় বন্ধ থাকে। আমার এক সহকর্মীর ফোনে অনিন্দ্যর সঙ্গে কথা হল।

এবারে ছোট 'ফার্স্ট পার্সন' লিখলেও নাকি মাফ!

শুটিং করছি রবীন্দ্রনাথের জীবনের।

চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে তাঁর আসবাবের নমুনা। তাঁর পোশাকের নিদর্শনে নির্মিত জোব্বা। এবং সর্বোপরি তাঁর বই।

আজ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ছবি করছি বলে নয়, আজীবনই আদর্শ প্রচ্ছদ বলতে রবীন্দ্রপুস্তকই বুঝে এসেছি। গেরুয়ার ওপর পোড়া লাল রঙে বইয়ের নাম, তলায় রচয়িতার সই। এই সহজ, এত সদ্যস্মরণযোগ্য, এত গভীর, এই রুচিমান প্রচ্ছদ আর দেখিনি।

বিজ্ঞাপনে কর্মরত থাকাকালীন নানারকম কাজই করতে হত।

কভার ডিজাইন-এর প্রসঙ্গ উঠলেই আমার সামনে আজও একটা প্রচ্ছদই ভাসে। 'সঞ্চয়িতা'।

বইমেলা শুভ হোক।

২৯ জানুয়ারি, ২০১২

আর উপায় নেই। একেবারে পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে। প্রায় জোর করে বিছানা ছেড়ে কাজে বেরতে হল। রবীন্দ্রনাথের ছবি শেষ করার সময় পার হয়ে যাচ্ছে যে!

আগে ভাবতাম, নানা কাজের মধ্যে থাকলে বোধহয় মাথা ক্লান্ত বোধ করে। নানা চিন্তায় ভরে থাকে। তখন 'ফার্স্ট পার্সন'-কে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

অসুস্থতার সময় দেখলাম, শূন্য মস্তিষ্কেরও একই দশা। অবসাদে ক্লিন্ন হয়ে সে-ও তার স্বাভাবিক সজীবতা হারায়। সেই সঙ্গে ক্রমে ক্ষীণস্রোত হয়ে আসে তার প্রসব-ক্ষমতা।

এই দু'টো সত্য যদি মেনে নেন, তা হলে আমার সাম্প্রতিক 'ফার্স্ট পার্সন'-এর আয়তন সম্পর্কে

আমাকে আর নতুন করে অজুহাত দিতে হয় না। অপ্রস্তুতও হতে হয় না।

আমাদের এবারের সংখ্যা ট্রাম।

সত্যি! বিচিত্র এই সর্পিল বাহনটি কত যুগ হল কলকাতাকে তার নিয়মিত সেবা দিয়ে এসেছে।

আজকের প্রজন্মের কথা জানি না—আমাদের ফেলে-আসা জীবন দিয়ে বুঝতে পারি ট্রাম যে কী অবিচ্ছেদ্য ভাবে ওতপ্রোত আমাদের জীবনের সঙ্গে।

যত দূর মনে আছে, 'মহানগর'-এর টাইটেল দৃশ্য শুরু হয়েছিল ট্রাম-লাইনের তার দিয়ে। তারপর কত না ভাবে ঘুরে-ফিরে ট্রাম গাড়ি সিনেমার পর্দাতেও আমাদের মুগ্ধ করেছে। মনে পড়ে মৃণালদার কত ছবি, তপনদার 'জতুগৃহ' ছবিতে ট্রামে করে অনিলদার সপরিবারে মধ্যবিত্তের অবসর আনন্দের চিত্র।

সম্প্রতি 'কাহানি' ছবিটাতে ট্রামের কয়েকটি দৃশ্য দেখলাম। ছবিটা যত্ন করেই বানিয়েছে সুজয়। কিন্তু একই ছবিতে ট্রামের গতি আর মেট্রো রেলের গতির কোনও তফাত পেলাম না! এটা কি এজন্যই যে থ্রিলারের গতিতে এই দুই ভিন্নস্বর চাপা পড়ে গিয়েছে? ট্রাম-লাইনের গমনভঙ্গি একান্তভাবেই কলকাতার চলনস্পন্দ। মুম্বইয়ের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়।

২২ এপ্রিল, ২০১২

জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে জন্মানোর সবরকম আনন্দ, সুবিধে এবং দায়িত্ব আমার জানা। আজও আমার একমাত্র সহোদর, আমার অনুজ ইন্দ্রনীল (আমাদের চিঙ্কু) আর আমি পিঠোপিঠি না হলেও মান-অভিমানে, খুনসুটিতে, অনাবশ্যক ক্ষণিক অভিমানের বোমাবর্ষণ কাটাতে-কাটাতে দিব্যি হাত ধরে চলেছি।

আমাদের এবারের সংখ্যা 'জ্যেষ্ঠ'। অনুজের তুলনায় কম-প্রতিষ্ঠিত বা কম-বিখ্যাত জ্যেষ্ঠদের নিয়ে এক সংখ্যা।

জ্যেষ্ঠসন্তান হয়ে জন্মানোর সুবিধেটার পাশে-পাশে কতগুলো বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ে। আমার জীবনে চিঙ্কু-ই বোধহয় দায়িত্ববোধের অনুভূতি প্রথম সঞ্চার করেছিল।

তাই জ্যেষ্ঠরা তুলনায় অবিখ্যাত বা অপ্রতিষ্ঠিত হলেও কনিষ্ঠদের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই বেশিগুণ দায়িত্ববান, সেটা তো বটেই। বিপরীত দৃষ্টান্তও নিশ্চয়ই আছে।

এই প্রসঙ্গেই মনে আসছে মহাভারত-এর ভীষ্মের কথা।

মাতা গঙ্গা-র কনিষ্ঠ বসুপুত্র, আর পিতা শান্তনু-র জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রত—যথার্থই 'জ্যেষ্ঠ' শব্দটির

প্রতাপ বা শক্তি অনুরণন নন। সারা 'মহাভারত' জুড়ে কেবল জ্যেষ্ঠোচিত বিচক্ষণতা, ধৈর্য্য এবং ক্ষমার অবিচল নিদর্শন হয়ে থাকেন প্রায় অন্তরালবর্তী হয়ে।

ত্যাগের মাহাত্ম্যে ভূষিত দু'টি অমল অঙ্গীকার যে তাঁকে রাজা থেকে রাজ-অভিভাবক করেছে, সেই গল্প আমাদের সকলেরই জানা।

তবু অন্তরালে থেকেও যেন 'মহাভারত'-এর এক অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর ভীষ্ম নিজে। 'ভীষ্মপর্ব'-তে আমরা ভীষ্মকে যতটা পাই, তা এক বিচক্ষণ যোদ্ধা হিসেবে। 'শান্তিপর্ব' আর 'অনুশাসন পর্ব' জুড়ে ভীষ্মের যে মহৎ ব্যাপ্তি তা যুধিষ্ঠিরের ধর্মাচরণ, অর্জুনের ধনুর্বিদ্যা বা শকুনির কপট রাজনীতিকে কেবল নাটকীয় করে দেয়।

আরেকজন জ্যেষ্ঠর কথা মনে পড়ছে—বাঙালি প্রায় তাঁকে ভুলতেই বসেছে। ইনি শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ। বাল্যে, যত দূর মনে আছে, কনিষ্ঠ জন্মের কিছুকালের মধ্যেই এই অপূর্ব কান্তিময়, মেধাবী, বিদ্বান বালকটি গৃহত্যাগ করেন।

চৈতন্যর গৃহত্যাগের সময় শচীমাতার যে আকুল বিলাপ তা বাঙালি আজও মনে রেখেছে নানা পদাবলি, যাত্রাভিনয় ও নাট্যরূপের কারণে।—

শচীমাতা কাঁদে নিমাই-নিমাই
প্রতিধ্বনি ফেরে নাই নাই নাই।

বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে সেরকম মাতৃহৃদয় নিঃসৃত কোনও প্রবল আকুতির ইতিহাস আমাদের জানা নেই। ফলে বাঙালির মন অতি সহজেই সেই অদৃশ্যমান বালককে অবান্তর, ক্ষণিকের স্মৃতিতে পরিণত করেছে।

আজকের সংখ্যা আরও এমন অনেক জ্যেষ্ঠকে নিয়ে, যাঁরা প্রতিভাবান হয়েও কনিষ্ঠের খ্যাতির অন্তরালবর্তী হয়ে বিরাজ করছেন।

জ্যেষ্ঠদের প্রতি এই সহানুভূতি-সংখ্যাকে দয়া করে আমার ব্যক্তিগত জ্যেষ্ঠত্ব দিয়ে বিচার করবেন না।

কারণ, 'রোববার'-এ আমি জ্যেষ্ঠ হলেও, যথার্থই অন্তরালবাসী। প্রধান প্রতিভা আমার অনুজ বা কনিষ্ঠরা।

২৭ মে, ২০১২

আজকাল সব তারিখই দেখি কোনও না কোনও একটা দিবস। মাঝে মাঝে মনে হয় সারা বছরের ক্যালেন্ডারে কোনও দিনই আর সাধারণ হয়ে থাকবে না।

প্রেম-প্রীতি-লোভ-অসূয়া, যাবতীয় জাগতিক বৃত্তি এসে শিরোস্ত্রাণ হয়ে উঠবে পানসে প্রাত্যহিকে। কোনও দিনকে আর অ-বিশেষ রাখা চলবে না।

আমার এই সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটিই শুরু হল যখন জানা গেল যে আগামী ২১ জুন নাকি বিশ্ব সংগীত দিবস বা World Music Day।

সত্যিই Father's Day, Mother's Day-র পর এবার সংগীতের জন্যও যে বিশেষ দিন নির্ধারণ করা হবে—এতে আর আশ্চর্য কী?

একেকসময় মনে হয়, আমাদের সাবেকী তিথিগুলোই বেশ ছিল। অন্তত সেগুলো প্রাত্যহিকের বিচ্ছেদকে উদযাপন করত অন্তর দিয়ে।

জামাইষষ্ঠী (যদিও Son-in-Law Day এখনও চালু হয়নি এই হয়ে গেল বলে) ভাইফোঁটা (আমাদের আদি অকৃত্রিম Brother's Day)—এগুলোর মধ্যে যে এক গভীর অন্তর্লীন হরিষ বিষাদ জড়িয়ে আছে, যেটুকু না থাকলে কিনা জগতের কোনও উৎসবই সার্থক হয় না।

দু'টো দুর্গাপুজোর প্রায় মাঝখানটাতে জ্যৈষ্ঠ মাস। মেয়েকে বছরে আরেকটা দিন দেখতে পাওয়ার আকুলতা থেকেই যেন এই জামাইষষ্ঠীর তিথিমাহাত্ম্য।

তাতে করে মেয়ে জামাই একবার এল—চোখের দেখা দেখে বাবা-মায়ের বুকের জ্বালা কিছুটা হলেও জুড়লো। আর সেই উপলক্ষে ভাল-মন্দ রান্না করে খাওয়া হল। পঞ্চব্যঞ্জন ছাড়া ভোজনরসিক বাঙালির কোনও তিথিই যে পূর্ণতা পেয়ে ওঠে না।

আর জামাইকে ভূরিভোজন করানোর পেছনে নিছক স্নেহের বাইরে একটা গোপন উদ্দেশ্যও হয়তো থেকে থাকবে—খাইয়ে-দাইয়ে জামাইকে একটু হাতে রাখা। যাতে শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের যত্ন-আত্তিতে কোনওরকম ভাঁটা না পড়ে।

ভাইদ্বিতীয়ারও একই গল্প। বাপ-মায়ের সঙ্গে নয় দুর্গোৎসবে, জামাইষষ্ঠীতে মেয়ের দেখা হল। কিন্তু ভাই তো জামাইষষ্ঠীর দিন তার নিজের শ্বশুরবাড়িতে। ভাই-বোনে হয়তো দেখাই হল না। তাই ভাই-বোনের একত্রিত হওয়ার জন্য ভাইফোঁটা বা রাখিবন্ধন।

যারা প্রাত্যহিকের সঙ্গী, তাদের নিয়ে বিশেষ তারিখের তাৎপর্য আমি জানি না। বা আমার মোটা বুদ্ধিতে বুঝে উঠিনি।

অ-দর্শন যাকে বিশেষ করে রেখেছে তার জন্য বিশেষদিন ধার্য করার একটা বেদনাবিধুর মধুর তাৎপর্য পাই।

কালিদাসের যক্ষ যদি নির্বাসিত না হয়ে কেবল রামগিরি পর্বতে বেড়াতে গিয়ে picture post-card পাঠানোর জায়গায় বরষার নবজলধরকে তাঁর দূতী করতেন তা হলে কি পয়লা আষাঢ়ের দিনটি এমন কাব্যিক মহার্ঘ্যতা পেত।

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' কথাটি উচ্চারণ মাত্রে সব বিরহীর হৃদয়ে যে তোলপাড়টা ওঠে তার কারণ বোধহয় কবি একটা তারিখ বেছে নিয়ে তার মধ্যে বিচ্ছেদ বেদনার যাবতীয় নির্যাসটুকু ভরে দিয়েছেন। তাই এটা আর পাঁচটা তারিখের মতো অর্থহীন লাগে না।

আসলে, যেখান থেকে কথাটা উঠেছিল—২১ জুন নাকি বিশ্বসংগীত দিবস।

আমরা, যারা প্রত্যক্ষ সংগীত চর্চার মধ্যে নেই। অথচ সারাবছর যখন তখন গান না শুনলেও চলে না—তাদের পক্ষেও আলাদা করে World Music Day-র অর্থ কী? সংগীতজ্ঞ বা রসিক মানুষদের কথা ছেড়েই দিলাম।

মাঝে মাঝে ভয় করে যে কোনও একদিন ৪ঠা জুলাই (আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস) ম্যাকডোনাল্ড বা কেএফসি একটা স্পেশ্যাল ডিসকাউন্ট দিতে শুরু করবে। আর আমরা দুদ্দাড়িয়ে গিয়ে সস্তায় খাবার আনন্দে এত বেশি দিশেহারা হব, যে ধীরে ধীরে ৪ জুলাই ভারতবাসীর কাছে ১৫ অগাস্টের থেকেও অনেক বেশি উত্তেজক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে ভয় কি?

যাকগে, আপনারা যারা জানতেন না যে ২১ জুন বিশ্ব সংগীত দিবস তাঁদের জন্য নতুন জেনারেল নোলেজ। আর, সেই উপলক্ষে আমাদের রোববার সংখ্যা—দ্বৈতগান বা গানের জুটি নিয়ে, ডুয়েট। এই গানের জুটি বললেই যেটা স্বচ্ছন্দ ভাবেই মনে আসে—তা কোনও মানবদম্পতি নয়। বৈষ্ণবকাব্যের ভাবনাসম্ভূত দু'টি শুক আর সারি-ই আমার কাছে আদি গানের জুটি।

রাধা ভাল না কৃষ্ণ এই কাব্যতর্কে আজন্ম লিপ্ত এই পক্ষীদম্পতি আমাদের চেতনাকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করে, যে বৈষ্ণব সংগীতের মধ্যে আমরা নিয়তই দ্বৈতের দ্যোতনা খুঁজি। একা বোষ্টম ঠাকুর গান শোনাতে এলে যেন মন ভরে না, সঙ্গে তাঁর বোষ্টমীটিও চাই। কারণ তাঁরাই তো শোনাবেন শুকসারির যুগযুগান্তের প্রণয়কলগোখা।

—শুক বলে, আমার শ্যামের মুখে মোহনবাঁশি
সারি বলে, রাধার মুখে ফুটবে বলে হাসি—
বাঁশি তাই তো বাজে
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।।

কে জানে, দ্বৈতগানের চেহারাটা আমার কেন যেন অসম্পূর্ণ লাগে কোনও একটা দৃশ্য-অবয়ব ছাড়া। তাই বুঝি, চলচ্চিত্রের পর্দায় দ্বৈতগানের চেহারাটা অনেক বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কারণ

পাত্রপাত্রী (এক্ষেত্রে, দ্বৈত কণ্ঠের অধিকারী) এখানে সশরীরে বর্তমান। সপ্তপদীর 'এই পথ যদি না শেষ হয়' মনে পড়ছে।

উত্তমকুমারের ঠোঁটে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তরল স্বর্ণকণ্ঠ কোথায় যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কেবল দ্বিচক্রযানারূঢ়া সুচিত্রা সেন যদি কেবল স্মিতহেসেই উত্তম সান্নিধ্যে লিপ্ত থাকেন।

তাই কেবল মাত্র 'তুমিই বল, তুমিই বল' আর এককলি 'লাল্লা-লা' গাইবার জন্যই গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে প্রায় অভিনেত্রীর ভূমিকা নিতে হয়।

এবং আগাগোড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একটি নিটোল গান যৎসামান্য অনুপ্রবেশের অধিকার পেয়ে বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ডুয়েট গানের আসন লাভ করে।

আরেকটু উদাহরণ টানলেই বোঝা যাবে 'শঙ্খবেলা' ছবির 'কে প্রথম কাছে এসেছি' গানটির কথা।

সেখানেও 'তুমি, না না আমি' বলে আবার শুরু হয় এক প্রণয় খুনসুটির প্রতিযোগিতা।

আসলে ডুয়েট গানের বাণীর নিরিখে বেশিরভাগ গানই একক সংগীত। কেবলমাত্র দ্বিতীয় একটি কণ্ঠ ব্যবহার করে একই কথার পুরাবৃত্তি বা পাদপূরণ করিয়ে সেটিকে ডুয়েট করা হয়, শুধু নায়ক নায়িকার উপস্থিতিকে অর্থবহ করার তাগিদে। নইলে 'চঞ্চল মন আনমনা হয়, যেই তার ছোঁয়া লাগে' সহজে এবং স্বচ্ছন্দেই নায়ক কিংবা নায়িকার সাঙ্গিতীক স্বগতোক্তি হতে পারত, তাতে গানের রসহানি হয়তো ঘটত না। কিন্তু, সেক্ষেত্রে পর্দায় দেখা নায়ক নায়িকার জুটির একজনকে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হতে হত, বায়োস্কোপের মনোরঞ্জনী নিয়মে সেখানে বোধহয় দর্শকের ষোলো আনা তৃপ্তিতে কোথাও ঘাটতি পড়ে।

বাংলা সিনেমার অন্য একটি বিখ্যাত গানের কথায় আসি। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী' ছবিতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে দু'জনের গলাতেই 'আমি যে জলসাঘরে বেলোয়ারি ঝাড়' গানটি শোনা যায়—সেটি দু'জনেরই একক গান। কিন্তু সিনেমার পর্দায় তনুজার (সন্ধ্যাকণ্ঠী) গানটি শুনে-শিখে নিয়ে মান্না দে-র গলায় সেই গানটিই গেয়ে উত্তমকুমার বাজিমাত করেন। এবং সেই গানটিই তখন যেন বিচ্ছিন্ন দুই প্রান্তিক নরনারীর মধ্যে এমন এক সুকুমার দৌত্যবৃত্তি করে, যে আলাদা করে গাওয়া গান দু'টি যেন আমাদের স্মৃতিতে প্রায় 'ডুয়েট' গানের অনুষঙ্গে বেঁচে থাকে।

এইভাবেই ছবির গান ধীরে ধীরে গানের পাঠের মধ্যেই এক নায়ক-নায়িকার সহচরবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। ছবির পর্দার বাইরে পুজোর গানে যখন রাহুল দেব বর্মন 'জানি না কোথায় তুমি, হারিয়ে গেছ আর পাব কি না' বলে বিলাপ করেন আর আশা ভোঁসলের 'এখানে'র চমক এক চিরপরিচিত অভিসারের অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত দেয়, তখন আমরা বুঝি যে গানের ইতিহাস, তার

পর্যায়ক্রম যে কত বৃহৎ ও নিত্য পরিবর্তনশীল যে তাকে বছরের একটা নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে বাঁধা কোনও কাজের কথা নয়।

১৭ জুন, ২০১২

গত সপ্তাহে হঠাৎ আবার নতুন করে আমার শহর পরম গর্বে ভরে দিল আমায়।

আমি দিল্লি যাচ্ছি। গোবিন্দ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এয়ারপোর্টে। বিমানবন্দরের কাছে পৌঁছে গিয়েছি প্রায়। হঠাৎ চোখে পড়ল, রাস্তায় চেয়ার পেতে-বসা একজন মানুষ। গাড়ি চেকিং-এর টিকিট দিচ্ছেন।

সাধারণত গাড়ির পার্কিং-টিকিট দেওয়া যুবকদের অত্যন্ত সদর্পে ছোটাছুটি করতে দেখি শহরের যে কোনও পার্কিং ফুটপাথ জুড়ে।

ফলে চেয়ারে বসে-বসে পার্কিং-টিকিট দেওয়া মানুষটির সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহলও তৈরি হল। এবং একটু কাছে যেতেই বুঝলাম, মানুষটি প্রতিবন্ধী। ঠিক যেভাবে আমরা 'টোল ট্যাক্স'-এর কুপন কাউন্টারে দাঁড়াই এবং টাকা দিয়ে টিকিট কাটি, সেভাবেই প্রতিটি গাড়ি সেই চেয়ারে বসা প্রতিবন্ধী যুবকের সামনে এসে থামছে, এবং টিকিট সংগ্রহ করছে। এর পিছনের ভাবনাটা, এবং একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে নিত্যকার চলমান পৃথিবীর সঙ্গে দায়িত্ব সহকারে জড়িয়ে নেওয়া—পুরোটাই চমৎকার।

এবং কলকাতার গাড়ি চড়া মানুষরা যে সেটাকে সসম্মানে স্বীকার করছেন, এটাও বড় ভাল।

এবার আমি মনে-মনে নজর রাখছি গোবিন্দর ওপর।

গোবিন্দ খুব ছোটবেলা থেকে আমার গাড়ি চালায়। এবং একজন সেলিব্রিটি-র চালক হিসেবে ও অনেক নিয়ম-কানুন, যানবাহন-সম্পৃক্ত বেশির ভাগ শৃঙ্খলাকে সহজেই লঙ্ঘনীয় মনে করে।

মোট কথা, আমি গাড়িতে থাকলে ও অনেকরকম নিয়ম ভাঙে। সিট বেল্ট পরে না। আর পুলিশ ধরলেই কাচ নামিয়ে আমায় দেখিয়ে দেয়। আমি বহুবার পুলিশকে বলেছি যে, গোবিন্দ অন্যায় করেছে। এবং আপনারা ওকে শাস্তি দিন। আমি গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সি করে চলে যাচ্ছি—তাঁরা অপ্রস্তুত হয়ে হাতজোড় করে চলে গিয়েছেন।

এই নিয়ে গোবিন্দর সঙ্গে প্রচুর অশান্তি হয়েছে। আমার গাড়ি থেকে 'প্রেস' লেখা স্টিকার আমি নিজে খুলে দিয়েছি—কোনও লাভ হয়নি।

ফলে এই একজন চলচ্ছক্তিহীন মানুষের সামনে গোবিন্দ কী কৌশল করে, এটা আমি দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।

ও মাগো! গোবিন্দ চেয়ারের কাছে এগোতে-এগোতেই গাড়ি স্লো করল, চেয়ারের সামনে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, টিকিট কাটল। আমরা এগিয়ে গেলাম।

পিছন ফিরে একবার দেখলাম, আমার পরের গাড়িগুলোও এক-এক করে এসে থামছে ওই চেয়ারটির সামনে।

যে-শহরের প্রচুর মানুষ যত্রতত্র থুতু ফ্যালা-কে গর্হিত মনে করেন না, পারলেই লাইন টপকে এগোন—তাঁরা সবাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এসে দাঁড়াচ্ছেন রাস্তার মাঝে রাখা ওই আসনটির সামনে।

যেখানে কোনও কড়াকড়ি নেই। টিকিট না-কেটে পালিয়ে যাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। কোনও শক্ত পেয়াদা নেই—কেবল নিজেদের মানবিকতা দিয়ে এই চেয়ারে বসা মানুষটিকে সম্মান করে সবাই যেন রাতারাতি দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে গিয়েছেন।

ততদিনে আমাদের আগের সংখ্যা 'পতাকা'-র 'ফার্স্ট পার্সন' তাড়াহুড়ো করে লিখে চলে এসেছি। নইলে কলকাতার মানুষের স্বতোৎসারিত মানবতার জয়পতাকার এই নম্র চিত্তশুদ্ধির কথাটা লেখা যেত।

১৯ আগস্ট, ২০১২

মাঝে-মাঝে মনে হয়, মানুষের বুঝি আর প্রয়োজন নেই মানুষকে।

বছর পনেরো আগে অবধি যেটা ছিল কেবল এক সচল দূরভাষ, সেটাই যেন বিগত কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে উঠল এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী-সচিব।

যার হাতে আমরা নির্দ্বিধায় প্রতিনিয়ত সমর্পণ করে চলেছি আমাদের স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ।

আমি নিতান্তই মোবাইল-অজ্ঞ।

তা ছাড়া, অনেকের অভিযোগ যে, আমি মোবাইল ফোনটা সঙ্গে রাখি কেবল ফোন করব বলে। ধরব বলে নয়।

অর্থাৎ কিনা, আমার ফোন করার দরকারটুকু মিটে গেলে আমি অনায়াসে ঘুম পাড়িয়ে রাখি আমার গতিমান সহচরটিকে।

কথাটা বোধহয় একভাবে ঠিকই। ফোন আর এসএমএস ছাড়াও মোবাইলের বহুলপ্রতিভার প্রয়োজন আমার কাছে কম।

যতদিন না আমার সংগ্রহের সব বই ফুরিয়ে যায় (যেটা প্রায় অসম্ভব), কিংবা সব সিনেমার

পুনঃপুন ডিভিডি-দর্শন ক্লান্ত করে মনকে (সেটাও অসম্ভবই মনে হয় আমার), নীলচে কম্পিউটার পর্দায় ইন্টারনেট-আসক্তির সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করে শ্রান্ত হয় দু'টো চোখ, ততদিন অন্তত সর্বক্ষণ মোবাইলাশ্রয়ী হয়ে আমায় কাটাতে হবে না।

তবু মোবাইল ফোন আমাকে ভাল লাগার গান শোনায়, যত্ন করে মনে পড়িয়ে দেয় যে কোনও সম্পর্ক-পার্বণ, আমার হয়ে নিপুণ দক্ষতায় বর্ণানুক্রমে মনে রাখে আমার জীবনের যত আসা-যাওয়া।

মোবাইলের পর্দা ঘনিষ্ঠতার বিশেষ-অবিশেষের পার্থক্য করে না। সম্পূর্ণ নির্মোহভাবে আমার সামনে তুলে ধরে আমার জীবনের যাবতীয় মানবস্পন্দন।

মোবাইলের 'এসএমএস' (বক্তব্য নয়) অচেনা প্রেরককে আলাদা করে সুন্দর বা অপ্রীতিকর করে না। আমার না-জানা না-দেখা কত সুন্দর বা কুশ্রীতাকে নিজ-নিজ উত্তুঙ্গ থেকে নামিয়ে এনে নিভাঁজ মসৃণ করে দেয় কত সহজেই।

মোবাইলে যেমন নিমেষে প্রবেশ করতে পারে সম্পর্ক, তেমনই অধিকতর দ্রুততায় নিষ্ক্রান্ত হতে পারে কোনও দীর্ঘ জীবনবন্ধন।

মোবাইল সন, তারিখ, সময় দিয়ে স্মৃতির পত্রসাহিত্য লেখে অবলীলায়। আবার সেই সাধের স্মৃতিচিত্রের বিলুপ্তির আয়োজনে সে-ই আমার নিভৃততম সহ-দুষ্কৃতী।

তবু নিধনের সময় জল্লাদেরও তো হাত কাঁপে বলে জানি।

তাই রোষাভিমান থেকে মুক্তি পাওয়া কয়েকটি আনন্দ-বেদনাকে জাগরূক রাখতেও তার আপত্তি নেই।

শুধু একটা জিনিসই এখনও শেখেনি আমার মোবাইল। না কি আমি নিজেই? ফেলে আসা সব সুখ-দুঃখের একটিই অন্তিম রং কেন আদতে বেদনারই, বিনষ্ট কোনও নৈকট্যের গূঢ় কোনও সঞ্চিত-বার্তা কেন তবে বারবার করে মনে করায়?

—একদিন তো এতটাও দিতে চেয়েছিল সে। তা হলে?

ভাগ্যিস, মোবাইলে কোনও হাতের লেখা থাকে না।

২৬ আগস্ট, ২০১২

অনেকদিন পর্যন্ত সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আমাদের শিক্ষকরা ছিলেন কেবলই মহিলা। আমরা তাঁদের 'আন্টি' বলে ডাকতাম।

তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন মধ্যবয়স্কা। বাড়িতে মা বা পিসিমণির বয়স তখন তুলনায় অনেক কম—আবার দিদিমার কিছুটা বেশি।

তাই 'আন্টি' সম্বোধনটা ছোটবেলায় এই মাঝবয়সি মহিলাদের সমার্থক হয়েই বেঁচে ছিল মনে।

এই ভাবনাটা সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে গেল 'জয়-জয়ন্তী' ছবিটা দেখার পর। দেখলাম আন্টিরা অল্পবয়সিও হন, সুন্দরীও হন, আবার নাচ-গানে পারদর্শীও।

প্রাইমারি স্কুলের এই মধ্যবয়স্কা শিক্ষিকারা সকলেই প্রায় সুতির শাড়ি পরতেন। পরতেন কনুই-হাতা ব্লাউজ। আর ছোট্ট একটা টিপ।

হ্যান্ডব্যাগ ছাড়াও, স্কুলের খাতার পাঁজা আর চক-ডাস্টার যেন তাঁদের সাজের অংশ বলেই মনে হত। তখন আমরা নিতান্তই ছোট। পাঁচ থেকে সাত বছরের শিশু।

দুষ্টুমি করলে দু-এক ঘা দিতেন কেউ-কেউ মাঝে-মাঝে, আর তার সঙ্গে দিতেন অপার স্নেহ। ক্লাসের কোনও ছেলেমেয়ের শরীর খারাপ হলে তাঁদের যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি, এবং বাড়িতে ফোন করে অভিভাবকদের খবর দিলে, তাঁরা না-এসে পৌঁছনো পর্যন্ত, একটা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েই যেত।

ফলে ওই সামান্য চড়চাপটার আঘাত শরীর এবং মন থেকে মিলিয়ে যেত অচিরেই। কেবল বড় হয়ে জানলাম, এটার নাম 'কর্পোরাল পানিশমেন্ট'।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলে তখন ক্লাস ফাইভ থেকে হাইস্কুল হত। সেখানে পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণির (অধুনা দ্বাদশ) সব ছাত্রছাত্রী—হঠাৎ একটা নির্জন নিভৃত দুপুরবেলায় অন্দরমহলের বাইরে বেরিয়ে এসে যেন এক বিশাল পৃথিবী।

এখানেই প্রথম দেখা হল পুরুষ-শিক্ষকদের সঙ্গে। স্কুলের নিয়মে তাঁদের 'স্যর' বলতে বলা হল। 'আন্টি'-র পুরুষ কাউন্টারপার্ট কেন 'আঙ্কল' না-হয়ে 'স্যর' হবেন—এই প্রশ্ন শিশুকালে মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু শিশুমন নিজেই সেটাকেই সেন্সর করেছিল সহজ বুদ্ধিতেই।

হাই স্কুলের আন্টিরা ছিলেন অন্যরকম। মোটেই সকলে মাঝবয়সি নন। সাদাসিধে পোশাকেও নন সকলে। কয়েকজন রীতিমতো সুন্দরী, এবং সেই বোধহয় প্রথম কয়েকজন 'আন্টি' কে দেখলাম স্লিভলেস ব্লাউজ পরে।

ভেবেছিলাম, এটা হাইস্কুলের বৈশিষ্ট্য।

'স্যর'-রা সর্বক্ষণ আশে-পাশে থাকলে 'আন্টি'দেরও যে একটু বেশি সাজতে ইচ্ছে করবে, এটা

বুঝেছি অনেক পরে। আমরা স্কুলে থাকতে-থাকতেই শুনলাম, সুপ্রিয়া আন্টির (বসু) সঙ্গে সুবীর স্যারের (দত্ত) বিয়ে হবে। এবং সোমেন স্যর আর নন্দিতা আন্টি বিবাহিত হলেন বোধহয় কোনও একটা লম্বা ছুটির সময়।

স্টাফরুম থেকে সংসার পাতার এই দৃষ্টান্তগুলো বড় চমৎকার, কৌতূহলোদ্দীপক ও মনোমুগ্ধকর লাগত। তার মধ্যে কোথায় যেন সব কথা প্রকাশ না-করেও একটা ভাললাগার নতুন উত্তাপ বুঝতে পারলাম। সেটার নাম যে রোমান্স, এবং এই হতচ্ছাড়া অনুভূতিটাই যে বহু দিন অবধি চালিত করবে আমার জীবনটাকেও, সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীটি তখনও সম্যকভাবে জানি না।

সব স্কুলের মতো আমাদের স্কুলেও কিছু শিক্ষক কড়া, আর কয়েকজন অনেক বেশ নরম প্রকৃতির ছিলেন। তবে স্কুল-জীবনের ছোটবেলায় ছাত্র হিসেবে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য Renaissance বানানটি নির্ভুল লিখতে পারলেই অনেকটা চলত। শব্দটার উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষকদের মধ্যেও মতদ্বৈধ ছিল বুঝতাম। আর আসল মানেটা বোঝা না-বোঝার মধ্যে দিয়ে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—সব পার হয়ে গেল।

দুই

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি নিয়ে এমএ পাশ করে বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু করলাম।

বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে নামকরা শিক্ষক হবে—হল না। মা'র ইচ্ছেটা ছিল আবার সম্পূর্ণ নীতি-নির্ধারিত। সৎ পথে থেকে উপার্জনশীল হওয়ার—সেটাও পারলাম কি না, ভবিষ্যৎ বলবে।

সাড়ে সতেরো বছরের পড়াশোনা শেষ করেও দেখলাম কিছুই শিখিনি। কিন্তু ফিল্মমেকার-টা কেমন করে যেন হয়ে গিয়েছি।

অল্পশিক্ষার গ্লানি নিয়ে শমীকদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) ওপর প্রবল অত্যাচার শুরু হল—পড়াও। সকাল সাতটায় শমীকদার গল্‌ফগ্রিনের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছি কতদিন খাতাপত্তর হাতে।

শমীকদার বাড়িতে আসবাব বলতে কেবল বই। আর, মেঝেতে ইতস্তত মীরা মুখোপাধ্যায়ের ব্রোঞ্জ-সৃষ্টিরা ছড়িয়ে-ছিড়িয়ে। তার মধ্যে কখনও সোফাক্লিস, কখনও শেক্সপিয়র। 'দ্য লাস্ট লিয়ার' ছবিটার আগে 'কিং লিয়ার' পড়া-ই বোধহয় শমীকদার কাছে এ যাবৎ শেষ ক্লাস।

নৃসিংহদাকে (নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী) অনেক বলেও নিয়ম করে 'মহাভারত'-টা পড়িয়ে ওঠাতে পারিনি। একদিন সক্ষোভে বললেন—আমার 'মেঘদূতম্'-টা ভাল করে পড়াতে ইচ্ছে করে সেরকম রসিক কাউকে! বুঝলাম, 'মেঘদূতম্-রসিক' এ জন্মে আর আমার হওয়া হল না।

আপাতত শিবাজীর (বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে নিয়মিত হানা দেওয়া শুরু হয়েছে। শিবাজী বাঁড়ুজ্জে

বামুন হয়েও ভোজনে যতটা না বিশ্বাস করেন, তার থেকে অনেক বেশি ভালবাসেন আহার পরিবেশনে।

শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের বাংলা দিয়ে। এর মধ্যে টুকরো-টুকরো করে মহাভারত, রবি ঠাকুর, বাংলা শব্দের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, বৌদ্ধ ত্রিপিটকের গলিঘুঁজি দিয়ে কোনও এক পড়ন্তবেলায় পড়ব হয়তো একদিন। সর্বান্তঃকরণে কামনা—ততদিনে হয়তো 'রেনেসাঁ'-র মানেটা যে জানা হল না, সেই আক্ষেপটা আর থাকবে না।

২ সেপ্টেম্বর, ২০১২

সাম্প্রতি, শহরে কিছু নিয়মিত নাট্যদ্রষ্টার আলোচনায় একটি বিদ্রুপবাক্য শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতা শহরের নানা নাট্যমঞ্চে একই সঙ্গে শেক্সপিয়ার-এর ঢল নেমেছে। এটা কি পুরোটাই পূর্ব-পরিকল্পিত, কাকতালীয়, না কেবল হুজুগমাত্র?

এই বিদ্রুপবাক্যে যদি নেহাত দোষ-পাড়া অভিযোগের বাইরেও কোনও সত্যিকারের নিরুত্তর প্রশ্ন লুকিয়ে থাকে, তা হলে তার সমাধান খুঁজে পেতে কলকাতাবাসীকে বিশাল বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।

সাহেবি আমলে নামঙ্কিত কলকাতার রাস্তাঘাট যখন ঔপনিবেশিক আত্মপরিচয় ঝেড়ে ফেলে খুঁজে নিচ্ছিল বঙ্গমহিমার নতুন গৌরব—একটি বিশেষ রাস্তা তার নিজের পরিচয়টুকু স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেছিল এক ইংরেজের কাছে।

আমাদের চিরপরিচিত 'থিয়েটার রোড' নতুন নাম পেল—শেক্সপিয়ার সরণি। যেন থিয়েটারের এক মহার্ঘ প্রতিশব্দ হিসেবেই কলকাতার এই 'নাট্য সরণি' আসলে রেখে দিল থিয়েটারের অমূল্য বিশ্ব-ইতিহাস।

আর সেদিন থেকেই যেন আনুষ্ঠানিক ভাবে কলকাতার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।

তাই আজ এই শহরে যদি কখনও কোনও অজুহাত ছাড়াই মঞ্চে-মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ে শেক্সপিয়ার-এর নাট্য সংকলন, তাঁর কমেডি-র অনুরণন, আর ট্র্যাজেডি-র দীর্ঘশ্বাস, দুই-ই তো কলকাতাবাসীর নিজস্ব প্রাপ্তি। তাকে কি বিদেশি ভেবে কুণ্ঠিত হওয়া যায়?

বাস্তবিকই, বেশ কয়েকটি শেক্সপিয়ার অনুবাদ বা অনুসরণ এখন রমরমিয়ে চলছে কলকাতার বুকে। এবং অভাগা আমি, তার বেশির ভাগই, আমার এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি।

দুই

এই পর্যায়ে যে-নাটকটি প্রথম দেখেছিলাম, সেটি সুমন মুখোপাধ্যায়ের (আমরা সুমনকে 'লাল' বলেই চিনি) নির্দেশনায় 'কিং লিয়র'। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র পর বাংলা নাট্যদর্শককে আর নতুন করে চেনানোর কোনও দায় নেই মঞ্চের এই জাদুকরের বিপুল ঐশ্বর্য।

'লিয়র'-এ এসে লালের এক অপূর্ব উত্তরণ—যেখানে বৈভব আর সংযম যেন একই সঙ্গে পরস্পরের প্রণয়াসক্ত।

আমি অবশ্য লন্ডন বা স্ট্যাটফোর্ড-এ-কোনও শেক্সপিয়ার অভিনয় দেখিনি। কিন্তু রবীন্দ্র সদনে, সেই সন্ধ্যায়, অভিনয় দেখে মনে হল, বাংলা ভাষার আবরণটুকু সরিয়ে নিলে এই অপূর্ব প্রযোজনাটি যে কোনও আন্তর্জাতিক নিদর্শনের তুলমূল্য।

সৌমিত্রদার আহ্লাদিত, উজ্জীবিত, হতচকিত, ক্লান্ত, হতাশাগ্রস্ত এবং চন্দ্রাহত 'লিয়র' কেমন করে যেন বুকের ভিতরটাতে ঢুকে পড়ে। আর বেরতেই চায় না। দেবু-র (দেবজ্যোতি মিশ্র) আবহ নির্মাণের অভিঘাত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় স্বপ্নের মতো।

দ্বিতীয় নাটক যেটি দেখলাম সেটি বাবান-এর (কৌশিক সেন) 'ম্যাকবেথ'। এই 'প্রথম' আর 'দ্বিতীয়' কেবলই আমার দর্শক অভিজ্ঞতার কালানুক্রম। প্রযোজনার প্রসাদগুণ বা মান সম্পর্কে কোনও তুলনামূলক মাপকাঠি নয়।

'স্বপ্নসন্ধানী'-র 'ম্যাকবেথ' মিনার্ভা রেপেটোয়ারি-র 'কিং লিয়র' থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। ওপর থেকে নেমে আসা এক বৃক্ষশিকড়ের তীক্ষ্ণ নখর আর কুয়াশার মধ্যেও প্রায় একই অবয়বলগ্ন তিন ডাকিনীর সম্মোহনী ভবিষ্যদ্বাণী যেখানে নায়কের প্রবল প্রতিরোধকে নস্যাৎ করে দিয়ে অন্যায় রক্তপানের অশুভ শপথবাক্যে মন্ত্রপূত করে দেয় ম্যাকবেথের কোষমুক্ত তরবারি, কিংবা সত্যিই যখন ম্যাকবেথ অবধারিত ভাবে জেনে যায় যে বিনাশকাল অবধি তাঁর সব ক'টি রজনী নিশ্ছিদ্রভাবে বিনিদ্র আর বাংলা সংলাপগুলো কেমন করে যেন মনে-মনে মূল ইংরেজি কবিতার শরীরধারণ করে, এক তীব্র বেদনা প্রায়-কণ্ঠরোধ করে আমাদের, আর আমি হাততালি দিতে ভুলে গিয়ে জড়ভরতের মতো বসে থাকি—তখন একটা কথাই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে,

—শেক্সপিয়ার কলকাতায় অভিনীত হবে না তো কোথায় হবে?

তৃতীয় নাটকটি সম্প্রতি দেখলাম। As you like it অনুসরণে 'নান্দীকার'-এর 'হৃদমাঝারে'। একেবারেই অন্য স্বাদের একটি প্রযোজনা। বর্ণিল, মজাদার, হুল্লোড়ে। হয়তো আরও অনেক কথা বলা যেত।

কিন্তু বন্ধু-অভিনেতা অনির্বাণ ঘোষ 'অরল্যান্ডো' চরিত্রে অভিনয় করেন, এবং খুব ভাল করেন—তাই নৈর্ব্যক্তিকও হতে পারব না বলে বেশি প্রশংসা করতে সংকোচ হচ্ছে।

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

সে প্রায় এক কুড়ি বছরেরও আগের কথা। আমি বয়সেও তরুণ, সিনেমা-জগতেও শিশু। কোনওমতে আধো-আধো বুলিতে, টলোমলো পায়ে বানাতে বসেছি 'হীরের আংটি'। সেখানেও একটা সোনার মোহরের ব্যাপার ছিল বটে—তবে সে-কথা থাক।

টালিগঞ্জে সবে পা রাখার অধিকার পেয়েছি। টেক্‌নিশিয়ান স্টুডিওতে অন্যান্য যাঁরা শুটিং করছিলেন, তাঁরা বেশির ভাগই আমার নাম অবধি জানেন না। আমার মুখটা চিনেছেন বিজ্ঞাপনের একটি ছেলে বলেই।

আমার ছবিতে অভিনয় করছেন যাঁরা, প্রত্যেকেই অবশ্য স্বনামধন্য : বসন্ত চৌধুরী, জ্ঞানেশ মুখার্জি, বঙ্কিম ঘোষ, বরুণ চন্দ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখার্জি, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, শকুন্তলা বড়ুয়া আর মুনমুন সেন।

তখন সবে মুনদি-র (মুনমুন সেন) সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পালা। কথায়-কথায় হতচকিত করে দেওয়ার মতো স্পষ্টবাদিতা, প্রথাগতভাবে যেটাই ত্যাজ্য, সেটাকেই অন্তর দিয়ে আলিঙ্গন করে নেওয়ার মতো বিশাল হৃদয়, সেই সঙ্গে নিজস্ব ব্র্যান্ডের অননুকরণীয় পাগলামি—সব মিলিয়ে মুনমুন সেন ধীরে-ধীরে খুব আদরের 'মুনদি' হয় উঠছে। আর আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করে চলতে শুরু করেছি—এমন একটা মানুষকে কেবল চিনি বলে। সে-চলা অবশ্য আজও চলছে।

ছবিতে মুনদি-র চরিত্রটা এক বড় জমিদার বাড়ির মেজ বউয়ের (মেজ ছেলে বরুণ চন্দ)। যাঁরা বিদেশে থাকেন। আর এবারে হঠাৎ বাড়ির পুজোর আগে কন্যা-সহ দেশের বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন কিছুদিনের জন্য। মুনদি কী শাড়ি পরবে, তা নিয়ে সকলের একটা অশঙ্কা ছিল। মুনদি অবশ্য ব্যাপারটা একটা বাক্যে সমাধান করে দিল। আমাকে বলল,

—হয় আমার মা-র শাড়ি, নয় তোর মা-র শাড়ি। তা ছাড়া, আমি মিনু শাড়ির মডেলিং করি বলে ওরা অনেক শাড়ি পাঠায়। এক ট্রাঙ্ক মিনু শাড়ি আছে। সেগুলো নিশ্চয়ই তোর চলবে না।

তিনটে অপশন-এর মধ্যে থেকে এটাই দাঁড়াল শেষমেশ : আমার মা-র শাড়ি। শকুন্তলাদি,

মুনদি দু'জনেই মা-র শাড়ি পরেছে সারা ছবি জুড়ে।

এবার এল ছবির শেষ দিনের শুটিং। কাহিনি-ক্রমেও সেটাই শেষ অঙ্ক।

মহাষ্টমী। ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হচ্ছে, আর বাড়ির ছেলে, বউ, নাতিরা ঠাকুরদালানে সমবেত। নতুন শাড়ি, গয়না পরে মহাষ্টমীর পুজো দেখছে বউরা। এদিনের শুটিংয়ে তো শুধু ঢাকাই পরলে চলবে না। বউদের মানানসই গয়নাও চাই। (আর তখন সেই অজানা, অনামা প্রথম পরিচালকের 'অঞ্জলি জুয়েলার্স'-এর অনন্যা-র মতো একটা বন্ধুও নেই যে, গয়না চেয়ে পাঠালে, বুবাই একটার জায়গায় দশটা নিয়ে এসে শুটিংয়ে হাজির হবে।)

শকুন্তলাদি চিরকালের লক্ষ্মী মেয়ে। ঠিক নিজের গয়না নিজে নিয়ে এল। আর পাগলি মুনদি শুটিং করতে এল জিন্‌স আর শার্ট পরে—আমি যা পোশাক ঠিক করব, তা-ই পরবে।

এটা যে আগে থেকেই অনুমান করিনি, তা নয়।

মা-কে বলেই রেখেছিলাম, তোমার সোনার গয়নাগুলো লাগবে মা, শুটিংয়ে।

মা রাজি হল একটাই শর্তে। গয়নাগুলো নিয়ে মা নিজে আসবে স্টুডিওতে। আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতো ভরসা মা'র নেই। আমার অনেক কাজ। আনমনে সব গয়না হারিয়ে ফেলতে পারি।

মুনদি-র মেক-আপ রুমে গিয়ে গয়নাগুলো দিলাম। মুনদি সোনার গয়না দেখে একেবারে খেপে আগুন। তার ওপর যখন শুনল গয়নাগুলো মা-র এবং মা নিজেই এসেছে গয়না পাহারা দিতে সটান বেরিয়ে গিয়ে মা-কে নিয়ে এসে বসাল নিজের মেকআপ রুমে।

তখন মুনদি টালিগঞ্জের অত্যন্ত গ্ল্যামারাস এক নায়িকা। আর আমার মা-র ছেলে টালিগঞ্জের সদ্য-টিকিট-পাওয়া এক অজ্ঞাতযশ নিতান্তই সাধারণ পরিচালনামনস্ক তরুণ।

তবু আমার মা-কে, সম্পূর্ণ অজনা এক মহিলাকে, সোজাসুজি 'মা' বলে ডাকতে কোনও অসুবিধা হল না মুনদি-র।

আর কেবল মাতৃসম্বোধনটুকুই কেন? অত্যন্ত আদরের পরামর্শ,

—মা, তুমি কোনও দিন শুটিংয়ে সোনার গয়না দেবে না। আমার মা বলেন, এত চড়া আলোয় সোনার গয়না নষ্ট হয়ে যায়।

তখন ফ্লোর-এ বিরাট জোগাড়যন্ত্র চলছে। আমার সেখানে থাকাটা নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু আমি, সব ফেলে শুনছি একটি মাতৃ-উপদেশ কীভাবে তাঁর মেয়ে পৌঁছে দিচ্ছে আরেক মায়ের কাছে। সে যেন কেবল মঙ্গলবাণী, তার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকুক বা না-থাকুক।

মা যতদিন ছিল, গয়না বিশেষ পরত না, গলার সরু চেনটুকু ছাড়া। মুনদি মাঝে-মাঝে পাথরের

গয়না পরে, দেখতে পাই। আর স্টুডিও-র কোনও আলো সুচিত্রা সেন-এর সোনার গয়নাকে স্পর্শ করে না কত যুগ হয়ে গেল!

কিন্তু এক মায়ের গল্পকে যে কেবল তার মেয়েই আরেক মায়ের গল্প করে দিতে পারে, এটার মধ্যে যেন এক সুপ্রাচীন লোককথার গন্ধ আছে, যার সাক্ষী আমি।

স্টুডিওতে সেই ঘটনার সুগন্ধ আমার মনে আজও উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লেখা।

৭ অক্টোবর, ২০১২

বর্ণ পরিচয়', 'আদর্শ লিপি' শেষ হয়েছে সবে। বাংলা হরফে নিজের নামটুকু নির্ভুল বানানে লিখতে পারি—'রেফ', 'মূর্ধ্যন-ণ' ঠিকঠাক রেখেই। 'স্বাক্ষর' শব্দটা চিনেছি, এটাও জানি যে, তার প্রয়োগটা আমার আয়ত্তের বাইরে।

'সই' কথাটা স্ত্রীলিঙ্গ হলেও, মা-কে তো তোমার সেই করতে দেখি না। মা যখন চিঠি লেখে দাদু, দিদা, বা ঠাকুমাকে।

'স্বাক্ষর' তা হলে কেবল প্রাপ্তবয়স্ক শব্দ নয়, তার মধ্যে একটা পৌরুষ-ও আছে। তাই সই করে বাবা। ব্যাঙ্কের চেক, কর্পোরেশনের চিঠি, আমার পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড। আর সই করতে গেলেই, বাবার হাতের লেখাটা আর বাবার মতো থাকে না। কেমন একটা দুর্বোধ্য রকমের প্যাঁচানো হয়ে যায়—যেন স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে বাবার কোনও সংকেতবাক্য বিনিময়।

রবি ঠাকুরের ছবি দেখি। কেমন মুনি-ঋষির মতো রূপ। সাদা শাড়ি, লম্বা সাদা চুল, গেরুয়া রঙের জোব্বা। যেন তপোবনের কণ্বমুনি।

রবি ঠাকুরের সইটাকেও তাই বাংলা বলে চিনতে পারি না। যেন মনে হয়, এ মুনি-ঋষিদের পুঁথি লেখার হস্তাক্ষর। চিনি বা না-চিনি, বুঝি বা না-বুঝি, কেমন যেন একটা সুগোপন সম্মোহন আছে ওই হস্তাক্ষরে। নকল করতে ইচ্ছে হয় বারেবারে। একবারে পুরোটা পেরে উঠি না কখনওই। তবে কোথায় যেন ধিকিধিকি জ্বলে গোপনতম ইচ্ছার অঙ্গার—যে, একদিন ঠিক পারব।

স্বাক্ষর—সে নাকি নিতান্তই ব্যক্তিগত পরিচয়। সেটা নকল করা অন্যায়। বলে দিয়েছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বলে দিয়েছে বাবা, মা-ও। তবু যেন দু'টো স্বাক্ষর হস্তগত না-করলে চলে না। এঁরা কেউ রবি ঠাকুরের মতো ছবির দেবতা নন। এঁরা শার্ট-প্যান্টই পরেন—বাবার মতো। কিন্তু সই দু'টো যে বড় লোভনীয়! সত্যজিৎ রায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ-টা নকল করা তুলনায় সোজা। 'য'-ফলটাই কেমন 'হ্রস্ব-ই' হয়ে যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সইতে আবার একটু রাবীন্দ্রিক প্যাঁচ। বাঙালির আদর্শ হাতের লেখা যেমন হতে হয়, তেমন আর কী!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সই দেখি 'দেশ' পত্রিকায়, বইয়ের বিজ্ঞাপনে। আর সত্যজিতের সই তো সেই ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসছি 'সিগনেট প্রেস'-এর বইগুলোয়।

এক ক্লাসের পর আরেক ক্লাস—বাংলা র‍্যাপিড রিডার পাল্টায়। কিন্তু লেখক বদলান না। পুরো শৈশবটা জুড়ে যেন অবন ঠাকুর সমগ্র। 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'নালক', 'রাজকাহিনী'। বাবা বলে, অবন ঠাকুর নাকি নামকরা ছবি-আঁকিয়ে। বাবা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলে। সত্যি তেমন ভাল আঁকতে পারলে, তাঁর গল্পে অন্য লোকে ছবি এঁকে দেয় কেন?

শকুন্তলার ছবিগুলো মাখন দত্তগুপ্তর আঁকা। মাখন কি কখনও মানুষের নাম হয় নাকি?

বাবা-মা বলে, হয়—মাখন হয়, ননীও হয়। আর মানুষের নাম নিয়ে নাকি ঠাট্টা করতে নেই। চুপ করে যাই। তবে ভাবনাটা পিছু ছাড়ে না। 'হ-য-ব-র-ল'-র তকাইয়ের কার যেন একটা নাম ছিল 'বিস্কুট'। কে জানে, হবে হয়তো।

আস্তে-আস্তে ক্লাস বাড়ে। ছবি-আঁকিয়ে অবন ঠাকুরের নানা পরিচয় পাই পরতে-পরতে। একদিন জেনে যাই যে, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমাটা সত্যজিতের বানানো।

সিনেমা বানানো কী, তাই ভাল করে বুঝি না। একটা গোটা তিন ঘণ্টার সিনেমা একা বানিয়ে ফেলতে পারে না কি কোনও মানুষ? অবিশ্বাস্য!

সেই অবিশ্বাস্যতাও বিশ্বাসঘাতকতা করে। একদিন দেখতে পাই, গুপি-বাঘাকে জলে ফেলে দিয়ে কোথাকার এক ফেলুদাকে নিয়ে উপন্যাসে লিখছেন সেই মানুষটা।

সবকিছু এত ভাল করে পারা—মোটেই ভাল নয়। তাই তো, ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়'-দের কেউ বন্ধু হয় না।

এবার আরেকটু ছাড়। শারদীয়। 'দেশ' পত্রিকায় ফেলুদার উপন্যাসটার প্রথম দখলদার আমি। বাবা, মা, ঠাকুমা, পিসিমণি—সবার আগে। কিন্তু অতটুকুই অনুমতি। যেন সিন্ডারেলা-র রাত বারোটা। তারই মধ্যে সময় চুরি করে, লুকিয়ে-চুরিয়ে আরেকটা উপন্যাস শেষ করি। লেখকের নাম 'নীললোহিত'। তখনও ক্লাসের বেশির ভাগ ছাত্রই ফেলুদা-র ভক্ত। যারা সব বড় হয়ে নীল আর্মস্ট্রং হবে বলেছিল, তারা সবাই এখন তোপসে হতে চায়। ভাবি, তোপসের মধ্যে আছেটা কী? হ্যাঁ, কপালজোরে ওরকম একটা দাদা পেয়েছিল!

আমার সহপাঠীরা সে-যুক্তি মানে না। তারা তোপসের মতো নানা অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চায়,

সেই সঙ্গে বেড়াতেও চায় নতুন-নতুন জায়গায়। ওরা বোঝে না, ভারতের মানচিত্রে যে-জায়গাগুলো আছে, সেখানে বেড়াতে যাওয়া তেমন আর কী কঠিন? ওরা এও বোঝে না, তোপসে চিরকাল তোপসে-ই থাকবে। তোপসে-রা কেউ ফেলুদা হয় না।

আমি তোপসে হতে চাই না বলে আমার খ্যাপায়। আমি মেয়েলি, ভীতু, ক্যাবলা। ওদের মতো অত চটপটে নই—এখনও গাড়ির রাস্তা পার হতে ভয় পাই।

মানচিত্রের দেশে বেড়ানো আমার কাছে আনন্দের, তবে ততটা নয়, যতটা নীললোহিত বেড়াতে যেতে পারে। অমলকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের গল্প শোনায় যে-ফকির, নীললোহিত-কে তার চেয়েও বেশি ভাল লেগে যায় কেন? নীললোহিত যে বলেছে—ও বুড়ো হবে না!

বলেছে বুঝি? জানি না, তেমন স্পষ্ট করে বলেনি বটে, কিন্তু কোথায় যেন কোন গোপন অঙ্গীকারে নীললোহিত আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ও কিছুতেই বুড়ো হবে না।

প্রত্যেকবার শরৎকাল এলেই আমার মনের ভেতরটায় আকুলিবিকুলি করে—নীললোহিত আসবে তো পুজোর আগে? ও কি জানে, যে আমি অপেক্ষা করে আছি? ফেলুদা যে আসবে, এটা স্থিরনিশ্চিত।

বীররা বারবার করে যুদ্ধ জিতে ফেরে, আর প্রেমিকরা? তাদের জন্য এত অপেক্ষা করতে হয় কেন?

ফেলুদা-র ছবি লেখক নিজেই আঁকেন। তিনি অবন ঠাকুরের মতো বোকা নন।

তাঁর আঁকা ছবিতে নির্ভুলভাবে ফেলুদা ফেলুদা-ই থাকে। জ্যাকেট, মাফলার, চারমিনারে।

আর নীললোহিত? সত্যিই কি তার কোনও ছবি আছে? কোনও গলার আওয়াজ? নীললোহিতের শব্দগুলোই ছবি আঁকে, গান গায়, গান ভুলে যায়, তারপর মাঝখান থেকে কবিতা বলে খানিক।

ফেলুদা ফার্স্ট বয়। তার অনেক ভক্ত।

ভাগ্যিস নীললোহিত সব পারে না। নইলে কী করে তার প্রেমে পড়তাম?

(চলবে)

৪ নভেম্বর, ২০১২

'দীন-ই-ইলাহি'-র যে সঠিক অর্থটা কী, সেটা নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা দেখতে পাই। প্রচলিত অর্থে আমরা জেনে এসেছি 'দীন-ই-ইলাহি'র মানে সর্বধর্ম সমন্বয়। আবার কোথাও অন্য কোনও ঐতিহাসিক বলছেন যে, প্রচেষ্টাটা প্রধানত ইসলাম আর হিন্দুধর্মের সেতুবন্ধন, যার মধ্যে কিছুটা ঢুকে পড়েছিল জৈন ও ইহুদি ধর্ম।

আবার কেউ-কেউ বলছেন, এ এক বিশেষ রাজধর্ম প্রজাদের রাজভক্তির উৎকর্ষ বিচারের জন্য।

বা, হয়তো ধর্ম বলতে যা বুঝি আমরা, আকবর তার বাইরে গিয়ে এক মুক্তনীতির কথা বলতে চেয়েছিলেন। সময়ের কুয়াশা আর বহুস্রোতা ইতিহাস-ধারা তাঁর মূল উদ্দেশ্যটিকে অধরা, অস্পষ্ট করে দিয়েছে।

কিন্তু কেবল ইতিহাস কেন, সমস্ত ধর্মের গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্যকে সম্মিলিত করে এক মানবিক ধর্মের সন্ধান তো তারপরেও করে গিয়েছেন কত মহামানব।

আমরা এই ধর্মসংকটকে 'অসাম্প্রদায়িকতা'-র তকমায় সীমাবদ্ধ করতে পেরেছি মাত্র, এর সার্বিক নিরাকার রূপ আমাদের কাছে এখনও পরিস্ফুট হল না।

যে-ভগবান আছেন বলে বিশ্বাস করি, তিনিও যেমন সশরীরে দৃশ্যমান নন, যে-ঈশ্বর নিরাকার তাঁর দর্শনও তো সমান অসম্ভব।

যে কোনও সার্বিকতার সামনেই বিভেদ প্রচুর।

হিন্দু-মুসলমান, আমরা-ওরা, তৃণমূল-সিপিএম।

আমার এক হিন্দু-বন্ধু আছেন, যাঁর জন্মদিন ৬ ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদ ভাঙার কলঙ্কে লিপ্ত হওয়ার তারিখ থেকে তিনি তাঁর জন্মদিবস সরিয়ে এনেছেন অন্য কোনও তারিখে।

যেন এই কলঙ্কের অন্ধকারের পরই সভ্যতার আলো ফোটার কথা। সেই আলোকময়তার মধ্যে নবজন্ম পাওয়ার আনন্দ কি কম গৌরবের?

সেই প্রাচীন আর্যবাক্য মনে পড়ছে, তমসা-র থেকে আমায় আলোকে নিয়ে চলো।

৯ ডিসেম্বর, ২০১২

বিচিত্র বিশেষ বর্ষপূর্তি সংখ্যা

'বিচিত্র' শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণের মধ্যেই আছে এক বিপুল বিচিত্রের সন্ধান। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা বর্ণনা দিচ্ছেন। তার মধ্যে 'বিশেষ চিত্র'-ও আছে, আবার 'নানাচিত্রময়'-ও আছে।

মোটের ওপর বোঝা গেল যে, আমাদের জীবনচিত্রের ধারাবাহিকতায় যখনই প্রবেশ করে কোনও অপ্রত্যাশিত, এবং এক মুহূর্তে চওড়া করে দেয় জীবনের মানে, তা হয়তো কেবল কোনও বিচিত্রেরই কারসাজি।

'নানাচিত্রময়' অর্থাৎ কোলাজ? তবে কোন-কোন 'বিশেষ' চিত্র দিয়ে গঠিত সেই পরমাশ্চর্য ব্যাপ্তি?

বাল্যের স্মৃতিতে ফিরে গেলে মনে পড়ে : বাবা, মা, ভাইয়ের সঙ্গে বেনারস বেড়াতে যাওয়ার কিশোর-স্মৃতি।

দশাশ্বমেধ ঘাটের দেওয়ালগুলো তখনও বিজ্ঞাপনী দেওয়াল-চিত্রে এমনভাবে আচ্ছন্ন হতে শুরু করেনি।

সময়টা ছিল কোনও এক কুয়াশার ভোর। ঘাটে স্নানার্থীর সংখ্যা তেমন নয়। বাবা ছবি তুলছিল এদিক-ওদিক। মা আর চিক্কু বসল গিয়ে একটা চবুতরায়। আমি তখনও সিঁড়ি থেকে সিঁড়িতে লাফানোর মজার সঙ্গে এই বিচিত্রদেশের রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত।

হঠাৎ চোখে পড়ল, এক বিদেশিনী ঘাটের সিঁড়িতে বসে। পরনে জয়পুরী প্রিন্টের সুতির স্কার্ট এবং কুর্তা, আপনমনে গঙ্গার সামনে বসে সেতার বাজিয়ে চলেছেন।

ভোরবেলার মন্দিরের ঘণ্টা, পায়রাদের ক্রমিক অর্ধচন্দ্রাকার আকাশভ্রমণ, বেনারসের স্থানীয় স্নানার্থীদের মধ্যে বসে থাকা ওই একাকিনী শ্বেতাঙ্গিনীকে মেলাতে পারছিলাম না মনে-মনে; অথচ দৃশ্যটির চৌম্বকশক্তির আকর্ষণ আমাদের ক্ষণেকের জন্য স্থাণুবৎ করে দিয়েছিল।

সেই কিশোর বয়সে 'হিপি' নামটা শেখা হয়নি তখনও। আর বিদেশিনীর হাতের সেতারটির উৎসও নিতান্তই বিস্ময়কর ভাবে অজানা।

কিছু দিন আগে আমাদের পৃথিবীর এক শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব যখন তাঁর সেতারের সাহচর্য থেকে চিরবিদায় নিলেন, তখন মনে হয়েছিল পৃথিবীময় অজস্র সেতারের আশীর্বাদ নিজে হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন ওই মানুষটি। তখন কৈশোরের সেই বিচিত্র স্মৃতি আরও কতগুলো বিচিত্রতর সিঁড়ি খুঁজে পেল।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর গোড়ায় নৃত্যশিল্পী, তারপর ভুবনবিদিত সেতারবাদক। আগাগোড়া ধ্রুপদী

সংগীতচর্চার মধ্যে লিপ্ত জীবনের মধ্যে থেকে কখন যে তিনি এক অপার্থিব সরলতায় বিষণ্ণ করেছেন 'পথের পাঁচালী'-কে, 'আকাশবাণী'-র প্রভাতী সুর দিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছেন লক্ষ-লক্ষ ভারতবাসীর এবং ভারতের বুকে কত সন্ধ্যা আগমনের মঙ্গলশঙ্খ হয়ে উঠেছে তাঁর 'দূরদর্শন'-এর ভূমিকা-সংগীত—সে কী কম বিচিত্র! যে বিশাল বিস্তারে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যাপ্তি, তার মধ্যে থেকে কি এক সংক্ষিপ্ত নির্যাস দিয়ে ভারতবাসীর দৈনন্দিনতাকে পুনর্রচিত করলেন এই বিচিত্র-মানব—কে জানে? তাঁর তো কোনও বিজ্ঞাপনী তালিম ছিল না।

'দীন যথা যায় দূর, তীর্থ দরশনে
রাজেন্দ্র সঙ্গমে.....'

এই অপূর্ব বিচিত্র-কবিও আমাদের শেখাতে পারলেন না যে, দেশ-বিদেশে বেড়াতে গিয়ে কেবল জাদুঘর দেখে ফিরে আসাটাই সব নয়।

সুইডেনে গিয়ে তো কোনও দিন চেষ্টা করিনি ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর বাড়ি খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে দেখা করার।

হয়তো দেখা করতেন না। আবার এত দূর থেকে এসেছি শুনলে করতেও তো পারতেন।

কমবার তো লস অ্যাঞ্জেলস যাইনি।

ওখানকার প্রভাবশালী বিত্তবান বাঙালি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপও হয়েছে। তাঁরা অত্যন্ত সহৃদয়ে 'ইউনিভার্সাল স্টুডিও' দেখাতে নিয়ে গিয়েছেন, সঙ্গী হয়েছেন 'ডিজ্‌নিল্যান্ড' যাত্রার।

একবারও কেন মনে হয়নি, এই শহরে রবিশঙ্কর থাকেন—একবার গিয়ে দেখা করিই না তাঁর সঙ্গে!

'বিচিত্র' শব্দটির অন্য একটি সংজ্ঞা দিচ্ছেন হরিচরণ—'বিকৃতানন।'

মানবস্বভাবের এই অলস, নিষ্কর্মা বিকৃত-রূপকেই আমরা 'বিচিত্র' বলে অভিবাদন করেছি বহু দিন।

এবার নতুন বছরে সময় হল বিচিত্রের বৈভবকে স্পর্শ করার।

—'হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ যেন আমাকে সর্বদা রক্ষা করে।'

২৩ ডিসেম্বর, ২০১২

চিয়ার্স

এই বছরকে বিদায় জানাতে এবং নতুন বছরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের বর্ষশেষ সংখ্যা—চিয়ার্স।

কারণ বিগত এবং আগামী ক'দিনের মধ্যে নানা দিবা ও নৈশভোজের নিতান্তই অপরিহার্য উপাদানটি হল 'সুরা'।

বছরের শেষ সংখ্যা তাই আমরা সুরা-র উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম। আমার ছত্রপতি মাস্টারমশাইকে নিতান্ত জ্বালাতন করে 'ঋগ্বেদ সংহিতা'-র এই সূক্ত দু'টি জোগাড় করা গিয়েছে।

তবে, বিষয়টা যেহেতু—মদ, শিবাজী'র (বন্দ্যোপাধ্যায়) পক্ষ থেকে সহযোগিতাটা একটা বিশেষ আগ্রহের আকার নিল।

সূক্ত দু'টির অনুবাদ উদ্ধৃত করছি।

ঋগ্বেদ-১১৬ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। অগ্নিযুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

হে বলবানদের অগ্রগণ্য ইন্দ্র। প্রভূত বল লাভের জন্য সোম পান করো। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে ডাকা হচ্ছে, পান করো। মধু পান করো, তৃপ্তি লাভ করে বৃষ্টি বর্ষণ করো।

হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, এর সঙ্গে আহার্য দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হচ্ছে, তুমি পান করো। কল্যাণ দান করো, মনে-মনে আনন্দ লাভ করো, ধন ও সৌভাগ্য দানের জন্য উন্মুখ হও।

হে ইন্দ্র! স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত করুক। পার্থিব মানবের দ্বারা যা প্রস্তুত হয়, তা-ও তোমাকে মত্ত করুক।

হে শত্রু নিধনকারী! মধুতুল্য সোম ঢালা হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে পাত্র। সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্বক রাক্ষসদের ভূমিশায়ী করো, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এ সোম দিচ্ছি।

এর থেকে প্রায় বোঝা যায় মিলিটারি ক্যান্টিনে মদের দাম কম কেন!

অন্য একটি সূক্ত-য় যাই—

১১৯ সূক্ত।। লবরূপী ইন্দ্র দেবতা। তিনিই ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আমার বড় ইচ্ছে যে গো-অশ্ব দান করি। আমি অনেক সোম-পান করেছি।

বায়ু যেমন বৃক্ষকে উন্নমিত করে তেমনই সোমরস আমাকে উন্নমিত করেছে।

আমি অনেক সোম পান করেছি।

দুই পৃথিবী মিলিত হয়ে আমার এক পার্শ্বেরও সমান হবে না। আমি অনেক সোম পান করেছি।

আমার এইরূপ ক্ষমতা যে, যদি চাও, আমি পৃথিবীকে একদিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে পারি।

আমি অনেক সোম পান করেছি।

এ পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করতে পারি। যে কোনও স্থান আমি ধ্বংস করতে পারি। আমি অনেক সোম পান করেছি।

পড়লে মনে হয়, এ তো কত চেনা! মাতালের এমন প্রলাপ তো কত শুনেছি!

কিন্তু মত্ত সংলাপের প্রতিটি বাক্যের পর 'আমি কিন্তু মদ খেয়ে বলছি না'-র অকৃত্রিম পুনরাবৃত্তি যে 'ঋগ্বেদ'-এও পাওয়া যাবে—এটা ভাবিনি।

তারপরে ভাবি, ভাবিনি-ই বা কেন?

আদতে তো তারাও মানুষ।

সমস্ত মানুষের জন্য ২০১৩ সুন্দর হোক। প্রীতিময় হোক।

রসালো হোক সমস্ত জীবন।

শুভ ২০১৩।

৩০ ডিসেম্বর, ২০১২

প্রখর তাপে, মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে, শুকনো গাছের ডালের শিরা-উপশিরা বেয়ে, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের করুণ আশ্বাসবাণীর অবিচল প্রার্থনায় বৈশাখ এল। আমরা পা রাখলাম ১৪২০-তে।

পয়লা জানুয়ারি-র ক্যালেন্ডারের প্রতিপত্তিও এখন কমে এসেছে। অনেক মানুষকেই দেখি মোবাইলের ক্যালেন্ডারের ছন্দেই বর্ষযাপন করছেন। কারও বাড়িতেই আর দেওয়াল ক্যালেন্ডার চোখে পড়ে না। সুদৃশ্য টেবিল-ক্যালেন্ডার এখন গৃহসজ্জার উপকরণ মাত্র।

ওষুধের কোম্পানি থেকে ফি-বছর যে একপাতা ক্যালেন্ডার হত, সেটাও বোধহয় স্মৃতি হতে চলেছে।

আর বাংলা ক্যালেন্ডার? তার যে কী দুর্দশা! চিরকাল আমাদের বাড়ির মাসকাবারি বাজার আসে যে-দোকান থেকে, সেই লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ক্যালেন্ডার ছিল আমাদের পারিবারিক দিনযাপনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

বিশেষ করে ঠাকুমা যতদিন বেঁচে।

হিন্দু ঘরের বিধবা—তাঁর জীবনটাই চলত একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অম্বুবাচী-র রাস্তা ধরে।

বাংলা ক্যালেন্ডারে আমাদের একটাই কৌতূহল—পুজোর দিনগুলো কবে?

তারপর যখন মা সযত্নে সব ক'টা রোগ এক করে আশীর্বাদী গয়নার মতো আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছে এক-এক করে, বাতের ব্যথার প্রকোপটা ভাল করে চিনতে বেশ ক'দিন ওই বাংলা ক্যালেন্ডারের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

এখন সত্যিই আমার নিজেরও রোমান ক্যালেন্ডার তেমন প্রয়োজন না-হলেও, একটা বাংলা ক্যালেন্ডারের জন্য মনটা মাঝে-মাঝে হা-পিত্যেশ করে।

—বাংলা বছরটা যে কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে—চটপট রোমান ক্যালেন্ডারের শেষ দু'টি সংখ্যার সঙ্গে মনে-মনে সাত জুড়ে নিয়ে অঙ্ক মেলাই।

বাংলা প্রকাশনা সংস্থাগুলোর কাছে বিনীত অনুরোধ—একটা ভাল বাংলা ক্যালেন্ডার করবেন? খুব দুর্মূল্য না-হলে অনেকেই কিনবেন।

থিম পুজো দিয়ে মহিষাসুর মর্দিনীর প্রতিপত্তি যাঁরা সদর্পে ফিরিয়ে এনেছেন মহানগরীর বুকে, তাঁরাও ভেবে দেখতে পারেন।

শুভ ১৪২০।

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

'ফ্লাইওভার'-এর বাংলা নাম 'উড়ালপুল' কে দিয়েছিলেন আমি জানি না। কিন্তু বাংলা নামটি যে খাসা হয়েছিল, সেটা মেনে নিতে কোনও বাধা নেই।

ছোটবেলায় রবীন্দ্র সরোবর লেকের কাছে বেড়াতে গেলে অমোঘ আকর্ষণ ছিল একটা লিলিপুল দেখতে যাওয়ার। তখন সবে Gulliver's Travel পড়েছি। লিলিপুট সম্পর্কে অপরিমেয় আগ্রহ। আর লেকের ওপর নিভৃত এই ঝোলানো সাঁকোটি যে ছোট, হাওড়া ব্রিজের মতো বাজখাঁই নয়—কেন যেন লিলিপুল-টা লিলিপুটদের দেশে যাওয়ার সেতু হয়েছিল, আমার কল্পনায়।

বৃথাই চেষ্টা। কবি সারা জীবন তাঁর 'রাজার বাড়ি' খুঁজে গেলেন, আর আমি খুঁজে মরলাম লিলিপুলের ওপারে নাগরিকদের।

প্রথম ফ্লাইওভার-এ চড়লাম আমেরিকার সান ফ্রান্‌সিসকো-তে।

তখন রাত হয়ে গিয়েছে। প্লেন থেকে সবে নেমে হোটেলমুখী আমি। রাত্তিরের আঁধারের মধ্যে

দিয়ে সমান্তরাল দু'টি পথ। একটা পথ হলুদ আলোর, অন্যটি লাল আলোর। হেড লাইট, টেল লাইট যে আগে দেখিনি—তা নয়।

কিন্তু ফ্লাইওভারের ঢালের এপাশ থেকে অন্য পাশটা যে কেবল কালো রাত্রির বুকে চলন্ত হলুদ আর লাল আলোকসজ্জা—সেটা কেমন যেন অদ্ভুত মনোহর হয়ে উঠেছিল আমার আমেরিকায় পা রাখার প্রথম রাতে।

তারপর হঠাৎ করে একদিন দেখলাম আমাদের বাড়ির পাশটিতেই লেক গার্ডেন্স ফ্লাইওভার তৈরির শুরু। আমাদের বাড়িটাও ভাঙা পড়বে কিনা, এই নিয়ে বাবা-মা'কে উদ্বিগ্ন হতেও দেখেছি।

এখন লেক গার্ডেন্স ফ্লাইওভার ব্যবহার করাটাই আমার জন্য সব থেকে সুবিধাজনক।

মা এই ফ্লাইওভার-টা দেখে যেতে পারেনি।

কারণ ততদিনে পৃথিবীর দীর্ঘতম, অনন্ত উড়ালপুলে মা'র যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে।

১৭ মার্চ, ২০১৩

'বৃন্দাবন' নামটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে ছোটবেলা থেকেই আমার মনে নানা প্রশ্ন। আর, স্বকল্পিত অনেক উত্তর—যার সঙ্গে অবধারিত ভাবে জড়িয়ে আছে নানা ছবি—Illustrated বৈষ্ণব পদাবলি থেকে পাহাড়ি Miniature সব।

বৃন্দা-কে তো চিরকাল 'দূতী' বলে জেনে এসেছি—আমাদের বাংলায় যার নাম 'বিন্দে দূতী'—যে কিনা রাধাকৃষ্ণর প্রণয়বার্তা-বাহিনী, যে কিনা রাধার বিরহের বাণী নিয়ে ছুটে যায় কৃষ্ণর কাছে, আবার কৃষ্ণর নানা লাম্পট্যের খবর এনে দেয় রাধাকে। অতএব সেই কল্পনার বৃন্দাবন কল্পনাতেই থাক। আমার কখনও তেমন ইচ্ছেও হয়নি স্বচক্ষে বৃন্দাবন দেখার।

ছেলেবেলায় নীললোহিতের কোনও একটা লেখায় পড়েছিলাম মনে আছে—যে, বৃন্দাবন-দর্শনার্থী নীললোহিত'কে একটা দোলনার সামনে এনে গাইড বলেছিলেন—এখানেই কৃষ্ণ-রাধা দুলতেন! অন্যান্য ভক্তপ্রাণরা টিপটিপ করে প্রণাম করলেন দোলনার খুঁটিতে। আর নীললোহিত তারই মধ্যে দেখতে পেল সেই দোলনার ধাতব খুঁটির গায়ে টাটা স্টিল-এর ছাপ।

বৃন্দাবন সম্পর্কে আরেকটা গল্প আমার ভারি পছন্দ।

মীরা রাজপুতানা থেকে এসেছেন বৃন্দাবনে।

তখন শ্রীচৈতন্যের দুই মহাশিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে। মীরা তাঁদের দর্শন কামনা করে দূত পাঠালেন।

দূত ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। রূপ-সনাতন মীরা'র সঙ্গে সাক্ষাতে অপারগ। কেননা তাঁরা যে সন্ন্যাসী—অতএব নারীমুখ দর্শন তো মহাপাতক।

ফের দূতকে পাঠালেন মীরা তাঁদের কাছে। বলে পাঠালেন—আমি তো জানতাম বৃন্দাবনে একজনই পুরুষ—তিনি শ্রীকৃষ্ণ। আর বাকি সকলেই তো নারী। সেটা কি গোস্বামীদ্বয় বিস্মৃত হয়েছেন?

বৃন্দাবনের নানা গল্প, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক, দিয়ে সাজানো হল এই সংখ্যা।

আবিরে-গুলালে-প্রণয়ে-বিরহে আপনার বসন্তোৎসব নিবিড় হোক।

২৪ মার্চ, ২০১৩

তিস্তার চরে বেলা পড়ে এল।

এখানে খোলা আকাশের তলায় সূর্যের আলো বহুক্ষণ দিনবন্দি।

আর তাই আমরাও প্রকৃতির এই আশীর্বাদ, যতটা সম্ভব উশুল করে নিচ্ছি।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

এই চৈত্রের দিনের শেষ প্রহরের আলোয় কোনও রক্তিম সর্বনাশ ছাড়াই আমার কুড়ি নম্বর ছবির প্রথম শট নেওয়া হয়ে গেল।

আমার এক অনুজ বন্ধু সারণ 'তিতলি' ছবির পরিচালনা বিভাগে ছিল।

মনে আছে, ছবির ফার্স্ট শট নেওয়ামাত্র বলে উঠেছিল,

—ছবি শেষ।

কৌতূহলী আমরা, আর সারণের আশ্বাস,

—শুরু মানেই তো শেষ।

আজ চৈত্র মাসের বর্ষবিদায়ের শেষ রোববার সেই কথাটাই উল্টো করে বলি।

শেষ মানেই তো শুরু। বিদায় ১৪১৯।

৭ এপ্রিল, ২০১৩

আমরা বড় হয়েছিলাম বাঙালি মধ্যবিত্তের চরিত্রগত চিহ্নবেষ্টনের মধ্যে। রোববারের দুপুরবেলার মেনুটা যেমন বাঁধা ছিল আলু দিয়ে পাঁঠার মাংসের ঝোলে, কিংবা জন্মদিনটা পায়েসে, তেমন বড়দিন-ও আসত তার নিয়মিত কেকের সম্ভার নিয়ে।

তখন পাড়ায়-পাড়ায় কেকের দোকান হয়নি। মন্‌জিনিস বা কুকি জার তো কোন অজানা ভবিষ্যতের গর্ভে।

বড়দিন ছুটির দিন। পিকনিক কিংবা চিড়িয়াখানা যাওয়ার দিন। তার ওপর কেক-টা ছিল উপরি পাওনা। কিন্তু বাৎসরিক উদ্‌যাপন বলেই হয়তো রোববারের মাংসটা যেমন পাড়ার দোকানের বলে জানতাম, বড়দিনের কেকটা কোত্থেকে আসে, সেটা আর জানার প্রয়োজন বোধ করিনি।

মাঝে-মাঝে মা-কে জিগ্যেস করলে, মা বলত—নাহুম।

'নাহুম'! সে আবার কারও নাম হয় না কি? ছড়া কাটলে প্রথমেই যেটা মনে আসত অন্ত্যমিল হিসেবে—সেটা হালুম।

তারপর আরেকটু বড় হয়ে পুজোর বাজারে যখন মা'র সঙ্গী হতে হয়েছে, তখন সেই সময়ের কলকাতার সবথেকে সাহেবি যে-বাজার, নিউ মার্কেট; সেখানে মা'র সঙ্গে যখন ঘুরে বেড়াতাম নানা দোকানের প্যাকেট হাতে, তখনই কোনও একদিন চোখে পড়েছে 'নাহুম'-এর বিখ্যাত সেই কেকের দোকান।

দোকানটা আর পাঁচটা দোকান থেকে অন্যরকম, কিন্তু যে কোনও শাড়ি, জামা, ব্যাগ, ছাতার গলির মধ্যে থেকে হঠাৎ যে দেখা দেবে আমার বড়দিনের উপহার—সেটা আমার পছন্দ না অপছন্দ ছিল এখন আর মনে পড়ে না।

কয়েক সপ্তাহ আগে ডেভিড নাহুম-এর মৃত্যুসংবাদ পড়লাম কাগজে। একটা স্মরণসভা-ও হয়েছিল শুনলাম—যাওয়া হয়ে উঠল না।

কলকাতার শেষ এক ডজন ইহুদি-র মধ্যে একজন চলে গেলেন।

এক সময়ে দুর্গাপুজোয় নিয়মিত বাজিয়ে এসেছেন মুসলমান সানাইওয়ালা—তাতে উৎসব উপভোগে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি।

নিউ মার্কেটের এই ইহুদিও একটা সময় অবধি প্রধান খ্রিস্টান উৎসবে কলকাতা-সুদ্ধু মানুষকে বড়দিনের কেক খাইয়েছেন—এই জন্যই কলকাতা তাঁর কাছে আজও কৃতজ্ঞ।

২৮ এপ্রিল, ২০১৩

‘খেরোর খাতা’-র জন্ম হয়েছিল কবে, কোথায়, কোন নববর্ষের সকালে—বণিক সম্প্রদায়ের হাত ধরে, সে ইতিহাসবিদরা বলতে পারবেন।

কিন্তু আমাদের কাছে, আমাদের প্রজন্মের শালু দিয়ে মোড়া এই অনাড়ম্বর লাল খাতাটি আশ্চর্যরকম ভাবে ফিরে এসেছে এক সম্পূর্ণ অনন্য রূপে।

ব্যবসায়িকদের জন্য সে-খাতা ছিল মূলত বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র, প্রতি পয়লা বৈশাখে তার আবাহন হত নতুন করে, এবং গত বছরের লাল খেরোর খাতাটির স্থান হত তার জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে।

আমি যে খেরোর খাতার কথা বলছি তার মূল্য দিনে-দিনে বেড়েছে—স্মৃতিতে, সম্ভারে ও শিল্পে। ধীরে-ধীরে লাল রঙের শালু কালচে হয়েছে, যেন শিল্পসৃষ্টির সমস্ত সুষমাতেই অমলিন হয়েছে এর প্রচ্ছদ।

আমার কাছে খেরোর খাতা মানে অবধারিত ভাবে আমার মহানায়ক—সত্যজিৎ রায়ের। সেটাই যেন প্রথম-প্রথম ছিল আমার সিনেমা-করিয়ে হওয়ার বীজমন্ত্র। জানতাম যে কেবল ওই বিশেষ খাতাটিই নয়, তার প্রতিটি পৃষ্ঠা জুড়ে এক-একটি বিস্ময়কর পাণ্ডুলিপিতে লুকিয়ে আছে আমার জীবনের অভিলাষ।

খেরোর খাতা কেবল কোনও চিত্রনাট্যের খসড়া নয়। সিনেমাকে যতভাবে, যতরকম করে আয়ত্তাধীন করা যায়, তার অমূল্য নিদর্শন এই খাতাগুলো।

কিছু-কিছু পৃষ্ঠার অনুলিপি এই সংখ্যায় ছাপা গেল—আমার দীক্ষামন্ত্র আজ যত সামান্য আকারেই হোক, ভাগ করে নিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে।

৫ মে, ২০১৩

দিল্লিতে জাতীয় পুরস্কার আনতে গিয়ে আবার সেই একই বিভ্রাট।

সরকার আমাদের পরম আপ্যায়নে পাঁচতারা হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করেন। আর আমাদের দেশের পাঁচতারা হোটেলগুলো পৃথিবীর অন্যান্য আধুনিকতম হোটেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সবার প্রথমে যেটা করে—সেটা হল ঘরগুলোকে Centrally Air Conditioned করতে গিয়ে সিলিং ফ্যানগুলোকে ‘হাওয়া’ করে দেওয়া।

কলকাতার মধ্যবিত্ত বাড়িতে পাখার সঙ্গে বড়-হয়ে-ওঠা আমার পঞ্চাশ বছরের মন হঠাৎ করে এসি-র দৌলতে পাখাকে বিদায় করতে পারে না। অতএব এখন ভিনদেশে গেলেই ভয় করে ফ্যানটা পাব তো!

বিদেশে চলচ্চিত্রোৎসবে যখন যাই, আগে থেকে ই-মেল করে দিই যে, প্লেনের টিকিটের মতোই ঘরে একটা পাখা আমার দরকার—সে টেবিল ফ্যান-ই হোক আর পেডেস্টাল ফ্যান-ই হোক।

এবার 'সত্যান্বেষী'-র শুটিংয়ের মাঝখান থেকে কোনওরকমে ছুটি করে গিয়েছি। আগে থেকে এটা জানানোর কথা আর মনে ছিল না।

দিল্লি পৌঁছে হোটেলের ঘরে দুরুদুরু বক্ষে প্রবেশ। আশঙ্কা সত্যি। হোটেল কর্তৃপক্ষকে করুণ অনুরোধ—যদি একটা টেবিল ফ্যান...। হা হতোস্মি!

বন্ধুবান্ধবদের ফোন করলাম—তাদের সবার বাড়িতেই সিলিং ফ্যান আছে, পেডেস্টাল ফ্যান নেই।

শেষমেশ সন্ধান মিলল পতৌদি-র বেগম শর্মিলা ঠাকুরের কাছে।

সেদিন এমনিতেই রিঙ্কুদি'র (শর্মিলা ঠাকুর) বাড়িতে নৈশভোজের নেমন্তন্ন ছিল।

সেসব যখন সারা হয়ে গেল, বেগমের নির্দেশে তাঁর বিপুল পরিচারক বাহিনী কোনওক্রমে একটা পেডেস্টাল ফ্যান ধরাধরি করে তুলে দিল গাড়ির পেছনের সিটে।

বেশ রাত হয়েছে। গাড়ি তখন ছাড়বে। গেটের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন রিঙ্কুদি আমাকে বিদায় জানাতে।

বসন্ত বিহারের ওই বিশাল দ্বিতল বাড়িটির সামনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন ষাটোর্ধ্ব শর্মিলা ঠাকুর। গাড়ি ছাড়লেই আবার গেট ঠেলে ঢুকে যাবেন তাঁর একাকিত্বের জগতে।

'সীমাবদ্ধ'-র শেষ দৃশ্যটা মনে পড়ল। শ্যামলেন্দুর দেওয়া হাতঘড়িটা খুলে ফেলে টেবিলের ওপর রেখে দিল সুদর্শনা। টপ শটে ফ্রেম জুড়ে সে একা।

তখনই মনে পড়ল, 'সীমাবদ্ধ'-র গল্পটাও তো একটা পাখার কারখানা নিয়েই!

১২ মে, ২০১৩

শৈশবের অনেকটা সময় জুড়ে যামিনী রায়কে আমি ভাবতাম মহিলা। নইলে 'যামিনী' কোনও পুরুষমানুষের নাম হয়!

আর শিল্পী বাবা-মা'র দৌলতে মুখে কথা ফোটার আগে থেকে ছবি দেখছি। যামিনী রায়ের মহিলারা কেমন বড়-বড় চোখ, সোজা সটান দাঁড়িয়ে—যেন মা দুগ্গার মর্ত-পরিবার। ঠাকুরের মতো মুখ-চোখ নিয়ে মা শিশুকে কোলে নিয়েছে। তিন মহিলা জটলা করেছে একসঙ্গে।

তখনও এটা বোঝার বয়স হয়নি যে, মেয়েরা মেয়েদের ছবি অত আঁকে না, যত না আঁকে পুরুষ! কেমন চমৎকার ছিমছাম সাজ। তুলির তিনটে ছোঁয়ায় কখনও মাথার খোঁপায় ফুল ফোটে।

কখনও চুড়ি হয়ে খালি হাত দু'টোকে সাজায়। আর আঁচলটা যখন কেমন এক জাদুটানে ঘোমটা হয়ে যায়, তখন পটুয়াকে মেয়ে না-ভেবে উপায় আছে!

একদিন আমার কল্পনার জগৎটা খান-খান হল বাবার অল্প বয়সের একটা ছবি দেখে। বাবা বসে আছে একটা মোড়ায়। আর বাবার সামনে মুখোমুখি বসে এক সুদর্শন পলিতকেশ বৃদ্ধ। জানলাম, এই বয়স্ক মানুষটিই—যামিনী রায়। তারপর কোথায় যে কোন আলমারির কোন কোণে ছবিটা গুঁজে রেখে বাবা-মা চিরতরে পাড়ি দিল, সে এক অন্য গল্প।

যামিনী রায়ের ক্ষণিক-দেখা ফোটোগ্রাফ'টা আর খুঁজে পাইনি।

তবু যামিনী রায় বেঁচে রইলেন। 'সোনার কেল্লা' দেখে এসে বন্ধুরা বুঁদ হয়ে আছে জয়সলমীর অ্যাডভেঞ্চারে। আর আমার চোখ ধরে রেখেছে ফেলুদা'র বসার ঘরে একটা বিরাট যামিনী রায়। শুনেছি, ওটা সত্যজিৎ রায় নিজে এঁকে দিয়েছিলেন।

ফেলুদা এখন ইলোরা যাচ্ছে, হংকং যাচ্ছে, জঙ্গলে যাচ্ছে, গোরস্থানে যাচ্ছে। তবু কখন যে একবার নিজের বসার ঘরে ফিরবে তার অপেক্ষায় থাকি। কারণ, ফেলুদা এই একটাই ভাল কাজ করেছে। দেওয়াল থেকে যামিনী রায়টা সরায়নি।

১৯ মে, ২০১৩

মাদুর বস্তুটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল এবং মুগ্ধতা প্রায় ছোটবেলা থেকেই।

মাদুরের ব্যবহার কবে কোথায় প্রথম দেখেছি, ঠাকুমার ঘরে, না আমাদের সোদপুরের পৈতৃক বাড়িতে—তা আর মনে পড়ে না।

কিন্তু মাদুর সম্পর্কে আমার আগ্রহ বার-বার ঘন বুনোটের নতুন চেহারা নিয়েছে নানাভাবে।

আমার ছোটবেলায়, আমাদের বাড়িতে, রান্নার কাজ করতেন পঞ্চুপিসি—এক বয়স্ক বিধবা। তিনি এসেই ছিলেন সঙ্গে তাঁর পানের ডিবেটুকু আর তেল চকচকে একটা মাদুর নিয়ে।

পঞ্চুপিসি মাদুরে শুয়েই ঘুমোতেন। মা তোশক করিয়ে দিতে চেয়েছিল—পঞ্চুপিসি রাজি হননি।

আবার আমাদের বাড়ির এখন যে গিন্নি, ছবি—(প্রায় আমার সমবয়সি), যে প্রথম আমাদের বাড়িতে পা রেখেছিল তার চোদ্দো বছর বয়সে—যখন জানলাম সে এসেইছে মেদিনীপুরের একটি মাদুরশিল্পী পরিবার থেকে, আমার কেমন যেন বিস্ময়কর লাগত!

বহুবার ছবি'কে আমি নানা অনুরোধ, উপরোধ, আদেশ, প্ররোচনা দিয়ে চেষ্টা করেছি কেবল আমার সামনে একটু মাদুর বুনে দেখাতে। ছবি আঁচল দিয়ে মুখের হাসিটুকু ঢেকে রান্নাঘরে পালিয়েছে যেন আমি কি না কি অসম্ভব কৌতুকপূর্ণ কিছু বলেছি!

মাদুরের সঙ্গে গালিচা বা কার্পেটের একটা সূক্ষ্ম তফাত আছে। আভিজাত্যের দিক দিয়ে কার্পেট-এর মূল্য হয়তো অনেকটা, আবার মাদুর যেন তার সহজতার জন্যই পবিত্র। এ যেন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কার্পেট, তা সে যতই দামি হোক না কেন, তার মূল স্থান আমাদের পায়ের নীচে। দেওয়ালে কার্পেট টাঙানোর ঔপনিবেশিক কায়দা যদিও এখন নানা ধনী বাড়িতে দেখতে পাই।

তার পরিপ্রেক্ষিতে মাদুরের স্থান অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

মাদুর আক্ষরিক অর্থেই আসন। শোওয়ার কিংবা বসার।

তাকে পায়ের তলায় রেখে তার ওপর আসবাব রাখার নয়। মাদুর পিছলে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারে।

তারপর এক সময়ে হয়তো-বা রবি ঠাকুরের জাপান ভ্রমণের পর আমদানি হল দেওয়ালের অর্ধেকটুকু জুড়ে মাদুরের skirting। ধনীর বাড়ির দেওয়ালের কাঠের প্যানেলিং ঝরে গিয়ে জায়গা করেছিল এই নব্য রুচির। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি গেলে সেই মাদুরের দেওয়াল আচ্ছাদন আজও দেখা যায়।

নানা ধরনের মাদুর, নকশি মাদুর, নানারকম চওড়া পাড়ের মাদুর, মাদ্রাজ বা কেরলের মাদুর— মাদুর ইতিহাস সুদূরপ্রসারী।

মাদুরের কাছে আমার একটা জিনিসই শিখতে বড় ইচ্ছে হয়। নম্রতা।

দেখি, এ জীবনে হয় কি না!

২৬ মে, ২০১৩

কোত্থেকে যে 'চণ্ডীমণ্ডপ' নাম হল জায়গাটার, ভেবেই পাই না।

চিরকাল এই চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপুজো, বাসন্তীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে এসেছে।

আর, নামকরণের বেলায় দেবীর এই তিনটে নাম সযত্নে সরিয়ে রেখে নাম দেওয়া হল 'চণ্ডীমণ্ডপ'।

একটাই সম্ভাব্য উত্তর মাথায় আসে—যে, গ্রামীণ প্রবীণরা 'ণ্ড' দিয়ে অনুপ্রাসের লোভটুকু ছাড়তে পারেননি।

কিছুকাল আগে অবধি পুজোর ক'দিন এই চণ্ডীমণ্ডপের এক মনোহারিণী রূপ। আর পুজো-টুজো চুকে গেলেই ঠা-ঠা দুপুরে সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে কোনও সুদূরযাত্রী পথিক, কিংবা একটু ছায়ার লোভে গ্রামের কুকুরগুলো। রোদ পড়লে বিকেলবেলা জমত বয়স্কদের আড্ডা। আবার কখনও অঞ্চলের নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় কোনও স্খলন ধরা পড়লে এই চণ্ডীমণ্ডপ ই হয়ে উঠত বিচারমঞ্চ।

আমরা গ্রিসের মার্কেট প্লেস নিয়ে এত কথা বলি, তত্ত্বায়ন করি—চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে নিতান্তই গেঁয়ো যোগী।

কিন্তু খণ্ড-খণ্ড করে গণতান্ত্রিক চেতনার এক তীর্থমালা এই চণ্ডীমণ্ডপগুলোই। সর্বাঙ্গীণভাবে।

আজ গ্রামের চেহারা অন্যরকম। চণ্ডীমণ্ডপকে আড়াল করেছে পার্টি অফিস। ভোটযন্ত্রের গণতন্ত্র তাদের নিজের-নিজের পেয়াদা বসিয়েছে এই পার্টি অফিসে।

চণ্ডীমণ্ডপগুলো কোথায়? নিতান্তই জরাজীর্ণ, নিজের অবশিষ্ট হাড়পাঁজর নিয়ে কোনওরকমে সংকুচিত হয়ে আছে।

তা হলে সত্যিই বুঝি জনতার দরবার আজ অপাংক্তেয় এবং অর্বাচীন!

তবু, সভ্যতার এক সুস্থ সময়ের কথা স্মরণ করে এই বাতিল-হয়ে-যাওয়া মণ্ডপগুলোকে গণতন্ত্রের 'পুণ্যতীর্থ' বলে নমস্কার জানাই।

২ জুন, ২০১৩